মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

চতুর্বিংশ বর্ষ

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।

১৩২০।

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

মাসিকপত্র ও সমালো ন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

চতুর্বিংশ বর্ষ

১৩২০

বৈশাখ হইতে আশ্বিন

কলিকাতা,

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

চচিত্র-সূচী

সাগরিকা।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

গৌড়ীয় প্রভাব।

হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইবার পর, মুসলমান-শাসন প্রচলিত হইবার আরম্ভকাল পর্য্যন্ত, প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল। এই পাঁচশত বৎসর আমাদের ইতিহাসের 'মধ্যযুগ'। ইহার প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য এই যুগ গৌরবহীন অধঃপতন-যুগ বলিয়া কথিত হইতেছে। ইহার সকল কথাই যেন অনিবার্য্য অধঃপতনের কথা;—তাহা যেন পতনোন্মুখ জীর্ণ মন্দিরের স্খলন-প্রবণ অন্তঃসার-শূন্যতার কথা! যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় এই যুগের পূর্ব্বেই প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে;—যাঁহারা শিল্পের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই যুগের পূর্ব্বেই কলাকৌশল-বিকাশের শেষ নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। সুতরাং 'মধ্যযুগ' অকীর্ত্তিকর অধঃপতন-যুগ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে।

অন্য প্রদেশের কথা যেরূপ হউক না কেন, প্রাচ্য-ভারতের পক্ষে 'মধ্যযুগ' নিরবচ্ছিন্ন অধঃপতন-যুগ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। এই যুগই বরং উল্লেখযোগ্য গৌরব-যুগ,—গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের বিজয়-যুগ। গৌড় জনপদ চিরদিনই পরানুকরণ-পরায়ণ—এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা তথ্যানুসন্ধানের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। একবার এই ধারণা পরিত্যাগ করিয়া, নিরপেক্ষভাবে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও অনেক উল্লেখযোগ্য পূর্ব্বগৌরবের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে।

যতদিনের ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারিয়াছে, ততদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেই অতি দীর্ঘকালস্থায়ী সাম্রাজ্য-গৌরবের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সকল প্রদেশেই কখন না কখন প্রবল প্রতাপশালী বিজয়ী-রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংস-দশায় নিপতিত হইয়াছে। সে সকল সাম্রাজ্য যেন বুদ্বুদের মত সহসা উত্থিত হইয়া,—দেখিতে না দেখিতে,—বুদ্বুদের মত সহসা বিলীন হইয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যাপারকে

নিতান্ত অনিবার্য্য মনে করিয়া, জনসমাজ যেন "মনঃস্থির" করিয়াছে ;—বিজ্ঞের মত বুঝিয়াছে এবং বুঝাইয়াছে,—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।"

পুরাতন সাম্রাজ্যের যাহা কিছু গৌরব, তাহা যেন ব্যক্তিগত গৌরব বলিয়াই অনুভূত হইয়াছে। তাহার সহিত জন-সমাজের সম্পর্ক যেন নিতান্ত অল্প, অথবা একেবারে অপরিজ্ঞাত। তাহার কথা যেন কেবল যদুপতির কথা,—রঘুপতির কথা,—তাহার কথা যেন চন্দ্রগুপ্তের কথা,—চাণক্যের কথা,—অশোকের কথা,—উপগুপ্তের কথা,—সমুদ্রগুপ্তের কথা,—অথবা হর্ষবর্দ্ধনের কথা। জনসাধারণ যেন নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় তাঁহাদের উত্থান-পতন দর্শন করিয়া আসিয়াছে!

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে, [এ সকল বিষয়ে,] কিছু কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী বর্ত্তমান ছিল;—বিবিধ বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়াও, দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহার সহিত রাজা-প্রজার সমান সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে যে সকল ঐতিহাসিক যুগ অতীত হইয়া গিয়াছিল, তাহার সকল যুগেই জন-সমাজের হৃদয়ে যে সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, সে সংস্কার ব্যক্তি চিনিত,—সম্প্রদায় চিনিত,—আর্য্য-অনার্য্য চিনিত,—স্বধর্ম্ম চিনিত,—চিনিত না কেবল স্বদেশ। তাহা কাহারও আদর্শ হইতে পারে নাই। আদর্শ হইয়াছিল ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর। তাহার অনুসরণই জনসমাজকে কৃতার্থম্মন্য করিত।

প্রাচ্য-ভারত ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচ্য-ভারত শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত ছিল। প্রাচ্য-ভারত শৌর্য্য-বীর্য্যেও ভারত-বিখ্যাত ছিল। কিন্তু প্রাচ্য-ভারত তাহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করিত বলিয়া বোধ হয় না। স্বচ্ছন্দ-বনজাত-শাকান্ন-পরিতৃপ্ত প্রাচ্য-ভারতের বহির্দৃষ্টি যেন তাহার অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল! অচল অটল হিমাচল-কলেবর যাহার অভেদ্য দুর্গ প্রাচীর, উত্তাল-তরঙ্গ-লীলাময় অতলস্পর্শ মহাসাগর যাহার প্রবল পরিখা, সেই বঙ্গভূমি প্রকৃতি-প্রদত্ত বিবিধ ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গরীয়সী হইয়াও, বহুকাল স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া, আর্য্যাবর্ত্তের কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যিনি যখন আর্য্যাবর্ত্তে প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইতেন, তখন বঙ্গভূমিও তাঁহাকেই প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইত।

মধ্যযুগের প্রারম্ভে,—মাৎস্য ন্যায়ের উৎপীড়নে,—আপন অসহায় অবস্থার

শোচনীয় পরিণামে পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া, আত্মচেষ্টায় আত্মরক্ষার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রাচ্য-ভারত ক্রমে ক্রমে জাগরণ লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্য ন্যায় দূরীভূত করিবার জন্য" গোপালদেবকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া, প্রাচ্য-ভারতের স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাহারা যুগে যুগে পরপদানত হইত, তাহারা এইরূপে দিগ্বিজয়-সাধনে বহির্গত হইয়াছিল;—যাহারা প্রণাম করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা এইরূপে সকল-উত্তরাপথে [আর্য্যাবর্ত্তে] প্রণম্য বলিয়া এক অভিনব পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল।

কিয়ৎকালের জন্য গৌড়ীয় বিজয়-বাহিনীর অপ্রতিহত প্রভাব সর্ব্বত্র অজেয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। গৌড় কবির প্রশস্তি-রচনা-কৌশলে সে কথা কত প্রস্তর-ফলকে ও ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গোপালদেবের সকল-দিক্-বিজিগীষু বীরপুত্র ধর্ম্মপালদেবের "করিগণ-চরণ-বিন্যাসভরে" বসুন্ধরা নিপীড়িতা হইত; মহাসাগরও সে বিজয়যাত্রার গতি-রোধ করিতে পারিত না;—তাঁহার "নাসীর" নামক অগ্রগামী সেনাদলের সমাগম-সংবাদে মোহপ্রাপ্ত হইয়া, কান্যকুব্জের অধীশ্বর সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন;—তাঁহার পুত্র দেবপালদেবের শাসন-ক্ষমতা সকলের নিকটেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তদীয় বীরভ্রাতা বিজয়ী জয়পালের আক্রমণে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি বশ্যতা-স্বীকারে [সন্ধি-বন্ধনে] আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী নরপতি প্রথম বিগ্রহ পালদেব "অজাতশত্রু" ছিলেন। তৎপুত্র নারায়ণপালদেবের "ইন্দীবরশ্যাম অসিপত্র যখন রণস্থলে বিস্ফুরিত হইত, তখন [ভয়াতিশয্যে] শত্রুগণ তাহাকে পীত-লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া দর্শন করিত।" তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ভট্ট-গুরবের প্রবল প্রতাপে শত্রুসেনামণ্ডলী "ভটাভিমান" [যোদ্ধা বলিয়া অহংকার] পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এইরূপে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, তাহার বাহুবলের অভাব ছিল না। কিন্তু বাহুবল অপেক্ষা জ্ঞান-বল আরও দূরবর্ত্তী দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের এই সকল দিগ্বিজয়-ব্যাপার যেন অন্তর্নিহিত সকল শক্তিকে এক সঙ্গে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ফলে,—সাহিত্যে "গৌড়ী রীতি," শিল্পে "গৌড়ী রীতি," দিগ্‌দিগন্তে গৌড়ীয় প্রভাব বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, তাম্রলিপ্তি এই গৌড়-গৌরবযুগের জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

এই গৌড়ীয় প্রভাবের সহিত পরম্পরাগত পুরাতন প্রভাবের সম্পর্ক ছিল; কিন্তু, সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অনেক দিন হইতে বিবিধ বিধানে সমন্বয়-সাধনের জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে প্রয়োজন অনুভূত হইয়া আসিতেছিল;—কিন্তু তাহার চেষ্টা মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। গৌড়ীয় সাম্রাজ্য রাজা-প্রজার সাম্রাজ্যরূপে প্রকৃতিপুঞ্জের সহায়তায় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যেন সকলশ্রেণীর জনমণ্ডলীকে এক স্নেহের ক্রোড়ে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল;—সকল সংকীর্ণতা যেন এক অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রাণতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে জনসমাজ এক অভিনব মিলন-ভূমির সন্ধান লাভ করিয়াছিল, এবং হিন্দু-বৌদ্ধ আর্য্য-অনার্য্য এক অভিনব মিলনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। অবস্থাভেদ, অধিকারভেদ, বর্ণভেদ প্রচলিত থাকিলেও, ভেদের মধ্যে অভেদের মূলমন্ত্র বিঘোষিত হইয়াছিল,—উচ্চবর্ণের লোকেও নীচবর্ণের লোকের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিল;— কর্ম্মকাণ্ডের উপর, জ্ঞানকাণ্ডের উপর, ভাবকাণ্ডের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল;—ভাবে বিভোর হইয়া, গৌড়ীয় জনসমাজ এক অভিনব দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। সে দৃষ্টি বাহির ছাড়িয়া, ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়া, ভোগের মধ্যে মোক্ষের, কুৎসিতের মধ্যে সুন্দরের, সসীমের মধ্যে অসীমের, জীবের মধ্যে শিবের সন্ধান লাভ করিয়াছিল।

এই প্রভাব গ্রন্থ-লোপের সঙ্গে সহসা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; এই প্রভাব শিল্পকীর্ত্তি-লোপের সঙ্গেও সহসা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ইহা জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে এরূপ দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এখনও বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ প্রতিভা-গৌরবের মধ্যে ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্পের মধ্যেই গৌড়ীয় প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং শিল্পের মধ্যেই তাহার তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা অধিক ফলপ্রদ হইবার আশা আছে।

গৌড়শিল্প ভাবপ্রবণ। ভাবপ্রবণ বলিয়াই আভাসাত্মক। ব্যক্তের ভিতর দিয়া অব্যক্তের আভাস প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষাই তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল বলিয়া, গৌড়শিল্প-কলা মানবচিত্তকে বাহির হইতে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়াছিল;— বিশ্বসৌন্দর্য্যসূত্রের মহাভাষ্যরূপে

প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহা যে অধোগতির নিদর্শন নয়, প্রত্যুত এক অভিনব রচনা-রীতির পরিচয়-বিজ্ঞাপক, তাহা এখন কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে এখনও বাদানুবাদ নিরস্ত হয় নাই।

মগধে এবং উৎকলে মধ্যযুগের শিল্পনিদর্শনের অভাব নাই। তাহা অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য বলিয়া, তাহার কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছে। যবদ্বীপের শিল্পনিদর্শনগুলিরও আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে নূতন নূতন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল প্রদেশে যে সকল শিল্পনিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল প্রভাব-ক্ষেত্র কোথায় ছিল, তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য কৌতূহলের অভাব না থাকিলেও, যথাযোগ্য চেষ্টার অভাবে, তৎসম্বন্ধে এখনও কোনরূপ নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে নাই।

মধ্যযুগের মগধের এবং উৎকলের শিল্পনিদর্শনের সঙ্গে যবদ্বীপের শিল্পনিদর্শনের কোনরূপ রচনা-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না, সে প্রশ্ন অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও উত্থাপিত হইত না। কারণ, যবদ্বীপের শিল্প-রীতির মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের শিল্পরীতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এক সময়ে দুন্দুভি-নিনাদ-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহা নীরব হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ সাদৃশ্য অপেক্ষা অসাদৃশ্যই দর্শন করিতে-ছেন! তজ্জন্য অনুসন্ধিৎসা নূতন উদ্যমে পণ্ডিতসমাজকে নূতন পথে তথ্যানুসন্ধানে নিবিষ্ট করিয়াছে। (১)

এতকাল যাহা মগধের এবং উৎকলের শিল্পরীতি বলিয়া কথিত হইতেছিল, তাহার প্রকৃত উদ্ভবস্থান কোথায়, তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তারানাথের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—তাহার উৎপত্তিস্থান বরেন্দ্রভূমি। ধর্ম্মপালদেবের এবং দেবপালদেবের শাসনকালই তাহার উৎপত্তি-কাল। বরেন্দ্রনিবাসী ধীমান্ এবং তৎপুত্র বীতপাল সেই

(১) সুপণ্ডিত ভিন্সেণ্ট স্মিথ তদীয় নবপ্রকাশিত শিল্পের ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—It is difficult, merely from study of the sculptures and without the aid of external evidence, to form a definite opinion whether the art of Boro Budur was derived from the east or the west side of India,—Chapter VII. P. 264.

শিল্পরীতির জন্মদাতা। তাহা ক্রমে ক্রমে মগধে উৎকলে এবং অন্যান্য অনেক জনপদে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতশিল্পের ইতিহাসে [এইরূপে] একটি নূতন অধ্যায় সংযুক্ত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। (২)

কোনও শিল্পরীতিই ব্যক্তিবিশেষের কপোলকল্পিত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা স্থানকাল-পাত্রোচিত ভাব সমবায়ের ধীর-বিকাশ মাত্র। যাহা ধীমানের এবং বীতপালের শিল্পরীতি বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীয় জনসাধারণের ধ্যানধারণারই পরিণত ফল। গৌড়ীয় জনসমাজে গৌড়বিজয়িযুগের নবজীবন-সংস্পর্শে যে ভাব-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, শিল্পের ভিতর দিয়া তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ধীমানের জন্মভূমিতে তাহার যে অসংখ্য নিদর্শন এতদিন অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহার কিছু কিছু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক একত্র সংগৃহীত হইবামাত্র, গৌড়শিল্পকলার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে গৌড়ীয় প্রভাব;— তাহা যেন মুক্তকণ্ঠে গৌড়-গৌরবযুগের বিজয়-গীতি গান করিতেছে।

শিল্পের প্রভাব বরেন্দ্রভূমির চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না;— রাষ্ট্রীয় বিবিধ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দিগ্‌দিগন্তেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই শিল্প বৃহৎ এবং সুন্দর,— সৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়। মাৎস্য ন্যায়ের অবসানে গৌড়ীয় জনসমাজে যে নবোদ্যম পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল,— যে নবোদ্যম দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে শৌর্য্যে বীর্য্যে বিবিধ বীরকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,— সেই নবোদ্যম শিল্প-কলাকেও এক অভিনব রচনা-রীতিতে আত্মবিকাশের শক্তি দান করিয়াছিল।

গৌড-শিল্পকলার অভিব্যক্তির সঙ্গে এক আশ্চর্য্য কল্পনা-সামর্থ্যের পরিচয় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহা আকারকে ভাব-বিমণ্ডিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, ভাবকে আকার দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। নারায়ণ-পালদেবের প্রধান মন্ত্রী ভট্টগুরবের [বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠাপিত] গরুড়-

(২) The Naga productions of Nagarjuna's time were rivalled by the creations of Dhiman and his son Bitapala, natives of Varendra (Bengal), who lived during the reigns of Devapala and Dharmapala.—A History of Fine Art in India and Ceylon by Vincent. A. Smith, Chapter IX P. 305.

স্তম্ভে যে শ্লোকাবলী উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার একটি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তাঁহার সুকুমার শরীর-শোভার ন্যায় লোকলোচনের আনন্দদায়ক,—তাঁহার উচ্চান্তঃ-করণের অতুলনীয় উচ্চতার ন্যায় উচ্চতাযুক্ত,—তাঁহার সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনের ন্যায় দৃঢ়সংবদ্ধ—কলিহৃদয়-প্রোথিত—শলাবৎ সুস্পষ্ট প্রতিভাত,—এই স্তম্ভে তাঁহার দ্বারা হরির প্রিয়-সখার [ফণিগণের শত্রুর] গরুড়ের এই মূর্ত্তি আরোপিত হইয়াছে।"

এই শ্লোকেই গৌড়-শিল্পকলার রচনা-গাম্ভীর্য্যের প্রকৃত লক্ষ্য সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা ভাবকেই আকার দান করিয়াছিল,—জনসাধারণের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার, তাহাদের উচ্চান্তঃকরণের এবং সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনের অনুরূপ শিল্প-কৌশলের বিকাশসাধনের আয়োজন করিয়াছিল। কেবল আকারানুকরণের হিসাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে তাহার সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভূত হইতে পারে না।

বরেন্দ্রভূমির নানাস্থানে এই যুগের শিল্পকীর্ত্তির যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ বিশিষ্ট শিল্পকলা অভিব্যক্ত। তাহাতে শ্রমের, যত্নের, অর্থব্যয়ের ত্রুটি লক্ষিত হয় না;—সুন্দরকে আরও সুন্দর করিবার উপযোগী রচনা-লালিত্য-বিকাশেরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সকল কথা অল্প কথা। প্রধান কথা— ভাব-সামঞ্জস্য। তাহা শিল্প-কৌশলে সুরক্ষিত, শক্তিসামর্থ্যে দৃঢ়-সংবদ্ধ,—হাস্যে লাস্যে যথাবিন্যস্ত,—সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে অলোকসামান্য।

রচনা-কল্পনা উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে আরোহণ করিতে গিয়া, এই শিল্পকলাকে অতিমাত্রায় অলৌকিকত্ব দান করিয়া গিয়াছে। এক মুখের পরিবর্ত্তে বহু মুখ,—দুই বাহুর পরিবর্ত্তে বহু বাহু,—এই শিল্পকলাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং এই অলৌকিকত্ব-লোলুপ সৌন্দর্য্য-বিকাশ-কৌশল আমাদিগের আকার-সর্ব্বস্ব সমালোচনায় শিল্পের অধোগতির নিদর্শন বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে!

ভাবকে আকারানুগত করিবার চেষ্টা না করিয়া, আকারকে ভাবানুগত করিতে গিয়াই, গৌড়শিল্পকলা অলৌকিকত্বের প্রশ্রয় দান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ভাবসামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া, পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এখন অতি অল্পসংখ্যক শিল্পরসজ্ঞ সমালোচক ভিন্ন জনসাধারণ আধুনিক শিল্পকলার মাহাত্ম্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আধুনিক শিল্পীও

সেই অল্পসংখ্যক রসজ্ঞের চিত্তবিনোদনের জন্যই আয়াস স্বীকার করেন। সেকালে এরূপ ছিল না। জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই সার্ব্বজনীন ভাষারূপে শিল্পকলা আত্মবিকাশলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্য জনসাধারণের ধ্যানধারণাই শিল্পের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যাহা বুঝিত, তাহারা যাহা চাহিত, তাহা 'ভাব';—শিল্পকলা যাহা অভিব্যক্ত করিত, তাহাও 'আকার' নহে, 'ভাব'। গৌড়শিল্পকলা এইরূপ গৌড়বিজয়যুগের জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিতে গিয়াই ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল; ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই, আকারকে ভাবানুগত করিতে বাধ্য হইয়াছিল; এবং আকারকে ভাবানুগত করিতে গিয়াই অলৌকিকত্বের প্রশ্রয়দান করিয়াছিল।

যাহা ভীষণ হইতে ভীষণ, তাহার মধ্যেও যে শিল্পসৌন্দর্য্যের অভাব নাই, তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভাবসামগ্রী পুঞ্জীকৃত করিয়া, সেকালের গৌড়শিল্পী যে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার সহিত একালের ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর সযত্নরচিত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির কত পার্থক্য! সেকালের মহিষমর্দ্দিনী মহিষ-মর্দ্দিনী;—মর্দ্দনের প্রণালীর ভিতর দিয়া তাহার ভাব-সামর্থ্য কেমন পরিস্ফুট;— যেন দেবাসুর-সংগ্রাম-কল্পনা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া, পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় বিঘোষিত করিতেছে। মহিষ-মর্দ্দিনী শূলাগ্রে মহিষাসুরের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়াছেন;—দৃঢ়মুষ্টি-নিবদ্ধ শূলদণ্ড যেন সবলে শূলাগ্র নিম্নাভিমুখে প্রোথিত করিতেছে! মূল ভাবের অনুগত হইয়া, শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, আকারের হিসাবে অলৌকিক হইলেও, তাহা যেন ভাবের হিসাবে স্বাভাবিক অপেক্ষা স্বাভাবিক। সেকালের গৌড়জন যাহাকে ধরিত, তাহাকে কেমন করিয়া ধরিত;—কেমন করিয়া পদবিদলিত করিত,—কেমন করিয়া আত্মপ্রাধান্য সুসংস্থাপিত করিত;—তাহার ভাব-সামগ্রী লইয়াই যেন সেকালের মহিষ-মর্দ্দিনী-মূর্ত্তি কল্পিত ও গঠিত হইত। সে ভাব অপরাজিতা মহাশক্তির মহাভাব,—উদ্যমে, অধ্যবসায়ে, অকুতোভয়তায়, অসংকোচে অনন্যসাধারণ। ইহার নিদর্শন যে দেশেই আবিষ্কৃত হউক না কেন, ইহা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর শিল্পকৌশলসম্ভূত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিরই ভাব-সম্পদের পরিচয় প্রদান করিবে। তাহা ভীষণে-মধুরে অপূর্ব্ব-সমাবেশ-কৌশলে—অনন্যসাধারণ বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

এই মূর্ত্তি-কল্পনার ভাব-সম্পৎ বড় বিচিত্র ;—তাঁহা লৌকিক অলৌকিকের সমাবেশ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিন্যাস, বেশভূষা-সমাবেশ, প্রহরণ-নির্ব্বাচন, এবং প্রহরণ-ধারণ-কৌশল, সমস্তই একটি মূল ভাবের অনুগত হইয়া সমগ্র সমর-ব্যাপারের ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, মূল ভাব—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ।"

"চিত্তে কৃপা" লৌকিক ভাব, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। "সমর-নিষ্ঠুরতা"ও লৌকিক ভাব, তাহারও উদাহরণের অভাব নাই। কিন্তু একাধারে এই উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ লৌকিক নহে ;—তাহা অলৌকিক অথবা লৌকিক-অলৌকিকের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাহার উদাহরণ বড় দুর্ল্লভ। তাহা ত্রিভুবনে কেবল "তাঁহাতেই" দেখা গিয়াছিল। তাই স্তুতিপরায়ণ দেবগণ গাহিয়াছিলেন ;—

চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি।

দেবগণ গাহিয়াছিলেন—হে দেবি! হে বরদে! [ভুবনত্রয়েঽপি] ত্রিভুবনের মধ্যেও কেবল [ত্বয্যেব] তোমাতেই তাহা [দৃষ্টা] দেখা গিয়াছে।

"চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা চ।"

বুঝিবা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে,—জয়পরাজয়ের অশান্ত আস্ফালনের অবসানে, স্বয়ং মহিষাসুরও তাহা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল বলিয়াই বুঝি স্বয়ং মহিষাসুরও নির্ভর-নীরব দীননয়নে দেবীর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল! তাই সেকালের অসুরমূর্ত্তি, আকারের হিসাবে, অতিপ্রাকৃত ;—অর্দ্ধ মানব অর্দ্ধ পশু হইয়াও, ভাবের হিসাবে স্বাভাবিক। তাহার রচনা-ভঙ্গীতে দন্ত কটমটী দেখিতে পাওয়া যায় না ; যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পরাভূত ঔদ্ধত্যের পরম পরিণাম দীনতার দারিদ্র্যে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। অসি আছে, সে দৃঢ় মুষ্টি আর নাই ; গ্রীবা হইতে মস্তক এখনও বিচ্যুত হইয়া পড়ে নাই ; কিন্তু সে রণহুঙ্কার আর নাই ; দেবী কেশাকর্ষণে দেহভার ধরিয়া না রাখিলে, দেহভার রক্ষা করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! যাহারা পাথর খুঁদিয়া এমন ভাব-সামঞ্জস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিরচনায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাদের শিল্পকৌশল উচ্ছৃঙ্খল হইলেও প্রাণময়—প্রতিভাময়—গৌরবময় বলিয়াই প্রশংসা লাভের যোগ্য।

সে কালের শিল্পী দুইটি ভাবই যথাযোগ্যভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল ;—এ কালের শিল্পী সে ভাবসম্পৎ হারাইয়া ফেলিয়াছে!

একালের মূর্ত্তিরচনার অসমর্থ কল্পনার সাক্ষীভূত শূলরোপণ-রীতির সহিত সেকালের শিল্পকৌশলের কত পার্থক্য, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। একালের শিল্পী মহিষাসুরের বক্ষে তির্য্যক্ ভাবে শূলাগ্র ঈষৎ সঞ্চালিত করাইয়া, ত্বক্ বিদ্ধ হইতে না হইতে, প্রথম রুধির-ধারা দর্শন করিয়াই যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে! একালের অসুর পরাভূত হয় নাই। সে দৃঢ়মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া, সগর্ব্বে দেবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে;—সিংহ তাহার কূর্পরদেশ কবলিত করিয়াও দংষ্ট্রা বিদ্ধ করিতে সাহসী হইতেছে না;—কালসর্পও স্বধর্ম্ম-বিস্মৃত হইয়া, কেবল অঙ্গশোভা অভিব্যক্ত করিয়াই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে! ইহার সহিত সেকালের মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির সামঞ্জস্য কোথায়? সে মহিষমর্দ্দিনীর বাহন পশুরাজ অসুর-নিপাতে অনন্যকর্ম্মা; কালসর্প অসুরের জিহ্বা-দংশনে অভিনিবিষ্ট; দেবী তাহার গ্রীবা চাপিয়া ধরিয়া, কণ্ঠচ্ছেদের আয়োজন করিতেছেন! সকল কল্পনার মধ্যেই পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় কেমন সুকৌশলে প্রত্যক্ষবৎ অভিব্যক্ত;—সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিতিভঙ্গীর মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ গতিভঙ্গী কেমন যথাযোগ্যভাবে বিকাশপ্রাপ্ত;—যেন সত্য সত্যই এক মহাসমর যথাযথভাবে অভিনীত হইতেছে। সে সংগ্রামে মহিষাসুর পরাভূত হইয়া গিয়াছে;—আর এক মুহূর্ত্ত,—এখনই তাহার জীবনলীলা অবসানপ্রাপ্ত হইবে!

যে শক্তি হৃদয়ে সাহস দিয়াছিল, বাহুতে বল সঞ্চার করিয়াছিল, কর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা আনিয়াছিল, সেই শক্তিই শিল্পকৌশলকেও এইরূপে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাই গৌড়ীয় প্রভাব। ইহার উদ্ভবস্থান উড়িষ্যা নহে,—মগধ নহে,—বরেন্দ্র। এই যুগের শিল্পকলার জন্মদাতা ধীমানের জন্মভূমিও উড়িষ্যা নহে,— মগধ নহে,— বরেন্দ্র। যে যুগের বাঙ্গালী সকল-উত্তরাপথে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়াছিল, সেই যুগের বাঙ্গালীই গৌড়-শিল্পকলায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার কীর্ত্তি-কলাপের ধ্বংসাবশেষ এখনও অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে,—ভারতদ্বীপপুঞ্জে—ভারত-সীমার বাহিরে অবস্থিত বহু দূরদেশে,—আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

একদিন যাহা সত্য ছিল, এখন তাহা স্বপ্ন-কাহিনী। সুতরাং একালের আমরা ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করি। কিন্তু বরেন্দ্রভূমির নানাস্থান হইতে সেকালের যে সকল শিল্পনিদর্শন আবি-

স্কৃত হইতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এই গৌড়ীয় প্রভাব দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

ধীমানের জন্মভূমির নানাস্থান হইতে মহিষ-মর্দ্দিনীর যে সকল পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত সেই যুগের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির যেরূপ ভাব-সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয় যায়, তাহাকে আকস্মিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হয় না। সেই স্থিতি ভঙ্গীর মধ্যে সেই গতিভঙ্গী,—সেই মর্দ্দন-প্রথার ক্ষমাশূন্য কৃপাশূন্য সীমাশূন্য দৃঢ়নিষ্ঠা যেন বাঙ্গালার মূর্ত্তির সঙ্গে অন্যান্য স্থানের মূর্ত্তিকে একই ভাব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে আকস্মিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হয় না। তাহার মধ্যে যে রচনা-প্রভাব দেদীপ্যমান, তাহাকে গৌড়ীয় প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে, অন্য কোনও স্থানে তাহার প্রভাব-ক্ষেত্র দর্শন করিবার আশা থাকে না। এ মূর্ত্তি বাঙ্গালার মূর্ত্তি—বাঙ্গালীর চিরারাধ্য মূর্ত্তি,—এখনও কেবল বাঙ্গালীর ঘরেই অর্চ্চনা-লাভ করিতেছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উপাসনা তত্ত্ব।

এই সংসারে আমি আছি বলিয়াই আর সকল পদার্থ আছে। আমি না থাকিলে, আমার পক্ষে তাহারা থাকে না। আমার দশটি ইন্দ্রিয় আছে, তাই এই দশেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাহা কিছু, সে সকলেরই অনুভূতি আমার আছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি, সে সকলই আমা হইতে পৃথক্ ভাবে, স্বতন্ত্ররূপে অনুভব করি। এই অনুভূতিই আমার সৃষ্টি, অন্যের নহে। আমার আমিত্বটাকে দেহগত অনুভূতির সকল ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্রভাবে জানি ও বুঝি বলিয়াই, অনুভূতিগম্য যাহা কিছু, তাহা আমা হইতে যে পৃথক্ এ বোধ আমরণ দেদীপ্যমান থাকে। নয়নযুগলের সাহায্যে আমি যাহা দেখিতে পাই, তাহা আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবেই দেখিতে পাই। আমি ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এ জ্ঞান আমার থাকেই। শ্রবণযুগলের সাহায্যে আমি যে সকল শব্দ ও ধ্বনি শুনিতে পাই, সে সকলই যে আমি শুনিতেছি, এবং আমার দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে শুনিতে পাইতেছি, এ বোধ আমার থাকেই,—

যাবজ্জীবন থাকেই। এমনই ভাবে আমার সকল অনুভূতিগম্য পদার্থই আমা হইতে পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয়।

অহং অস্মি।—Ergo Cogito Sum.

আমি আছি—সুতরাং আমি আছি। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের জ্ঞানটা নিত্যসিদ্ধ; দেহীমাত্রেরই এ জ্ঞান থাকে। আমার আমিত্বের জ্ঞানটা যখন নিত্য, তখন আমা হইতে যাহা পৃথক্—যাহা আমি দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি, অনুভব করি—তাহার অস্তিত্বটাও আমার আমিত্বের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ, আমি আছি এবং আমি ভোগী বলিয়াই, আমার ভোগ যাহা কিছু তাহা যতদিন আমি দেহী থাকিব, আমার ইন্দ্রিয় সকল সজীব থাকিবে, ততদিন আমার পক্ষে দেদীপ্যমান থাকিবে। আমার দৃষ্টিশক্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার পক্ষে সমুদ্ভাসিত থাকিবে। তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল যেমন ভাবে সজীব থাকিবে, তেমন ভাবে সেই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আমার অনুভূতিগম্য থাকিবে। এই অনুভূতিগম্য জগৎকে শাস্ত্র বিসৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি যেন আমার আমিত্বকে ছুড়িয়া ফেলিয়া—দূরে রাখিয়া—উহার স্বতন্ত্র স্থিতির কল্পনায় মুগ্ধ হইতেছি। আমি আছি বলিয়াই আমার জগৎ আছে, আমি মরিলে আমার পক্ষে আমার জগৎও মরিবে। তাই কবীর বলিয়াছিলেন,—

"হম্ ডুবা ত জগ্ ডুবা।"

প্রবল বন্যার স্রোতে আমি যখন ডুবিয়া যাই, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুভূতিগম্য জগৎও ডুবিয়া যায়। এই আমি—কে? ইহাই কিন্তু বলিতে পারিব না; আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন পণ্ডিতেই বলিতে পারে নাই। আমি আছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি, বুঝিতেছি—সর্ব্বকর্ম্মই করিতেছি; কিন্তু আমি জানি না, আমি কি ও কে। শ্রুতি বলিতেছেন,—

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা
তমাহুরাদ্যং পুরুষপ্রধানম্॥

এক সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, অথচ স্বয়ং নিরাকার অনন্ত পুরুষ-প্রধান নিত্য বিদ্যমান আছেন; তিনি বিদেহ-আত্মা; তাঁহার হস্ত নাই তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চরণ নাই তিনি বিশ্ব-চরাচর ভ্রমণ করেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি সর্ব্বদর্শী, তাঁহার শ্রবণ নাই তিনি সকল শব্দ শুনিতে পান; তিনি বিশ্বসৃষ্টিকে জানেন,

বিশ্বের কেহই তাঁকে জানে না। এই অনন্ত ও অজ্ঞেয় আত্মা প্রতি দেহে বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, তিনিই আমি, আমিই তিনি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তটির ধারণা আমাদের নাই। যে কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটা আমাদের মনে দৃঢ় হয়, আমরা আমাদের দেহগত আত্মাকে চিনিতে—জানিতে—বুঝিতে পারি—আমি কে তাহার ঠিকমত নির্দ্দেশ করিতে পারি—তাহাই উপাসনা, তাহাই সাধনা, তাহাই তপস্যা ও আরাধনা। আমি ছাড়া—আমা ছাড়া অন্য পরমেশ্বর নাই। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীধৃত বচন-পরম্পরায় এ কথাটি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। যথা কৌর্ম্মে—

মন্যন্তে যেষু চাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥

অর্থাৎ, যাহারা আত্মাকে উপাস্য পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করে, তাহারা সে দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করে না, তাহাদের সকল পরিশ্রমই পণ্ড হয়। রুদ্র যামলেও উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্।

অর্থাৎ, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, পরমানন্দরূপিণী উপাস্যা দেবীকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করিবে।

"আত্মাভেদেন সংচিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।
সোঽহমিত্যাস্য সততং চিন্তনাৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"
"অহং দেবি ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ॥"
"অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ।
সোঽহমিত্যেব সংচিন্ত্য বিহরেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।"
"যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং মুনে।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে॥"

অর্থাৎ, আত্মার সহিত অভেদ করিয়া উপাস্য দেবতাকে চিন্তা করিলে মানুষ তন্ময়তা লাভ করে—সেই আমার উপাস্য দেবতাই আমি, সতত এই ভাবনা করিলে উপাসক তন্ময় হইয়া যায়। আমিই আমার আরাধ্যা দেবী, অন্য কেহ নাই, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইলে, অজ্ঞানের বিলোপ হয়। সেই আমি, যে আমি সর্ব্বব্যাপী, এইরূপ চিন্তা করিলে আনন্দে বিরাজ করা যায়। যেমন ফেন তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই লীন হয়, তেমনই এই আত্মবিসৃষ্ট জগৎ আত্মাতেই বিলীন হয়। এইরূপ

অসংখ্য বচন তন্ত্রে পাওয়া যায়; সকল তন্ত্রের গোড়ায় এই একই ভাব; সকল তন্ত্রই এই একই উপদেশ দিতেছেন ;কেবল পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে বটে। তন্ত্র বলিতেছেন—আমা ছাড়া অন্য উপাস্য নাই, আমি ছাড়া অন্য দেবতা নাই। আমা হইতেই জগতের সৃষ্টি, আমাতেই জগতের সংহৃতি, সুতরাং আমাকেই আমি আরাধনা করিয়া থাকি, আমাকেই আমি চিনিতে—বুঝিতে—জানিতে পারিলে আমার উপাসনা ফলবতী হয়। শিববাক্য আছে—

বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং।

হে দেবি বিনা উপাসনায় আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অপূর্ব্ব ফল মনুষ্যকে আমি দিই না। এই উপাসনা করিতে হয় কেন? শাস্ত্র বলিতেছেন, দুঃখ নিবৃত্তি হেতু উপাসনার প্রয়োজন। কিসের দুঃখ? অতৃপ্তি জন্য যে দুঃখ, তাহাই দূর করিবার জন্য মানুষ অহরহঃ চেষ্টা করিতেছে। কি জানি কি চাই। যাহা চাহি, তাহা পাই না; যাহা পাই তাহাতে দুই দিনেই অতৃপ্তি বা অরুচি বোধ হয়, তাহা আর চাহি না। কাজেই এমন সামগ্রী চাহিতে ইচ্ছা করে, যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার থাকে না, আর কিছু চাহিবার সাধ হয় না। ইহা পাইনা বলিয়াই দুঃখ।

"বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।"

"প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্॥"

সাংখ্যে দুঃখের এই দুইটি বিবৃতি আছে। যাহা বাধা—ঈপ্সার পথের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়, তাহাই দুঃখ। যাহা আমার দেহগত অনুভূতি শক্তির বিকাশ পথে প্রতিকূল বেদনার বা অনুভাবনার সৃষ্টি করে তাহাই দুঃখ। আমি আছি, আমার দেহ আছে এবং সেই দেহজন্য বিসৃষ্টিস্বরূপ একটা জগৎ আছে। দেহাত্মবুদ্ধ আমি বটি, পরন্তু দেহের অংশ বিশেষে আমার আমিত্ব নিবদ্ধ নহে। আমার দেহের প্রতি অঙ্গ যে আমার, এই মমত্ব বোধ আমাতে নিত্য বিদ্যমান। আমার শরীর, আমার চক্ষু কর্ণ নাসিকা, আমার পাণিপাদ পায়ু, আমার অস্থিচর্ম্ম-মেদমজ্জা—আমাতে যাহা কিছু আছে, সে সকলই আমার, আমি কিন্তু তাহাদের কাহারও বিশিষ্ট ভাবে নহি। অথচ এই দেহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আমি আমাকে ভাবিতে পারিলেও সে ভাবনা কখনই স্থায়ী হয় না। সাধারণতঃ সাংসারিক সকল কার্য্যে ও ব্যবহারে, দেহটাকেই আমি আমার আমিত্বের সহিত মিশাইয়া রাখি। এই দেহের সাহায্যে আমি জগৎকে বুঝি ও দেখি। দেহ উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মবিশিষ্ট, জগৎ গতিশীল। আমি সাধ মিটাইয়া আমার দেহ-গত অনুভূতি এবং আসক্তি নিচয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারি না। দেখার

মতন দেখা হয় না, শুনার মতন শ্রবণ হয় না, উপভোগের মতন উপভোগ হয় না। আজ যাহা অপচিত, কাল তাহা উপচিত ; অপচয়ে কতকটা সাধ মিটে, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপচয় হইয়া আবার তৃষ্ণার সৃষ্টি করে—হৃদয়ের শূন্যতা কখনই দূর হয় না। ইহাই দুঃখ। এই দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উপাসনা ও সাধনার সৃষ্টি। এই দুঃখের পূর্ণ উপশান্তি ঘটে আত্মসাক্ষাৎকারে। তন্ত্র বলিতেছেন, কর্ম্ম করিয়া দেখ, হাতে হাতে ফল পাইবে।

কথাটা আরও একটু ফুটাইয়া বলিব। আমার দেহগত সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি দেহের সাহায্যে অভিব্যক্ত। ক্ষণে ক্ষণে দেহের উপচয়-অপচয় ঘটিতেছে ; ইন্দ্রিয়শক্তির প্রয়োগে অপচয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপচিত ইন্দ্রিয়-শক্তির উপচয়ও ঘটিতেছে। যতদিন আমার দেহ সজীব থাকিবে ততদিন এই উপচয়-অপচয়ের কার্য্য চলিতে থাকিবে। মনে কর, আমি সুস্বাদু ভোজ্য আহার করিতেছি, আহারকালে আমার আস্বাদন শক্তির প্রয়োগে রসনার পরিতৃপ্তি হইতেছে। কিন্তু কতকক্ষণ খাইতে খাইতে সে পরিতৃপ্তির ভাব দূর হয়—আর খাইতে ইচ্ছা যায় না। তেমনি দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করিলে দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। এই যে ইন্দ্রিয়প্রয়োগ জন্য ক্লান্তি, ইহা দেহজ শক্তির অপচয়ে ঘটিয়া থাকে। এই ক্লান্তি জন্যই তৃপ্তি বোধ হয়। কিন্তু সে তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। দেহের ব্যয়িত শক্তির উপচয় ঘটিলে আবার দেখিতে, শুনিতে, খাইতে, আঘ্রাণ করিতে সাধ যায়। স্থায়ী তৃপ্তি হয় না বলিয়াই শাস্ত্র বলিতেছেন, উপভোগে তৃপ্তি নাই—দেহের সাহায্যে যে উপভোগ, তাহার ফলস্বরূপ তৃপ্তি ও তুষ্টি দেহধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষণস্থায়ী হয়। এই ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি জন্যই দুঃখ ; আমি সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিতে চাহি, দেহ আমার সে সাধে বাদ সাধে। আমার সাধ মিটে না, তাই আমার দুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই দুঃখ দূর করিতে পারিলে, সুখ মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। সুখ গঙ্গা-প্রবাহের মতন একটানা স্রোত, দুঃখ সেই স্রোতোমুখের গণ্ডশৈলমালা। এই শৈলশ্রেণী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিলে, বা অন্য কোন উপায়ে অতিক্রম করিতে পারিলে, সুখের একটানা স্রোত নিত্য ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য—দুঃখ দূর করি কোন উপায়ে ? সুখোদয় হয় কিসে ? শাস্ত্র বলিতেছেন—যখন দেহ জন্যই সকল দুঃখ, তখন দেহজয়ী হইতে পারিলে দুঃখ দূর করা চলে, সুখোদয় সম্ভবপর হয়। সাধক বলেন যে, দেহ জয়

করাইত এক বিষম দুঃখ। একটা দুঃখ দূর করিবার জন্য অন্য দুঃখের সৃষ্টি করি কেন? প্রবৃত্তিমূলক দেহ, সেই দেহের প্রবৃত্তি ও আসক্তিনিচয়কে দমন করিতে পারিলে, পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারিলে, দেহজয়ী নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারা যায়। আমি রক্তমাংসের শরীরধারী, নানা উপভোগ-বিমুগ্ধ বিষয়ী জীব, আমি নিষ্কামকর্ম্মী হইব কেমন করিয়া? যত চেষ্টা করিনা কেন, আমার দেহাত্মবুদ্ধি—আমার অহঙ্কার ত দূর হইবার নহে। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি রসাস্বাদন করিতেছি, আমি ভোগ করিতেছি—এ বোধ ত আমার নিত্য সঙ্গী। যতদিন দেহাত্মবুদ্ধ, মায়াপাশে পরিবেষ্টিত সংসারী গৃহস্থ থাকিব, যতদিন পুত্র কলত্র স্বজন পরিজন লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ততদিন এ জ্ঞান ত দূর হইবার নহে। বিশেষ, আমিত একা থাকিতে পারি না; তাই চিঁড়ের বাইশ ফের করিয়া, আত্মীয় স্বজন, সমাজ ও জাতি লইয়া আর দশ জনের সঙ্গে জড়াইয়া আমি সংসারে থাকি। গুটী পোকার গুটীর মতন আমার সংসার, আমার পরিবার আমার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। এ গুটী আমি কাটি কেমন করিয়া? তন্ত্র জীবের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—ভয় নাই, এমন উপায় আছে, যাহা তুমি অবলম্বন করিতে পার, যাহা তোমার অনায়াসসাধ্য—তোমার অধিকারভুক্ত। আমি সেই উপায় বলিতে পারি। সদ্‌গুরুর সাহায্যে সেই উপায় অবলম্বন কর, তোমার দুঃখ দূর হইবেই। ইহাই তন্ত্রের প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম ও সাধনা। এই সিদ্ধান্তের উপর তন্ত্রের অধিকার-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। একা তন্ত্র কেন, বৈষ্ণব ভক্তগণ—আচার্য্যগণ গোড়ায় এই প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের ও কর্ম্মের কথা কহিয়াছেন। ইহা বড় মজার সামগ্রী।

শাস্ত্র বলিতেছেন—দেখ, এই বিশ্বসৃষ্টির আর কিছু বুঝ আর নাই বুঝ, এটাত বুঝ যে, আমি ছাড়া আর কিছু নাই। সেই আমি যে কি ও কেমন তাহা জানা যায় না, কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু এই আমিত্বটাকে তুমি ধরিতে পার। মানিয়া লও, সেই আমিই ব্রহ্ম—অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত ও অসীম শক্তিধর পুরুষ। সেই আমি দেহেতে আছেন বলিয়া দেহ সজীব—দেহের সাহায্যে সেই "আমি" পরিদৃশ্যমান জগৎকে নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকেন। দেহগত "আমি"র এই যে সৃষ্টি-বুভুক্ষা—ভোগ করিবার তৃষ্ণা, ইহাই আমিত্বের অনুভূতির অবলম্বন স্বরূপ। আমার যদি কোন ইন্দ্রিয়শক্তি না থাকে, দেখিতে শুনিতে বুঝিতে আমি যদি না পারি, তাহা

হইলে আমার কি থাকে? কি জানি কি থাকে! যাহা থাকে, তাহার উপলব্ধি আমাতে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তেমন আমিত্বের চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই; সে থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক। কিন্তু "আমি আছি" এই বোধটা প্রবৃত্তি-জন্য; অর্থাৎ, আমাতে প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে বলিয়াই 'আমি আছি' এই জ্ঞানটা আমাতে নিত্য বিদ্যমান আছে। এই প্রবৃত্তি ও আসক্তির একটা পারিভাষিক নাম দিলাম রস। যখন এই রসের সাহায্যে আমার আমিত্বের উপলব্ধি হয়, অন্যথা হয় না, তখন আমি বলিলেই ঐ রস বুঝাইবে। অতএব

রসো বৈ সঃ।

অর্থাৎ, তিনিই—আমিই—রস স্বরূপ। সে রস কি? শ্রীপাদ আচার্য্য বলেন, উৎকট ইচ্ছার বাচকই রস। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে

"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"।

ইত্যাদি প্রয়োগে 'রস' শব্দটি ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। মনের অনুকূল আলম্বনজনিত সুখানুভব বিষয়ক উৎকট ইচ্ছাই প্রীতি, অনুরক্তি, রাগ, রস ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই রসের সাহায্যে তুমি তোমার আমিত্বের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন কর, সেই সম্বন্ধ অনুসারে কাজ করিলেই তোমার দুঃখ দূর হইবে। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন;—

চেত্যাচিত্যোর্ন তৃতীয়ম্

এই সূত্রে ভক্তিশাস্ত্র ও তন্ত্রসিদ্ধান্তের সমন্বয় করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বেদ ও তন্ত্র এক। ইহার অর্থ—প্রকৃতি ও ব্রহ্ম এই দুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ নাই। অর্থাৎ, পুরুষ জ্ঞেয় বটে, কিন্তু ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয় নহেন। পুরুষ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তিনি যখন জ্ঞেয় হন, তখন আপনিই আপনার বিষয় হন, ঘটাদি সেরূপ নহে, উহারা আপনা হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহারই বিষয় হয়। অতএব পুরুষ ঘটাদির ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়রূপ জ্ঞেয় নহেন। যেমন 'আমি' বলিলে, আমার শক্তি, গুণ প্রভৃতি সমস্তই সেই 'আমির' মধ্যে নিহিত থাকিল, সেইরূপ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি নিত্য যুক্তভাবে বিদ্যমান, এই দুই ছাড়া তৃতীয় কিছু নাই। আমিও যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। যখন তৃতীয় বস্তু নাই, তখন আমার আমিত্ব এবং ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব এক। ইহাই যদি ঠিক হইল, তাহা হইলে আমাকে—ব্রহ্মকে ধরিতে পারিলে দুঃখ দূর হইতে পারে। দুঃখ ত বাধা মাত্র, যেখানে বাধা নাই, সেখানে

দুঃখ নাই। আমি আমাতে মজিয়া থাকিতে পারিলে, সে উপভোগে বাধা দিবে কে? তন্ত্র বলেন ইহাই উপাসনা। আমাকে খুঁজিব, আমাকে পাইব, আমাকে লইয়া আমি আমার আসক্তিনিচয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিব। ইহাই আরাধনা।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আমি ও দেহব্যাপী আমি, এই দুই যখন এক—ভিন্ন ও বিরোধী নহে, তখন তন্ত্র বলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ আছে কলেবরেও সেই গুণ আছে। তাই—

"আদৌ সংজায়তে বীজো ব্রহ্মাণ্ডঃ সহসাঙ্কুরঃ।
তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ।
চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ
আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ।
প্রদীপকলিকাকারঃ জীবং হৃদি সদা স্থিতম্
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।"

বীজ প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপ অঙ্কুরে পরিণত হয়, তাহার অভ্যন্তরে কঙ্কাল দণ্ডরূপ সুমেরু প্রকাশিত হয়; সেই মেরুর অভ্যন্তরে চরাচর ভূতের এবং দেবাদির আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রাণীর হৃদয়ে দীপ-কলিকার ন্যায় জীব অবস্থিতি করেন। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী যেমন অন্যত্র গমন করিলেও আবার রজ্জুর আকর্ষণে প্রত্যাগত হয়, সেই প্রকার গুণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা আকৃষ্ট হন। এই হেতু যামলে উক্ত হইয়াছে—,

"দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্
তত্তদ্বীজাত্মক মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ

যে মনুষ্যশরীর যেমন বীজোৎপন্ন, ধ্যানগম্য ইষ্টদেবের রূপও তেমনি বীজ মন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বীজ মন্ত্র জপ করিলে আত্মজ্ঞ—ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে। তন্ত্র আবার বলিতেছেন—

"বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদ্ধারকারিণী।"

সেই বর্ণ ও রূপ কি ও কেমন?

"তত্তদ্দেবতায়াস্তন্মন্ত্রঘটকীভূত তত্তদ্বর্ণোৎপন্ন-
মুখহস্তপদাদ্যবয়ববিচ্ছিন্নশরীরজ্ঞান বিষয়ার্থমিতি"

যে যে দেবতার যে বীজ মন্ত্র, সেই বীজমন্ত্র ঘটিত সেই সেই বর্ণোৎপন্ন মুখ হস্ত পাদাদি অবয়বসম্পন্ন শরীর জ্ঞান ধ্যানগম্য হয়। মন্ত্র ঘটকীভূত রূপ ধ্যান-সাধা করা বড়ই কঠিন, তাই গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অমূর্ত্ত বিষয়ে

চিত্ত স্থির হয় না, অতএব বীজ ঘটকীভূত সিদ্ধসাধক-সেবিত মূর্ত্তের চিন্তা করিবে। ইহাই তন্ত্র সাধনার গোড়ার কথা। তন্ত্র দেহ ছাড়া বাহিরের কাহাকেও অন্বেষণ করিতে বলে না। এই দেহেই সর্ব্বস্ব নিহিত আছে—বিশ্বচরাচরে যাহা আছে, দেহেই তাহা আছে। দেহেই স্বর্গ ও নরক, দেহেই গোলক, ব্রহ্মলোক, কৈলাস, সুমেরু—কুমেরু; দেহেই ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিরাজ করিতেছেন, দেহেই আদ্যাশক্তি জগন্ময়ীর নিত্য লীলা হইতেছে যত জীব, তত শিব; দেহে দেহে শিব বিরাজ করিতেছেন।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সকল জগৎ তন্ময় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সকল পদার্থে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। সেই পরমাত্মা পরিতুষ্ট হইলে জগৎ পরিতুষ্ট হয়; তাঁহাকে প্রীত করিলে সমুদয় জগৎকে প্রীত করা হয়; তাঁহার আরাধনা করিলে সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করা হয়। আমিই যখন সর্ব্বস্ব, আমার দেহই যখন আমার পক্ষে আমার জগৎ-দ্যোতনার যন্ত্রস্বরূপ, তখন আমি প্রীত হইলে, আমি প্রসন্ন হইলে, আমার জগৎ—আমার বিসৃষ্টি প্রীত হইবে, বিশ্বচরাচর প্রসন্নময় হইবে। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, পরব্রহ্ম প্রভৃতিকে উপলক্ষ করিয়া আমি যে স্তবস্তুতি করিয়া থাকি, সে আমারই উপাসনা, আমারই স্তুতিবন্দনা। পত্র পুষ্প ফল তোয় দিয়া আমি যে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকি, সে আমারই অর্চ্চনা। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া উৎসবের উল্লাস ফুটাইয়া আমি যে দুর্গোৎসব করিয়া থাকি, তাহাও আমার উৎসব, আমার পূজা, আমার আরাধনা। কেন না তন্ত্র বলিয়াছেন যে, আমি ও আমার ইষ্টদেবতায় কোন পার্থক্য নাই।

গোড়ায় বলিয়াছি যে, দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উপাসনা—সাধনা—আরাধনা। সেই দুঃখটা কিসের? শাস্ত্র বলিতেছেন, প্রবৃত্তির উপভোগ-পথে যে বাধা, তাহাই দুঃখ। অতএব প্রবৃত্তির দমন কর, নিষ্কামকর্ম্মী হও, ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না—তোমার দুঃখ থাকিবে না। সাধক বলিলেন, উহা আমি পারিব না, আমাকে অন্য পথ দেখাও। তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র অন্য পথ দেখাইতেছেন। ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছেন যে, তুমি সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর,

তাঁহার প্রসাদভোজী হইয়া থাক, তোমার সুখ হইবে। তোমাকে ছাড়িতে কিছু বলি না, কোন কঠোর করিতে বলি না, তবে তোমার যাহা, তাহা তোমার নহে, শ্রীকৃষ্ণের তোমার পুত্র কলত্র তোমার ঘরবাড়ী, তোমার [illegible] তোমার [illegible], তোমার গাড়িজুড়ি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের। তুমি খাইবে বটে, কিন্তু তুমি সামান্য অন্ন খাইও না, দেবতার ভোগ খাইও; তাঁহাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, প্রসাদরূপে সকলই উপভোগ কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য; তোমার দেহগত রিপুসকলের বিনিয়োগ তোমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই করিবে। রাগ, রোষ, মান, অভিমান করিতে হয়, তাঁহার উপর করিবে; তিরস্কার তর্জ্জন-গর্জ্জন যাহা কিছু করিতে হয়, তাঁহার সম্মুখে করিবে। তিনি রসময়—রসো বৈ সঃ—তোমার সকল রসের বেগ তিনি ধারণ করিবেন। তিনি যখন হৃদয়বিহারী বংশীধারী, তখন তোমার ভালমন্দ যাহা কিছু আছে সকলই তিনি গ্রহণ করিবেন—গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবিচারিত চিত্তে তাঁহাতে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর; তিনি তোমার দুঃখ দূর করিবেন। এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া ভারতের বহু বৈষ্ণব আচার্য্য, বিশেষতঃ বল্লভাচার্য্য, ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব এই ভক্তি-সিদ্ধান্তের উপর প্রেম ও মধুর রসের উদ্ভাবনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন তিনি রসময়—তাঁহার

"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদি

রসলাভ করিয়া আনন্দী হইয়াছে—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মানন্দ আবির্ভাবরূপ মুক্তির প্রতি রসের হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব "রস" বলিতে এ স্থলে শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব রতিকেই বুঝিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, ঐ স্থায়িভাব যখন দেবাদিবিষয়ক হয়, তখন উহা রতি নামে প্রসিদ্ধ হয়, এবং যখন কান্তাবিষয়ক হয়, তখন ব্যক্ত অর্থাৎ বিভাবাদি সহযোগে এক প্রকার আনন্দকর আস্বাদের উৎপাদক হইয়া শৃঙ্গার নাম ধারণ করে। রতি বলিতে অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই তিনি শ্রীভগবানে কান্তাভাব আসক্তি অর্পণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি নায়ক, আমি নায়িকা; তিনি প্রেমময়, আমি তাঁহার প্রেম বিহ্বলা সেবিকা, এই ভাবের উদ্ভাবনার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। যাঁহাকে পিতা, মাতা, গুরু, সখা বলা যায়, তাঁহাকে স্বামী, প্রণয়ী, নায়ক, নাগর, রসময়, সুখময়

স্নেহময়, সুধাময় কেন না বলা যাইবে? কারণ কান্তাভাব-আসক্তি প্রবল হইলেই আত্মনিবেদন পূর্ণাঙ্গে সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কান্তাভাবেই হয়। ভক্তিসূত্রে

তথা ব্রজগোপিকাণাং—

বলিয়া ব্রজবল্লবীদিগের কান্তাভাবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবের ঘর দিয়া যাইয়া আমি আমাকে ধরিব, আমাকে চিনিব, আমাকে জানিব। ভক্ত বলিতেছেন, চিনিব—জানিব—বুঝিব বটে, পরন্তু আমিময় হইব না। চিনি হইব না, চিনি খাইব।

তন্ত্র বলিতেছেন যে, ভক্তিশাস্ত্র আমার কথাই বলিতেছেন, আমার সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিতেছেন বটে; পরন্তু আর একটু সোজা পথে চলিলে ভাল হয়।

যৎ যৎ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ বস্তুঃ সদসৎ বাখিলাত্মকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

বাহিরে ও ভিতরে, বিশ্বে ও দেহে যে সৎ ও অসৎ বস্তুসকলে যে শক্তি-নিচয় ক্রীড়া করিতেছে সে সকলই তুমি বা আমি। সেই শক্তির উদ্বোধন ঘটাইতে পারিলে, শক্তির সাহায্যে মায়ার আবরণ ছিন্ন হইবেই। সেইটা করিতে পারিলেত সকল গোল ঘুচিয়া যায়। কেন না দেহে সেই আদ্যাশক্তি আছেন বলিয়াই দেহ সজীব, দেহের রস সজীব, আসক্তিনিচয় সজীব।

এই শক্তির উদ্বোধনই তন্ত্রের সাধনা। তন্ত্র বলিতেছেন, তোমার মনুষ্য দেহের খবর আমি রাখি, দেহের কোথায় কোন্ শক্তির খেলা হইতেছে, তাহাও আমি জানি। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে তোমার আত্মশক্তির উদ্বোধন হইবে, তাহা আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি; তুমি তাহা অবলম্বন কর; তোমার কল্যাণ হইবে।

তন্ত্রের প্রথম কথা—

জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ।

জপেই সিদ্ধি, জপেই সিদ্ধি, জপেই সিদ্ধি, ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই! ইহা হইতেই নাম কীর্ত্তনের পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। তন্ত্রের দ্বিতীয় কথা—

অহং দেবি ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহম্ ইতি ভাবয়েৎ।

আমিই আমার ইষ্টদেবী, আমা ছাড়া অন্য দেবতা নাই। আমার দেবতা স্বর্গে বসিয়া থাকেন না, কাঁদিয়া কাটিয়া ভূত নামানর মতন তাঁহাকে নামাইতে হয়।

না। তিনি হৃদ্‌বিহারী—আমারই মধ্যে আছেন, আমাতেই আছেন। তন্ত্রের তৃতীয় কথা—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রী-পুং-রূপং ধত্তে।

সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মে স্ত্রী বা পুরুষ রূপের আরোপ করা হয়। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলে তিনি উমা, শ্যামা, গৌরী ; আমি তাঁহাকে পিতা বলিলে তিনি শিব বা বিষ্ণু। আমি তাঁহাকে রাজা বলিলে তিনি শ্রীরামচন্দ্র, আমি তাঁহার কিঙ্কর। আমি তাঁহাকে সখা বলিলে—নায়ক-নাগর স্বামী বলিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। আমার সাধ মিটাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাতে রূপের আরোপ করিতে হয়। তন্ত্রের চতুর্থ কথা—

"গুরোর্ব্বাক্যং মূলমন্ত্রং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং গুরুঃ।"
"গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ।
"সর্ব্বেশং সর্ব্বদং দেবং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥"

গুরুবাদ—গুরুই সর্ব্বস্ব, ইহকাল, পরকাল, ইষ্ট সাধনা, আরাধনা, গুরুই পরম ব্রহ্ম। তন্ত্রের পঞ্চম কথা—

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বদা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

শুচি অশুচি নাই, রোগ শোক নাই, স্থান-অস্থান বিচার নাই, পবিত্র অপবিত্র নাই, যখন যেখানে যে অবস্থায় ও যে ভাবে থাকিবে, সেই অবস্থায় ও সেই ভাবে ও স্থানে ইষ্ট মন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। এ পক্ষে ত্রুটি যেন না হয় ; এ কার্য্যে ত্রুটি হইলেই সর্ব্বনাশ। এই উক্তির সহিত ব্যবহারের সমন্বয় সাধন করিতে যাইয়া তন্ত্র ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার উঠাইয়া দিয়াছেন। সাধনায় জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই।

তন্ত্রের উপাসনা-তত্ত্বের সমাচার ইহার অধিক আর দিতে পারি না। একেত নিষেধ আছে ; দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র বলিতেছেন, যাহা হাতে কলমে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে না পার, তাহার আলোচনা করিও না। সুতরাং সাধনকাণ্ডের গুপ্ত কোন অংশেরই ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। তবে বোধ হয় এইটুকু স্পষ্ট করিয়াছি যে, তন্ত্র তথাকথিত পৌত্তলিকতা বা Idolatory নহে ; এমন কি তন্ত্র Personal God বা জীব হইতে স্বতন্ত্র ধাতা পাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নহেন। তন্ত্র বলেন যে, এক আমিই আছি, এ বিশ্ব সংসারে আর ত কেহ নাই। দেবীসূক্তে এই আমারই কথা ব্যক্ত রহিয়াছে ; তন্ত্র সেই দেবী

সূক্তের উক্তি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। আমাতেই স্ত্রীত্ব ও পুংত্ব নিহিত—হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যখন আমার ইচ্ছা হয় যে একোঽহম্ বহু স্যামঃ—তখনই এক বহু হয়, আমার বিসৃষ্টির বিকাশ হয়। আমি এই আমাকেই "তুমি" বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আমার ভাবের এবং আসক্তির সাহায্যে আমারই তৃপ্তির জন্য সেই তুমির অর্চ্চনা করিয়া থাকি। এই অর্চ্চনা বা উপাসনার প্রভাবে যখন তুমি ও আমি এক হইয়া যাই, তখনই আমার সিদ্ধি লাভ হয়, তখনই আমার জন্ম সার্থক হয়। সাধকের প্রকৃতি ভেদে, প্রবৃত্তি ভেদে, অধিকার ভেদে সাধনার নানা পদ্ধতি নির্নীত হইয়াছে। গুরু শিষ্যের পরিচয় পাইয়া পদ্ধতির নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুঃখ দূর করিবার জন্যই তন্ত্রের সাধনা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে যেমন দুঃখ হউক না, সাধক সাধনার সাহায্যে সে দুঃখ দূর করিবেই। ইহাতে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। তাই মায়ের কাছে তন্ত্রের উপাসক প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ধন দেও, পুত্র দেও, ঐশ্বর্য্য দেও, মনোরমা পত্নী দেও,আমার যাহা নাই, যাহার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা তীব্র রহিয়াছে, তাহা আমাকে দেও। তুমি দিলে আমার সাধ মিটিবে; তুমি দিলে তোমার দত্ত সামগ্রী মাথায় করিয়া লইয়া আমি তোমার শরণাগত হইব। তখন তোমায় পাইলে আমার আর চাহিবার কিছু থাকিবে না, আমি তোমার কৃপায় নিষ্কাম ও নিরীহ হইব। তন্ত্রের সাধন তত্ত্বের ইহাই মূল উদ্দেশ্য। মূলের মোটা কথা কয়টা, যত সংক্ষেপে আমি পারিয়াছি, ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে চেষ্টা সার্থক হইল, কি ব্যর্থ হইল, তাহা মনোময়ী মাই জানেন।

শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শারদীয়া পূজা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, তন্ত্র "আমি বা আত্মা" ছাড়া অন্য কোনও ইষ্ট দেবতার কল্পনা করেন নাই। তন্ত্র ভূয়োভূয়ঃ বার বলিয়া দিয়াছেন যে, ইষ্ট-দেবতাকে কখনই স্বীয় আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিবে না। আর এক কথা; তন্ত্র বলেন, মনুষ্যদেহ তথা জীবদেহ বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার; যে যে গুণ বিশ্বে আছে, সেই সেই গুণ মনুষ্য-দেহে বিদ্যমান আছে। বিশ্বসৃষ্টি Macrocosm বা বিরাট্, মনুষ্যদেহ Microcosm বা স্বরাট্। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিতেছেন,—

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতাল' ভূধরা লোকা আদিত্যাদিনবগ্রহাঃ।
নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পাদাধস্তনং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা।
জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিরন্ধ কে।
তলাতলং গুল্‌ফমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্।
পাতাল' কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবোলোকস্তথা হৃদি।
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি।
জনলোক স্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকো ললাটকে।
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥
ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরু রুদ্রলোকে চ মন্দরঃ।
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে যে গুণ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এই দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাতাল, পর্ব্বত, ভুবাদি লোক, আদিত্যাদি নবগ্রহ এবং নাগ, ইহারা সমস্ত প্রাণীরই দেহমধ্যে সংস্থিত আছে। পাদের অধোভাগে অতল, তদূর্দ্ধভাগে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জানুসন্ধিতে তল, গুল্‌ফমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল এবং কটিসন্ধিতে পাতাল বিদ্যমান আছে। নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবলোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুর্দ্বয়ে মহর্লোক, তদূর্দ্ধভাগে জনলোক, ললাটদেশে তপোলোক, এবং মস্তকে সত্যলোক,—এই প্রকারে দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। এই দেহের ত্রিকোণে মেরু; ঊর্দ্ধ-কোণে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস, বাম কোণে হিমালয়, এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু এই সকল কুলপর্ব্বত অবস্থিত। এই ভাবে তন্ত্র মনুষ্যদেহের মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টির সংস্থান দেখাইয়াছেন। তন্ত্রের বর্ণিত কৈলাসের বর্ণনা কোনও বাহিরের কৈলাস পর্ব্বত নহে; উহা কুলপর্ব্বত; অর্থাৎ, দেহগত কৈলাস পর্ব্বতের আনুমানিক বিবরণমাত্র।

এই ত দেহ, এই দেহে আত্মা বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মাই আমাদের ইষ্টদেবতা, তিনিই সর্ব্বময়।

সর্ব্বদেবময়ীং দেবং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥

আত্মাকে সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী ও পরমানন্দরূপিণী দেবী মনে করিয়া

আত্মার আরাধনা করিতে তন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। তন্ত্র জোর করিয়া বলিতেছেন ;—

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

আত্মস্থ দেবতা অর্থাৎ আত্মময়ী বা আত্মরূপা ইষ্টদেবতাকে পরিহার করিয়া যে সাধক বাহিরের দেবতার উপাসনা করে, সে হস্তস্থিত কৌস্তুভ মণি দূরে ফেলিয়া কাচখণ্ডের আকাঙ্ক্ষায় বৃথা অন্বেষণে জীবন যাপন করে। এ পক্ষে তন্ত্র উপনিষদের বিরোধী নহেন; অদ্বৈতবাদের অপহ্নব ঘটান নাই। তন্ত্র স্পষ্টই বলিতেছেন ;—

একৈব হি মহামায়া নামভেদং সমাশ্রিতা।

এই মহামায়া দেহগত আত্মার শক্তিরূপিণী বা আত্মস্বরূপিণী। মনুষ্যদেহে যোগগম্য ছয়টি চক্র আছে। শিবসংহিতায় ও হঠযোগে যে ভাবে এই ষট্‌চক্রের বর্ণনা আছে, তন্ত্রের বর্ণনাও অনেকটা তদনুরূপ। কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে এই ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়।

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্‌।

মূল পদ্মে কুণ্ডলিনী যাবৎকাল নিদ্রায়িতা থাকেন, তাবৎ কাল যন্ত্রমন্ত্র অর্চ্চাদির দ্বারা কোনও ফলোদয় হয় না। কুণ্ডলিনী আদ্যাশক্তি মহাশক্তি; তিনি স্বয়মেব নিদ্রিতা থাকিতে পারেন না। সাধকের কর্ম্মফলে, দেহগত ধর্ম্মফলে কুণ্ডলিনী নিদ্রায়িতা থাকেন। এই নিদ্রায়িতা কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হয়—উদ্বুদ্ধা করিতে হয়, তবে সাধনা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি কৃপা করিয়া দেখাইলে তবে আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনই তন্ত্র-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য; উহাই সিদ্ধি, উহাই ঋদ্ধি।

তন্ত্র বলেন, যেমন নয়নের উপরে কোনও সামগ্রী রাখিলে তাহা ঠিক দেখিতে পাওয়া যায় না; নাসিকার মধ্যে ফুল গুঁজিয়া দিলে তাহার গন্ধ তেমন পাওয়া যায় না; জিহ্বার উপর কিছু রাখিয়া সদ্যঃ সদ্যঃ গলাধঃকরণ করিলে, উহার আস্বাদ তেমন পাওয়া যায় না, তেমনই দেহস্থ আত্মাকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে দেহ হইতে পৃথক করিয়া তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়। তুমি যাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাও, তুমি তাহাকে তোমার যুগলনয়নের দৃষ্টিসন্ধির উপরে—তোমা হইতে একটু দূরে ধরিয়া দেখিয়া থাক। দূরাগত বংশীধ্বনি অতিমধুর, শ্রবণের সাধ মিটাইতে হইলে দূরের বিহঙ্গ কলরব, দূরের সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে

হয়। যে সামগ্রী ভোজন করিবে, তাহাকে সন্ত সন্ত গিলিলে জিহ্বার সাধ মিটে না; তাহাকে অনবরত চিবাইতে হয়, দন্তের সাহায্যে রস নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া জিহ্বার উপর বুলাইতে থাকিলে তবে ভোজ্যসামগ্রীর স্বাদ পাওয়া যায়। পুষ্পপরাগ পবন-সন্তাড়িত হইয়া তোমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তবে তোমার সৌরভ-বোধ হয়; নাকের ভিতরে ফুল গুঁজিলে বা আতর লাগাইলে গন্ধ পাওয়া যায় না। অনুভূতির সাহায্যে কিছু উপভোগ করিতে হইলে, তাহাকে দেহ হইতে কিছু দূরে, একটু স্বতন্ত্রভাবে রাখিতেই হইবে। আত্মাকে অনুভূতি বা আসক্তির সাহায্যে বুঝিতে ও জানিতে হইলে, তোমা হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া, তোমার দেহ হইতে তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। এই হেতু চণ্ডী বলিতেছেন,—

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।

তুমি মা (আত্মা) এই বিসৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিরূপা, সেই সৃষ্টির রক্ষাব্যাপারে তুমি স্থিতিরূপা, আবার উহার সংহরণ বা সঙ্কোচ ব্যাপারে তুমিই সংহৃতিরূপা, তাই তোমাকে এই জগতের জগন্ময়ী দেবী বলিয়া লোকে পূজা করিয়া থাকে। বিসৃষ্টি কি? দেবীসূক্তে তাহা বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। দেহের সাহায্যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্ব দেখি, শুনি ও বুঝি। দেহের মধ্যে,স্নায়ুকেন্দ্রে সকল পদার্থের অনুভূতি হইলেও, অনুভূত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহিরে ফেলিয়া আমরা অনুভব করিয়া থাকি। এই স্বতন্ত্রীকরণকে বিসৃষ্টি বলে। আমার নয়নের মধ্যে তোমার ছবি অঙ্কিত হইলেও সে ছবিকে আমি দেহের বাহিরে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিয়া থাকি। এই বাহিরে ফেলার নামই বিসৃষ্টি। ইহা আত্মার একটি শক্তি আত্মাকে চিনিতে ও জানিতে হইলে এই শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। এই শক্তিই দ্বৈত-বোধের উপায়-স্বরূপ। এই বিসৃষ্টির পথে অনুভূতির—আসক্তিনিচয়ের বিকাশ হয় বলিয়াই, আমা হইতে পৃথক্ করিয়া, আমার মনের মতন সাজে সাজাইয়া আত্মার আরাধনা করিতে হয়। তাই শিব বলিতেছেন,—

আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং শক্তিমাত্মস্বরূপিণীম্।
মনসা বচসা চৈব কায়িকেন চ চিন্তয়েৎ।

বিষ্ণুযামলে বিষ্ণু বলিতেছেন,—

মাতস্ত্বং পরমং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন।
কালাত্মা স্থূলযদ্রূপং তৎপশ্যন্তি দিবৌকসঃ

শিব বলিতেছেন,—

স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্।

এই ভাবের অনেক বচন প্রায় সকল তন্ত্রেই পাওয়া যায়। যাহা হউক, তন্ত্রের উপাসনা-তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত কি, তাহা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। এইবার তান্ত্রিকী উপাসনার বিশিষ্টতাটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মাণ্ড ও দেহকে তন্ত্র সমগুণসম্পন্ন বলিয়া থাকেন। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, দেহে যেমন আত্মা থাকিয়া দেহের সজীবতা রক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ডে তেমনই পরমাত্মা থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডলীলার বিকাশ করিতেছেন। এই আত্মা

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

বটেন; কিন্তু সেই স্থাণুকে বেড়িয়া এক শক্তি লীলা করিতেছেন। এই শক্তিকে আমরা ধরিতে পারি, কেন না শক্তিই প্রকট। ব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তির লীলা, দেহভাণ্ডেও সেই শক্তির খেলা। এই শক্তিই জগন্মাতা—আদ্যাশক্তি। ইঁহাকে উদ্বুদ্ধা করিতে হয়; সেই উদ্বোধনই তন্ত্রের সাধনা-পদ্ধতি। এই শক্তিরই বিকাশ দেহে নানাভাবে হইয়া থাকে। ষড়রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই শক্তির বিকার; একাদশ আসক্তি—গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি; পূজাসক্তি; স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি; কান্তাসক্তি; বাৎসল্যাসক্তি; আত্মনিবেদনাসক্তি ও পরমবিরহাসক্তি—এই শক্তির বিকাশ মাত্র। তন্ত্র সমাজধর্ম্মের ধার ধারেন না, পাপ পুণ্যের বিচার করেন না। তন্ত্র বলেন, আমার সাধনায় যাহা উপযোগী, তাহাই আমার গ্রাহ্য; অন্য সকলই পরিহার্য্য। তন্ত্র প্রথমে রিপু ও আসক্তির সাহায্যে ইষ্টের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক করিয়া থাকেন। শেষে ষট্চক্র-ভেদ আদি শক্তির ক্রিয়া করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার সাধন করেন। তন্ত্রের গোড়ায় ভাব, শেষে যোগ। যোগের জন্য যেমন কালাকালবিচার আছে, ভাবের জন্যও তেমনই কালাকালনির্ণয় করিতে হয়। এই কালাকালবিচারসময়ে তন্ত্র বাহ্য প্রকৃতির সহিত—(ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহভাণ্ডের) অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধন করিয়া থাকেন। তন্ত্র বলেন, তোমার দেহের যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা আছে, বায়ু কফ পিত্ত শ্লেষ্মার বিকার হেতু অবস্থাবিপর্য্যয় আছে, ব্রহ্মাণ্ডেরও ঠিক তেমনি আছে। ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার সহিত দেহের আত্মার সম্মেলন ঘটাইতে হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহকে সমাবস্থাপন্ন—সমসূত্রে সংবদ্ধ করিতে হইবে। যোগপক্ষে দুইটি কাল আছে,—

"স্বাপকালো বামবাহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ।"

যখন বাম নাসিকা দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তখন দেহের স্বাপকাল কহে; যখন দক্ষিণ নাসিকা দিয়া প্রশ্বাস বাহির হয়, তখন প্রবোধকাল বলে। পৃথিবীর উত্তরায়ণ প্রবোধকাল, দক্ষিণায়ন স্বাপকাল। আবার প্রতিদিনে পৃথিবীর স্বাপকাল ও প্রবোধকাল আছে। তন্ত্র বলেন, এই প্রবোধ এবং স্বাপকালের বিচার করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতে হইবে। এই জাগরিতা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে ষট্‌চক্রের মধ্যে বিচরণ করাইলে ইষ্টসিদ্ধি হয়।

"যাতায়াতং ক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্।"

বারে বারে ষট্‌চক্রভেদ করিতে থাকিলে মনের লয় হয়; মনের লয় হইলে আত্ম-বিকাশ স্বয়মেব ঘটিয়া থাকে। তন্ত্র বলিতেছেন,—

ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিসতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্।
অবাক্‌রূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষাদ্‌ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ
এবং দ্বাদশধা দেবি যাতায়াতং করোতি যঃ
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মন্ত্রসিদ্ধির্ন চান্যথা
যত্র তত্র মৃতশ্চায়ং গঙ্গায়াং শ্বপচালয়ে।
ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে নান্যথা প্রিয়ে॥

সনাতনী কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গরূপিণী; পদ্মের নালের ভিতরের সূতা যত সূক্ষ্ম, এই ভুজঙ্গরূপিণী তেমনই সূক্ষ্ম ও অমৃতরূপিণী; ইঁনি ধ্যানগম্যা, দিব্যরূপা—বাক্যমনের অগোচরা; ইঁহাকে ধ্যান করিলে, জপ করিলে, এবং দ্বাদশ বার ষটচক্রভেদ করাইলে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যায়; সে সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। সে জীবন্মুক্ত পুরুষ, সে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেও যেমন, শ্বপচালয়ে মরিলেও তেমনই।

ইহাই তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির গোড়ার কথা। তন্ত্র-সাধনার দুইটি অঙ্গ আছে,—(১) ভাব-সাধনা, (২) শক্তি-আরাধনা। শক্তি-আরাধনার অন্তর্গত জপ, যজ্ঞ, ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা, লতাসিদ্ধি, ভৈরবীচক্র প্রভৃতি। ভাব-সাধনায় পূজা, উপাসনা, ধ্যান, জপ, লীলা, সেবা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দুর্গোৎসব এই ভাব-সাধনার অন্তর্গত সামাজিক উৎসব। কুণ্ডলিনীকে মা বলিয়া, মাতৃ-ভাবে তাঁহাকে জাগাইয়া, চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করিয়া, যে পূজাপদ্ধতি, তাহাই শারদীয়া পূজা। ইহা অকালবোধন; ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবীর যে আয়তনে আমরা

বাস করিতেছি, তাহারই স্বাপকালে দেবনিদ্রার কালে,—এই পূজার বোধন করিতে হইয়াছে বলিয়াই; শারদীয়া পূজায় অকাল-বোধন করিতে হয়। দেবনিদ্রার কালের পূজা বলিয়াই ইহার নাম নবরাত্রের পূজা। এই অকাল-বোধনের ক্রমটি অতি সুন্দর। প্রথমে ব্রতপক্ষে ব্রতনিয়মাদি করিয়া শক্তিপূজার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়; তাহার পর পিতৃপুরুষদের আহ্বান করিতে হয়। দক্ষিণায়নে পিতৃপুরুষগণ জাগিয়া থাকেন। মাতৃশক্তির উদ্বোধন জন্য পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া তাঁহাদের সহায়তা লাভ করিতে হয়। মাতৃপূজা আত্মার খেলা; দেহী আত্মা বংশানুক্রমের প্রভাবে কোন্ ভাবে সম্মূঢ়া হইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে ও জানিতে হইলে, যাঁহাদের কৃপায় আমি দেহী হইয়াছি, তাঁহাদেরই করুণা প্রার্থনা করিতে হয়। সে করুণা লাভ করিলে, কুণ্ডলিনীকে অকালে জাগাইতেও কোনও বাধা থাকে না। তাই মহালয়ার পরেই দেবীপক্ষ—নবরাত্রের উৎসব আরব্ধ হয়।

মাকে জাগাই ভাব দিয়া। মা আমার হিমালয়-কন্যা। এ হিমালয় নেপালের উত্তরের হিমালয় পর্ব্বত নহে, আমার দেহস্থ বামকোণব্যাপী হিমালয় পর্ব্বত আছে, তদ্দেশজাতা মনোময়ী কন্যা। দেহের বামকোণে হৃৎপিণ্ড, তাহারই মধ্যে পর্ব্বে পর্ব্বে বিস্তৃত হিমালয় ভাব-গিরি আছে। মাকে দেহস্থ দক্ষিণ-কোণের কৈলাস পর্ব্বত হইতে নামাইয়া হৃদয়ে—হিমালয়ে আনিয়া বসাইতে হইবে। ইহাই হইল দুর্গোৎসবের অকালবোধন। দক্ষিণায়নে—স্বাপকালে মা কৈলাসে শিবসংযুক্তা হইয়া থাকেন। এ সময়ে কৈলাস হইতে মাকে হৃদ্‌গেহে আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই ভাবময়ীকে আগমনী গান শুনাইতে হয়,—মাকে কন্যারূপে আহ্বান করিতে হয়। পুরাণ তন্ত্রের এই দেহতত্ত্বটুকু লইয়া অতিমনোহর উপাখ্যান সকল রচনা করিয়াছেন। হরগৌরীর এই উপাখ্যান পাঠ করিলে ভাবোদয় হয়; ভাব জন্মিলেই ভাবময়ীকে ফুটাইয়া তোলা যায়। সাধক এই সকল উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; বাস্তব-পক্ষে পুরাণের বহু উপাখ্যানের ঐতিহাসিক ভিত্তিই নাই, উহারা অর্থবাদ, অর্থাৎ বেদের ও তন্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল কাহিনীর আকারে ব্যাখ্যাত—সরলীকৃত, অথবা ভাবোন্মেষের মার্গস্বরূপ। শিবগৌরী-ঘটিত বহু উপাখ্যানই ভাবোন্মেষের উপাখ্যানমাত্র। আগমনী এ রস জমাইবার, ভাব ফুটাইবার উপায়স্বরূপ। বাসন্তী দুর্গোৎসবে এমন আগমনীর হাঙ্গাম নাই, সে ত অকালবোধন নহে। তখন মাকে কন্যারূপে আবাহন করিতে হয় না। শারদীয়া পূজায় কন্যারূপে

আহ্বান করিবার একটু হেতু আছে। কন্যাকে ডাকিবার কালাকাল নাই, যখন ইচ্ছা তখন মেয়েকে ডাকিতে পার, আর সেই মেয়ে জনকের ডাকে নাচিতে নাচিতে, সোহাগে আদরে গলিয়া ঢলিয়া বাপের কোলে আসিয়া উপবেশন করেন। মেয়ে ঘুমাইলেও তাহাকে ডাকিয়া ঠেলিয়া জাগাইলেও কোনও অপরাধ হয় না। তাই শরৎকালে মা আমার আত্মজা কন্যা। এক হিসাবে মা ও মেয়ে দুই এক; মাও মা, মেয়েও মা। মার কাছে একটু সঙ্কোচ আছে, একটু বিধিনিষেধের বেড়া আছে, মেয়ের কাছে তাহার কিছুই নাই। জননী জনকের কাছে থাকিলে স্তন্যপ পুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রের গমন নিষিদ্ধ আছে। মা বলিয়া ডাকিতেও নিষেধ আছে। মেয়ের পক্ষে এবম্প্রকারের কোনও নিষেধ নাই। তাই অকালবোধনের সময়ে শরৎকালে মা আমার কন্যারূপে ফুটিয়া থাকেন। তাই শরতের আগমনী কন্যার পিতৃগৃহে আগমন-বিশেষ। কন্যাভাবে আহ্বান করিলে কুলকুণ্ডলিনী কৈলাস ত্যজিয়া হিমালয়ে আগমন করিয়া থাকেন। অকালে ষট্চক্রভেদের একটা পদ্ধতিবিশেষকে পুরাণ অতিমধুর অতি মনোহর উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা ব্রহ্ম—

"রসো বৈ সঃ।"

তিনি রসস্বরূপ। রস কি? দেহের অনুভূতিশক্তিই—আসক্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি রসস্বরূপ। ইংরেজিতে রসকে Emotions বলা যাইতে পারে। তিনি রসময় কেন? যে হেতু তাঁহাকে রসের সাহায্যেই কেবল চিনিতে ও জানিতে পারি। রস ছাড়া তিনি যাহা, তাহা বাক্য মনের অগোচর, তাহা অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত, অননুভূত। আমি তাঁহাকে রস ও ভাব দিয়াই বুঝিয়া থাকি। তাই সাধকের হিসাবে তিনি রসময়—ভাবময়। আত্মাকে বাক্য মনের গোচর করিতে হইলেই রসের সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহাকে নিরাকারই রাখ, আর সাকারই কর, তাঁহাকে ধ্যানগম্য, ভাবগম্য করিলেই তাঁহাকে রসময় করিতেই হইবে। তন্ত্র বলেন যে, রসময়ী কুলকুণ্ডলিনীকে ভাবময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিতে হয়। দুর্গা দশভুজা আমার সেই ভাবময়ী জননী। আমার সাধ মিটাইবার জন্য আমি চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করিয়া থাকি। তিনি কেমন, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না; তবে তিনি যে আমি, আমি যে তিনি, তাহা অনুমানে অনেকটা বুঝিতে পারি। বেদ, উপনিষদ্, আগম, নিগম, আমার এই অনুমানের সমর্থন করিতেছেন।

অতএব আমি আমাকে, আমার ভাবময়ী কুণ্ডলিনাকে, আমার সাধের মতন সাজাইব। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আমার সাধ মিটাইয়া মায়ের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি সেই চণ্ডীর আলেখ্য ধরিয়া দশভুজার পূজা করিয়া থাকি। আমার কাছে আমার কোনও লজ্জা নাই; আমার মা আমার—আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। আমি সেই মায়ের কাছে আমার ভালমন্দ সকল সাধ ব্যক্ত করিব, উলঙ্গ হইয়া আমার মনের সকল অভিরুচি প্রকাশ করিব। ইহাই দুর্গোৎসব। তন্ত্র বলিতেছেন;—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গ সংসারী নিবৃত্তি পরমাত্মনি॥

আমি সংসারী, প্রবৃত্তিমার্গই আমার অবলম্বনযোগ্য। সাধ মিটে না বলিয়াই, পিপাসার শান্তি হয় না বলিয়াই, আমি আমার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার ভাবময়ী দেবী আমার ভাবানুকূলা হইবেনই; আমি তাঁহার সাহায্যে আমার সকল সাধ মিটাইব। সেই সাধ মিটাইবার জন্য তৃপ্তি-তুষ্টি-সাধনের জন্য আমার দুর্গোৎসব। তাই আমি আমার মায়ের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করি—ধন দেও মা, জন দেও মা, রূপ দেও মা, ঐশ্বর্য্য দেও মা, মনোরমা কামিনী দেও মা, পুত্র দেও মা, কন্যা দেও মা-- আমার যাহা কিছু চাই, তাহা দেও; ইহসংসারে আমার যত অভাব, তাহা পূর্ণ কর মা! তুমি কল্পলতিকা, তুমি না দিলে আর কে দিবে? তোমা ছাড়া আর কাহার কাছেই বা প্রার্থনা করিব? তাই ভক্ত গান করিয়াছেন,—

আর কারে ডাকবো শ্যামা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নয় মা তোমার,
ডাকবো গো যাকে তাকে।

একনিষ্ঠাই ভাবের ও রসের সর্ব্বস্ব। একনিষ্ঠ না হইলে ভাব ফুটে না, রস উথলায় না। একনিষ্ঠ না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই তন্ত্র শতমুখে এক-নিষ্ঠ-সাধনার গুণগান করিয়াছেন। ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"ডাকার মতন ডাক দেখি মন,
কেমন মা তোর রৈতে পারে।"

ডাকার মত ডাকিতে হইবে, প্রাণ মন ঢালিয়া ডাকিতে হইবে, তবে ত মা জাগিবেন। মা আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আবার ব্রহ্মাণ্ডের জীবনসর্ব্বস্ব। আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব যখন তিনি, তখন তিনি আমার অতি নিকটে—প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। বিশ্বের সর্ব্বময়ী যখন তিনি তখন বিসৃষ্টির প্রভাবে আমি

তাঁহাকে দূরে—অতিদূরে ভাবিয়া থাকি। বিশ্বময়ী ও আত্মময়ীকে এক করিতে বড় কষ্টে পড়িতে হয়। তখন একনিষ্ঠার সাহায্যে ডাকার মতন ডাকিলে মা আর থাকিতে পারেন না, জাগিয়া উঠিয়া বসেন। দুর্গোৎসবে বিশ্বময়ী ও আত্মময়ী এক হইয়াছেন। মা আমার দশভুজা—দশদিক্‌প্রসারিণী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী। আবার মা আমার স্নেহ-ঘটমধ্যস্থা কন্যা উমা—দক্ষিণা কালী। মায়ের দালান-জোড়া, ঘর-আলো-করা প্রতিমার দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি! দেখিবে, মা আমার বিশ্বময়ী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজননী। আর পূর্ণ ঘটের দিকে তাকাইয়া দেখ দেখি? নারিকেলের মধ্যে যেমন জল থাকে; কি জানি কোথা হইতে সে জল আসে, কেমন করিয়া আসে, কেহ জানে না, তেমনই দেহের মধ্যে রসময় আত্মা—রসময়ী, ভাবময়ী, আদ্যাশক্তি ঢলঢল রূপে বিরাজ করিতেছেন। এই দুই জনকে—দুই আত্মাকে এক করিবার উপাসনাই দুর্গোৎসব। একা সাধকের সাধনা নিষ্ফলা হইতে পারে, পরন্তু সমাজসংহতির উপাসনা দুর্গোৎসবের উৎসব ব্যর্থ হইবার নহে। চণ্ডী ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, দেবতাগণ যেমন নিজের নিজের শক্তি ও অস্ত্র দিয়া মহাদেবীকে অসুর-ধ্বংসরূপিণী করিয়াছিলেন; তেমনই সমাজদুর্গতি দূর করিবার জন্য, মাতৃশক্তির উদ্বোধনচেষ্টায় তোমরা নিজের নিজের বিশিষ্ট শক্তির প্রয়োগ কর—সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা—তোমাদের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবার নহে। মহাকালিকা পুরাণে বারে বারে নানাভাবে এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই কালিকা পুরাণই দুর্গোৎসব-পূজাপদ্ধতির মূল। কালপ্রভাবে আমরা শ্রীগুরুর কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছি, শাস্ত্র বুঝিবার বুদ্ধি হারাইয়াছি; শাস্ত্রের আদেশের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি। ফলে মাটীর প্রতিমা মাটীই থাকে, দুর্গোৎসব আর করা হয় না। দুর্গোৎসবের অন্তরালে যে বাঙ্গালার কত ইতিহাস লুকান আছে, কত সমাজতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা এক মুখে বলা যায় না, এক জীবনে শেষ করা যায় না। তন্ত্রের সাধনতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে দুর্গোৎসব বুঝা কঠিন; দুর্গোৎসব না বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালীকে চিনিতে পারিবে না। তাই অনন্ত সাগর সম তন্ত্রসাধনা-বিস্তার হইতে সামান্য দুই একটি রত্নখণ্ড পাঠকগণকে উপঢৌকন দিলাম। একে ত তন্ত্রসাগর পার হইতে কেহ পারেন নাই; তাহার উপর অধুনা তান্ত্রিক পণ্ডিতের অভাব ঘটিয়াছে: আমরা ইংরেজি শিখিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি। ফলে আমরা জানিই বা কি, বলিবই বা কতটুকু? কিন্তু যতটুকু জানি, এবং যাহা জানি, তাহার যতটুকু প্রকাশ করিবার অধিকারী,

সেটুকুও ভাল করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলে,মাসিক পত্রে কুলাইবে না , একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। সে গ্রন্থের এখনও প্রয়োজনাভাব। কেন না, তন্ত্র বলিতেছেন, শুশ্রূষু অধিকারী না পাইলে, তন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে নাই। তন্ত্র ব্যাখ্যা বক্তৃতার বিষয় নহে, হাতে কলমে করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার পদ্ধতি। এই সকল সন্দর্ভের সাহায্যে কখনও যদি জিজ্ঞাসুর সৃষ্টি করিতে পারি, অনুসন্ধিৎসুর দল পুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে নিজের জীবন সার্থক হইল,মনে করিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকালের কথা।

১

বয়সের দোষে কেমন হইয়াছি, কাল যাহা ঘটিয়াছে, আজই তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু সেকালের অনেক কথা বেশ মনে পড়িতেছে। কৈশোর যৌবনের অনেক কথা আধভাঙ্গা ঘুমের স্বপ্নের মত অল্প অল্প মনে হয়। রকে উঠানে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ানোর কথা অবশ্য মনে নাই, চারি পাঁচ বৎসর বয়সের প্রত্যেক ঘটনাগুলি নিখুঁত ভাবে মনে পড়িতেছে। পিতামহী যখন সকাল বেলা ফুলের ডালা হাতে করিয়া ফুল তুলিতে যাইতেন, ডাল নোয়াইয়া যখন ফুল তুলিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তখন যে কচি হাত বাড়াইয়া সেই নোয়ান ডাল হইতে দুই চারিটি ফুল ছিঁড়িয়া ডালায় ফেলিয়া কৃতার্থ হইতাম, তাহা বেশ মনে আছে। তাহার ফলে সমবয়স্ক প্রতিবেশী বালকদিগের সঙ্গে দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যে ফুল তোলার একটা প্রতিযোগিতা ছিল, ডালা ভরিয়া ফুল আনিয়া দেবপূজার সহায়তা করিলাম বলিয়া যে আত্মপ্রসাদ পাইতাম, সেই নিখুঁত সুখটুকু সভ্যতালোকের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন উপিয়া গিয়াছে। ফুলতোলার প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। সে কালে শুধু বর্ষীয়সীরাই ফুল তুলিতেন না ; উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক অতিবৃদ্ধ রামানন্দ পঞ্চানন মহাশয়কেও ফুল তুলিতে দেখিয়াছি। তিনি ডালা হাতে করিয়া সমস্ত গ্রামটি ভ্রমণ করিতেন। বেশ মনে পড়িতেছে, তিনি নিমন্ত্রণে কর্ম্মবাড়ীতে যাইয়া সিধায় যে সন্দেশ পাইতেন, ফুল তুলিবার সময়ে সেইগুলি ডালায় করিয়া আনিতেন ও আমাদিগের মত বালকদিগকে ঝুঁটিয়া দিতেন। সেই সন্দেশ পাইয়া আমাদিগের কত আনন্দ, কত নৃত্য, দেখে কে? সেই অল্পে

সন্তুষ্ট হইবার কথা মনে করিলে এখনও আনন্দে চক্ষে জল আসে। যে দিন তিনি সন্দেশ আনিতেন না, সে দিনও আমাদিগের কোন মনঃকষ্ট হইত না; আজ নাই, আনিতে পারেন নাই, যেদিন পারিবেন, নিশ্চয় আনিবেন, এই বিশ্বাস আমাদিগের (সে কালের বালকদিগের) ছিল।

শুনিতে পাই, দক্ষিণ-বঙ্গে ও পূর্ব্ব-বঙ্গে ছেলেদের উপরে গুরুমহাশয়ের নিজের প্রভুতা ও জীবিতাবস্থায় অবনত বেত্রের মৃতাবস্থার ঔদ্ধত্য প্রতিমুহূর্ত্তে সপ্রমাণ করিতেন; কিন্তু উত্তর-বঙ্গে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতবহুল আমাদিগের গ্রামে, বোধ করি, সেরূপ গুরুমহাশয় ছিলেন না। শূদ্র গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ বালককে দেববালক মনে করিয়া তাহার উপরে কখনই হাত উঠাইতেন না; শান্তভাবে মাটীতে, পাতায় ও ক্রমে কাগজে লিখাইতেন, শিশুবোধ পড়াইতেন, খেলার জন্য ছুটী দিতেন, প্রাতে টোপা ভাত (প্রাতরাশ) খাইবার জন্য ছুটী দিতেন। 'টোপা ভাত' কাহাকে বলে, বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে যেমন সকালে পচা ঘিয়ে ভাজা বাজারের খাবার আনিয়া, অথবা বাড়ীতে চর্ব্বি-মিশান ঘিয়ে লুচী মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাকে খাইতে দেওয়া হয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। পূর্ব্বে দক্ষিণ-বঙ্গে আখের গুড় বা খেজুর গুড়ের সঙ্গে কিছু কিছু মুড়ি দেওয়া হইত; উত্তর-বঙ্গে মুড়ি না দিয়া বালক-বালিকাকে ভাত রাঁধিয়া দিবার পদ্ধতি ছিল। তরকারী ভাল হইত না, ভাতে-ভাত হইত। আলু, পটোল, কাঁচকলা, ডাল, পোস্ত, বা মাছ, ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করিত, বেগুন পোড়া দিবারও রীতি ছিল। সকাল বেলায় বালকবালিকাকে দিবার জন্য যে ভাত রাঁধা হয়, তাহারই নাম 'টোপা ভাত'। রঙ্গপুরী খাঁটী সরিষার খাটী তেল ও লবণের যোগে পাড়ার বালক বালিকার সহিত একত্র বসিয়া সেই টোপা ভাতে যে 'তার' পাইয়াছি, আজ পোলাও, খিচুড়ী, পক্বান্ন, মিষ্টান্নে সে তার পাই না। কালদোষে জিভ কেমন অসাড় হইয়া গিয়াছে। দুর্গা-পূজায় ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যে বাল্যভোগ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতেও লুচী পক্বান্ন দিবার রীতি নাই। অদ্যাপি খিচুড়ী বা ভাতে ভাত দিবার পদ্ধতি আছে। না সে কালে সেই বাল্যভোগের প্রসাদ পাইতে কতই আমোদ পাইয়াছি,—এক কথায় তাহা বুঝাইতে পরি না। আহারের প্রসঙ্গ যখন উঠিয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আহারের কথার শেষ করিয়া অন্য কথা পাড়িব।

একদিন মধ্যাহ্নে পাড়ার বালক বালিকার সঙ্গে একটি ঘরে খাইতে বসিয়াছি। সে কালে এ কালের মত কোনও বিষয়েই আড়ম্বর ছিল না। সে কালে গৃহ-

দেবতাকে দিবার জন্য গৃহিণীরা নিজের প্রস্তুত তিলের লাড়ু, নারিকেলের লাড়ু, সর-ভাজা, ক্ষীরের ছাঁচ সর্ব্বদা গৃহে রাখিতেন। সে কালে অধিকাংশ ফলাহারের নিমন্ত্রণে সরুধান্যের পাতলা চিড়া, খৈ, মুড়কি, উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর ও চিনি দিলেই হইত, তাহার উপরে যিনি দুইচারিখানি লুচী ও দুই একটি সন্দেশ দিতেন। তাঁহার প্রশংসার পার ছিল না। ভোজনেও সেইরূপ পোলাও কালিয়ার ঘটা ছিল না। সিদ্ধ, ভাজা, ডাল ও ব্যঞ্জনের কিন্তু অবধি ছিল না, তাহার উপরে দধি ও পায়স থাকিত। পাচকের পৃষ্ট অন্ন সেকালে কেহই খাইতেন না; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, সকল কার্য্যেই স্বয়ং গৃহকর্ত্রীকেই অন্নপূর্ণার কাজ করিতে হইত। এত ঘৃত, এত তৈল, এত মশলা লাগিত না; হাতের গুণে তাক-তুকের গুণে প্রত্যেক ব্যঞ্জনই অমৃততুল্য সুস্বাদু হইত। সেদিন আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী সমস্ত রন্ধন পরীবেশন করিয়াছিলেন। সেই দিনের একটি ব্যঞ্জন আমার মুখে বড় উপাদেয় লাগিয়াছিল, আমি সেই ব্যঞ্জনটি চাহিয়াছিলাম, মাতৃদেবী দিয়াছিলেন। পরে আবার চাহিলে তিনি গরম হইয়া বলিলেন, "যদি ভাল হইয়া থাকে, সকল বালক বালিকাই পাইবে, তোকে দিয়াই ফুরাইয়া ফেলিব, অন্য ছেলে পুলেকে দিব না, কেমন?" আর তিনি দিলেন না। আমারও অভিমান হইল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আহারের জন্য কখনও কোনও জিনিস চাহিব না। অদ্যাপি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি। কিন্তু তখন আমি নির্ব্বোধ বালক, মাতার মহিমা বুঝি না। যখন সেই জগদ্ধাত্রীর কথা মনে হয়, তখনই চোখে জল আসে, এখন কি আর গৃহিণীদিগের মধ্যে সেই উঁচু ভাবের ছবিটুকু দেখিতে পাইব? তখনকার মা যে শুধু আমার বা তোমার মা ছিলেন, তাহা নহে, বিশ্বসংসারের মা ছিলেন; এখনকার মা শুধু তার পেটের ছেলেটির। অন্য ছেলেরা হাঁ করিয়া দেখিতেছে, এখনকার মা লজ্জার মাথায় বাজ হানিয়া নিজের ছেলের মুখে অনায়াসে মিষ্টান্ন গুঁজিতেছে; হায়! কি ছিল; কি হইল! সোনার বাঙ্গালা ছাই হইয়া গিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদিগেরই যখন এতটা পতন, আমরা স্বার্থপর পুরুষ, আমাদের কথা ছাড়িয়াই দাও।

আমরা পাড়াগাঁয়ে সাদাসিদে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে জন্মিয়াছি। বলা বাহুল্য তাঁহারা নিজের পয়সা দিয়া কখনও সহর হইতে মালদহী আম বা কুটানী কমলা লেবু পরিবারবর্গের জন্য কিনিয়া আনিতেন না। মাঝে মাঝে গ্রামের জমীদার আনাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দুই চারিটি করিয়া দিতেন। অংশানুসারে আমরা তাহার কতটুকু পাইতাম, পাঠক পাঠিকা

ভাবিয়া দেখুন। আমার স্মরণ হয়, একবার আমি অর্দ্ধাংশ কমলা লেবু পাইয়াছি। আমি খাইব, মনে করিতেছি, একটি ভিক্ষার্থিনী দরিদ্রা তাহার একটি ছেলেকে লইয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হইল, সেই বালকটি আমার হাতের কমলালেবুর দিকে তাকাইয়া আছে, আমি অমনি সেই লেবুখণ্ড সেই বালকের হাতে দিলাম। নিকটে বৃদ্ধা পিতামহী দাঁড়াইয়াছিলেন; দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "দ্যাখ, তোর কখনই কষ্ট হইবে না, তুই সুখে কাল কাটাইবি।" বলা বাহুল্য, এইরূপ উৎসাহে বালক নিজের চরিত্র গড়িতে পারে। এ স্থলে আরও একটু বলা ভাল যে, আমি নিজের জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই, কোন গুণে আমি নিজের জীবন চরিত লিখিতে যাইব? মাতা পিতামহীর সংসর্গে যে এক আধটুকু সাধুভাব পাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চলিয়া গিয়াছে; কখনও যদি বিজলীর মত এক আধবার আসে, স্বার্থপরতা তখনই তাহাকে পিষিয়া দূর করিয়া দেয়। কেবল সে কালের একটি চিত্র সকলের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের গুরু মহাশয় সকালে মাত্র শিক্ষা দিতেন, বিকালে আর তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছিল না। বিকালে আমরা খেলিয়া বেড়াইতাম। আমরা ফুটবল, ব্যাট বল, টেনিস খেলা জানিতাম না। আমরা রাম রাবণের যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের খেলা করিতাম; সে যুদ্ধে ব্যূহ রচনা পর্য্যন্ত হইত। তীর ধনুর যুদ্ধ অল্পই ছিল, গদা-যুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধের প্রচলন অধিক ছিল। কতকগুলি ছেলে চক্রাকারে দাঁড়াইত, তাহারই নাম ব্যূহ; বালকদিগের বাধাসত্ত্বেও যে বালক বল করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত, সে বাহবা পাইত। বিস্তৃত ভূমির শেষ সীমায় একটি পাকাটী পুতিয়া রাখা হইত; সেই ভূমির অপর সীমায় দাঁড়াইয়া দুইটি বালক একবারে দৌড় দিয়া যে আগে গিয়া পাকাটীটি ছুঁইবে, খেলায় সেই জিতিবে, অপর হারিবে। এক বালক একটি সুপারি মুটে ধরিবে, অপর বালক তাহা খুলিয়া লইবে, না পারিলে সে ঠকিবে। এক বালক একটি বাতাবি লেবু পেটের উপরে রাখিয়া দুই উরু তাহার উপরে রাখিয়া দুই হাতে সেই উরু দুইটি খুব আঁকড়াইয়া ধরিবে, অন্য বালক তাহা খুলিয়া লইবে, না পারিলে সে ঠকিবে। সাত হাত মাটী মাপিয়া সমুদ্র করা হইত, যে তাহা ডিঙ্গাইবে, তাহার বাহাদুরী হইবে। বাহুযুদ্ধে জয়ী হইলে তাহারও প্রশংসা ছিল। মাতারা দাঁড়াইয়া জয়ের পুরস্কার ঘোষণা করিতেন।

অন্যের ছেলে নিজের ছেলেকে মারিল বলিয়া সে ছেলের উপর রাগ করিতেন না। আর এক প্রকার খেলা ছিল দোল ও কালীপূজা। পাকাটীর চৌদোল ও মকরকণ্ঠ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চৌদোল টাঙ্গান হইত, শিব মৃত্তিকায় শালগ্রাম গঠন করিয়া তাহাতে বসাইয়া ফুল তুলিয়া পূজা হইত ঝুলন হইত, বালীর আবির দেওয়া হইত। একটি কাল কচুর গাছে কচুর 'নাইলে' চারিখানি হাত খ'ড়কে দিয়া লাগান হইত, জবা ফুলের পাপড়িতে জিভ্ করিয়া লাগাইয়া কালী প্রস্তুত হইত, ফুলে জলও বালীর নৈবেদ্য তাহার পূজা হইত, ছোট বড় কচু গাছে পাঠা ও মহিস করিয়া তাহাকে বলি দেওয়া হইত। কত কি খেলার কথা বলিব? বুদ্ধিমান্ বালক আবার নূতন রকমের খেলা আবিষ্কার করিত। আরামের খেলা ছিল—দোলনায় দোলা। ছায়াবহুল গাছের মোটা ডালে অল্প মোটা শক্ত দড়ীতে দুই দিকে বাঁধিয়া একখানি তক্তা টাঙ্গান থাকিত; তাহাতে বসিয়া কোনও বালক আস্তে আস্তে দুলিয়াই আরাম পাইত, কোনও বালক আস্তে আস্তে দোলাইয়া দিত। কোনও দুষ্ট যুবক আসিয়া যখন মাথার উপরে তুলিয়া বেগে ছাড়িয়া দিয়া দোলাইত, তখন দোল্নায় উপবিষ্ট বালকের আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া যাইত সে তখন প্রাণপণে দুই হাতে দুইখানি দড়ী শক্ত করিয়া ধরে, এবং প্রাণপণে চীৎকার করে—ছাড়ার পরে সেই বেগে যখন দুই চারিবার বেগে দোলে, তখন আবার বালক খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে, "আবার দোলাও, আবার দোলাও" বলে; কিন্তু মাথার উপরে তোলার সময়ে আবার চীৎকার করিয়া উঠে। বসন্তের শেষে ও গ্রীষ্মের প্রথমে বালকেরা যখন দৌড়াদৌড়ি খেলায় ক্লান্তি বোধ করিত, সেই সময়ে এই দোলনায় দুলিত। অন্য ডালে বসিয়া দোয়েল শিস্ দিত, আকাশে উড়িয়া একবার পঞ্চমে স্বর তুলিয়া বৌ-কথা-কও পাখী আকাশ ভাসাইত, আর অন্য দিকের ছায়ায় প্রবীণের মধ্যে কেহ কেহ পাতা মাদুরে বসিয়া বাঁ হাতে হুঁকা ধরিয়া দাবা খেলার পিলঠিকে ত্যাগ করিব, কি নৌকাকে ত্যাগ করিব, এই চিন্তায় তামাকু খাইবারও অবকাশ পাইতেন না। সকলেই নিজের নিজের কাজে তন্মনস্ক, কাহারও দিকে কেহ চাহিতেছে না, কাহারও কথায় কেহ কাণ দিতেছে না। যদি কখনও দোলনার দড়ী ছিঁড়িয়া ঝুপ করিয়া বালক পড়িয়া যাইত, এবং মুহূর্ত্ত পরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত, তখন বৃদ্ধেরা দাবা খেলা ছাড়িয়া "সর্ব্বনাশ হইল!" বলিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিতেন; গাছের ডাল হইতে দোয়েল উড়িয়া যাইত, কিন্তু বৌ-কথা-কও পাখী

উড়িয়া উড়িয়া আরও জোরে হাঁকিয়া আকাশে ঢেউ তুলিত, তাহা যারা বুঝাইয়া দিত,—সুবিস্তীর্ণ আকাশে উড্ডিয়মান সঙ্কীর্ণ মর্ত্ত্য লোকের সঙ্গে আবার কিসের সম্বন্ধ ?

পূজা আসিয়াছে। পূজার নামেই বালক বালিকা আনন্দে অধীর। ছুতোর আসিয়া যখন প্রতিমার পাঁঠ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই দেখিবার জন্য বালক বালিকার ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি, আনন্দে উন্মত্ততা। আজি কুম্ভকার আসিয়া বুঁদি বাঁধিয়াছে, আজ মাটী লইয়াছে, আজ মাথা লাগাইয়াছে, আজ দোমাটী করিয়াছে,—সকল বালক বালিকার মুখে তখন এই সকল কথা শুনা যাইত। গঙ্গাজল নারিকেলের জলে হিঙ্গুল সহযোগে হরিতাল মাড়িয়া যখন রঙ্গ প্রস্তুত করা হইত, প্রতিমা চিত্র করার পরে যখন প্রতিমাকে কাপড় পরান ও তারকুশির সাজে সাজান হইত, তখন দলে দলে বালক বালিকা আসিয়া সমস্ত দিন প্রতিমার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিত; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, সমস্তই তাহারা ভুলিয়া যাইত। সমস্ত বছর বালক বালিকা দেশী মোটা সুতার গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুত মোটা ছোট ছোট কাপড় পরিয়া সময় কাটাইয়াছে; আজ তাহারা ধোয়া নকাসি পেড়ে শান্তিপুরী, ঢাকাই ধুতি, চাদর, শাড়ী পাইবে; সে জন্য তাহাদিগের আনন্দের সীমা নাই। তাহাদিগের মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়া বাহির হইত। সে কালের বালক বালিকা অল্পেই সন্তুষ্ট হইত; এ কালের বালক বালিকার মত উচ্চ মূল্যের ধুতী. উড়ানী, শাড়ীর প্রয়োজন ছিল না। ডসনের জুতা, কফ্‌দার উৎকৃষ্ট শার্ট, কোট. মোজা ও সেমিজ. বডীর আবশ্যকতা ছিল না। দশ বার বছরের বালক বালিকা জুতা পরিত না, পৈতার সময়ে জুতা ও বিবাহের সময়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরকে বনাতি জুতা ও অবস্থাপন্ন বরকে জরির জুতা দিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা চটী জুতা ও বিষয়ীরা নাগরা জুতা সকল পথ হাতে করিয়া লইয়া কর্ম্মবাড়ীর পুকুরে পা ধুইয়া পায়ে দিতেন। সেকালে খড়মের চাল বেশী ছিল। সেকালের ছুতোর উৎকৃষ্ট খড়ম প্রস্তুত করিতে পারিত। বাঙ্গালার ভিতরে মুর্শিদাবাদ ও রঙ্গপুরে হাতীর দাঁতে নকাসি করা উৎকৃষ্ট খড়ম প্রস্তুত হইত। এখনও দুই এক জন বৃদ্ধ ছুতোর আছে; তাহারা হাতীর দাঁতের ও মহিষের শৃঙ্গের সকল কাজই জানে; কিন্তু কিনিবার লোক নাই। খড়ম জুতার সহিত প্রতিযোগিতায় টিকে নাই। আপাত-চটকদার অস্থায়ী কারপেটের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সতরঞ্চ ও গালিচা, কারপেটের আসনের সহিত প্রতি-

যোগিতা করিয়া কুশাসন ও পিঁড়ি প্রায় অন্তর্দ্ধান করিতে বসিয়াছে। পূজার সময়ে সে কালে—অবশ্য বালিকাকে নয়,—বালকদিগকে এক এক জোড়া নূতন খড়ম কিনিয়া দেওয়া হইত। সেই খড়ম লাল পাকা রঙ্গে রঞ্জিত থাকিত। এখনকার ছুতোর সে পাকা রঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছে। সেই রঞ্জিত খড়ম পাইয়া বালকদিগের কতই নৃত্য! সেকালের বালক বালিকাকে ও গৃহিণীদিগকে পূজার সময়ে যেরূপ ধুতি, চাদর ও শাড়ী দেওয়া হইত, এ কালের চাকর চাকরাণীকে যদি তাহা দেওয়া হয়, তবে তাহারা নাক সিঁট্‌কাইয়া তখনই তাহা মুনিবের মুখের উপর ফেলিয়া দেয়! এখন আর গরীব লোকের ছেলেরাও এক-রঙ্গী ধুতি চাদর পরে না; গরীব লোকের মেয়েরাও চূণারী শাড়ী পড়ে না; গৃহিণীরাও এখন আর বালুচরী বুটাদার চেলীর আদর করে না। যখন পরণ পরিচ্ছদের কথা, বসন ভূষণের কথা উঠিল, তখন এই প্রসঙ্গেই তাহা বলিয়া শেষ করি। তখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সকল সময়ে গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুতি মোটা ধুতি চাদর পরিতেন, বিষয়ীরাও তাহাই পরিতেন। কেবল পূজার মত উৎসবে সাদা সিমলাই ধুতি উড়াণী ব্যবহার করিতেন। রাজা জমীদারদিগের মধ্যে সকল সময়েই সিমলাই কাল ফিতা পেড়ে, শান্তিপুরী, বা ঢাকাই নকাসি পেড়ে ধুতি ও সেই সেই স্থানের উড়াণী ব্যবহারের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সন্ধ্যাপূজার সময়ে তসরী গরদ ও প্রাতে সভায় গরদের জোড় পরিতেন। মেয়েরা সর্ব্বদা গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুতি মোটা চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী, উৎসবে ঢাকাই, শান্তিপুরী শাড়ী, নীলাম্বরী, নীলকণ্ঠী বা বালুচরী বুটাদার চেলি পরিতেন। বড়মানুষের মেয়েদিগের ভিতরে বেণারসী চেলি ও উড়ানীও প্রচলন ছিল। দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বড়মানুষের বালকেরা সোণার বালা, মধ্যবিত্তের বালকেরা রূপার বালা পড়িত। পূজা পার্ব্বণে প্রায় সকল বালকেরই গলায় সোণার হার, বাহুতে সোণার বাজু থাকিত। দশ বার বৎসর বয়সের পরে সকল বালকেই বালা খুলিয়া ফেলিত; কিন্তু বড়মানুষের গলায় হার ও বাহুতে বাজু আজীবন থাকিত। সকল ভদ্রলোকেরই আঙ্গুলে সোনার আঙটি থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আবার ক'ড়ে আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলে একটি রূপার আঙটিও দিতেন। সৌখীন্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কোন কোন বিষয়ী সোণার সূতায় গাঁথা ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা ও সোণার ইষ্টকবচ ধারণ করিয়া হার ও বাজুর সখ মিটাইতেন। গৃহিণীরা কেহই কাঁকালে সোণার গোট

পরিতেন না, নাভির নীচে সোণা ধারণ করিতে নাই, এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল। বড়মানুষের মেয়েরা সোণার, মধ্যবিত্তের মেয়েরা রূপার পৈঁচে, লবঙ্গ-দানা, নারিকেল-ফুল, কঙ্কণ, বাউটী, হাতে ও বাহুতে কবচ দিতেন। সকলেরই বাহুতে সোণার বাজু, গলায় সোণার হার, কাণে সোণার ঢেড়ি, ঝুম্‌কো, নাকে সোণার নত, মাথায় সোণার সিঁথি শোভা পাইত। শুনিয়াছি, আমাদিগের জন্মিবার পূর্ব্বে গৃহিণীরা বাহুতে তাড় নামক একরূপ গহনা পরিতেন; আমরা তাহার ব্যবহার দেখি নাই।

শীতকালে সধবা মেয়েরা এক একখানি ফরাসী ছিটের দোলাই পাইতেন; সেকালের মেয়েদের কোনও প্রকারের জামা পরিবার রীতি ছিল না। বালক বালিকারা কুর্ত্তা ও ছিটের দোলাই পাইত তাহাতেই তাহাদিগের আনন্দ উছ-লিয়া উঠিত। কিন্তু প্রায়ই তাহাদিগকে কুর্ত্তার পরিবর্ত্তে 'গাঁথি' পরাণ হইত। একখানি কাপড় এমন ভাবে গায়ে জড়াইয়া একটিমাত্র বাঁধ দেওয়া হইত, যাহাতে সেটি জামার মত হইত, এবং সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিত। তাহারই নাম গাঁথি। তখনকার মেয়েরা সকলেই গাঁথি করিতে জানিতেন; এখনকার মেয়েরা নামও জানেন না। পুরুষদিগের মধ্যে আঙ্গারখার ব্যবহার ছিল। আঙ্গারাখা আর কিছুই নয়, চাপকানের নীচের অংশ কাটিয়া ফেলিলেই আঙ্গরাখা হয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কাপড়েব বাঁধ দেওয়া আঙ্গরাখা গায়ে দিতেন; বড়লোকের আঙ্গরখার বোতাম থাকিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোনরূপ জামা ব্যবহার করিতেন না। তুলা ভরা জামা ও তুলাভরা টুপীরও ব্যবহার ছিল। অবস্থানুসারে কেহ দোহর ও কেহ গ্রাম্য তাঁতীর প্রস্তুতি ভবল তিহাতি কাপড় গায়ের উপরে জড়াইয়া দিত। মওড়া চগজি হইলে দোলাই হয়, সূক্ষ্ম মগজি হইলেই দোহর হয়। পুরুষ গায়ে দোলাই দিত না। কাল ও লাল বনাতেরও খুব ব্যবহার ছিল। বড়লোকেরা সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যের কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতেন; অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও সময়ে সময়ে শাল ব্যবহারের রীতি ছিল। পায়ে মোজা কাহারও দেখিয়াছি মনে হয় না। সেকালে শীতবস্ত্রের এত আড়ম্বর ছিল না; সেকালের লোক অনেক সময়েই ধুতির কোঁচা গায়ে দিয়া শীত কাটাইত। প্রবাদ আছে, যত কাপড়, তত শীত।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

পরিত্যক্তা।

(১)

হরিশপুরের শ্রীদাম চাটুয্যে গ্রাম্য জমীদার গাঙ্গুলীদের ঘরজামাই হইয়া সর্ব্বপ্রথম কোন্ সালের কোন্ তারিখে শ্রীধাম হরিশপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের বিশ্বকোষেও যখন পাওয়া যায় না—তখন আমাদিগকে তাহার আবিষ্কারচেষ্টায় অগত্যা বিরত হইতে হইল।

যাহা হউক, তদবধি তিনি গাঙ্গুলীদের ন'কর্ত্তা জগমোহন গাঙ্গুলীর ঘরজামাইরূপে হরিশপুরে সংস্থাপিত হন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে জগমোহনের পুত্রগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীদাম অবশেষে শ্বশুরমন্দিরের পশ্চাতে একটা জঙ্গলের ধারে খড়ো বাড়ী করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি শ্বশুরের নিকট কিছু কিছু মাসহারা পাইতেন, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর শ্যালকেরা তাঁহার এই মাসহারা বন্ধ করিয়া দিলেন। কুলীনশ্রেষ্ঠ শ্রীদাম ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, শ্যালকদের ভয় দেখাইলেন, হয় তিনি মামলা করিয়া পাদুকাপ্রহারে মাসহারা আদায় করিবেন, না হয় আর একটা বিবাহ করিয়া শ্যালকত্রয়কে জব্দ করিবেন।—কিন্তু তাঁহার এই ভয়প্রদর্শনে কোনও ফল হইল না। উকীলেরা বলিলেন, মামলা করিয়া হারিতে হইবে, কারণ স্বর্গীয় কর্ত্তার উইলে মাসহারার উল্লেখ নাই; এবং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণও ঘটিয়া উঠিল না, যেহেতু, তাঁহার পত্নী বিরাজমোহিনী উগ্রচণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জানাইলেন, তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে অহিফেনসেবনে সকল জ্বালা জুড়াইবেন।—সুতরাং না হইল মামলা, না হইল বিবাহ।—শ্রীদাম অনন্যোপায় হইয়া সংসারপ্রতিপালনের জন্য পাঁঠার মাংসের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

পাঁঠার ব্যবসায়ে কোন প্রকারে সংসার চলিত। কিছু দিনের মধ্যেই হরিশপুর গ্রামে শ্রীদাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে 'পাঁঠা-বাঁচা ঠাকুর' এই উপাধি প্রদান করিল।

গ্রামের কেহ বলিল, "শ্রীদাম, তুমি এত বড় লোকের জামাই, নিজে এক-জন মহাকুলীন, তোমার কি এ ব্যবসা সাজে?

শ্রীদাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যবসা?"

"এই পাঁঠা ব্যাচা।"

শ্রীদাম রাগ করিয়া বলিলেন, "আজ কাল পাঁঠা ব্যাচে না কে? আমি যেন চার পেয়ে পাঁঠা বিক্রয় করি, আর গাঁয়ের 'হুমরো চুমরো' মশায়রা যে দো'পেয়ে পাঁঠা হাজার হাজার টাকায় বিক্রী ক'রচেন! যে পাঁঠার যতটা বেশী পাশ, তার দাম তত বেশী! বাবা, দু'হাজার টাকায় দো'পেয়ে পাঁঠা বিক্রী করলে দোষ হয় না, আর আমি দেড় টাকায় চার পেয়ে পাঁঠা বিক্রী করি ব'লে তোমরা আমাকে দশ কথা শুনোতে এসেছ? কলিতে বিচার নাই।"

যুক্তির সারবত্তা দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তা চম্পট দান করিল।

(২)

পাঁঠার অভিসম্পাতেই হউক, আর কাল পূর্ণ হওয়াতেই হউক, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে শ্রীদাম ঠাকুর পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

গ্রামের কেহ কেহ বলিল, "এত দিনে পাঁঠাগুলো বাঁচ্‌লো!"

কেহ কেহ বলিল, "কিন্তু ছেলেটা যে না খেতে পেয়ে মো'ল।"

শ্রীদামের আঠার বৎসর বয়স্ক পুত্র দামোদর পিতার মৃত্যুতে সংসার অন্ধ-কার দেখিল। কি করিয়া চলিবে স্থির করিতে না পারিয়া তাহার পিতা যে কয়টি পাঁঠা 'জিয়াইয়া' রাখিয়াছিলেন, সে তাহা একে একে কাটিয়া ভক্ষণ করিল। পুঁজি ফুরাইয়া গেল, অথচ উদরে ক্ষুধার অভাব রহিল না।

দামু কি করিয়া সংসার চালাইবে, মাথায় হাত দিয়া তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় হরিশপুরের ডাক্তার নিবারণ চৌধুরী তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

নিবারণ বাবু পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন; কম্পাউণ্ডারী করিতে করিতে তাঁহার ডাক্তার হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, ডাক্তারী ব্যবসায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কায ঔষধ-মিশ্রণ। এই কার্য্যে যখন তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তখন পরের দাসত্ব করিয়া কি হইবে, স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিবারণ হরিশপুরে ডিস্‌পেন্সারী খুলিয়া অত্যন্ত পসারে ডাক্তারী করিতে লাগিলেন; তিনি যেবার হরিশপুরে ডাক্তারী আরম্ভ করেন, সেইবার হরিশপুর ও তাহার সন্নিহিত গ্রামসমূহে ৭৯৩ জন লোক বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত শত রোগীর চিকিৎসার ভার নিবারণ ডাক্তার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সব্য-সাচী ছিলেন, এক হস্তে হোমিওপ্যাথি ও অন্য হস্তে এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিতেই তাঁহার অধিক হাতযশ ছিল, নির্দ্দোষ হোমিওপ্যাথির ঔষধ সেবনে রোগী ভুগিত বটে, কিন্তু মরিত কম; কিন্তু এলোপ্যাথিতে তিনি উদরাময়ে চক্ষুরোগের ঔষধ দিতেন, সুতরাং রোগীকে অবিলম্বে চক্ষু মুদিতে হইত।—যে রোগী বাঁচিত, লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিত, "নিবারণ ডাক্তারের কি হাতযশ, যেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! একদাগ ঔষধ পেটে পড়েছে কি না পড়েছে—অমনই বিকারের রোগী উঠে বসে!—ভাগ্যে নিবারণ ডাক্তারের দাওয়াই খেয়েছে, তাই বাঁচ্‌লো।" কিন্তু যে মরিত লোকে বলিত, "উহার পরমায়ু ফুরাই-য়াছে, ডাক্তারের ঔষধে কি ফল হইবে!"

এরূপ যাহার হাতযশ ও পসার, তাহার টাকা জমিতে অধিক সময় লাগে না। নিবারণ ডাক্তার দুই বৎসরের মধ্যেই পাকা ডিস্‌পেন্‌সারী করিয়া ফেলিলেন। কলিকাতার বাথগেট্‌ ও স্মিথ ষ্ট্যানিস্‌ষ্ট্রীটের দোকান ছাড়া অন্য স্থান হইতে ঔষধ আনাইতেন না।—গ্রামের অন্য ডিস্‌পেন্সারীতে যে ঔষধের দাম দুই আনা, নিবারণ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে তাহার মূল্য ছয় আনা। কেহ এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবারণ সহাস্যে বলিতেন, "আমি ত 'নেটিভ্‌ ফারম্‌' থেকে ঔষধ আনাই নে যে, জলের দামে ঔষধ দেব। আমার ঔষধ বিলাতী ফারম্‌ থেকে আমদানী, অনেক দাম।"

কমলা যখন সদয়া হন, তখন তিনি অনুগৃহীত ভক্তকে নানা উপায়ে ধনবান করেন। নিবারণ ডাক্তার অর্থোপার্জ্জনের ফন্দীতে ওস্তাদ ছিলেন, সময় বুঝিয়া তিনি আর্শেনিক ও কুইনাইনের সংমিশ্রণে 'অমৃতসার' নামক ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। জ্বরের ঔষধ, কিন্তু তাহাতে প্রেমজ্বর পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। এই ঔষধ-সেবনে জ্বরাক্রান্ত অনেক রোগীর আশু উপকার হইল বটে, কিন্তু শেষে তাহারা হাত পা ফুলিয়া মরিতে লাগিল। তথাপি

নিবারণের ঔষধ হুহু করিয়া কাটিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে ঔষধের এজেণ্ট নিযুক্ত হইল। সংবাদপত্রে 'অমৃতসারে'র কলম কলম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতে লাগিল। বড় বড় ডাক্তার পর্য্যন্ত 'অমৃতসারে'র সুখ্যাতি করিয়াছেন, এই মর্ম্মে প্রশংসার ঢাক বাজিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সকল ডাক্তার বহুদিন পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তাক্ষর সনাক্ত করিবার জন্ত কাহারও মাথা ব্যথা করিল না।

(৩)

এইরূপে দ্রুত ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ায় নিবারণের একতালা ইমারত দোতালা হইল; গবর্মেণ্ট তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিলেন, এবং তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে হরিশপুরের মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি 'টাকরাজ' নামক একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশতৈল আবিষ্কারের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে কন্যাদায়ে তাঁহাকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইল।

নিবারণের কন্যা শৈলবালা কুরূপা নহে, কিন্তু বাতরোগে তাহার একখানি হাত ও একখানি পা পঙ্গু, ইহার উপর সে একটু তোত্‌লা ও কাণে কিছু কম শুনিত। আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের এমন মেয়ে অচল—এ কথা না বলিলেও চলে। ভাগ্যবান নিবারণ সুপাত্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে চিঠি পত্র লিখিয়াছিলেন, লোকও পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু কন্যার অঙ্গহীনতার কথা শুনিয়া কেহই সে কন্যা ঘরে আনিতে সম্মত হইল না। অর্থের প্রলোভন নিষ্ফল হইল দেখিয়া নিবারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।—তাঁহার ধারণা ছিল, বিবাহে যৌতুকটাই প্রধান লক্ষ্য, 'কনে' উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্যের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটীতে যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহাদের মত 'বেকুব' সংসারে কয় জন আছে? আট টাকা বেতনের কম্‌পাউণ্ডার নিবারণ চৌধুরী অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে মাসিক পাঁচ-শতাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া মনে করিতে লাগিলেন, অর্থবলে কেবল সামাজিক মানসম্ভ্রম নহে, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ক্রয় করা যায়।

কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, দেশের অধিকাংশ লোকই বোকা, অর্থবিনিময়ে কেহই স্বীয় পুত্রকে তাঁহার জামাতা করিতে সম্মত নহে; তখন হরিশপুরের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যুবক দামোদরের কথা তাঁহার মনে পড়িল।

দামোদর কষ্টে সৃষ্টে তাঁহার স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল;

তাহার পর পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তি পাঁঠাগুলি গলাধঃকরণ করিয়া, কি করিয়া সংসার চালাইবে এই কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় নিবারণ তাহাকে স্মরণ করিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ভাদ্রমাসের সন্ধ্যা। গ্রামের গর্ত্ত ডোবা পুষ্করিণীগুলি জলে পরিপূর্ণ, তাহার উপর নির্ম্মল শরৎ-চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া জলরাশি দ্রবরৌপ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। গৃহস্থের গোশালায় সাঁজালের ধোঁয়া উঠিয়া যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে। বাদুড়ের দল বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশব্দ পক্ষসঞ্চারে দ্রুতবেগে ফলাহারের সন্ধানে উড়িয়া চলিয়াছে। একটা বকুল-গাছের ঘন পত্রের মধ্যে দুই তিন শত শালিখ পাখী সমবেত হইয়া সন্ধ্যার মিলন-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। একটা জলপূর্ণ ডোবার উপর অবস্থিত বাঁশ-বনে আসিয়া কতকগুলি শৃগাল সমস্বরে সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করি-তেছে। গ্রাম্য ষষ্ঠীগাছের পাশ দিয়া কৃষককুটীরস্থিত মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকচ্ছটা বর্ষার আতটপূর্ণা তরঙ্গিণীর বক্ষে সুদীর্ঘ আলোকশলাকাবৎ প্রতিফলিত হইতেছে, এবং অদূরবর্ত্তী খেয়াঘাটে বসিয়া এক জন পথিক খেয়া নৌকার প্রতীক্ষায় রামপ্রসাদী সুরে উচ্চকণ্ঠে শঙ্করীর নিকট 'তবিলদারী' প্রার্থনা করিতেছে।

দামোদর ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়া একখানি ময়লা চাদর গলায় জড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নিবারণ বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশপূর্ব্বক ফরাসের এক পাশে বসিল। নিবারণ তখন একটা স্থূলোদর বালিশে ঠেশ দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে সেই দিনের 'বেঙ্গলী'খানি দেখিতেছিলেন। তিনি যদিও ইংরাজী ভাষায় ঔষধের নামগুলি ভিন্ন আর কিছুই পড়িতে পারিতেন না, এবং ইংরাজীতে নামটি স্বাক্ষর করিতে মাঘমাসের শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেন, তথাপি 'বেঙ্গলী'র তিনি গ্রাহক ছিলেন, এবং প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে তাহার পাতাগুলি উল্টাইয়া বিদ্যাবত্তা পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

ফরাসের উপর হিংক্সের 'পাখাপ্রুফ' 'ডবলউইক'-বিশিষ্ট সুবৃহৎ ডোম-ওয়ালা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। দামোদরের আবির্ভাবমাত্র নিবারণ 'বেঙ্গলী'খানা ফেলিয়া রাখিয়া বালিশের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সোজা হইয়া বসিলেন, তাহার পর দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন হে দামু,

আছ কেমন? তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। তোমার বাবা সর্ব্বদাই এ দিকে আস্‌তেন, খোঁজ খবর নিতেন; তোমরা একালের ছেলে, খবরটা পর্য্যন্ত লও না! তা তোমার শরীর ভাল আছে ত? তোমার মা ভাল আছেন?"

দামোদর নতমস্তকে বলিল, "হ্যাঁ, মা ভাল আছেন। মেসোমহাশয়, আপনি আমাকে ডেকেছেন?"

দামোদর গ্রামসম্পর্কে নিবারণকে মেসোমহাশয় বলিত; বোধ হয় একটু দূর সম্বন্ধও ছিল।

নিবারণ বলিলেন, "তোমার মার সঙ্গে আমি একবার দেখা করবো—অনেক দিন থেকেই মনে করচি। তা আমার সময় কম; যাক্, আমার যা বলবার আছে—আমার মুহুরী চক্রবর্ত্তীকে দিয়েই তা ব'লে পাঠাব। তোমাকে ডেকেছি কেন, বলি শোন। শুন্‌ছি, তোমাদের এখন সংসার চলাচলের উপায় নেই, খুব কষ্টে পড়েছ, আর তুমি বেকার বসে আছ। আমার স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের চাকরী খালি আছে, দশ টাকা মাইনে, এণ্ট্রেন্সপাশ ও এফ্‌এ ফেল অনেকগুলি লোক দরখাস্ত করেছে; নর্ম্মালে ত্রৈবার্ষিক পাশকরা কয়েকটি লোকও উমেদার আছে। তুমি যদি সে চাকরী করতে চাও ত কাজটা তোমাকেই দিতে পারি। কি বল?"

দামোদর হাতে স্বর্গ পাইল; দশ টাকা বেতনের চাকরী আপনা হইতে জুটিতেছে! লক্ষ্মী এত দিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। দামোদর তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া আসিল, এবং পরদিন হইতে সে হরিশপুরের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের 'টুল' অধিকার করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে দুগ্ধপোষ্য বালকগণের পৃষ্ঠে ও করতলে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যেই দামু পণ্ডিতের এমন সুনাম প্রচারিত হইল যে, গ্রামের ছেলেরা 'বর্গি এলো' ছড়াটা শুনিলেই পিতামহীর অঞ্চলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বর্গির পরিবর্ত্তে দামুপণ্ডিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিত।

(৪)

যথাসময়ে মুহুরী চক্রবর্ত্তী দামোদরের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবারণের কন্যার সহিত দামুর বিবাহের ঘটকালী করিয়া গেল। দামুর মা কিছু 'দাবী' করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাবীদাওয়া করিলে বিবাহ হইবে না এবং দামুর চাকরী থাকিবে না,এইরূপ আভাস পাইয়া তিনি দাবী ছাড়িয়া দিলেন। নিবারণ চৌধুরী অতি অল্পব্যয়ে কন্যাদায়

হইতে উদ্ধার হইলেন, মনে মনে বলিলেন, "স্কুলের সেক্রেটারীর কাজটা হাতে ছিল, তাই বেখরচায় কন্যাদায়ে উদ্ধার হইলাম।—লোকে বলে, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই। নিবারণ চৌধুরী এমনই বোকা!"

পঙ্গু ও তোত্‌লা, তাহার উপর কালা বৌ লইয়া ঘর করা সহজ নহে, বিশেষতঃ দামোদরের গৃহে অশনবসনের যে সচ্ছলতা। দামোদরের মা 'বৌমা'কে বাড়ী আনিতে সাহস করিলেন না, নিবারণ কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি ত জানিয়া শুনিয়াই মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার আক্ষেপের কোনও কারণ ছিল না।

কিছুদিন পরে নিবারণের চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন, দামু দূরে দূরে থাকে, তাঁহার কন্যার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে সম্মত নহে। তাঁহার কন্যা পঙ্গু হোক—তোতলা হোক—বধির হউক,—তাহার যে একটি হৃদয় আছে, এবং সে হৃদয় অন্যান্য বালিকার হৃদয়েরই অনুরূপ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কন্যাকে অসুখী ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তিনি দামোদরকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। দামোদরের বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিলেন, দামু যদি তাঁহার কন্যাকে ভালবাসে, তাহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়, ও তাহাকে লইয়া 'ঘর' করে,—তাহা হইলে তিনি দামোদরের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন।

বুদ্ধিমান দামোদর এ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। শৈলবালাকে সে কোন দিন একখানি সাবান, কোনদিন এক কৌটা সতীশোভনা সিন্দুর, কোনও দিন বা এক শিশি তরল আলতা আনিয়া দিয়া প্রণয়টা বেশ ঘনীভূত করিয়া তুলিল। শৈলবালার মুখে আবার হাসি ফুটিল। মা ছেলের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার আশা ছিল, ছেলের দু পয়সা উপার্জ্জন বাড়িলে তিনি একটি টুকটুকে বৌ আনিয়া ঘরে তুলিবেন, নূতন বৌ লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিবেন; কিন্তু দামু তাঁহার এত আশা বুঝি বিফল করে!—মা এক একদিন দামুকে তাহার স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতের জন্যও মৃদু তিরস্কারও করিতেন, কিন্তু দামু কোনও কথা বলিত না; শেষে একদিন সে জ্বালাতন হইয়া বলিয়া ফেলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! আমি কি জন্য কি করছি, তা তুমি কি করে বুঝবে?"

কিছুদিন পরে দামু পুত্রসন্তানের মুখ দেখিল। নিবারণ দেখিলেন, দামুর সংসার বাড়িতেছে; তাহার উন্নতির কোনও উপায় করিতে না পারিলে

ভবিষ্যতে দামুর সংসার তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। তিনি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দামুকে ঢাকার 'সার্ভে ইস্কুলে' জরিপ শিখিতে পাঠাইলেন। দামোদর অক্লান্ত পরিশ্রমে যথাসময়ে জরিপের পরীক্ষায় পাশ করিল।

এই সময় ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইবে বলিয়া গবর্মেণ্ট অনেক জমী কিনিতেছিলেন। গবর্মেণ্টের এক জন কণ্ট্রাক্‌টর দামুকে বুদ্ধিমান দেখিয়া এবং তাহার পূর্ব্বপরিচয় লইয়া তাঁহার কন্যার সহিত দামুর বিবাহ স্থির করিলেন। দামু তাঁহাকে বলিয়াছিল, তাহার স্ত্রী খঞ্জ, তোতলা, কালা,—সে স্ত্রী লইয়া সংসার চলিবে না। কণ্ট্রাক্টর বাবু সন্ধান লইয়া জানিলেন, দামুর কথা অতিরঞ্জিত নহে। সুতরাং বিবাহে কোনও আপত্তি হইল না। বিবাহের পর শ্বশুর কণ্ট্রাক্টরের চেষ্টাতেই দামু এক জন ল্যাণ্ড-একুইজিসন ডেপুটী কালেক্টরের অধীনে একটি সদরআমিনী পদ লাভ করিল।

কিছুদিনের মধ্যেই দামু দক্ষতাগুণে ডেপুটী কালেক্টরের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। দামুর প্রতি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস, বড় বড় 'প্লট' ক্রয় করিতে হইবে, দামু জরীপ করিয়া, দর ঠিক করিয়া দিতে লাগিল; তাহাই মঞ্জুর! দামু প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, যে জমীর চারি হাজার টাকা মূল্য, তাহার জন্য ছয় হাজার টাকা আদায় করিয়া দিত। জমীর অধিকারীর প্রাপ্য সাড়ে চারি হাজার, দামুর প্রাপ্য দেড় হাজার।

সুতরাং পঁয়তাল্লিশ টাকা মূল্যের দামু দুই বৎসরের মধ্যে বড়লোক হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইল, স্ত্রীকে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার দিল, এবং ব্যাঙ্কেও আট দশ হাজার টাকা জমাইল। কিন্তু দামুর এ সুখ সৌভাগ্য দর্শন নিবারণ চৌধুরীর ভাগ্যে ঘটিল না, তিনি ধর্ম্মরাজের আহ্বানে ডাক্তারী ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করিলেন। হরিশ-পুরের তিন জন ডাক্তারের অবিশ্রান্ত চেষ্টা বিফল হইল।

(৫)

দামু শৈলবালার নামও সহ্য করিতে পারে না। পিতার মৃত্যুর পর তাহার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; চুলে তেল নাই, রুখু মাথা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, হাতেই গাছকয়েক চুড়ী। শৈলবালার দুই ভাই ছিল, পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া পৃথক হইল। পেটেণ্ট ঔষধ

ও তেলের ব্যবসায় একমালিতেই চলিতে লাগিল। মা স্বতন্ত্র 'হাঁড়ি কাড়িলেন'; তিনি শৈলকে দুবেলা দুটি খাইতে দিতেন, তাই অভাগিনীর অনাহারে মৃত্যু হইল না।

কিন্তু কষ্ট ত আর সহ্য হয় না। শৈলবালা নিজের দুঃখ জানাইয়া স্বামীকে পত্র লিখিল, সে পত্রের প্রত্যেক ছত্র অশ্রুসিক্ত। কিন্তু সে পত্র পাইয়াও দামোদরের দয়া হইল না। সে তখন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, বাড়ীতে বন্ধুগণের মেলা; প্রত্যহ চায়ের 'পার্টিতেই' তাহার তিন চারি' টাকা খরচ। তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাসদাসীবৃন্দে মুখরিত, তাহার নবীনা গৃহিণী কনকলতা নানা অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া ভুবনমোহন হাস্তে তাহার হৃদয়ে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি বিকীর্ণ করিতেছে, তাহার সুকুমার স্নেহভাজন পুত্রকন্যা অলঙ্কারে-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এ সময় সেই পল্লীবাসিনী, পঙ্গু, তোতলা অভাগিনীর কথা কিরূপে তাহার মনে পড়িবে? দূর পল্লীর এক প্রান্তে তাহারই যে পূর্ব্বস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নৃত্যলাল মাঘের দারুণ শীতে পিঠে একখান ময়লা নেকড়া জড়াইয়া হিমে পড়িয়া ক্ষুধায় কাঁদিতেছে, আর তাহার মা তাহার অর্দ্ধনগ্ন দেহ বুকের মধ্যে ঢাকিয়া অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিয়া বলিতেছে, "ভগবান আর কতদিন আমাকে এমন করিয়া পুড়াইয়া মারিবে! আহা, ছেলেটার কি গতি হবে?" তাহার সেই কাতর আর্ত্তনাদ দামোদরের কর্ণে প্রবেশ করিল না। দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াও যখন শৈলবালা স্বামীর নিকট হইতে কোনও উত্তর পাইল না, তখন সে সকল আশা ত্যাগ করিল। সে মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমার ছেলেটার কি গতি হবে?"

মা বলিলেন, "পূজার সময় তো বাড়ী আসবে,—দেখা যাক; আমি যে ক'দিন আছি, সে ক'দিন তোদের না খেয়ে মরতে দেব না।"

পূজা আসিল। এবার দামোদর মহাসমারোহে মহামায়াকে গৃহে আনিতেছে। মায়ের শুভাগমনে দামোদর বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় করিবে, স্থির করিল। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে প্রকাণ্ড টাপোর বাঁধা হইল; কলিকাতা হইতে অনেক টাকা ব্যয়ে সোণালী ডাকের সাজ আসিল। জমিদার গাঙ্গুলীবাড়ীর পূজায় বার ঢাক বাজিত। দামোদর ঢাকের সংখ্যায় গাঙ্গুলীদের পরাজিত করিবার সংকল্প করিয়া ষোল ঢাকের বায়না পাঠাইলেন। সকলে

বুঝিল, নূতন বড়লোক দামোদর চাটুয্যে এবার ঢাকের আওয়াজে গ্রামের কাণে তালা লাগাইবে।

দামোদর সপরিবারে ষষ্ঠীর দিন নৌকাযোগে গৃহে উপস্থিত হইল। দামোদর কর্ম্মস্থান হইতে বহু সামগ্রী সহ বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসিগণের মধ্যে মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। ঘাটে, পথে, রমণীসমাজে কেবলই দামোদরের কথা, তাহার সৌভাগ্যের কথা, তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য ও তাহাদের গঠনকৌশলের কথা। গ্রাম দামোদরময় হইয়া উঠিল। পল্লীরমণীগণ দলে দলে দামোদরগৃহিণীকে দেখিতে ছুটিল। শৈলবালা ও তাহার জননীর কর্ণে সকল কথাই প্রবেশ করিতে লাগিল। শৈলবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "এ সকলই আমার হইতে পারিত, কি পাপে সকলে বঞ্চিত হইলাম।" ভগবানের বিচার দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শৈলবালার মা জামাতার অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তাঁহার স্বামী যদি তাহার উন্নতির পথ মুক্ত না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আজ এত ঐশ্বর্য্য, এত গহনা, এত সুখ কোথায় থাকিত? দামোদর যখন তাহাদের গ্রামের বিদ্যালয়ে দশ টাকা বেতনে পণ্ডিতি করিত, তখন সে তাঁহাদের আশ্রিত ছিল, অনুগত ছিল; তখন সে শৈলবালার মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন দামুর অর্থ হইয়াছে, পয়বাড়ী হইয়াছে, দশ জনে তাহাকে মানুষ মনে করিতেছে। এখন সে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক, পরিণীতা পত্নীকে কুশলবার্ত্তা-জিজ্ঞাসাতেও পরাঙ্মুখ। শৈলবালার মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। দামু বাড়ী আসিয়া গ্রামের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের সহিত দেখা করিতে গেল, তাহার দুই হাতের আট অঙ্গুলীতে আটটা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়, লেড্‌লর বাড়ীর শার্টের 'কলস্ কলারে' যেন মুখ দেখা যায়। শার্টের সোণার বোতামের পালিস ঝক্ মক্ করিতেছে, আর, "ডবল ব্রীজ" প্যাটার্ণের সোণার চেনেরই বা শোভা কত! যাঁহারা পূর্ব্বে দামোদরকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না, তাঁহারাও দামোদরকে দেখিয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। দামোদরের পিতা কুলীন, কিন্তু কাঞ্চন-কৌলীন্যে দামোদর গ্রামস্থ সকল কুলীনকে পরাজিত করিয়াছিল। দামোদর পূজায় বাড়ী আসিয়া সকলের বাড়ী গেল,—গেল না কেবল তাহার প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ী। শৈলবালা এতদিন পরেও স্বামীর চরণদর্শন

করিতে পারিল না, এই দুঃখেই তাহার অন্য সকল দুঃখকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় যখন দামোদরের বাড়ীতে ষোলটা পাখাওয়ালা ঢাক একসঙ্গে বাজিয়া গ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিল, তখন সেই বাদ্যধ্বনি শৈলবালার কর্ণে উৎকট বিদ্রূপহাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সে তাহার পাঁচ বৎসরের পুত্রকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া চন্দ্রালোকিত গৃহকুট্টিমে বসিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

(৬)

সন্ধ্যারতির ঢাক বাজিয়াছে। গ্রামের বালক যুবক বৃদ্ধগণ পোষাকী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পূজা-বাড়ীতে মহামায়াকে প্রণাম করিতে যাইতেছে। আনন্দে উৎসাহে সকলেরই মুখ প্রফুল্ল; সপ্তমীর আধখানা চাঁদ সুধাময় হাস্যে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে; সমস্ত প্রকৃতি যেন মনের আনন্দে হাসিতেছে; রজনীগন্ধা, কদম্ব ও চম্পকের সৌরভরাশি বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, যেন তাহা শারদ লক্ষ্মীর সুরভিত নিঃশ্বাস। পূজা-বাড়ীতে আলোকমালার কি উজ্জ্বল শোভা! মায়ের সোণালী সাজে তাঁহার সুপ্রশান্ত প্রফুল্ল আননে চণ্ডীমণ্ডপস্থিত শতদীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের নয়ন, মন বিমুগ্ধ করিতেছে। পূজামণ্ডপে লোকের ভীড়ে বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। ধূপধূনার সৌরভে পূজামণ্ডপ পূর্ণ। সকলেই কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তিবিহ্বলনেত্রে দশভুজার মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। পুরোহিত মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চপ্রদীপ আন্দোলিত করিয়া মায়ের আরতি করিতেছেন, আর ষোলটা ঢাক পাখা দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া সমতালে বাজিতেছে। উৎসব-ভবন আনন্দে পূর্ণ।

আরতি শেষ হইল; ঢাকের বাদ্য থামিয়া গেল; দর্শকমণ্ডলী মাতৃচরণে প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে পূজামণ্ডপ পরিত্যাগ করিল। ভীড় কমিতে দেখিয়া গৃহলক্ষ্মীরা মাতৃচরণ দর্শনাশায় স্পন্দিতবক্ষে সসঙ্কোচে একে একে দামোদরের পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। দামোদরের আদরিণী গৃহিণী কনকলতা মণ্ডপের একপ্রান্তে আড়ালে দাঁড়াইয়া পরিচিতা গ্রামবাসিনীগণের অভ্যর্থনা করিল; তাহার কণ্ঠবিলম্বিত কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান 'পুষ্পহারে' দীপরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল, তাহার মনোহর কর্ণভূষায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। ভাগ্যবতীর মনে হইল, আজ তাহার জীবন সার্থক।

ঝাড়লণ্ঠনভূষিত 'টাপোরে'র নীচে জনসমাগম বিরল হইয়া আসিলে, দামোদর তাহার তিনবৎসরবয়স্ক পুত্রের হাত ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সোপান-শ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয় পূর্ণ; সে নির্নিমেষনেত্রে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়ার সঙ্গে একটি পাঁচ বৎসরের বালক! বালকের পায়ে ছেঁড়া জুতা, গায়ে একটা ময়লা জামা; সে কৌতূহলবিস্ফারিতনেত্রে ঠাকুর দেখিতে লাগিল।—এই বালক শৈলবালার গর্ভজাত সন্তান, দামোদরের পুত্র নৃত্যলাল।—সে মামার বাড়ীর পুরাতন ঝি বামার সঙ্গে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে। শৈলবালা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

বামা দামোদরকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "প্রেণাম হই জামাই বাবু, ভাল আছেন ত? আমাদের ওদিকে যে পায়ের ধূলো দিলেন না! পুরোণো সম্বন্ধ কি একেবারেই ভুল্‌তে হয়? আহা, দিদিমণি আমার দিবে-রাত্তির চোখের জলে ভাস্‌চে। সংসারে কি ভগবানের 'বিচের' নেই? বাবা 'নেত্যনাল', তোমার বাপ্‌কে পেন্নাম কর, ইনি তোমার বাপ্‌; তা কি করেই বা চিন্‌বে?"

শৈলবালার পুত্র নৃত্য ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর পিতার পদতলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল।

বামা আসিয়া এখানে এ ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, দামোদর তাহা পূর্ব্বে কল্পনাও করে নাই। পুত্রকে তাহার চরণে প্রণত হইতে দেখিয়া সে অপ্রস্তুতভাবে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইল, এবং "আমি একা মানুষ, বড় ব্যস্ত", এইরূপ দুই একটি কথা বলিয়াই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দ্বিতীয় পক্ষের নন্দনের হাত ধরিয়া এক দিকে সরিয়া পড়িল। বাবা একটা কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না দেখিয়া বালক নৃত্যলাল মনে বড় বেদনা পাইল, তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। বামা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

দামোদরের পুত্র উমানাথ বলিল, "বাবা, ও ছেলেটা কার ছেলে?"

দামোদর অন্যমনস্কভাবে বলিল, "ও কোন্ ভিখিরীর ছেলে হবে।"

দীর্ঘকালপরে নৃত্যলালের মুখ দেখিয়া দামোদরের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য-

রসের সঞ্চার হইয়াছিল, যতই কঠিনহৃদয় হউক—সে মানুষ, তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। রাত্রে সে কথাপ্রসঙ্গে তাহার দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইল, নৃত্যলাল ঠাকুর দেখিতে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছে। তাহাকে একবার কোলে লইতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল। আহা, ছেলেটার গায়ে একটা ভাল জামা নাই, ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়া সে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছিল।

দামোদরের এই সমবেদনাপূর্ণ কথা শুনিয়া দামোদরের দ্বিতীয় পক্ষ কনকলতা চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করিল,—অভিমানভরে বলিল, "কে তাকে জামা জুতা দিতে বারণ করছে? তা নিয়ে এস না কেন, তোমার সেই শৈলবালাকে। আমি যদি এত চোখের বিষ হয়ে থাকি ত দাও না আমাকে বাপের বাড়ী বিদেয় করে'! জানি তোমার ষোল আনা মনের টান সেই তোত্‌লা কালা মাগীর দিকে, কেবল চক্ষুলজ্জায় আমাকে ঘরে রেখেছ বৈ ত নয়! ভাগ্যে বাবাকে শ্বশুর পেয়েছিলে, তাই দু'পয়সা রোজগার করে খাচ্ছ; এখন আমাকে মনে লাগ্‌বে কেন? 'নেমকহারাম' মান্‌ষের স্বভাবই এই রকম।" গৃহিণী অভিমানভরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। তাহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইতে লাগিল।—দামোদর জগৎ অন্ধকার দেখিল, পত্নীর অভিমান ভঙ্গ করিতে তাহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। দামোদর প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর শৈলবালা বা তাহার পুত্রের কথা মুখে আনিবে না। অভিমানভঙ্গে কনকলতা অষ্টমীপূজার আয়োজন করিতে বসিল। সপ্তমীর নিশি প্রভাত হইল।

(৭)

দশমীর দিন অপরাহ্ণে দামোদরের পূজা-মণ্ডপে মহামায়ার 'বরণ' আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকের বাদ্যে আর সে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে না, তাহাতে যেন বিষাদের হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে। সানাই সুর করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিদায়-গাথা গান করিতেছে; তাহার সুরের প্রতিকম্পনে আসন্ন বিরহের করুণ বেদনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা পুরাঙ্গনাগণ মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন; সংবৎসরের মত তাঁহাকে বিদায় দান করিতে সকলেরই চক্ষু ছলছল করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে বহুমূল্য বারাণসী-শাড়ী-বিমণ্ডিতা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা কনকলতা বরণডালা মস্তকে লইয়া বরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তাহারই বরণের

অধিকার; অন্যান্য রমণীগণ অদূরে দাঁড়াইয়া গৃহিণীর বরণ-শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় একটি সধবা রমণী ধীরে ধীরে পূজার দালানে উঠিয়া, মাতৃ-মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী যেন বিষাদের প্রতিমা, তাহার পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র; আভরণের মধ্যে দুই হাতে দুই গাছি কাচের চুড়ি; তাহার কেশ রুক্ষ, চক্ষু দুটি অশ্রুভারে অবনত।

রমণী দেবীর চরণে লুটাইয়া পড়িল, অশ্রুরুদ্ধনেত্রে মায়ের স্বর্ণ-নথ-শোভিত প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, তুই স্বামীর ঘরে চলিলি, আমার স্বামীর ঘরে আমার স্থান নাই, আমি কোথায় যাব মা? আমাকে তোর চরণে স্থান দে, আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাক্।"

শৈলবালা আর কোনও কথা বলিতে পারিল না; সে মাতৃচরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বরণে হঠাৎ বাধা পড়িল; কনকলতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সক্রোধে বলিল, "এ আপদ এখানে কেন মরিতে আসিল!" আকস্মিক বিভ্রাটে ঢাকের বাদ্য থামিয়া গেল; সানাইয়ের কণ্ঠরোধ হইল!—কেবল পশ্চিম গগন হইতে শ্রান্ত তপনের লোহিত রশ্মিজাল বাতায়নপথে মায়ের হরিতাল-রঞ্জিত অতসীবর্ণাভ মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার প্রশান্ত মুখকান্তিকে করুণার উৎসধারায় সিক্ত করিল: মনে হইল, নিরাশ্রয়া অভাগিনী কন্যার দুঃখে মা ত্রিনয়নীর নেত্রত্রয় হইতে অশ্রুরাশি উৎসারিত হইতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ইংরাজী চিত্র-কলায় প্রাণ।

একটা জাতি যখন বড় হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় হইবার উপযোগী উপাদান অনেক কাল ধরিয়া প্রকৃতি রাণী সেই জাতির প্রত্যেকের গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। শক্তি বা মহত্ব অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বহু ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গা আনিয়া জাতির স্বাস্থ্যের উৎস ও পিপাসার জল যোগাইয়া থাকেন।—তবেই জাতি বড় হয়। ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার

জনে উদাসীন হইয়া, মাটীর দেহে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া, স্বপ্নময় রাজ্যে শূন্য আকাশে মেঘে মেঘে বিচরণ করিয়া কেহ কখনও বড় হয় নাই, কেহ কাহাকেও বড় ও সুখী করিতে পারে নাই, কেহ কখনও জাতি গড়িতে সমর্থ হয় নাই। অন্যায় কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না, তাহার কুফল একদিন না একদিন, এক স্থানে না হয় অন্য স্থানে ফলিবেই ফলিবে। ব্যক্তিগত অপদার্থতার ফলে মানুষ নিজে ভোগে, পরিবারকে দুঃখসাগরে ভাসায়, জাতিকে চিরদুঃখী করিয়া ভিক্ষুকের বেশে ভবের হাটে ছাড়িয়া দেয়।

ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে মানুষের সার্থকতা,—স্বপ্নের অনুধাবন কিংবা সংসারের পঙ্কে জীবন-ত্যাগে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নহে। মানুষ যখন প্রকৃতির অন্তরবাহী শক্তিময় প্রাণের সন্ধান পায়, তখনই মানুষ বড় হইতে থাকে, জাতিকেও বড় করিয়া তোলে। প্রাণ প্রকৃতির সকল বস্তু অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব, আবার স্বপ্ন অপেক্ষা অনধিগম্য, সুদূরস্থিত অসীম অনন্তচারী।

যখন জাতির ভিতরে প্রাণ প্রকাশ পায়, তখন সেই জাতির কোনও কর্ম্মক্ষেত্রই তাহার শক্তির বহির্ভূত থাকিতে পারে না। সকল কর্ম্ম-বিভাগেই শক্তির আবির্ভাব হয়।

আজ ইংরাজ-জীবনের চিত্রের কথা বলিব। ইংরাজের কলা-চর্চ্চা নানা রসে পরিপূর্ণ। এক প্রবন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে। আজ উদাহরণের সাহায্যে কোমলভাবের একটু আলোচনা করিব।

প্রথম চিত্র।—ইহার বিষয় চিত্রের দিকে চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মানুষটি চরিত্রের কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অন্যায় করিয়াছিল, তাই সরকার তাহাকে কারাবাসে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তার প্রাণকে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

বন্দীর হৃদয় পঞ্জর-পিঞ্জরে কাঁদিতেছে। ঐ দেখ, বন্দীর জীবনসঙ্গিনী তাহার হৃদয়-বৃন্তের ফুলটিকে কারাবাতায়নে তুলিয়া ধরিয়াছে, জানালার লোহার গরাদের ফাঁক দিয়া যতটা পারে, পুত্রমিলনসুখ উপভোগ করিবার জন্য বন্দিনী ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে; অভাগিনীর মস্তক দুঃখের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্র।—এক দিকে শুক, অন্য দিকে শারী, মধ্যে বেদনায় কারা-পিঞ্জর—হৃদয়বিদারী ব্যবধান।

তৃতীয় চিত্র।—মুক্তির আদেশ। কারাবাসী মুক্তি পাইয়াছে। তাহার সুখদুঃখের সঙ্গিনী শিশুসন্তানকে লইয়া উপস্থিত। হতভাগ্য আনন্দের আবেগে জীবনসঙ্গিনীর স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী তাহার স্বামীর মুক্তির আদেশপত্রখানিই দ্বাররক্ষীকে দেখাইতেছে। চিত্রবিদের মহত্ত্ব এই চিত্রে শুধু মানব-প্রাণের ভাবপ্রকাশেই আবদ্ধ নয়। একটু লক্ষ্য করিয়া কুকুরটির দিকে চাহিয়া দেখুন, সে কেমন আবেগের সহিত স্বামীস্ত্রীর মিলিত হাত দুখানি লেহন করিতেছে! তাহার আনন্দও ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কৃতী পুরুষ কি মানবে কি জীবে ভাবের প্রাণময় ধারা মানবতার খাতে প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ত যথার্থ কলাবিৎ।

৪র্থ চিত্র।—তার জীবনের প্রথম দুষ্কৃতি। আলোকের অভাব যেমন অন্ধকার, তেমনই ন্যায়, সত্য ও প্রেমের অভাবই দুষ্কৃতি; ইহারই অন্য নাম পাপ, বা কলুষ। দুষ্কৃতি, অন্যায়, বা পাপের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে কি না, এই গূঢ় বিষয়ে বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এই চিত্রে অভিব্যক্ত বালকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন, অনুতপ্ত, অসহায় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শিশু যদি অন্যায় করিয়া থাকে, তবে সে অন্যায়ের জন্য দায়ী কে? দায়ী তার পিতা মাতা, দায়ী তার সমাজ, দায়ী তার সমাজের সাধনা, দায়ী তার দেশ, দায়ী তার দেশের ভগবান্। কোথা হইতে সে এ জগতে আসিল? তার প্রাণে প্রেম দয়া সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি দেবত্ব ও পশুত্বের সমহারে কে এই অদৃষ্ট গড়িল? এই প্রশ্নের উত্তর নাই। যখন এই সমস্যার সমাধান হইবে তখন সমাজ জেল ভাঙ্গিয়া কারাক্ষেত্র রচিয়া ধানের চাষ করিবে। যুগযুগান্তর ধরিয়া কাব্য ও সাহিত্যের চর্চ্চার ফলে যদি সমাজে সে প্রেম ও শক্তির আবির্ভাব না হয়, তাহা হইলে মানব-সাধনা নিষ্ফল। মানবহীন ধরায় কত ফুল ফুটিবে, ঝরিবে, আবার ফুটিবে আবার ঝরিবে, স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী নীরবে কুল কুল গানে সাগর-সন্ধানে ছুটিয়া চলিবে। অত মানুষ, অত ছাইভস্মের দরকার কি? তাই এই প্রেমময়ী নারী চিত্রকর তাঁহার হৃদয়ের প্রেমস্রোতের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এই চিত্রে বহাইয়া দিয়াছেন। বালকের উদাস দৃষ্টিতে মানুষের সকল জ্ঞান ও সকল সাধনার প্রতি অব্যক্ত ধিক্কারের ভাব কেমন চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫ম চিত্র।—পিতৃমাতৃহীন। এর ব্যাখ্যা আর কি করিব! আমিও যে উহাদেরই দলভুক্ত। ছয় মাসের মাংসপিণ্ড বসুন্ধরারে উপহার দিয়া মা আমার

চলিয়া গিয়াছিলেন। কথা ফুটিতে না ফুটিতেই পিতাও ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতামাতার নির্ম্মল প্রেম আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই-- তাই মা আমার আজ বিশ্বময়ী, পিতা আমার বিশ্বময়। তাই যার কেউ নাই, তার কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয়। যেখানে দুঃখ, যেখানে ক্রন্দন, যেখানে চোখের জল, সেই দিকেই প্রাণ ধায়। কি চমৎকার চিত্র! ছেলে দুটির মুখের দিকে চাহিলে হৃদয়ের সব রক্ত যেন চোখ দিয়া বাহির হইতে চায়। অমন করিয়া কাঁদাইতে না জানিলে কি আর জাতি গড়া যায়? ইংরাজ-চিত্রকরের তুলিকার এই শক্তিবলে ইংরাজ আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

চোখের জলের স্রোত একবার বহিলে গর্ব্বের বাঁধ, জাতি-দ্বেষের বাঁধ, ধর্ম্মমতের বাঁধ চূর্ণ হইয়া স্রোতে মিশিয়া ডুবিয়া যায়। যে সমাজ দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ, যে সমাজের প্রত্যেক নরনারী ভবের হাটে পিতৃমাতৃ-হীনের মত সকলের দ্বারে ভিখারী, যেখানে ধনী প্রাসাদে বসিয়া কাঁদিতেছে, দরিদ্র ভাঙ্গা কুটীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, পুরোহিত মন্দিরে বসিয়া কাঁদিতেছে, অপদার্থ পথভ্রান্ত ছেলে কাঁদিয়া মরিতেছে, শিক্ষিত জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া কাঁদিতেছে, নিরক্ষর অজ্ঞানতার তাড়নায় কাঁদিতেছে, পুরুষ নারীর অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছে, নারী পুরুষের পীড়নে কাঁদিতেছে; সেখানেই ত চিত্রকরের তুলিকায় শক্তিসঞ্চার আবশ্যক। 'নরম গরম' মধুর-মধুর জীবন আঁকিয়া, তন্দ্রাকে ঘোর নিদ্রায় পরিণত করিলে ধ্বংসের পথই আবিষ্কৃত হয়; যুগযুগান্তরের যে অপদার্থতার জন্য আজ কাঁদিয়া মরিতেছি, সেই মোহান্ধকারকেই আরও ঘনীভূত করিয়া তোলা হয়। চিত্রে প্রাণ ও শক্তি-সঞ্চার আমাদের পক্ষে যেমন আবশ্যক, এমন আর কাহারও নয়। চিত্র-শিল্পের বিজ্ঞানকে নির্ব্বাসিত করিয়া সমাজের নিজস্ব সাধনার দোহাই দিয়া আপনাদের মনগড়া পথে চলিলে চিত্রকাব্যে শক্তিসঞ্চার অসম্ভব। প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দেশের সাধনার সাহায্যে চিত্রকাব্যের মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। সকল জাতি তাহাই করিয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। মুক্তির অন্য পথ নাই।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মন।

সম্পাদকের আত্মকাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আমার প্রকৃত নামটি গোপন করিয়া এই কাহিনী উপলক্ষ্যে যে কোনও একটি ছদ্ম-নাম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি—ধরুন আমার নাম শ্রীমনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি একখানি মাসিক পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক—আমার কাগজখানির নামও গোপন করিয়া তৎস্থলে লিখি—"আর্য্যশক্তি"। এই কপটতাটুকু অবলম্বন করিলাম বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি—কারণ অদ্য যে আত্মকাহিনীটি বিবৃত করিতে বসিয়াছি—তাহাতে আমার বুদ্ধিমত্তা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই—বরঞ্চ তদ্বিপরীত। আমার আসল নামটি শুনিলে আপনারা অনেকেই হয় ত আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন ; কারণ আমি বঙ্গ-সাহিত্যে এক জন নগণ্য ব্যক্তি নহি, এবং আমার কাগজখানিরও যথেষ্ট নাম হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এই যে, নাম যত হয়, টাকা কড়ি তাহার উপযুক্ত কিছুই হয় না। সম্মুখেই পূজা—প্রেসের দেনা শোধ করিতে হইবে, কাগজের দোকানেও অনেক টাকা বাকী, যে কারম আমাদের ছবির ব্লক প্রস্তুত করে, তাহারাও তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তহবিলের অবস্থা শোচনীয়। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া রঙ্গীন কাগজে এক লম্বা চৌড়া হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া কলিকাতায় অজস্র বিলি করিলাম—এবং মফস্বলেও নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিলাম, এ বৎসর "আর্য্যশক্তি" পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কয়েক সহস্র (ঠিক কয় সহস্র লিখিয়াছিলাম মনে নাই) অধিক ছাপাইয়াও কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারিতেছি না। দামোদরের বন্যার মত হু হু করিয়া গ্রাহকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে আর অধিকদিন যে নূতন গ্রাহকগণকে সম্পূর্ণ সেট কাগজ দিতে পারিব—এমন ভরসা নাই। অতএব যাঁহারা আর্য্য-শক্তির নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাটা কিন্তু সত্য নহে। নূতন গ্রাহক মোটেই হইতেছিল না, এবং "আর্য্যশক্তি"র অবিক্রীত সংখ্যাগুলি স্তূপাকার হইয়া বাড়ীতে স্থানাভাব

ঘটাইতেছিল। কিন্তু ঈদৃশ মিথ্যাভাষণে পাপ নাই। মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলা যাইতে পারে। এরূপ আড়ম্বর করিয়া বিজ্ঞাপন না দিলে আমার কাগজ চলে না—না চলিলে আমার প্রাণ রক্ষা হয় না ; কারণ এই কাগজই আমার একমাত্র জীবিকা—এবং আমি যে একজন সৎকুলীন ব্রাহ্মণ, সে কথাটা অলীক নহে।

সপ্তাহকাল মধ্যে হ্যাণ্ডবিলের ফল পাইতে লাগিলাম। অনেকগুলি নূতন অর্ডার আসিল—কিছু টাকা পাইলাম। দেনা কতক কতক পরিশোধ করিলাম, এবং বাকী টাকা, পূজার অবকাশে দেশভ্রমণে যাইব বলিয়া, রাখিয়া দিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী আন্দোলন পূরা দমেই চলিতেছে। বঙ্গ-সাহিত্যের মরা গাঙ্গেও ভাবের বাণ ডাকিয়া উঠিয়াছে—আমিও আর্য্যশক্তিতে উদ্দীপনাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোলদীঘী, বিডন-বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে—কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল প্রভৃতি জন-নায়কগণ দেশান্তরিত হইয়াছেন—আবার গুজব উঠিয়াছে—সিমলাশৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে—আরও কয়েক জন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।

পূজার সংখ্যা আর্য্যশক্তি বাহির হইয়াছে। কার্ত্তিকের কাপি প্রেসে দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইব—আপিসে বসিয়া প্রবন্ধনির্ব্বাচন করিতেছিলাম। বেলা যখন নয়টা হইবে, সেই সময় এক জন অপরিচিত যুবক, পঞ্জাবী কামিজের উপর রেশমী চাদর ঝুলাইয়া, ছাতা-হস্তে আমার আপিসে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আপনারই নাম মনতোষ বাবু ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"—ভাবিলাম, বোধ হয় নূতন গ্রাহক হইতে আসিয়াছে,—তিনটি টাকা পাওয়া যাইবে।

লোকটি আমায় নমস্কার করিয়া, বিনা আহ্বানেই পাশের বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"অনেক দিন থেকে আপনাকে দেখবার জন্যে উৎসুক ছিলাম। আপনি এক জন দেশবিখ্যাত লোক। আজ আমার সুপ্রভাত।"

আমি বিনয়সূচক একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলাম, "আপনার নাম কি ?"

"আমি এক জন অখ্যাত অজ্ঞাত লোক। আমার নাম শুনলে ত আপনি

চিনতে পারবেন না। আমি মফস্বলে থাকি। সম্প্রতি একটু কাজে কলিকাতায় এসেছিলাম। আর্য্যশক্তিতে আপনার প্রবন্ধ পড়ে আপনার উপর বড়ই শ্রদ্ধা হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম একবার গিয়ে আলাপ করে আসি। আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

দেখিলাম, গ্রাহক হইবার গতিক নয়—একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম, তবে তাহার স্তবে তুষ্টও হইলাম। একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ক্ষমতা।"

সে বলিল—"আপনার মত আর দু চার জন 'সামান্য ব্যক্তি' বাঙ্গালাদেশে থাকলে কি আর ভাবনা ছিল? অন্য লোকে কি মনে করে জানি না, কিন্তু আমার ত বিশ্বাস—এই স্বদেশী আন্দোলনকে আর্য্যশক্তিই জাগিয়ে রেখেছে।"

আমি বলিলাম—"সাধ্যমত দেশের একটু কাজ করতে চেষ্টা করে থাকি।"

বাবুটি বলিল—"আজকাল আর্য্যশক্তিই বোধ হয় বাঙ্গালার প্রধান মাসিকপত্র?"

"আমাদের কিছু বলা শোভা পায় না তবে অনেকেই এখন এ কথা বলছেন বটে। গত সপ্তাহের বঙ্গদূত দেখেছেন?"

"না—কি লিখেছে?"

"আমাদের পূজোর সংখ্যার একটা সমালোচনা করেছে"—বলিয়া দেরাজ হইতে বঙ্গদূতখানি বাহির করিয়া বাবুটির হস্তে দিলাম। তাহাতে ঠিক ঐ কথাই ছিল—আর্য্যশক্তিই এখন বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। তবে ও কথাটি বঙ্গদূত বলে নাই—আমি নিজেই বলিয়াছিলাম, কারণ সমালোচনাটি আমারই স্বরচিত।

যুবক পাঠান্তে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"বাঃ—বেশ লিখেছে। ঠিকই লিখেছে। আচ্ছা মশায়, কোন্ শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আর্য্যশক্তির বেশী প্রচার?"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম—"দেশের অধিকাংশ গণ্য মান্য পদস্থ লোকেই আমাদের গ্রাহক। এ দিকে বর্ম্মা থেকে আরম্ভ করে ও দিকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত—যেখানেই বাঙ্গালী আছে—সেখানেই আর্য্যশক্তি-আদর।"

কথাটা বিলক্ষণ অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম। আমরা যে কেবল কাগজ ছাপাইয়াই বিজ্ঞাপন দিই, এমন নহে—সুযোগ পাইলেই মুখে মুখেও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকি।

লোকটি বলিল—"তা ত হবেই—তা ত হবেই। আমরাও দেখেছি কি না—আর্য্যশক্তিতে এক একটা স্বদেশী প্রবন্ধ বেরিয়েছে—আর কলেজের ছেলেরা মেতে উঠেছে।"

"হ্যাঁ—কলেজের ছেলেদের মধ্যেও আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক। আগে তত ছিল না। স্বদেশী প্রবন্ধগুলো যে সময় থেকে বেরুতে আরম্ভ করেছে—সেই সময় থেকে কলেজের ছেলেরা খুব গ্রাহক হচ্চে।"

বাবুটি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিল—"আচ্ছা মনতোষ বাবু,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?—আর্য্যশক্তির গ্রাহক কত হয়েছে ?"

একটু চিন্তার ভান করিয়া বলিলাম—"ঠিক মনে নেই।"

"দশ হাজারের বেশী হবে বোধ হয় ?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন মনে মনে কত হিসাব করিতেছি, এরূপ ভাবটা দেখাইয়া বলিলাম—"না—দশ হাজার এখনও উঠেনি।"

বাস্তবিকই উঠে নাই। অর্দ্ধেকও উঠে নাই। সিকি উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কেন জানি না, বাবুটি ধরিয়া লইল, দশ হাজার পূরিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। বলিল—"উঃ—ন হাজারের উপর গ্রাহক। বোধ হয় বাঙ্গালা আর কোনও মাসিকপত্রের গ্রাহক ন হাজার উঠেনি ?"

একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া বলিলাম—"অর্দ্ধেকও নয়।"

লোকটি তখন ধীরে ধীরে পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল। একটু কাসিয়া, একটু হাসিয়া, সঙ্কোচের সহিত বলিল—"আমি দুটি স্বদেশী প্রবন্ধ লিখেছি। এ দুটি—আর্য্যশক্তিতে ছাপাবার মত হবে কি ?"—বলিয়া কাগজগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম—"তাই বল!—তোমার উদ্দেশুটা এতক্ষণে বোঝা গেল। এত আমড়াগেছে না করে প্রথমে সোজাসুজি বল্লেই হত। তোমার এ প্রবন্ধ যদি রাবিশ হয়, তুমি আমা[illegible] পুরুষ বলেছ বলেই কি আমি এ ছাপব ?" প্রবন্ধ দুই [illegible] উল্টাইয়া দেখিলাম, শেষে বাক্য রহিয়াছে—অ[illegible]নতন্ত্র।

বলিলাম—"আচ্ছা, রেখে যান, সময় মত পড়ে দেখ্‌ব। যদি ছাপাবার উপযুক্ত হয়, তবে অবশ্যই ছাপা হবে।"

"কার্ত্তিকে বেরুবে কি ?—অবশ্য যদি মনোনীত হয় ?"

"কার্ত্তিকে ?—কার্ত্তিকের কাপি ত একরকম ঠিকই হয়ে গেছে। অগ্রহায়ণের আগে আর—"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। বলিল—"আচ্ছা, দেখবেন। না হয় অগ্রহায়ণেই দেবেন। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হল, মনতোষ বাবু। আপনার অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এখন তবে আসি—নমস্কার।"

"নমস্কার"—বলিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ উঠিয়া আবার বসিলাম।

লোকটিও দ্বারের বাহির হইল—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল, আমার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ। পূজা-সংখ্যায় একটা ইংরাজী সমালোচনা লিখিয়া তাহা প্রকাশের জন্য অবিনাশকে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের আপিসে পাঠাইয়াছিলাম। প্রবেশমাত্র তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হল হে ?"

অবিনাশ বলিল,—"কাল সকালে বেরুবে। আমি নিজে বসে থেকে কম্পোজ করিয়ে প্রুফ্‌ দেখে দিয়ে এসেছি। ও লোকটা কেন এসেছিল ?"

"রসিক বাবু ?"

"ওর নাম কি রসিক বাবু নাকি ? আপনাকে তাই বলেছে বুঝি ?"

"না, মুখে বলেনি, নিজের লেখা বলে এই দুটো প্রবন্ধ দিয়ে গেছে —নীচে সই রয়েছে শ্রীরসিকমোহন সেন গুপ্ত।"

অবিনাশ উত্তেজিতস্বরে বলিল—"ওর মাথা! ওর চৌদ্দপুরুষেও কারু নাম রসিকমোহন সেন গুপ্ত নয়।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে ও কে ?"

"ডিটেক্‌টিব। ওর নাম ভূপতি রায়।"

ভীত হইয়া বলিলাম—"ডিটেক্‌টিব, বল কি ? বোধ হয় ভুল করছ।"

অবিনাশ জোরের সহিত বলিল—"হ্যাঁ, ও ডিটেক্‌টিব। আমি ওকে খুব চিনি। পঞ্চাশ দিন ওকে আমি লালবাজারে দেখেছি। কি বল্লে ?"

শুনিয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম; একে এই নূতন

তালিকার গুজব—তাহার উপর কতকগুলা অযথা মিথ্যা কথা বলিয়া আর্য্যশক্তির প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উহার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিলাম। ও এখন তাহারও উপর পুলিসোচিত রঙ্গ চড়াইয়া কি ভীষণ রিপোর্টই যে দাখিল করিবে, তাহা ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অবিনাশ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল—"কি সব কথাবার্ত্তা হল, আমায় বলুন দেখি।"

যত দূর স্মরণ করিতে পারিলাম—সমস্ত কথা অবিনাশের নিকট ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া সে গালে হাতে বসিয়া রহিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কাযটা ভাল হয় নি। যে দিন সময়।" টেবিল হইতে সেই কাগজগুলা উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ প্রবন্ধ দুইটি নীরবে পাঠ করিয়া শেষে বলিয়া উঠিল—"দেখেছেন পাজির চালাকি ?"

"কি ?"

"আরে সর্ব্বনাশ!—এর নাম কি প্রবন্ধ ? এ যে একবারে আগুন! এই ছাপাইলেই হয়েছে আর কি ! সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি।"

"বল কি !"

"শুনুন না।"—বলিয়া প্রবন্ধদ্বয়ের কয়েকটা স্থান পড়িয়া আমায় শুনাইল।

আমি বলিলাম—"সর্ব্বনাশ! বোধ হয় আমাদের ফাঁসাবার মৎলবেই প্রবন্ধ দুটো রেখে গেছে। দাও ছিঁড়ে ফেলি।"—বলিয়া প্রবন্ধ দুইটি আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ওয়েষ্টপেপার-বাস্কেটে ফেলিয়া দিলাম।

অবিনাশ বলিল—"এ বেরুলে সদ্য সদ্য আমাদের বিরুদ্ধে ১২৪ ক—আর পাঁচটি বছর করে শ্রীঘর। ওগুলো শুধু ছিঁড়ে ফেল্লে চল্‌বে না। একবারে উননে ফেলে দিয়ে আসুন। কি জানি, যদি আমাদের আপিস্ খানাতল্লাসী করায়—ঐ টুকরোগুলো নিয়ে গিয়ে যোড়া দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিষম প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করাবে।"

আমি বলিলাম—"ঠিক বলেছ অবিনাশ! তাই বোধ হয় সে রাস্কেলর মৎলব।"—বলিয়া ছিন্নাংশগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, অন্তঃপুরে গিয়া সেগুলি জলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিলাম।

স্নান করিয়া, পূজা আহ্নিক সারিয়া জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি, অবিনাশ বসিয়া মাথা গুঁজিয়া একমনে কি লিখিয়া যাইতেছে।

চারি পাঁচ তক্তা লিখিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হচ্ছে কি ?"

"একটা প্রবন্ধ লিখছি।"

"কি প্রবন্ধ ?"—বলিয়া লেখা কাগজগুলি উঠাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অবিনাশ ইংরাজ গভর্মেণ্টের অসামান্য ন্যায়পরতা, অপার সদাশয়তা, আদর্শ প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে একটি পরম রমণীয় স্তব রচনা করিয়াছে। যে সকল অপরিণামদর্শী অজ্ঞলোক ঈদৃশ মহানুভব পিতৃমাতৃতুল্য গভর্মেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। বুঝিলাম, সেই ডিটেক্‌টিভের কৌশল বিফল করিবার জন্য এটি অবিনাশের উল্‌টা চার্জ।—প্রবন্ধ শেষ করিয়া কাগজগুলি গুছাইয়া, কোণ ফুঁড়িয়া সূতা গাঁথিয়া বলিল,—"লিখে দিন—'মনোনীত—কার্ত্তিকের জন্য'—লিখে সই করে দিন।"

আমি তাহাই লিখিয়া সহি করিয়া দিলাম। অবিনাশ আমার বুদ্ধি-বল—অবিনাশ আমার দক্ষিণ হস্ত। প্রবন্ধটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া অবিনাশ বলিল—"বেলা হয়েছে, এখন তবে বাড়ী চল্লাম। স্নানাহার করিগে।"

আমি বলিলাম, "ওহে এক কায করনা। আজ এইখানেই স্নানাহার কর। কি জানি যদি পুলিস টুলিস এসে পড়ে, তুমি থাকলে তবু অনেকটা ভরসা হয়।"

অবিনাশ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ ত আমার থাকবার যো নেই, মনতোষ বাবু! বাড়ীতে এক জন কুটুম্ব এসেছেন। আমি না গেলে—"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, তা যাও, কিন্তু আজ ওবেলা একটু সকালে সকালে এস।"

"তা আসব" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অবিনাশ সেই যে গেল—আর তিনদিন ধরিয়া তাহার টিকিটিও দেখিতে পাইলাম না। এ তিনদিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম। পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে—মনে হয় ঐ বুঝি পুলিস আসিল। গলির মোড়ে লাল পাগড়ি দেখিলেই কাঁপিয়া উঠি

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জেলকে আমার এত ভয় কেন? কেন তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ জেলে ধর্ম্মবিচার নাই, জাতিবিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করি না। জেলে আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার জন্য কুশাসনই বা পাইব কোথায়, একটু গঙ্গাজলই বা পাইব কোথায়? আমি যাহার তাহার হাতে খাই না। এক, বাড়ীর লোক, কিংবা সুপরিচিত ব্যক্তি, যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্রাহ্মণ, তাহারই হাতে খাই। জেলে ত সে আব্দারটি আমার খাটিবে না; দ্বিতীয় কারণ—বিধবা হইতে আমার ব্রাহ্মণীর ঘোরতর আপত্তি। দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হইলে, আমি জীবিত অবস্থায় জেল হইতে যে বাহির হইব না, ইহা নিশ্চয়। আমার বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্যও তেমন ভাল নহে। জেলের অন্ন খাইয়া আমি কয়দিন বাঁচিব বলুন? আমি মরিয়া গেলে, আমার ব্রাহ্মণীর দশাই বা কি হইবে, আর আমার নাবালক পুত্রকন্যাগণই বা কোথায় দাঁড়াইবে? এই দুইটি বাধার জন্য জেলে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা,—নচেৎ আমার মনে যে একটা অহেতুকী জেলভীতি আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। ইহা হীন ভয় নহে—সুদুর্লভ পরিণামদর্শিতা।

যাহা হউক, রাম রাম বলিয়া ত তিন দিন কাটিয়া গেল, কোনও বিপদ ঘটিল না। খানাতল্লাসী হইবার হইলে এতদিন হইত। মনে কতকটা ভরসা পাইলাম।

চতুর্থ দিনে অবিনাশ আসিলে বলিলাম,—"কি হে, কদিন ছিলে কোথা? আসনি যে?"

অবিনাশ বলিল,—"আজ্ঞে বাড়ীতেই ছিলাম। খানাতল্লাসী টল্লাসী কিছু হয় নি ত?"

"না। সেই ভয়ে আসতে না বুঝি?"

"আজ্ঞে, ভয়ে নয়, ভবিষ্যৎ ভেবেই আসিনি। ধরুন, যদি পুলিস আসত, আর আপনাকে আমাকে দুজনকেই ধ'রে নিয়ে যেত, তা হলে আর্য্যশক্তির দশা কি হত, বলুন দেখি? কাগজখানি বন্ধ হ'য়ে যেত, আপনার এতবড় একটা কীর্ত্তি লোপ হ'ত, বঙ্গসাহিত্যের 'সমূহ' ক্ষতি হ'ত।"

পরিণামদর্শিতা বিষয়ে অবিনাশ আমার উপযুক্ত শিষ্য। "আর্য্যশক্তি"র প্রতি অবিনাশের অসাধারণ টান। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কাগজের প্রতি একটু কম এবং আমার প্রতি তাহার একটু বেশী টান দেখিলেই যেন মনটা খুসী হইত।

অবিনাশ মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিল,—"আবার ত একটা গুজব শুনে এলেম।"

"আবার কি শুনলে?"

"নূতন তালিকায় সাহিত্যবিভাগ থেকে তিনটে নমিনেশন যাচ্ছে। এক-জন বড় কবি, এক জন বড় মাসিকসম্পাদক, আর এক জন বড় দৈনিক সম্পাদককে ডিপোর্ট করা হবে। শেষের নামটি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেছে, কিন্তু এ দেশে সব চেয়ে বড় কবি কে, এবং সব চেয়ে প্রধান মাসিকপত্র কোন্‌টি, এই নিয়ে কাউন্সিলে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে—বাদানুবাদ চলছে।"

আমি বলিলাম—"তাতে আর আমাদের ভয় কি? ধরে ত কেদার মিত্তিরকে ধরবে। ওদের আকারও আমাদের চেয়ে বড়, ছবিও আমাদের চেয়ে বেশী ছাপে, গ্রাহকসংখ্যাও অনেক বেশী—প্রায় আমাদের ডবল। কেদার মিত্তিরের 'ধূমকেতু'র কাছে কি আমাদের 'আর্য্যশক্তি?' আমাদের 'আর্য্যশক্তি'কে কেই বা পোঁছে?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"সে ত ঠিক কথাই—কিন্তু আমরা যে ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছি কি না যে, আমাদেরই গ্রাহক সব চেয়ে বেশী,—প্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশী। এটা কতকটা আসামীর স্বীকারোক্তি গোছ হয়ে পড়েছে, বুঝছেন না?"

শুনিয়া আমার বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু মৌখিক সাহস দেখাইয়া বলিলাম—"বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দাও। বিজ্ঞা-পনে কে কি না লেখে? এই তুমি যে তোমার কেতাবের বিজ্ঞাপনে ছাপাচ্ছ—বিষবৃক্ষের পর এমন উপন্যাস আর প্রকাশিত হয় নাই,—লোকে ভুলছে? কেউ ত কিনছে না। গবর্মেণ্ট কি আর এমনই নির্ব্বোধ যে, বিজ্ঞাপন দেখে ভুলে যাবে?—রুই কাৎলা কেদার মিত্তিরকে ছেড়ে চুনোপুঁটি আমাকে ধরবে?"

"শুধু ত বিজ্ঞাপনে নয়, আপনি ভূপতি রায়কেও ত ঐ রকম সব কথা বলেছেন কি না!"

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া বলিলাল,—"হ্যাঃ, ভূপতি রায় ত ভারি একটা লোক—তার কথা অমনি গভর্মেণ্ট শুনলে আর কি! তার রিপো-র্টের যদি কোনও ভেলু থাকৃত—তা হলে সেই দিনই আমাদের আপিস খানাতল্লাসী হত না?"

অবিনাশ সংশয়ের স্বরে বলিল—"তা বটে।"

কাজকর্ম্ম যাহা ছিল, তাহা করিয়া অবিনাশ বেলা দশটার সময় বাড়ী গেল। অন্যদিন বিকালে তিনটার সময় আসে—এদিন আর আসিল না। তাহার এই অনিয়ম দেখিয়া আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম।

সন্ধ্যাবেলা অবিনাশ আসিয়া বলিল—"না—কোনও ভয়ের কারণ নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, নূতন কিছু শুনলে নাকি?"

অবিনাশ বলিল—"শ্যামবাজারে বেণীমাধব বাবু থাকেন, জানেন ত?" বড় বাবু—পাঁচশো টাকা মাইনে পান। আপনার যদি ডিপোর্টেসনই স্থির হয়ে থাকে, তবে আর কেউ জান্‌তে পারবার আগে তিনি জান্‌তে পারবেন। তাই মনে করলাম—যাই, গিয়ে কৌশলে সংবাদটা নিই।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল?"

"আজ্ঞে না। আলাপ থাকলে ত অসুবিধেই হত। কৌশলে কথা বের করে নেবার মতলবে গিয়েছিলাম কি না। দেখলাম—তিনি কখনও আপনার নামও শোনেননি—আর্য্যশক্তি বলে যে একখানি কাগজ আছে, তাও জানেন না। যদি, আমরা যা ভয় করছি, তাই হত, তা হলে এতদিন এ সম্বন্ধে কত চিঠিপত্র, কত মন্তব্য ওঁর হাত দিয়ে যেত—আপনার নাম, আর্য্যশক্তির নাম বেশ ভালরকমই জানতে পারতেন।"

কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলাম—"কি—কি—কি? বল—বল—বলত?"

অবিনাশ তখন আরম্ভ করিল—"বাবুটির কাছে গিয়ে আমি বল্লাম—'আমাকে মনতোষ বাবু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'—তিনি বল্লেন—'কোন্ মনতোষ বাবু?' আমি বল্লাম, 'যাঁর আর্য্যশক্তি।' তিনি বল্লেন—'পেটেণ্ট ওষুধ বুঝি? তা আমার বাপু পেটেণ্ট ওসুদ কসুদে তেমন বিশ্বাস নেই।' আমি বল্লাম—'না, পেটেণ্ট ওষুধ নয়—আর্য্যশক্তি মাসিক পত্রিকা।' তিনি বল্লেন—'মাসিক পত্রিকা?—না, আমারই ভুল হয়েছে। সে ওষুধটার নাম আর্য্যশক্তি নয়—শক্তিচূর্ণ। তা, প্রেমতোষ বাবু কি বলেছেন?' আমি বল্লাম—'প্রেমতোষ বাবু নয়—মনতোষ বাবু। তিনিই আর্য্যশক্তির সম্পাদক। তিনি আপনাকে এই কথা বলে পাঠালেন—আপনি হচ্চেন আপিসের বড় বাবু—যদি আপনাদের আপিসে আর্য্যশক্তির গোটাকতক গ্রাহক করে দেন, তবে বড় উপকার হয়। আর

আপনি নিজেও যদি গ্রাহক হন।' বাবুটি বল্লেন—'আমি একখানা মাসিক-পত্র নিই যে। তার নামটা কি ভাল—হ্যাঁ, ধূমকেতু। তা বাপু, সেইখানাই পড়ে উঠবার সময় পাইনে—আবার নতুন মাসিকপত্র নিয়ে কি ক'রব বল! আর আমার আপিসের বাবুদের সম্বন্ধে আমার বলাটা ভাল দেখায় কি? তার চেয়ে বরং বেলা দুটোর সময় বাবুরা যখন টিফিনঘরে তামাক খেতে নামে, সেই সময় সেইখানে গিয়ে তুমিই তাদের ধর—কিছু ফল হতে পারে।' আমি বল্লাম—'যে আজ্ঞে—নমস্কার।' বলে চলে এলাম।"

শুনিয়া বুকটা একেবারে হাল্কা হইয়া গেল। তাহার বুদ্ধিকৌশলকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এত খুসী হইলাম, আজ যদি অবিনাশ অবিবাহিত থাকিত—আমি তাহাকে নিজ জামাতা করিবার প্রস্তাব করিতাম। সে উপায় না থাকায়, রাত্রে খাইবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম—এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোলাও রাঁধাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম।

বসিয়া বসিয়া দুই জনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পশ্চিম-ভ্রমণ সম্বন্ধে তাহার সাহায্যে একটি প্রোগ্রাম স্থির করিলাম। দেখিলাম, তাহারও ইচ্ছাটা—আমার সঙ্গে যায়। বলিলাম—"তুমিও যাবে?"

সে বলিল,—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে। কিন্তু অনেক টাকা খরচ যে! হাতে কিছু নেই।"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম—"কুছ্ পরোয়া নেই। খরচ আমার। তুমি চল।"

পরদিন বখেমেলে আমরা যাত্রা করিব, স্থির হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রা করিবার সময় ছোট খুকী হাঁচিল। আমি আবার বসিয়া, নিঃশেষিত হুঁকাটি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী বলিলেন—"ও কিছু নয়—সর্দ্দির হাঁচি।"

আপিসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জিনিসপত্র উঠিয়াছে। আমি আবার যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সিঁড়ি নামিবার সময় ছাতার বাঁটটা গেল কপাটের আংটায় আটকাইয়া!

আবার ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। এক গেলাস জল খাইলাম। দুইটা পান মুখে দিলাম। দিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ীতে চড়িলাম। আমার পাচক চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃহৎ এক ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া কোচ-

বাক্সে গিয়া বসিল। সে আমার সঙ্গে যাইবে। অবিনাশ বাড়ী হইতে সোজা ষ্টেশনে গিয়া যুটিবে, পরামর্শ ছিল।

টিকিট পূর্ব্বেই কেনা ছিল। মধ্যম শ্রেণীতে গিয়া আরোহণ করিলাম। অবিনাশ উপরের বঙ্কে উঠিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। আমি নীচের বেঞ্চিতে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলাম।

মনটা বড় ভাল ছিল না। এক ত, গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলেই বাঙ্গালীর মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার উপর যাত্রাকালে দুই দুই বার বাধা পড়িল। ভাবিতে লাগিলাম—কি অদৃষ্টে আছে, ভগবান জানেন। হয় ত নূতন তালিকায় আমার নাম উঠিয়াছে—সেই বিদেশ হইতেই ছোঁ মারিয়া আমায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। বেণীমাধব বাবু হয় ত অবিনাশের সঙ্গে ছলনা করিয়াছেন—আমার ও আমার কাগজ সম্বন্ধে যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অভিনয়মাত্র। কিংবা হয় ত বড়সাহেব স্বয়ং স্বহস্তে গোপনে এ সকল বিষয় লেখালিখি করিতেছেন—বড় বাবুকে জানিতে দেন নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে খুকীই বা হাঁচিবে কেন—এবং ছাতাই বা আটকাইয়া যাইবে কেন?

ভাবিয়া আর ফল কি? অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এই বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা কিছুতেই ছাড়িল না।

পরদিন প্রাতে গয়ায় নামিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদে বেণীঘাটে স্নান করিয়া, অক্ষয়বট দেখিয়া, সহর প্রদক্ষিণ করিয়া, তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে পঞ্জাব মেলে কাণপুর যাত্রা করিলাম—কাণপুরে দুই দিন থাকিয়া আগ্রায় যাইব। এলাহাবাদে এক জন আমায় আগ্রার তোতারামের হোটেলের কথা বলিয়া দিয়াছিল। ছাড়িবার পূর্ব্বে কলিকাতায় আমার ম্যানেজারকে লিখিয়া দিলাম —জরুরী চিঠিপত্র যেন তোতারামের হোটেলের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়, —সেখানে তিন চারি দিন অবস্থান করিব।

কাণপুর দেখিয়া বিকালের মেলে আগ্রা যাত্রা করিলাম। তুণ্ডুলায় গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তোতারামের হোটেল খুঁজিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইল না—তাহাদের লোক গাড়ীর সময় ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া থাকে।

তোতারামের দুইটি বাড়ী আছে—একটি একতালা, অপরটি দ্বিতল। একতালা বাড়ীতে দৈনিক এক টাকা করিয়া ভাড়া, প্রতি কামরায় দুই তিন জন যাত্রীর স্থান। দ্বিতল বাড়ীতে একটি করিয়া স্বতন্ত্র কামরা পাওয়া যায়, দৈনিক ভাড়া দুই টাকা করিয়া, উপরেই কল পাইখানা আছে, স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধনের স্থান আছে। আমরা সেই দ্বিতল বাড়ীটিতে গিয়াই উঠিলাম।

পরদিন প্রাতে বাহির হইয়া সহর ও জুম্মা মস্‌জিদ্ দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর ফোর্ট দেখিবার ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম, স্বদেশী হইয়া অবধি বাঙ্গালীকে আর সহজে ফোর্ট দেখিবার পাস দেয় না। তথাপি গাইড্ বলিল, একটা দরখাস্ত লিখিয়া দিন—আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

চেষ্টা করিতে করিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল—পাস মিলিল না। দিনটা বৃথাই গেল।

পরদিন আহারের পূর্ব্বে তাজ ও এৎমাদুদ্দৌলা এবং অপরাহ্ণে সিকান্দ্রা দেখিবার পরামর্শ করা গেল। তৎপরদিন এক্কা করিয়া ফতেপুরশিক্রী যাওয়া যাইবে।

যথাপরামর্শ, বেলা সাতটার পর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাজ দেখিতে বাহির হইলাম।

ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বাগানের ভিতর কিছু দূরে এক জন বাঙ্গালী বাবু বেড়াইতেছে। আমাদের দেখিয়া লোকটা দাঁড়াইল—আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা ধীরে ধীরে তাজমহলের দিকে অগ্রসর হইলাম। সে লোকটিও, যেখানে ছিল,সেখান হইতে বাগানে বাগানেই অগ্রসর হইয়া,তাজের পাদদেশে আমাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহার বয়স অনুমান পঞ্চ-ত্রিংশৎ বর্ষ, দীর্ঘাকার, হস্তপদাদির অস্থিগুলি সুপুষ্ট, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। চোখে সোণার চশমা, মোটা মোটা গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাহাকে দেখিয়াই পুলিসের লোক বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল।

কিন্তু সে আমাদের কিছু বলিল না। একটু যেন মনোযোগের সহিতই আমায় দেখিতে লাগিল—অবিনাশের প্রতি দৃক্‌পাত করিল না।

আমরা জুতা খুলিয়া উপরে উঠিলাম। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সে লোকটিও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিল।

উপরে নকল, নীচে আসল সমাধি দর্শন করিয়া, ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগি-

লাম। পশ্চাতের একটা মিনারেটের পাদদেশে পৌঁছিয়া, লোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। অবিনাশের হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইলাম—বলিলাম, "এস, উপরে উঠি।"

বহু পরিশ্রমে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম। তথাকার বিশুদ্ধ মৃদু বায়ু বড় মধুর লাগিতে লাগিল। বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম—সে লোকটিকে কোথাও দেখিলাম না।

বায়ুসেবনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর অবিনাশকে বলিলাম—"কে হে লোকটা আমাদের পানে কট্‌মট্‌ করে চাইতে লাগল?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"পুলিসের লোক।"

"কি করে জানলে?"

"ওর কপালে, চুলের ঠিক আধ ইঞ্চি নীচে—একটা গোল লাল দাগ দেখেছেন?"

"না—আমি অত লক্ষ্য করিনি।"

"আমি করেছি। পুলিস-ক্যাপের দাগ। ওদের সরকারী টুপীগুলো ভারি টাইট্‌ হয় কি না।"

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একটু পরে বলিলাম—"আমাকেই ধরতে এসেছে না কি?"

"হতে পারে—নাও হতে পারে। পুলিসের লোক কি আর পশ্চিমে বেড়াতে আসে না?—তাজমহল দেখে না?"

আমি মনকে বুঝাইবার ছলে বলিলাম—"বেড়াতেই এসেছে বোধ হয়—কি বল অবিনাশ?"

সে গম্ভীরভাবে বলিল—"আশ্চর্য্য কি!"

সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম—লোকটা আবার বাগানে গিয়াছে। অবিনাশের গা টিপিয়া ইসারা করিয়া তাহাকে দেখাইলাম।

লোকটা এক স্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাজমহলের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে দৃষ্টি আরও উর্দ্ধে তুলিয়া, একে একে মিনারেটের মস্তকগুলি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, পকেট হইতে বাইনকুলার দূরবীণ বাহির করিয়া আমাদের প্রতিই লক্ষ্যস্থাপন করিল।

তাহার এই আচরণে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অবিনাশ বলিল—"গতিক ভাল নয়।"

খড়িক যে ভাল হইবে না—যখন খুকী হাঁচিয়াছিল, আমি তখনই জানিতে পারিয়াছিলাম!

"কি করা যায় হে?"—বলিয়া আমি অবিনাশের হাত চাপিয়া ধরিলাম।

"এখানে বসে থাকি আসুন। ও লোকটা চলে গেলে তখন আমরা নামব।"

লোকটা বেশীক্ষণ রহিল না। মিনিট দশ পনেরো ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া, ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া নামিলাম। ফটকের বাহির হইয়া গাড়ীর নিকট গিয়া দেখি, কোচম্যান কোচবাক্সে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইয়া, এৎমাদ যাইতে আজ্ঞা দিয়া আমি গাড়ীতে উঠিতেছি—এমন সময় দেখি, নিকটস্থ ছবির দোকান হইতে খানকতক ছবি হাতে করিয়া লোকটা বাহির হইল। গাড়ী ছুটিল। মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, ও বোধ হয় আমাদের দেখিতে পায় নাই।

অবিনাশকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ভাবছ হে?"

সে বলিল—"কপালে দাগ আছে বলেই যে পুলিসের লোক—এমন কিছু স্থিরতা নেই। যারা ইংরাজি কোট প্যাণ্টালুন পরে, মাথায় শক্ত হ্যাট পরে, তাদেরও কপালে ও রকম দাগ হয়ে যায়। সেই কথা আমি ভাবছিলাম।"

"তবে বাইনকুলার করে আমাদের দেখছিল কেন?"

"আমাদের দেখছিল কি তাজমহলের শোভা দেখছিল, তাই বা কে জানে?"

"হতে পারে।"—বলিয়া আমিও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এৎমাদে পৌঁছিয়া, দেখিয়া বেড়াইতেছি—এমন সময় পশ্চাতে জুতার শব্দ পাইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—সেই মূর্ত্তি। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এবার লক্ষ্য করিলাম—অবিনাশ যাহা বলিয়াছে, তাহাই—কপালের উর্দ্ধদেশে একটি পরিষ্কার লাল গোল দাগ রহিয়াছে। অবিনাশের পর্য্যবেক্ষণশক্তিতে চমৎকৃত হইলাম।

সরিয়া সরিয়া লোকটার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। এৎমাদের গঠন-সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য, কিছুই আর ভাল লাগিল না। অবিনাশকে বলিলাম—"চল হে—বাড়ী যাই।"

"চলুন।"—বলিয়া অবিনাশ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যখন ফটক পার

সাহিত্য

জীবনের প্রথম স্মৃতি

হতেছি, তখন একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলাম—দেখিলাম, লোকটা এৎ-মাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমাদের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। পা টিপিয়া অবিনাশকে বলিলাম—"কি হে—এবার কিসের শোভা দেখছে ?"

অবিনাশ বলিল—"গতিক ভাল নয়।"

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি করিলাম। আহারে বসিলাম ঐ মাত্র। কিছুই খাইতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর অবিনাশকে বলিলাম—"ওহে সিকান্দ্রায় যাওয়া যাবে কি ? লোকটা যে রকম পিছু নিয়েছে, সেখানেও যদি যায় ?"

অবিনাশ বলিল—"আমাদের পিছু নিয়েছে কি দুটো জায়গায় আমরা ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গেছি, তার ঠিক কি ? যে আগ্রা দেখতে আসে, এই সবই ত দেখে।"

"যদি আমরা সিকান্দ্রায় গিয়েও দেখি—সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে ?"

"তা হলে একটু চিন্তার কারণ বটে। সিকান্দ্রা এখান থেকে ছ মাইল দূর—সেখানেও যদি সে ঠিক আমাদের সঙ্গেই পৌঁছে যায়, তা হলে ঘটনাক্রমের থিওরিটা একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বৈ কি !"

আমি বলিলাম—"বিশেষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।"

যাহা হউক, বেলা আড়াইটার সময় সিকান্দ্রা যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া কোথাও লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—শরীর অত্যন্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন হইতে দুশ্চিন্তাটা কিয়ৎপরিমাণ অপসৃত হওয়াতে ক্ষুধাও বেশ চাগিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম—"এখন রন্ধনাদি আরম্ভ করিলে খাইতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইবে। তাহার চেয়ে বাজার হইতে লুচি, কচুরী, আচার, রাবড়ী প্রভৃতি কিনিয়া আন, খাইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়ি।"

আহারাদি শেষ করিয়া, আটটার পূর্ব্বেই শয়ন করিলাম। ঘরে একটা লণ্ঠন জলিতে লাগিল।

অবিনাশ ত দশ মিনিটের মধ্যেই নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। ভাবিলাম—সুখী তাহারা, যাহারা বিখ্যাত্‌নহে—যাহাদের ডিপোর্টেশনের ভয় নাই।

এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম—আমার আর নিদ্রা কিছুতেই আসে না। রাত্রি যখন আন্দাজ সাড়ে আটটা—তখন শুনিতে পাইলাম—বাহিরের বারান্দায় দুই জন লোক চাপা গলায় কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "মনতোষ বাবু" নামটা কাণে যাইবামাত্র—কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম।

কথাবার্ত্তা পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল—কিন্তু কোনও কথা আর ধরিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে উঠিয়া, দ্বারের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে বাহিরে চাহিলাম। বারান্দায় বাতি জ্বলিতেছে—দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে—হোটেল-ওয়ালা এবং সে।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হোটেলওয়ালা কথা কহিতে কহিতে আমার বদ্ধ দ্বারের পানে দুইবার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

কৈ অবিনাশ!—তোমার সেই ঘটনাক্রমের থিওরি এখন কোথায় গেল?

হোটেলওয়ালা বলিল—"এখন বাবুকে উঠাইব কি?"

সে বলিল—"না। কাল ভোরে আমি আসিব। আমার এখন কাজ আছে।"

"হুজুর কোথায় টিকিয়াছেন?"

"পুলিস আপিসের হেডক্লার্ক গঙ্গাধর বাবুকে জান?"

"নাম শুনিয়াছি।"

"সেইখানে আছি। দেখ—বাবুকে আমার কোনও কথা যেন বলিও না—খবর্দ্দার। বুঝিলে?"

"না হুজুর—যখন বারণ করিতেছেন, তখন বলিব কেন? আদাব।"

লোকটি চলিয়া গেল।

আমার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া অবিনাশকে উঠাইলাম। তাহাকে সকল কথা বলিলাম।

শুনিয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভগ্নস্বরে বলিলাম—"ও অবিনাশ!—কিছু বলছ না কেন? এখন উপায় কি?"

অবিনাশ সংক্ষেপে বলিল—"পালান।—যখন সে পুলিস-হেডক্লার্কের বাড়ী-তেই অতিথি—তখন নিশ্চয়ই সে কলকতার ডিটেক্টিব। ওর কোনও কথা আমাদের বোল্‌তে হোটেলওয়ালাকে বারণ করে গেল, তবেই বেশ বোঝা

যাচ্ছে—ওর কুমৎলব আছে—পাছে জান্‌তে পেরে আপনি পালিয়ে যান। ভোরবেলা এসে বাড়ী ঘেরাও করবে—এই বেলা সরে পড়ুন।"

"কোথা পালাব ?"

"যেখানে হয়। এখানে থাকলে কাল সকালে এসেই ক্যাঁক্‌ করে ধরবে। হাওয়া গাড়ী করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দু দণ্ড রাত্রি থাক্‌তে কনেষ্টবল দিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে রাখবে।"

"পালাতে বলছ—পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াব অবিনাশ ?"

"আপনি ত আর খুন করেন নি যে, যখনই ধরবে, তখনই ফাঁসি দেবে ? এখন যদি দু এক বছর গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তে পারেন—তার পর এ সব স্বদেশীর গোলমাল থেমে থুমে গেলে—আর আপনাকে ধরতে চাইবে না।"

বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—আর কোঁচার খুঁটে বারংবার চক্ষু মুছিতে লাগিলাম। এই বয়সে কোথায় পলাইয়া বেড়াইব ? খাইবই বা কি ? অবিনাশকে সেই কথা বলিলাম।

সে বলিল—"আপনি নাম ভাঁড়িয়ে আমায় চিঠি লিখবেন। আমি আর্য্যশক্তির তবিল থেকে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেব—যেখানে যখন থাকবেন। তবে আপনাকে একটা কৌশল করতে হবে।"

"কি ?"

"আপনি আজ পালান—আমি কালই কলকাতায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমি লোককে বলব, আপনি দিল্লী গেছেন—দু চার দিন পরে ফিরবেন। সপ্তাহ খানেক পরে, যেখানে আপনি থাকবেন, সেখান থেকে একটা কাল্পনিক প্রেরকের নাম দিয়ে আমায় একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন—যেন আপনার হঠাৎ কলেরায় মৃত্যু হয়েছে।"

কথাটা শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাতে কি ফল হবে ?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"ফল দু রকমের আশা করছি। প্রথমতঃ—আপনি মরে গেছেন শুনলে, গবর্মেণ্ট আপনার নামে ওয়ারেণ্ট বন্ধ করে দেবে—ধরা পড়বার ভয় আর থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ—আপনার মৃত্যু উপলক্ষে সভা টভা করে, প্রবন্ধ লিখে, বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এইটে প্রচার করে দেব যে, আপনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—আপনার অনাথা বিধবা আর অসহায় পুত্রকন্যায়ের ভরণপোষণের আর কোনই উপায় নেই—আর্য্য-

শক্তির আয়ই একমাত্র সম্বল—আর্য্যশক্তির গ্রাহকসংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ না হলে তাহাদের উপবাস করতে হবে। এই রকম ফন্দি করে কিছু গ্রাহক বাড়িয়ে নেব।”

আমি বলিলাম,—“আয়নার দেরাজে আমার ফটোগ্রাফ আছে। বাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে নিয়ে, আমার জীবনচরিতের সঙ্গে সে ছবিও একখানা ছেপে দিও!”

অবিনাশের বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বলিলাম—“মরার খবর দেবে—বাড়ীর লোক যে কেঁদে কেটে অস্থির হবে?”

“গোপনে তাঁদের বলে দেব এখন। তবে লোক দেখান একটু কান্না-কাটি করতে হবে বৈ কি।”

আমি বলিলাম,—“তা যেন হল। কিন্তু বছর দুই পরে যখন আমি বেরুব—তখন লোকে কি বলবে?”

অবিনাশ বলিল,—“তখন এই সংবাদ প্রচার করা যাবে যে, কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে হঠাৎ আপনি ধৃত হয়ে তিব্বতে কিংবা চীনে—ঐরকম একটা যায়গায় নীত হয়েছিলেন, এখন মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। অমুক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে আপনার এই দুই বৎসরের আত্মচরিত বেরুবে—সে কাহিনী পাঠ করে পাঠক যুগপৎ হর্ষে, ক্রোধে ও বিস্ময়ে ক্ষিপ্ত-প্রায় হয়ে উঠবেন—তা শত উপন্যাসের ঘনীভূত নির্য্যাস—এই সব বলে আরও খুব একচোট গ্রাহক বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।”

“তার পর।”

“সে রকম একখানা উপন্যাস আমি ইতিমধ্যে রচনা করে রাখব এখন, তাই আপনার বেনামীতে মাসে মাসে ছাপা যাবে।

“তা হলে, এখন পালাবার উপায় কি?”

“উপায় বলে দিচ্ছি।”—বলিয়া অবিনাশ টাইম্-টেবেল বাহির করিল। লণ্ঠনটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ ঝুঁকিয়া টাইম্-টেবেলের পাতা উল্টাইয়া বলিল—“আচ্ছা, ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে পৌনে দশটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার ছাড়বে; সেখানা সিটি ষ্টেশনে দশটা তিন মিনিটে পৌঁছিবে, উনিশ মিনিটে ছাড়বে। সিটিতে গিয়া আপনি সেই গাড়ী ধরুন। তুণ্ডুলায় রাত্রি এগারোটায় পৌঁছবেন। সেখান থেকে বারোটার সময় পশ্চিম যাবার এক এক্সপ্রেস আছে। তাতে চড়ে লম্বা দিন।”

"তার পর, কাল সকালবেলা পুলিস এলে তোমায় ত জিজ্ঞাসা করবে! তুমি কি বলবে?"

"বলব—আপনি কলকাতা চলে গেছেন। ওরা বড় বড় ষ্টেশনে আপনাকে ধরবার জন্যে টেলিগ্রাফ্ করে দেবে এখন। মরুক বেটারা খুঁজে!"

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম সাড়ে নয়টা। বলিলাম—"আর ত দেরী করলে চলবে না। বেরুন যাক্ তা হলে।"—বলিয়া, আমি একটি ছোট ব্যাগে অত্যাবশ্যক দুই চারিটি জিনিস লইলাম—টাকাকড়ি কোমরে বাঁধিয়া লইলাম। বলিলাম—"তুমি জামা গায়ে দাও। আমায় তুলে দিয়ে আস্‌বে চল।"

অবিনাশ বলিল—"আমাকেও যেতে হবে?"

কাতরস্বরে বলিলাম—"তুমি না সঙ্গে থাক্‌লে আমি যে হাত পায়ে বল পাইনে অবিনাশ!"

অবিনাশ প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাকে বলিলাম—"অবিনাশ, তুমি আমার ছেলে নও—কিন্তু আমার ছেলেরই মতন। তোমার উপর আমার সংসার—আমার ব্যবসা—সবই ভারই রইল। দেখো, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা যেন কোনও কষ্ট পায় না অবিনাশ!"

অবিনাশ সজলনেত্রে বলিল—"আমাকে আর অত করে বলতে হবে না। আমায় পায়ের ধুলো দিন।"—বলিয়া সে আমার পদযুগল স্পর্শ করিল। আমার চক্ষু দিয়া আবার দর দর ধারায় অশ্রু বহিল।

প্রস্তুত হইয়া দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—"ওহে, আমরা যে বেরুব, হোটেলওয়ালা বেটার সন্দেহ হবে না ত? আমরা পালাচ্ছি ভেবে ও যদি তাকে খবর দেয়?"

অবিনাশ বলিল—"সন্দেহ যাতে না হয়, তার উপায় আমি করছি। ব্যাগটা আমার হাতে দিন"—বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। হোটেলওয়ালাকে ডাকিয়া হিন্দীতে বলিল—"ওহে, ক্ষুধায় যে নাড়ী চোঁ চোঁ করিতেছে। এই ব্যাগটায় ভরিয়া কিছু লুচীটুচী কিনিয়া আনিব ভাবিতেছি—তা এত রাত্রে খাবারের দোকান খোলা পাওয়া যাইবে কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল—"হাঁ বাবু—পাইবেন বৈ কি।"

"আচ্ছা, যাই দু জনে গিয়া খাবার কিনিয়া আনি। তোমাদের দরজা কখন বন্ধ হয়?"

"রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে কোনও যাত্রী আসে কি না দেখিয়া তবে আমরা দরজা বন্ধ করি।"

"আচ্ছা—তার অনেক আগেই আমরা আসিব। দেখিও বাপু—আমরা ফিরিবার পূর্ব্বে যেন দরজাটি বন্ধ করিয়া দিও না। বিদেশ বিভুঁই—বিঘোরে যেন মারা না যাই।"

"না বাবু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এগারোটার আগে দরজা বন্ধ হইবে না।"

বাহির হইয়া, মোড়ে পৌঁছিয়া, এক্কা ভাড়া করিয়া সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিতেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ বলিল—"ভয় নেই, ষোল মিনিট থামে।"

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীটা একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। আমি অগ্রে, অবিনাশ পশ্চাতে সেই দিকে পদচালনা করিলাম। কাছাকাছি গিয়া দেখি, লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া, সেই ভীষণ মূর্ত্তি! সে আমাদের দিকে কটমট করিয়া একবার চাহিয়া, নিমেষের মধ্যে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"মাফ্ করবেন—আপনিই কি মনতোষ বাবু?"

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমায় ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছে। ভাবিলাম—পাছে পালাই—তাই ট্রেণের সময়েও প্লাটফর্ম্মে পাহারা দিতেছে।

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অবিনাশ অদৃশ্য। হায়, এই নরাধমকে আমি স্ত্রী পুত্র কন্যার ভার অর্পণ করিয়াছিলাম!

আমার ভাব দেখিয়া লোকটা পুনর্ব্বার বলিল—"আপনিই কি মনতোষ বাবু—আর্য্যশক্তির সম্পাদক?"

আমি তাহার মুখের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ।"—আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল—দেহ অবশ হইয়া আসিল।

তাহার পর লোকটি কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখিয়া, সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম—ওয়েটিং-রুমের টেবিলের উপর শুইয়া রহিয়াছি, আমার দেহ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। এক দিকে অবিনাশ—অপর দিকে সেই লোকটি—দাঁড়াইয়া আমায় পাখা করিতেছে। অদূরে—ঔষধের বাক্স খুলিয়া এক ডাক্তার বসিয়া আছে।

আমি চক্ষু খুলিতেই অবিনাশ বলিল—"কেমন বোধ হচ্ছে মনতোষ বাবু? সেই কালেই আমি বলেছিলাম—আপনার শরীর দুর্ব্বল—আজ

রাত্রে ট্রেণে উঠে কাজ নেই।—ভাগ্যিস্ আমাদের অনাদি বাবু ছিলেন—আমাদের আর্য্যশক্তির লেখক অনাদি বাবু—আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন—উনি ধরে ফেল্লেন—নইলে আপনার ভারি আঘাত লাগত।"

আমার মাথা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। ক্ষীণস্বরে বলিলাম—"কোথা অনাদি বাবু?"

"এই যে ইনি"—বলিয়া অবিনাশ তাঁহাকেই দেখাইয়া দিল—যাঁহাকে আমরা ডিটেক্‌টিব বলিয়া সারাদিন ভ্রম করিয়াছিলাম।

এইটুকু বুঝিতে পারিলাম —ভয়ের কোনও কারণ আর নাই। আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

অনাদি বাবু আমার আর্য্যশক্তির এক জন প্রধান লেখক—ঢাকায় ওকালতী করেন—কিন্তু চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ কখনও হয় নাই। ইনিও ছুটীতে পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের আপিসে গিয়া ম্যানেজারের নিকট শুইয়াছিলেন - আমি অমুক তারিখ হইতে অমুক তারিখ পর্য্যন্ত আগরায় তোতারামের হোটেলে থাকিব। তাজে ও এৎমাদে আমাকে দেখিয়া, আমিই যে মনতোষ বাবু, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল; কারণ, আমার উপহৃত একখানি ফোটোগ্রাফ তাঁহার গৃহে আছে। তথাপি সঙ্কোচবশতঃ আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। পরে তোতারামের হোটেলে গিয়া খাতায় আমার নাম ধাম দেখিয়া তিনি কৃতনিশ্চয় হন। আমি নিদ্রিত ছিলাম বলিয়াই আমায় জাগাইতে নিষেধ করেন। পরদিন হোটেলে আসিয়া আমায় একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিবেন,এই উদ্দেশ্যে তাঁহার কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে হোটেলওয়ালাকে বারণ করিয়াছিলেন। পুলিস আপিসের হেডকেরাণী গঙ্গাধর বাবু তাঁহার মাতুল—তাঁহারই বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন। ক্যাণ্টনমেণ্টে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল—নিমন্ত্রণ খাইয়া সেই ট্রেণেই ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলের বাসা সিটি ষ্টেশনের সন্নিকটেই।

শেষবার একবার অবিনাশের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সে আমায় খুব বাঁচাইয়া দিয়াছে—অনাদি বাবু কোনও কথা জানিতে পারেন নাই।

অনাদি বাবুকে লইয়া বড়ই আনন্দে আগারায় কয়েকদিন যাপন করা গেল। তাঁহার মাতুলের সুপারিশে ফোর্ট দেখিবারও পাস পাওয়া গেল। আগ্রা হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন, তথা হইতে দিল্লী দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নব্য-সাহিত্যিক।

[Henri Lavedanর ফরাসি হইতে।]

দীনেশ—বয়স পঁচিশ। পরেশ—বয়স আটাশ। স্থান—দীনেশের গৃহ। কাল—সন্ধ্যা।

দীনেশ টেবিলের সুমুখে চেয়ারে আসীন।—সুমুখে একতাড়া কাগজ। পাশে একটি ল্যাম্প।

পরেশের প্রবেশ।

পরেশ। ও কি! এখনও ঐ লেখা নিয়েই রয়েছ। সকাল সন্ধ্যে তোমার কি ঐ একই কাজ?

দীনেশ। চব্বিশ ঘণ্টা।

পরেশ। ও একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। শেষটা এলে যাবে।

দীনেশ। সে সম্ভাবনা নেই।

পরেশ। কি রচনা কর্‌ছ—বল দেখি?

দীনেশ। সেই লেখা, যে লেখা আমার জীবনের একমাত্র কায—মহাব্রত!

পরেশ। যার বিষয় শুধু শুনেই আস্‌ছি, কিন্তু দেখতে পাইনে।

দীনেশ। হাঁ তাই।

পরেশ। লেখাটা এগচ্ছে ত?

দীনেশ। না।

পরেশ। ওটা ত অনেকদিন তোমার হাতে আছে। আর কতকাল?

দীনেশ। জৈনধর্ম্মের শেষ কথা হচ্ছে—"স্যাং"। ছ মাসও হতে পারে, বিশ বছরও হতে পারে।

পরেশ। বল কি?

দীনেশ। যা বলছি, তাই।

পরেশ। কি মুস্কিল! একটু হাত চালিয়ে নেও না কেন! লোকে তোমার লেখার জন্য কত প্রত্যাশা করে রয়েছে। তোমার হাতের যা হোক্ একটা কিছু চায়। তাদের বেশী দিন শুধু আশার উপর রাখা ঠিক নয়।

দীনেশ। প্রতীক্ষা করার অর্থ হচ্ছে অপেক্ষা করে থাকা।

পরেশ। অবশ্য তুমি যে দরের লেখক, তাতে তাদের অপেক্ষা করে থাকাতে কোনও লোকসান নেই। তবুও কি জান, তুমি যে খেলা খেলছ, তাতে বিপদ আছে।

দীনেশ। জুয়ো? ঐ খেলাই ভালবাসি।

পরেশ। অবশ্য তোমার কথা তুমি ভাল বোঝ। বলি, তোমার শেষ লেখাটা কতদিন হল বেরিয়েছে?

দীনেশ। ১৯০৮।

পরেশ। পাঁচ বছর?

দীনেশ। "নবগুচ্ছ।"

পরেশ। হাঁ. আমার মনে পড়ে গেছে। অদ্ভুত লেখা। একদম প্রথম শ্রেণীর। সমগ্র প্রবন্ধটি একটি ছোট ছেলের মুঠোর ভিতর ধরে। দু খানি মাত্র পাতা, আর এক একটি পাতায় বিশটি করে ছত্র।

দীনেশ। সাহিত্যের মূল্য ওজনদর নয়।

পরেশ। তা ত নিশ্চয়ই। ও লেখাটা সাহিত্যসমাজে মহা তোলপাড় ঘটিয়েছিল। সে যাই হোক্, তোমার 'নবগুচ্ছ' যে নূতন গোছের হয়েছিল তার আর সন্দেহ নেই।

দীনেশ। আমার বিশ্বাসও তাই। ওতেই "গুঞ্জামালা" পত্রিকার কপাল ফিরে গেল। বাজে গ্রাহকেরা সব কাগজ ছেড়ে দিলে, অবশিষ্ট রয়ে গেল—শুধু সমজদার লোক যারা আর্ট বোঝে।

পরেশ। অর্থাৎ "গুঞ্জামালা" এখন জাত পেয়েছে।

দীনেশ। সে শুধু আমার প্রসাদে। আমার লেখাই বাজে পাঠকদের ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়েছে।

পরেশ। এখন যখন স্ব-শ্রেণীর পাঠকের সম্পর্কে এসেছ—তখন তোমার তেড়ে লেখা দরকার।

দীনেশ। ও কথা তোমাদের বলা সহজ। তোমার মত লেখা—গোবদা—ভারি—ঝুলে—পড়া।

পরেশ। বড় বেশী?

দীনেশ। খুব বেশী নয় তবুও বেশ ভারি। আমি তোমার "মৃগাঙ্কলেখার—প্রসূন-কলিকা" পড়েছি।

পরেশ। তার পর।

দীনেশ। হয়েছে এক রকম। অসংখ্য ত্রুটির গুণেই বইখানি অপূর্ব্ব। আসল কথা, জিনিসটে ভিতরে কাঁচা। আমি চাই পাক্‌তে।

পরেশ। পাক্‌তে ত তুমি অনেক দিন হল সুরু করেছ। ঐই বেলা সাব-

ধান হ'য়ো। নইলে ফলের মত বেশী পাকতে গিয়ে, শেষটা পচে না ওঠ।

দীনেশ। সে ভয় আমার নেই।

পরেশ। আচ্ছা ও কথা থাক্। এখন বলো ত কি লিখছো? খাপ্পা হয়ো না। এই যে! টেবিলের উপর একটি প্রকাণ্ড খাতা দেখছি। এই টে?

দীনেশ। হাঁ।

পরেশ। দেখতে পারি?

দীনেশ। যদি ইচ্ছে কর ত—

পরেশ। দেখছি, আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে। (খাতাখানি তুলিয়া লইয়া) এখন বুঝেছি—(আহ্লাদ সহকারে খাতাখানি খুলিয়া) তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ? এত শুধু সাদা পাতা।

দীনেশ। এই আমার বই, অর্থাৎ যখন লেখা হবে তখন হবে। কবে? ও ত নেহাৎ বাজে প্রশ্ন।

পরেশ। রসিকতা করছ—না সত্যসত্যই!

দীনেশ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। পাতাগুলি সব গুনে গেঁথে রেখেছি। আমার বইয়ে এর চেয়ে এক পাতা বেশীও হবে না—কমও হবে না। যখন পাতা পাওয়া গেছে তখন ফলের আর দেরি কি?

পরেশ। কতগুলি?

দীনেশ। একশ নিরনব্বই। ছাপার ছশ পাতা হবে।

পরেশ। এদিকে বইয়ের নাম লেখা শেষ হতে না হতে, ওদিকে তোমার শেষ হয়ে আস্‌বে।

দীনেশ। ক্ষতি কি? যদি নামের আধখানাও সুন্দর হয়।

পরেশ। শুনতে পাই তোমার পয়সা আছে।

দীনেশ। ওকে আর পয়সা বলে না।—বাবা কিঞ্চিৎ জলপানি দিয়ে গেছেন।

পরেশ। যা হোক তাঁর দুরদর্শিতা ছিল। তা না হলে তোমাকেও আর পাঁচ জন বাজেমার্কা লেখকের মত ভারি লেখা লিখতে হত।

দীনেশ। প্রাণ গেলেও নয়। ও আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি আর্টিষ্ট। চিন্তা ভাষাগত হলেই রসাতলে যায়। প্রকৃত প্রতিভা প্রকৃতিস্থ,

স্ব-স্থ, আপনাতে আপনি ব্যাপৃত। প্রতিভার প্রকাশ করার অর্থ তাকে গোপন করা। নিজের হাতে কিছু গড়ার মানে হচ্চে—পরের হাতে গিয়ে পড়া, সমালোচকদের প্রশ্রয় দেওয়া। যতক্ষণ আমরা পরের বিচারাধীন নই, ততক্ষণই আমরা স্বাধীন।

পরেশ। তার আর সন্দেহ কি? অবশ্য এ ভাবেও জিনিসটে দেখা যেতে পারে। এরি নাম নীরব কবিত্ব।

দীনেশ। কথাও তাই। মুখ? খোলবার দরকার কি? যতক্ষণ আমরা কথা না কই, ততক্ষণই আমরা পরের কাছে গ্রাহ্য।

পরেশ। অন্ততঃ কেউ প্রতিবাদ করে না।

দীনেশ। সমাজকে দেও আশা, শেখাও ধৈর্য্য,—সমাজ আর কিছু চায় না।

পরেশ। ত

দীনেশ। না।

পরেশ। মাপ করো; লোকে তোমার বিষয় কি বলে জান? সকলে দুঃখ করে যে, তুমি পাঁচ বৎসরের ভিতর আর কিছু লিখলে না।

দীনেশ। কি বল্লে—লোকে দুঃখ করে? ও ত সুখের কথা। ও ত আমাদের মনের শোবার মখমলের বিছানা।

পরেশ। শেষে সকলে বল্‌বে, তোমার লেখবার ক্ষমতা চলে গেছে।

দীনেশ। (অবাক হইয়া) আমি? আমি অক্ষম? আমি?—

পরেশ। হাঁ গো হাঁ, তুমি।

দীনেশ। (ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া) যাও।

পরেশ। ইতিমধ্যেই লোকে বল্‌তে আরম্ভ করেছে। যদি 'সত্যি কথা শুন্‌তে চাও—

দীনেশ। (মহাক্রুদ্ধভাবে) আমি!!

পরেশ। সকলেই বলছে......

দীনেশ। নিজের কাণে শুনেছ—এত বড় সাহস।...হাসির কথা বটে ......আমি দীনেশ বোস, অক্ষ......না...ধৈর্য্য ধরে থাকা কঠিন।

পরেশ। অবশ্য কথাটা খোস খবর নয়। কিন্তু উপায় কি?

দীনেশ। অ্যাঁ! এই কলকাতায়, এই বঙ্গদেশে লোকে বলে কি না,—আমার শেষ হয়ে গেছে—আমার ভিতর আর কিছু নেই—সব খালি—সব ফুরিয়ে গেছে—

পরেশ। না, "ফুরিয়েছে", এ কথা কেউ বলে না। "নবগুচ্ছ" পদার্থটি এতই যৎসামান্য যে ওতেই যে সব ফুরিয়ে—

দীনেশ। (চীৎকার করিয়া) কি রকম? যৎসামান্য? মূর্খ! ভাল করে সেটা পড়েছ?

পরেশ। এক বার পড়েছি—আবার পড়েছি।

দীনেশ। তা হলে তার এক বর্ণও বোঝো নি।

পরেশ। ভাই মাপ করো। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে আসি নি। পাঁচ জনে যা বলে, তোমারি ভালর জন্যে, সেই কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। শুনে যা খুসী তাই করো।—

দীনেশ। যত বেটা গাধা—গরু—হাতি!

পরেশ। (উত্থান করিয়া) আজ তবে আসি। আমি চেঁচামেচি ভাল বাসিনে। ওতে আমার মাথার ঠিক থাকে না।

দীনেশ। না একটু থাকো। এরা কিনা বলে—আমি খালি হয়ে গেছি! আচ্ছা দেখিয়ে দেব যে—

পরেশ। কি করে?

দীনেশ। আমার হাত থেকে যে কি বেরুবে, তা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

পরেশ। কি বল্‌তে চাও একটু খুলে বল।

দীনেশ। এই মাস যেতে না যেতেই—

পরেশ। সত্যি? আমাকে ত মিছে আশা দিয়ে ভোলাচ্ছ না?

দীনেশ। আমি এবারে একখানি আস্ত বই তাদের মুখে ঠেসে পুরে গিলিয়ে দেব—এবং সকলে হাঁ হয়ে থাক্‌বে।

পরেশ। বাহবা কি বাহবা! শোভানাল্লা!

দীনেশ। আর এতেই তারা—আবার অনেক দিন ঠাণ্ডা থাক্‌বে।

পরেশ। আঃ! এতদিনে একটা কাজের মত কাজ করেছ। এইবার যত বাজে লোকের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। আর যত পোকায় খাওয়া বাতিল সমালোচকের দল—

দীনেশ। ওই গুলোই ত যত অক্ষম, অকর্ম্মণ্য—ভুয়ো—খোসা।

পরেশ। বাঃ বেশ বলছ, বলে যাও। তোমার মুখে এখন সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েছে। এই ত চাই। একখানা পুরো বই লেখা হয়ে গেছে—আর আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে?

দীনেশ। তাই।

পরেশ। শেষ করেছ ত ?

দীনেশ। ক থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত।

পরেশ। আর এ কথা আমাকে এতদিন বলো নি। বাহাদুরী আছে।

দীনেশ। এখন ত টের পেলে।

পরেশ। ভাল! বইখানি কি ?

দীনেশ। দেখাচ্ছি।

পরেশ। বড় ?

দীনেশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ।

পরেশ। কত পাতা ?

দীনেশ। কুড়ি।

পরেশ। অঁ্যা—না—ও হরি! বল কি ?

দীনেশ। আঃ কি কষ্ট, কি পরিশ্রম! এ হচ্ছে মস্তিষ্ক-চোঁয়ানো একটি ফোটা। এর বেশী আর কিছু বলবার নেই।

পরেশ। হ্যাঁ! তা অবশ্য। তবে এর জন্য পাঁচটি বৎসর মাথা খাটিয়েছ ?

দীনেশ। পাঁচের চাইতেও ঢের বেশী। এ হচ্ছে আমার হৃদয়ের রক্ত, আমার বুকের পাঁজর—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। কি ?

পরেশ। না কিছু নয়! হে ভগবান্! সে যাক! ব্যাপারটি কি ? আমি একটু অভিভূত হয়ে পড়্‌ছি।

দীনেশ। ব্যাপার হচ্ছে,—আমি পরে যে সব বই লিখিব, তার ক্যাটালগ্।

পরেশ। (অবাক হইয়া) অঁ্যা!

দীনেশ। আমার ক্রমশঃপ্রকাশ্য গ্রন্থাবলীর নামের তালিকা। বুঝতে পেরেছ ? বিশ পাতা মাত্র। এই বিশ পাতায় আমার সমস্ত ভবিষ্যতের ইতিহাস রয়েছে। উপন্যাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, নাটক। আমি যা লিখব, মহাভারত তার অর্দ্ধেকও নয়। এর পর কে বল্‌তে সাহস করবে যে, আমার প্রতিভা নপুংসক—যে আমার ক্ষমতার শেষ—

পরেশ। না—না—না। লোকে কোন কথাই বল্‌বে না।

দীনেশ। কুড়ি পাতা! এক বার বইয়ের নামগুলি শোনো,—"কলকণ্ঠী"—কাব্য। "একটি চোখ"—নাটক।

পরেশ। চমৎকার!

দীনেশ। "কথা-কণিকা", "প্রলয়ের অট্টহাস্য"।

পরেশ। আমি এখন থেকেই তা দেখতে পাচ্ছি।

দীনেশ। "বিজ্ঞানের বস্ত্রহরণ", "দীপচত্বারিংশৎ"।

পরেশ। বাঃ বাঃ বাঃ!

দীনেশ। "কন্থা-পন্থা"। "কাঠের পোকা"। "চীনেমাটীর হৃদয়"।

পরেশ। একটু থামো। "কাঠের পোকাটি" আমাকে উৎসর্গ কর্‌তে হবে।

দীনেশ। সে আর কি বেশী কথা! আমি এখনই সেটি তোমাকে উৎসর্গ করে দিলুম।—"নখরাজী", "ভগবানের বালিশতা"।

পরেশ। বাহবা কি বাহবা! আর বাকি—কি? এ সব ত হয়েই গেছে! ডিম ত সব তৈরি—এখন বাকি রইল শুধু কাগজের উপর পাড়া।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর।

মা যেমন সন্তানের সুখসম্ভোগ ও পুষ্টিসাধনের জন্য, তাঁহার দুধ মথিয়া ননীটুকু ছাঁকিয়া তোলেন, প্রকৃতি রাণীও তেমনি করিয়া যুগে যুগে কালপীযুষরাশি মন্থন করিয়া একটী কবি বা একটী কলাবিৎ জনসমাজকে উপহার দিয়া থাকেন; সেই ভাগ্যবান পুরুষ হৃদয়ের কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ প্রেম লইয়া জনসমাজের মধ্য দিয়া শান্তসলিলময় প্রশান্ত নদের মত তর তর বেগে বহিয়া যান; সন্তাপিত নরনারী চারিদিক হইতে আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসিয়া সেই প্রেমস্রোতে অবগাহন করে, অঞ্জলী পুরিয়া সুধা পান করিয়া হৃদয় সুশীতল করে।

মানবের যুগযুগান্তরের সাধনা, হাসি কান্না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চোখের জল কবি বা কলাবিদের হস্তে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকে। তাঁহার মোহন বাঁশী সমাজ-দেহের হৃদিকন্দর কাঁপাইয়া যখন বাজিয়া উঠে, তখন দিগন্তর হইতে সাগর-অন্বেষণকারী নির্ঝরের মত, অসংখ্য নরনারী হৃদয়ের দুঃখ-পসরা মাথায় বহিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে সেই মধুর রবের দিকে ধাবমান হয়।

জনসমাজের বহু পুণ্যের ফলে যথার্থ কবি, ভাস্কর বা চিত্রবিৎ বহুর এক এবং একের বহুরূপে আসিয়া ধরাতলে দেখা দেন। মানবের ইতিহাস এই সত্যের নিশান উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে। কত যুগ আসিল এবং গত হইল; কত হস্তিনা, কত কার্থেজ, কত রোম ও কত দিল্লী এই মহাকালসাগরে বুদ্বুদের মত জন্মগ্রহণ করিল—আবার নিমেষে মিলাইয়া গেল,কিন্তু যে কয় জন প্রেমিক-প্রাণ মহাপুরুষ এই সাগরের তীরে বসিয়া,—আমাদিগকে ওপারে লইয়া যাইবার জন্য তরী নির্ম্মাণ করিলেন,আমাদের কল্যাণার্থ অর্ঘ্যজবা ভক্তি-ভরে সাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেন,-- সেই মহাপুরুষদের জনসমাজ ভুলিতে পারিল কই?—

কৃতি ভাস্কর তিনিই, যিনি তাঁহার সমাজের সাধনাকে ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এক দিকে যেমন জাতির অতীত গৌরব, বর্ত্তমানের সুখ,সুবিধা,আশা ও আনন্দ তাঁহার কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া অন্তঃ-সলিলরূপে প্রবাহিত হইয়া জাতিকে নব-প্রাণে ও প্রেরণায় মাতাইয়া তোলে, তেমনি অপর পক্ষে তাঁহার কঠোর নির্ম্মল বিচার-বুদ্ধি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া জাতির অতীত ও বর্ত্তমানের সকল কলঙ্কের কাহিনীকে অনুতাপের অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া সমাজকে নির্ম্মল করিয়া লয়। এই স্থলেই কবি-ভাস্করের সকল প্রতিভা ও সকল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণকল্পে যে প্রতিভা নিত্য-প্রয়োজনীয়, মঁশীয়ের রোঁদাতে তাহা বর্ত্তমান,—তাই তিনি আজ তাঁহার নিজের দেশ ফ্রান্সে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল মানবজাতির বন্ধু বলিয়া আজ সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত। মানবের আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া যিনি সমাজে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেন, কিংবা মানবের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যিনি বিশ্বকে চোখের জলে ভাসাইয়া কর্ম্মী করিয়া তোলেন, সেই ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীর যে কোনও সমাজেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন, পৃথিবীর যে কোণেই বিরাজ করুন না কেন, তিনিই মানবের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু।

তিনিই সমাজ বা জাতিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারেন। ইয়োরোপে এই শ্রেণীর মনস্বী, মানবের সমুদয় চিন্তা-ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হইয়া ইয়োরোপকে আজ এই গৌরবময় স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর মানুষ যখন যথেষ্ট পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা

বড় ছিলাম।—আজকাল সে রকম বাঁশীর সুর আর শুনিতে পাওয়া যায় না তাই আমরা দীন, ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছি।

আমরা এখন একে একে এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত, বোঁদার সৃষ্ট ভাস্কর্য্যাবলীর চিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১ম চিত্র—Age of the Aryans—আর্য্য-যুগ। এই ভাস্কর্য্যে বোঁদা আমাদের পিতামহ আর্য্যদের সরল ও তথাকথিত অবিকশিত মানসিক অবস্থা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কি যেন মনে করিতে যাইতেছিল কিন্তু মনে পড়িতেছিল না,—তাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিবিষ্টমনে মাথায় হাত দিয়া সে বিষয় স্মরণে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে যে শিশু-সুলভ সরল সৌন্দর্য্যও স্বভাবের একটী স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের অবতারণা করা হইয়াছে—তাহা যে স্বর্ণযুগে সামবেদ রচিত হইয়াছিল--সে মধুময় যুগেই সম্ভবে। একদিন যাঁহারা এই মহা অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে দর্শন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে গাহিয়াছিলেন, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং তমসঃ পরাস্তাৎ"—সেই জ্যোতির্ম্ময়দের পুত্র হইয়া আমরা আজ আঁধারে ফিরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছি কেন?—মনস্বী বোঁদা এই মূর্ত্তির ভিতর দিয়া আজ যেন আমাদিগকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

২য় চিত্র—"চুম্বন"। এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই ভাস্কর্য্যের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পুরুষ-প্রকৃতির লীলারস-রঙ্গের কাহিনীর গভীরতা সম্বন্ধে এই ভাস্কর্য্য ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর নিকট কি অভিনবত্ব প্রকাশ করিবে? যে দেশের হাওয়ায় গীতগোবিন্দের উৎপত্তি, সেই দেশের মানুষকে পুরুষ-প্রকৃতির অনন্ত প্রেম-লীলার মধুরিমা বুঝাইতে যাওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র।

বোঁদা তাঁহার এই অমর সৃষ্টিতে মাধুর্য্য রসটী বড় গভীর ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এ চুম্বন বড় নিগূঢ় রস-সম্ভোগ; দেহ, মন, প্রাণ যখন এক হইয়া যাইতে চায়, যখন নয়নে নয়ন, হৃদয়ে হৃদয়, পরাণে পরাণ মিলিত হয়, এ সেই যোগ, এ সেই চুম্বন।

৩য় চিত্র—সেণ্ট্ জন দি বাপ্টীষ্ট্। এই মূর্ত্তিতে যোগী জন্এর মানব-প্রেম পূর্ণমাত্রায় প্রকাশমান। সেণ্টজন্ খৃষ্টের পূর্ব্বগামী এবং সমসাময়িক। খৃষ্টকে তিনিই দীক্ষিত করেন। কথিত আছে, য়িহুদি সমাজ যখন দুরাচারে ও পাপভারে অবনত, যখন অমানুষিক অত্যাচার, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সমা-

মহিষ মর্দ্দিনী।

Mohila Press, Calcutta

জকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া দুর্ব্বিসহ যাতনার আগার করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সাধু জন্ যিশুর আগমনবার্ত্তা বহন করিয়া য়িহুদি-সমাজে অবতীর্ণ হন। তিনি অনাচারী মানবকে আশার বাণী শুনাইয়া বেড়াইতেছেন—এই ভাবটি ব্যক্ত করাই সম্ভবতঃ ভাস্করের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন।—সাধুর মুখে আপনাহারা প্রেমের শান্তভাব কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৪র্থ চিত্র—Thoughts—আত্ম-চিন্তা।—এই নামকরণ ঠিক ভাবটি প্রকাশ করে না, অথচ বাঙ্গালা ভাষায় 'সমাধি' বলিলে যাহা বুঝায়, ভাস্করের উদ্দেশ্য ততটা গভীর কি না বলা কঠিন। আত্ম-চিন্তা একটু গভীর অবস্থা লাভ করিলে যাহা বুঝায়,তাহাই ব্যক্ত করা সম্ভবতঃ ভাস্করের উদ্দেশ্য। বিচিত্র সংসারের বিচিত্র কর্ম্মকোলাহলে কেন্দ্রীভূত মূল-কারণে আত্ম-নিবেশ করা—যাহাকে আমরা কর্ম্মযোগ বলিয়া জানি, তাহাই বোধ হয় বোঁদা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন। মুখের শান্ত ভাব ও সমাধিস্থ স্থির প্রকৃতি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

৫ম চিত্র—Hand of God—বিধাতার হাত। মহাকবি ভাস্কর তাঁহার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে গভীর ও জ্বলন্ত অন্তর্দ্দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বিধাতাকে আমরা চিনিতে পারি আর না পারি, সেই প্রেমপূর্ণ অন্তর্বন্ধন অতিক্রম করিবার সাধ্য আমাদের নাই।—আমাদের দুঃখও যাতনা, সুখ ও প্রীতি, সকলের ভার মাথায় বহিয়া তাঁহার ভুজবন্ধনেই আমাদের মাথা রাখিবার স্থান খুঁজিয়া লইতে হয়। তাঁহার ঐ মঙ্গল ও প্রেমের "হাত দুখানির মাঝখানে যে বুক সে বুকেই" আমাদের চির-আশ্রয়। বেদ ও পুরাণ, বাইবেল ও কোরাণ অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের চোখে যে জ্ঞান ও প্রেমের অঞ্জন মাখাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে—সেই জাজ্বল্যমান অন্তর্দৃষ্টি বোঁদা কেমন অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! ইহাই ত প্রতিভা, ইহাই ত মানবপ্রেম;—মানবকে প্রেমের পথ যে দেখাইয়া দেয়, তাহার মত মানবের সুহৃদ আর কে আছে?

এই হাত যখন মানুষ দেখিতে পায়—নিশিদিন অবিশ্রান্তভাবে সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে চলিয়াও সেই হস্তের অঙ্গুলিনির্দ্দেশের প্রতি মানুষ যখন তাঁর দৃষ্টিকে সজাগ করিয়া রাখে, তখনই ত মানুষ অসাধ্যসাধনে সক্ষম হয়, নিজেকে পরম মঙ্গলে এবং জাতিকে মহাকল্যাণে ভূষিত করিয়া তোলে।

এই মনস্বী ভাস্করের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে পাঠককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। ভাস্করের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, তাঁহার নাম ধাম গোত্র সম্বন্ধে আলোচনা একটি প্রবন্ধে সম্ভবে না। তাহার প্রয়োজনও নাই। রোঁদার চরিত বাজারে বিক্রয় হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছা, কিনিয়া পাঠ করিতে পারেন। যে চিন্তাস্রোত এই ভাস্করের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছি। সময়ে প্রতীচ্যের এই প্রাণময় ভাস্কর্য্যের ধারা বঙ্গভাষায় আনয়ন করিব —হৃদয়ে এরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে। কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত—জীবন অতি সংকীর্ণ। আশার সাফল্য, আশার উদ্ভাবনকর্ত্তা যিনি, তাঁহারই কৃপা-সাপেক্ষ।

ভাস্কর্য্যের বৈজ্ঞানিক রীতি পদ্ধতি (Technicalities) সম্বন্ধে প্রাচ্যে ও ও প্রতীচ্যে রুচি-ভেদ আছে। সেই রুচিভেদ আমাদিগকে প্রকৃত গুণগ্রহণে অন্ধ না করিয়া ফেলে—সে বিষয়ে প্রত্যেক পাঠককেই সাবধান থাকিতে হইবে। আমাদের দেহের আকার, বর্ণগত পার্থক্য ও ভাস্কর্য্যের বাহিরের কার্য্যকরী রীতিপদ্ধতির প্রভেদ একই পদার্থ। মানুষের প্রাণ যেমন একই জিনিস—তেমনই ভাস্কর্য্যেরও অন্তর্নিহিত ভাব-স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সকল দেশ ও সকল সমাজের শিল্পের মধ্য দিয়াই সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। রোঁদা সাধু জনকে বস্ত্রহীন দেহে প্রদর্শিত করিয়াছেন—আমি হয় ত গৌরকে কৌপীনে সুশোভিত করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিব। জীবে দয়া ও নামে রুচি উভয়েই সমভাবে বর্ত্তমান, বাহিরের বস্ত্র তার কাছে কোন্ ছার। বঙ্গের নব যুগের এই নব সাধনার দিনে কি শিল্প, কি কাব্য, কি ভাস্কর্য্য, এ সকলের বাহিরের কৃত্রিমতার পার্থক্য যাহাতে আমাদের হৃদয়ের গুণগ্রাহিতাকে কুহেলিকাচ্ছন্ন না করিয়া ফেলে—এই জন্যই এ স্থলে দুই একটি কথার অবতারণা করিলাম।

রোঁদার প্রতিভা অনন্তমুখী; একটি প্রবন্ধে তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা বঙ্গে এই সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। কত জন আসিবে, কত জন সে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদিগকে অফুরন্ত কাব্যশিল্পে ধনী করিয়া তুলিবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মন্।

গ্রন্থ-পরিচয়।

বাঙ্গালার বেগম। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌ হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে যাঁহাদের লীলালহরী নানা বর্ণে চিত্রিত আছে, যাঁহারা সেই শতাব্দীর রাজনীতিক ব্যাপারের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলেন, যাঁহাদের অপূর্ব্ব কাহিনী আজিও লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকে, সেই মহীয়সী মহিলাদিগের চরিত্র চিত্রিত করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নিকট তাঁহার সুখপাঠ্য গ্রন্থ 'বাঙ্গালার বেগম'কে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'বাঙ্গালার বেগম' বলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা বা মুর্শিদাবাদের বেগমবৃন্দকেই বুঝিতে হইবে; কারণ, ব্রজেন্দ্রনাথ মুর্শিদাবাদের বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার বেগমদিগের বিষয়ই তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার কথা বলিতে হইলে মুর্শিদাবাদের কথাই বলিতে হয়। কারণ "The history of Mursidabad city is the history of Bengal during the eighteenth century". অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থের 'বাঙ্গালার বেগম' নামকরণ অযৌক্তিক হয় নাই। তবে "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার বেগম" হইলে আরও সুস্পষ্ট হইত; কিন্তু অন্যান্য শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে বেগমচরিত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার বেগমদিগের বিবরণ হইলেও, অনায়াসে গ্রন্থের নাম 'বাঙ্গালার বেগম' রাখা যাইতে পারে।

গ্রন্থকার প্রথমে লুৎফউন্নিসার চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা বেগম ছিলেন। তিনি ক্রীতদাসীরূপে আলিবর্দ্দীর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, পরে সিরাজউদ্দৌলার বেগম হইয়া উঠেন। সিরাজউদ্দৌলার বিবাহিতা পত্নীর নাম ওমদাৎউন্নিসা। ইনি ইরাজ খাঁর কন্যা। কেহ কেহ লুৎফউন্নিসাকে ওমদাৎউন্নিসা বলিতে চাহেন। ওমদাৎ-উন্নিসা যে লুৎফউন্নিসা নহেন, এবং তিনিই যে ইংরাজ খাঁর কন্যা, তাহার বিশেষরূপ প্রমাণ আছে। সিরাজের আরও দুই একটি বেগমের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লুৎফউন্নিসা তাঁহার ভালবাসার পাত্রী ছিলেন। লুৎফউন্নিসাও সিরাজের পদে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে লুৎফউন্নিসার সিরাজের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার হৃদয় কোমলতা ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। লুৎফউন্নিসার চরিত্র যদিও পূর্ব্বে কোনও কোনও গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার আনুপূর্ব্বিক জীবন-চরিত ও অপূর্ব্ব চরিত্র বিশেষরূপে চিত্রিত করিয়া ইতিহাসানুরাগ ও চরিত্রচিত্রণ-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'আমিনা'। আমিনা সিরাজউদ্দৌলার মাতা ও আলিবর্দ্দী খাঁর কনিষ্ঠা কন্যা। আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র জৈনুদ্দীনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ আমিনা-চরিত্রে তাঁহার ঔদার্য্য, কারুণ্য প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধ আলিবর্দ্দী-বেগম। এই মহীয়সী মহিলার বিবরণ ইতিহাসের কোনও কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তিনি যে আলিবর্দ্দী খাঁর

দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার চরিত্রের আলোচনা হইলেও, ব্রজেন্দ্রনাথ, তাহা বিশদভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চতুর্থ প্রবন্ধ—মণি বেগম। মণি বেগম সামান্য নর্ত্তকী হইতে কিরূপে নবাব মীর-জাফরের বেগম হইয়া সিরাজউদ্দৌলার গুপ্ত ভাণ্ডারের ধনরত্ন লাভ করিয়া অবশেষে কোম্পানীর মাতৃস্বরূপিণী (মাদর-ই-কোম্পানী) হইয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পঞ্চম প্রবন্ধ 'ঘসিটি'। ঘসিটি বা মেহেরুন্নিসা আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদের পত্নী। ঘসিটির সহিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের অনেক সম্বন্ধ বিজড়িত আছে, তাঁহার উন্মাদয়িত্রী রূপলহরী ও রাজনীতিক কূটবুদ্ধি আলিবর্দ্দী খাঁর সংসারে ও রাজ্যে যে তুফানের সৃষ্টি করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ সে পরিচয়-প্রদানের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ প্রবন্ধ 'জিন্নতুন্নিসা'। জিন্নতুন্নিসা মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যা, সুজাউদ্দীনের পত্নী ও সরফরাজখাঁর মাতা। ইতিহাসে যতটুকু তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শেষ জীবন কিরূপে যাপন করিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার উল্লেখ করিতে পারেন নাই; ইতিহাসে তাহাও জানা যায়। জিন্নতুন্নিসার শেষ জীবন আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসিটির সংসারেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সংসারের কর্ত্রীস্বরূপাই ছিলেন। সরফরাজের শিশুপুত্র আগা বাবাকে অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তিনি নফিসা বেগম নামেও অভিহিতা হইয়াছেন।

দুই এক স্থলে সামান্য ত্রুটী থাকিলেও, তাঁহার গ্রন্থখানি যে বঙ্গসাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, তাহা বলা যাইতে পারে। শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ষষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য ।০ চারি আনা। গ্রন্থখানির ষষ্ঠ সংস্করণ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, পাঠকসমাজে ইহার যথেষ্ট আদর হইয়াছে। এরূপ সমাদৃত হইবার ইহা যোগ্যও বটে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ-সংখ্যা অগণিত,—আজিও তাহা সংগৃহীত হইতেছে। সেই সাগরবিশেষ উপদেশরাজি হইতে বাছা বাছা রত্নগুলি আহরণ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন। মানসিক ব্যাধিতে জনসমাজ জর্জ্জরিত। এই দুর্দ্দমনীয় ব্যাধির প্রশমনার্থ যত কিছু ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণের উপদেশামৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ বলিয়া মনে করি। অতএব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এই কল্যাণপ্রদ বহুমূল্য উপদেশ-গুলি মানবহৃদয়ের স্বাস্থ্যবিধানে যে সমর্থ হইবে, আমাদের এমন আশা আছে। গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, সকলে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে নিঃসঙ্কোচে ইহা পাঠ করিতে পারেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এরূপ উপাদেয় সামগ্রীর এমন সুলভ ও সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

মণিমালা। নাটক। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি. এ. প্রণীত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা। পুস্তকখানির মলাটের 'নাটক' কথাটি লেখা আছে বলিয়াই ইহাকে নাটক বলি-

তেছি; নতুবা গ্রন্থমধ্যে নাটকত্বের গন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। লেখক অবশ্য নাটক গড়িবার জন্য অনুষ্ঠানের ক্রটী করেন নাই। কথোপকথনে ইহা রচিত। ইহাতে ছন্দ আছে, সঙ্গীত আছে, স্বগত-উক্তি আছে, 'জলে ঝম্পপ্রদান' আছে, এমন কি, 'চুম্বনে লয়' পর্য্যন্ত আছে। তথাপি ইহা নাটক হয় নাই। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ের ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, যাহার সহায়তায় নাটকীয় কর্ম্ম-স্রোত অঙ্কে অঙ্কে হু হু করিয়া বহিয়া যায়, এবং নাট্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে,—সেই প্রাণ-বস্তরই এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ অভাব। রস-পরিচালন, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতির সহিত এ নাটকের (?) কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার অধিকাংশ গর্ভাঙ্কই অকারণ, অনাবশ্যক। কার্য্য-কারণ বলিয়া জগতে যে একটি নিয়ম আছে, তাহা ইহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহার পাত্রপাত্রীগুলি যে গর্ভাঙ্কে গর্ভাঙ্কে কেন দেখা দিতেছে, কেন অত আবোল তাবোল বকিতেছে, তাহা কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। আষাঢ়ে গল্পে যেমন কোনও কৈফিয়ৎ থাকে না, সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে কোনও ছেদ থাকে না, এ নাটকেরও (?) সেই দশা। ইহার নায়িকা মণিমালা কেমন করিয়া কোথা হইতে সোমদত্তের সহিত জুটিল, আবার বাসন্তীই বা কি উপায়ে সিংহলে শান্তনুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কান্যকুব্জে আসিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সাজিল,—এ সমস্ত ব্যাপার একেবারে কুহেলিকাচ্ছন্ন—অবোধ্য। গ্রন্থের আগাগোড়া যেন এক ভোজবাজী চলিতেছে। ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি আঁকিতে হয় বলিয়াই নাটক-মধ্যগত প্রত্যেক কথার বিশেষত উপযোগিতা থাকে। উপযোগিতার অর্থ এই যে, যে ভাবাবেশে যাহার যতটুকু বক্তব্য, সেই ভাবাবেশে তাহাকে ততটুকুই বলাইতে হয়। কিন্তু এ গ্রন্থে সে সমস্ত বিধি কিছু নাই। ইহার কথাবার্ত্তাগুলি অধিকাংশ স্থলেই 'গায়েপড়া' গোছের হইয়াছে। ইহার স্বগত উক্তি সকলও অত্যন্ত সুদীর্ঘ। সেই জন্য ইহার প্রায় সমস্ত চরিত্রই অস্বাভাবিক ও বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের মহারাজ, রাজকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া চীনদেশীয় বৌদ্ধপর্য্যটক থিয়েনসান ও ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেরই কথা কহিবার ভঙ্গী প্রায় একরূপ। প্রায় সকলেই আমাদের দেশের আধুনিক শিশুকবিদের মত অল্পবিস্তর কবি। তাহাদের কথাবার্ত্তায় 'হিম জোছনায় রজত প্রান্তরে কল-ভাষিণী নির্ঝরিণীর হিরণ্ময় স্রোত-রেখার অনুরাগ,' 'ঘুমন্ত বনচ্ছায়া সঞ্জীবনী' প্রভৃতি উৎকট কবিত্বের বাহার আছে। কেহ যে কবিত্ব-কণ্টক দলিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে, এমন আশা আদৌ নাই;—তবে লেখকের পক্ষে একটা আশ্বাসের কথা এই যে, বাঙ্গলার এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নজীর আছে, "ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই,—এ যে কেবল গন্ধ!'

সদ্ভাব-কুসুম। ৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা।—শিশুদিগের জন্য বঙ্গভাষায় প্রতিনিয়তই রাশি রাশি বহি বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহার অধি-কাংশই 'অপের, অদেয় ও অগ্রাহ্য'। বালক-বালিকাদিগের প্রকৃত পাঠোপযোগী গ্রন্থের এ দেশে একান্ত অসদ্ভাব। আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা স্বর্গীয় কবি সেই অভাবমোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু দুইখানি পুস্তক রচিত হইতে না হইতে নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে

আমাদিগের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই সম্ভাব-কুসুম উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অন্যতম। কবি ইহাতে গল্পচ্ছলে কতকগুলি নীতি-উপদেশ কবিতায় গাঁথিয়া গিয়াছেন। কবিতাগুলি সরস ও সরল। এ পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে আমরা সুখী হইব।

ভূদেব-জীবনী (সংক্ষিপ্ত)। শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য।৶০ ছয় আনা। আমরা এ চরিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-প্রণালী যদিও ভাল নহে, কিন্তু গ্রন্থকারের সংগ্রহ প্রশংসনীয়। ভূদেব-জীবনের বহু ঘটনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভূদেব-চরিত্রের মূল সূত্র যে তাঁহার মৌলিকতা, এ কথা পাঠে চরিত বুঝিতে পারি। বাঙ্গালীকে এ গ্রন্থ পড়িতে আমরা অনুরোধ করি। ভক্তিভরে মহাত্মার জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর জীবন মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভূদেবের মাহাত্ম্য,—ধর্ম্ম, সমাজ ও লোক-শিক্ষা—এই তিন বিষয়েই আপনাকে প্রচার করিয়াছিল। তিনি জীবন-যাত্রার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীদক্ষিণেশ্বর। শ্রীপ্রমাদদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দক্ষিণেশ্বরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বর নামের সহিত বাঙ্গালীমাত্রই আজি পরিচিত। নবদ্বীপ যেমন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি,—দক্ষিণেশ্বরেরও অঙ্গে অঙ্গে তেমনই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। নবদ্বীপের মত দক্ষিণেশ্বরও আজি হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক সংক্ষেপে রাণী রাসমণির ও শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মোহনভোগ। শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। মোহনভোগের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই 'রঙ্গ-চঙ্গে' কেতাবখানি শিশুসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহার ছাপা ও ছবি পরিপাটী। মলাটের ছবিখানি মনোরম। কিন্তু মোহনভোগের ঠোঙ্গা নয়, বিলাতী কেকের 'পেপার-ব্যাগ্'। বাঙ্গালীর রুচি বিকৃত হইয়াছে। দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালী শিশুর অঙ্গে বিজাতীয় বেশের অভিশাপ দেখিয়া দুঃখ হয়,—জাতীয় অধঃপতনের বহর দেখিয়া লজ্জিত ও শঙ্কিত না হইয়া থাকা যায় না।—বঙ্গমানবকগণের বিজাতীয় বেশ উদ্ভট হইলেও সত্য; সমাজে তাহার অস্তিত্ব আছে; তাহাও আমরা অস্বীকার করিব না। কিন্তু শিশুসাহিত্যে সে বেশের আমদানী করিলে, জাতীয় ভাবের সঙ্কোচ ঘটিবে। মোহনভোগের মলাটের শিশুকুল আহেলে-বিলাতী, এই-মাত্র জাহাজ হইতে নামিয়া আসিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের কোটে, প্যাণ্টে, ঘাঘরায় মোহনভোগ মাখাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে মোহনভোগই অশুচি হইয়াছে। আমাদের মা ষষ্ঠী কি বন্ধ্যা হইয়াছেন? বাঙ্গালীর পরম শত্রুও ত এমন অপবাদ দিতে পারে না! বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে কি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অসম্ভব? ইউরোপের শিল্পীরাও ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে কুঞ্চিত বসনের লীলা-ভঙ্গীর সমাবেশ করিয়া থাকেন। আমরা আর কত দিন

উদ্ভটের অনুসরণ করিব? শিশুর সরস মনেই জাতীয়তার বীজ বপন করিতে হয়। শিশুসাহিত্য তাহার সহায় না হইয়া যদি বিদেশী বিলাসের পোষক হয়, তাহা হইলে 'নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!'—মোহনভোগের রচনা মন্দ নহে। শিশু-হৃদয়ের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় আছে, অনেক রচনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোষ্ঠযাত্রা, চাঁদ সওদাগর, লবকুশ প্রভৃতি হিন্দু শিশুর সুপথ্য। খোকা বাহাদুর ও লবকুশের চিত্র দুইখানি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লবকুশের ছবিতে ঘোড়াটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়! অশ্বমেধের অশ্বের পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র শাখার অন্তরাল হইতে দৃশ্যমান; পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে বোধ হয়, যেন দোদুল্যমান। চিত্রকর অশ্বটিকে প্রাধান্য দিলে শিশুদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিতেন। রাজা ও রাণীর সুরঞ্জিত ছবি সুন্দর। মোহনভোগ অসংখ্য চিত্রে পূর্ণ; ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই পরিপাটী। তাহার তুলনায় ছয় আনা মূল্য সুলভ বলিয়া মনে হয়। পূজার সময় শিশুরা মোহনভোগ পাইলে তৃপ্তি লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্রাট জর্জ্জ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহৃদয়তা ও সমবেদনা ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। সম্রাটের চরিত্র প্রজার জ্ঞাতব্য বটে; কিন্তু সদাশয় পঞ্চম জর্জ্জ যদি সম্রাট না হইতেন, তাহা হইলেও, তাঁহার চরিতের আলোচনায়, মনুষ্যত্বের পরিচয়ে, পাঠক লাভবান হইতেন। গ্রন্থকার সংক্ষেপে সম্রাটের চরিতকাহিনী সঙ্কলিত করিয়াছেন।—এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। অতএব, 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি যাহাই বলুন, দেশে 'ভদ্রলোক ডাকাতের' আতঙ্ক যতই বাড়ুক, আমরা বলিব, বাঙ্গালী রাজভক্ত বটে।—লেখক ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। যথা 'মহিমাকাহিনী'। অনেক স্থলে লেখক বাঙ্গালা শব্দে ইংরাজী লিখিয়াছেন। যথা,—'এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নৌবিদ্যায় এত দূর পারদর্শী হইলেন যে, তিনি যখন সব লেপ্টে-নাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর ছিল।' বাঙ্গালা রচনা-রীতির অনুসরণ করিলে লেখক লিখিতেন,—'উনিশ বৎসর বয়সেই তিনি সব লেপ্‌টেনেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।' লেখক 'জাঁকজমকের প্রসেসনকে' ভাষায় স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ পক্ষপাতিতায় ভাষার 'জমক' দূরে থাক 'জাঁকও' লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। শোভা-যাত্রা, মিছিল কি অপরাধ করিল?—ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল ত্রুটীর সংশোধন করিলে আমরা আনন্দিত হইব।—গ্রন্থখানির কাগজ, ছাপা ও মলাট সুন্দর।

দগ্ধ-কচু।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবিতা বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পদ্যের ন্যায় তাঁহার গদ্যও সুন্দর। তাঁহার 'দগ্ধ-কচু' সুখপাঠ্য নক্সা। সেন কবির নিপুণতায় 'দগ্ধ-কচু'ও মুখরোচক হই-য়াছে। বহু দিন হইল, 'ভারতী'র পদ্মপাতায় কবিবর এই 'কচুপোড়া' পরিবেশন করিয়া-ছিলেন। সে স্বাদ কি ভুলিবার? পুরাতনের মোহ কি কেহ ভুলিতে পারে? আজ মনে হইতেছে,—'তে হি নো দিবসা গতাঃ!'—কিন্তু যাক, সাধারণের সহিত সেই পুরাতন

প্রসঙ্গের—আমাদের সেকালের সুখস্মৃতির কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং 'ধান ভানিতে শিবের গীত' সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।—দগ্ধ-কচুতে সেন কবি যে রস ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা চাকভাঙ্গা মধুর মত মধুর। আশা করি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের তথাকথিত রসিকতা নামক চিটে গুড়ে যাঁহাদের অরুচি জন্মিয়াছে, দগ্ধ-কচু তাঁহাদের ভাল লাগিবে।

হাসন-হোসেন। শ্রীরেবতীমোহন সেন প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত। ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে। লাল রঙ্গের কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ছয় আনা। হজরৎ মহম্মদের দৌহিত্রদ্বয়—হাসন ও হোসেনের ঈশ্বরনিষ্ঠা, শৌর্য্য, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানব-সাধারণের আদর্শ-স্থানীয়। রেবতী বাবু বাঙ্গালা ভাষায় হাসন ও হোসেনের অবদান লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অবদান সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ সীমায় কখনও আবদ্ধ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি বাড়িতেছে, ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে। হাসন-হোসেনের ন্যায় গ্রন্থের প্রকাশে এই সত্যই সূচিত হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ। সাহিত্যও কালধর্ম্মের অনুবর্ত্তী। যুগধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কোনও জাতি, কোনও জাতির সাহিত্য উপচয় লাভ করিতে পারে না।—এই গ্রন্থের ভাষা সহজ, চলনসই। আশা করি, বেরতীবাবুর শ্রম সাফল্য লাভ করিবে।

বিদুর। শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা। পুস্তকখানি শিশুপাঠ্য বলিয়াই মনে হয়। শিশুদের জন্য কথিত গ্রন্থে বিচার-বিতর্কের অবকাশ নাই, লেখক তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। 'বিদুর' কোথাও প্রবন্ধ, কোথাও উপাখ্যান। নিরবচ্ছিন্ন আখ্যান-পথে বিদুর-চরিত্র বর্ণিত হইলে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। গ্রন্থের ভাষাও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। বহু দুরূহ শব্দের প্রয়োগে ভাষা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রসাধন-সাধনে রামকানাই বাবু আদৌ চেষ্টা করেন নাই।—উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা পুরাণের মহনীয় চরিত-মালা দেশ-কালের উপযোগী করিয়া বাঙ্গালার শিশুসমাজে উপহার দিতেছেন, তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ দেশে প্রত্যেক লেখকই স্বতঃসিদ্ধ। নূতন লেখক যেমন গ্রন্থ লেখেন, অমনই মুদ্রা-যন্ত্রে অর্পণ করেন। তাঁহাদের রচনা দেখিয়া দিবার কোনও ব্যবস্থাই এ দেশে নাই। প্রকাশকগণ ছাপিয়া বেচিয়াই কর্ত্তব্য পালন করেন। প্রকাশের পূর্ব্বে বহিগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিলে, সাহিত্যে আবর্জ্জনার পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে,—সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

ধ্রুব। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস প্রণীত। সচিত্র। মূল্য চারি আনা। পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু বালকবালিকার সুপথ্য, তাহা 'বিদুর' উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। 'ধ্রুব' চলনসই। এই সকল কাহিনী বর্ত্তমান কালের উপযোগী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিতামৃতে পরিণত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। সতীশ বাবুর 'ধ্রুবে' বিশেষত্ব নাই। শিশুপাঠ্য সাহিত্যের রচনায় সাফল্যলাভ সহজ সাধনার বস্তু নহে। কিন্তু এ দেশে শিশুর লালন-পালনের ন্যায় তাহাদের পাঠ্যরচনাও কাহাকেও শিখিতে হয় না। শিশু-সাহিত্যকে সরস করিবার শক্তি সকল লেখকের নাই। শক্তি বিচার না করিয়া, অথবা শক্তি অর্জ্জন না করিয়াই যাঁহারা শিশু-সাহিত্যের রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সঙ্কল্প সাধু হইলেও, চেষ্টা সফল হয় না। এই জন্য এই শ্রেণীর গ্রন্থে পৌরাণিক আখ্যানের শুচিতা ও স্বচ্ছতা, অথবা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী গল্পের মনোজ্ঞতা বা সরসতা, কিছুই থাকে না। তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'। যে দেশে খৃষ্টানী 'সাদাপ্রভুর উপদেশ' শিশুদের সঙ্গী হইতে পারে, সে দেশে কাণা খোঁড়া ধ্রুবও প্রার্থনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ভারত-স্থাপত্য।

[illegible] উদাসীন। [illegible] পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ [illegible] নানারূপ আলোচনা করিয়া আসি- [illegible] লে, দুইটি বিভিন্ন মতের অভ্যুদয় হইয়াছে। এক [illegible] ভারত-প্রতিভাপ্রসূত। অন্য মতে,—ভারত-শিল্প সম্পূর্ণ- [illegible] করণ-প্রসূত না হইলেও, অনেকাংশে [illegible] পরিপুষ্ট।

যাঁহারা দ্বিতীয় মতের পক্ষপাতী, তাঁহারাও [illegible] ভারত-স্থাপত্যকে অনন্ত- [illegible] ও ভারত-প্রতিভাপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন [illegible]বে কেহ কেহ এখনও বলিতেছেন,—মুসলমান-শাসন-প্রভাবে ভারত-স্থাপত্যের পুরাতন আদর্শ উত্তরকালে কিয়ৎপরিমাণে [illegible] হইয়া গিয়াছে।

এখনও এতদ্বিষয়ের শেষ কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এখনও অনেক অনুসন্ধানের ও আলোচনার প্রয়োজন আছে;—অনেক কথা বুঝিবার এবং বুঝাইবারও প্রয়োজন আছে। সুতরাং আলোচনা যত অধিক হইবে, সত্যনির্ণয়ের পথ ততই পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। সেই আশায়, [illegible] পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও তথ্যানুসন্ধানে [illegible] রহিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায়, আমরা যাহা করিতেছি, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা এ সকল বিষয়ে গ্রন্থরচনা করিলে, আমাদের পক্ষে তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা করা কঠিন হইয়া পড়ে;—হয় নিরবচ্ছিন্ন স্তুতিবাদে, না হয় নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাবাদে,—আমরা আমাদের বিচারদৌর্বল্যতার পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া পড়ি।

অধ্যাপক হাভেল ভা র ত-স্থা প ত্য নাম দিয়া সম্প্রতি একখানি সুন্দর সচিত্র গ্রন্থ (১) প্রকাশিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকগণের সাহায্যার্থ কোনও কোনও [illegible] লেখক তাহার সমালোচনাও প্রকাশিত করিয়াছেন। (২) [illegible] বলিয়া, এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত হইতে

---

(১) Indian Architecture: Its Psychological, Structure and History, from the first Mahomedan Invasion to the present day.—By E. B. Havell. (John Murray, London, 1913).

(২) ১৩২০ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে ও 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'গড়ন' ও 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখ যোগ্য।

পারে নাই। কেহ কেহ ইহার নামমাত্রই শ্রবণ করিয়াছেন। যে অল্প-সংখ্যক বাঙ্গালী পাঠক চক্ষুঃকর্ণের বিবাদভঞ্জনের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাও সকলে সমানভাবে সকল কথার বিচার করিয়া, এই অভিনব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার যথাযোগ্য অবসর পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

এই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে কলিকাতার রাজকীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"তাজের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত সিংহলের চণ্ডীশিব নামক পঞ্চচূড় বা পঞ্চরত্নমন্দির এই প্রথায় রচিত।" (৩) বলা বাহুল্য, সিংহলে এরূপ মন্দির নাই; অধ্যাপক হাভেলও এরূপ কথা লিখেন নাই। চণ্ডীশিব একটি ক্ষুদ্র মন্দির হইলেও, তাহার নাম এখন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে,—তাহা যবদ্বীপে অবস্থিত। আর এক জন লিখিয়াছেন,—"আগ্রার তাজমহল এতদিন Saracenic artএর চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল; হাভেল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন,—চারি কোণে চারিটি মিনার আর মধ্যস্থলে গম্বুজ, জগতের কুত্রাপি Saracenic art-এর এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি?" (৪) এইরূপে, অধ্যাপক হাভেল যাহা বলেন নাই,—বলিতেও পারিতেন না,—সেই সকল কথাও তাঁহার মুখে গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে!

অধ্যাপক হাভেল ভারতবাসী না হইয়াও, যেরূপ সহৃদয়তার সদ্ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু সমালোচনার প্রথম উদ্যমে এই কৃতজ্ঞতা যে ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি বিজয় লাভ করিতে পারে নাই; যাহা বিজয় লাভ করিয়াছে, তাহা ভাব-প্রবণতা—নিন্দায় প্রশংসায় তুল্যরূপে অসংযত,—তুল্যরূপেই অযথা-প্রযুক্ত। প্রথম ভাবোচ্ছ্বাস এইরূপ হইবারই কথা;—তাহা সুধীজনের পরিহার্য্য হইলেও, ভাব-প্রবণতার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভারত-স্থাপত্য যে অনন্যসাধারণ ও ভারত-প্রতিভাপ্রসূত, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ভারত-স্থাপত্য অনন্যসাধারণ কেন, তাহার আলোচনা এখনও সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহা কি সর্ব্বতোভাবে আর্য্য-

(৩) ভারতী (আশ্বিন, ১৩২০)
(৪) মানসী (আশ্বিন, ১৩২০)

প্রতিভাপ্রসূত? তাহা হইলে, তাহার পক্ষে অনন্যসাধারণ হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। কারণ, আর্য্য-পরিবার বহু শাখায় বিভক্ত, বহু দেশে উপনিবিষ্ট, এবং বহু ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইলেও, মূলে একবংশসম্ভূত বলিয়া, সকল দেশের সকল শাখার আর্য্য-পরিবারের পক্ষে স্থাপত্য-ব্যবস্থায় কিয়ৎ-পরিমাণে একভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা অধিক। এরূপ অবস্থায় ভারত-স্থাপত্যের অনন্য-সাধারণত্ব একটি প্রহেলিকা-রূপেই প্রতিভাত হয়। তাহার কারণ কি,—ভারত-স্থাপত্য-বিষয়ক গ্রন্থের পক্ষে তাহা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থে সে আলোচনা স্থান লাভ করে নাই। অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থে এই আলোচনা স্থান লাভ করিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহার গ্রন্থের নাম ভা র ত- স্থা প ত্য হইলেও,তাহা ভারত-স্থাপত্যবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় নাই। তাহাতে কেবল এক যুগের ভারত-স্থাপত্যের একদেশমাত্রই আলোচিত হইয়াছে;—তাহাও অতি সংক্ষেপে। ১ম,—মুসলমান-শাসন ভারত-স্থাপত্যের মূল গঠনরীতিকে পরি-বর্ত্তিত করে নাই; ২য়,—ভারতবর্ষের পুরাতন স্থাপত্য-প্রতিভা অনাদরে অব-হেলায় নিরাশ্রয়ের ন্যায় পর্য্যটন করিতে বাধ্য হইলেও, এখনও ভারতবর্ষ হইতে চিরপ্রস্থান করে নাই; ৩য়,— দিল্লীর নব রাজনগরের নির্ম্মাণে তাহাকেই আমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য;—এই তিনটি কথাই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান কথা। সুতরাং এরূপ গ্রন্থে ভারত-স্থাপত্যের ধারাবাহিক বিবরণ-লাভের আশা করা যাইতে পারে না;—সেরূপ প্রয়োজনে ইহা আদৌ লিখিত হয় নাই।

ইহা একটি বিশিষ্ট প্রয়োজনে লিখিত হইয়াছে; এবং সেই প্রয়োজনের পক্ষে যাহা অনুকূল, কেবল সেই সকল কথাই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। কোন্ প্রণালীতে দিল্লীর নব রাজনগর নির্ম্মিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিলাতে মত-ভেদ আছে। আমাদের দেশে, ভারতবাসীর মধ্যে, মতভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমাদের বর্ত্তমান স্থাপত্য-রীতি হিন্দু হউক আর বৌদ্ধ হউক, অথবা হিন্দু-বৌদ্ধ-ইস্‌লামীয় হউক, তাহা এখন আমাদের। আমাদের দেশের রাজধানীর রচনাকার্য্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধু। উদ্দেশ্য সফল হইলে, আমাদেরই লাভ। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হউক, এই প্রার্থনায় সকল ভারতবাসীই সমস্বরে যোগদান করিতে পারেন। তথাপি ইহা অল্প লাভ; কেন না, ইহা কেবল সাময়িক লাভ। এই গ্রন্থে যে সকল নূতন কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত

বলিয়া সভ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলে, আরও অনেক বিষয়ে আমরা লাভবান হইতে পারিব। ভারত-শিল্পের কথা উঠিলে, ভারতবর্ষের বাহিরেই তাহার উদ্ভব-ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিবার প্রথা মর্য্যাদা লাভ করিত। ভারতবর্ষের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং অনুসন্ধান করিতে জানিলে, ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রমাণ-পরম্পরার অভাব ঘটিবে না,—এই কথার প্রচার করিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেল ভারতবর্ষের সম্মুখে এক নূতন আশার আলোক-বর্ত্তিকা সংস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ নানা কারণেই অভ্যর্থনা-লাভের যোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অবতারণা করিয়া, অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"ফরগুসনের গ্রন্থ পাশ্চাত্য স্থপতিগণের পুস্তকালয়ে সমাদরের সহিত স্থান প্রাপ্ত হইলেও, ইহা সেই শ্রেণীর গ্রন্থ, যাহা কেহ কখনও পাঠ করেন না।" (৫) ইহা সত্য হইলে, বিস্ময়জনক। তবে সুখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক হাভেল তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই। তিনি যত্নপূর্ব্বক ফরগুসনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অনেক প্রমাণ ও চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরগুসনের সঙ্গে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের নানা বিষয়ে মত-পার্থক্য সংঘটিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তিনি নিজেও সেরূপ সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষের অনেক স্থাপত্য-নিদর্শন অনাবিষ্কৃত ছিল;—যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও অনেক নিদর্শনের অধিষ্ঠানক্ষেত্র বিলক্ষণ দুর্গম বলিয়াই পরিচিত ছিল। এরূপ অবস্থায়, অল্পসংখ্যক নিদর্শনের সাহায্যে, তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে গ্রন্থ-রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত বলিয়া, তখনও, এবং এখনও, তাঁহার গ্রন্থই ভারত-স্থাপত্যের প্রধান গ্রন্থ। বিলাতের স্থপতিগণ এখন আর তাহা অধ্যয়ন করেন কি না, জানি না; কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্বেও [১৯১০ খৃষ্টাব্দে]

(৫) Fergusson only read into Indian Architecture the values he attached to it from his knowledge of Western archœlogy, and consequently the only result of his magnificent pioneer work has been to give the subject an honourable place in the Western architect's library among the books which are never read.—Preface.

বিলাতেই তাঁহার গ্রন্থের অভিনব সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে;—দুর্ম্মূল্য হইলেও, তাহার গ্রাহকের অভাব ঘটে নাই। বিলাতের লোকে সত্য সত্যই তাহা পাঠ করিতে বিরত হইয়া থাকিলেও, সেই দৃষ্টান্তে, আমাদের পক্ষে ফরগুসনের গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিবার বা অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই;—অধ্যাপক হাভেলও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ভূমিকার আর এক স্থলে অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য-নির্ণয়ের জন্য" তিনি "প্রধানতঃ যে দলিলগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহা অট্টালিকার নিকটই প্রাপ্ত হওয়া যায়;—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য"। (৬) ইহা নূতন বিচার-রীতি নহে;—ইহাই চিরপরিচিত এবং চিরপুরাতন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক হাভেল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথা নহে, তাহা নূতন কথাও নহে,—তাহা ফরগুসনের অমর-গ্রন্থের সুপরিচিত উক্তির পুনরুক্তিমাত্র। (৭) ফরগুসনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত সিদ্ধান্তে, এবং অধ্যাপক হাভেলের নবপ্রকাশিত গ্রন্থের তদ্বিষয়ক পুনরুক্তিতে এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়ের দলিল এক;—কেবল ব্যাখ্যাপদ্ধতি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

অট্টালিকাকে প্রধান ও নির্ভরযোগ্য দলিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, পাথর কুড়াইবার প্রয়োজনকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তাহার

(৬) In working out the principal historical sequences, I have relied chiefly upon the documents which the buildings themselves provide : they are by far the most reliable.—Havell.

(৭) Some men of great eminence and learning, more conversant with books than buildings, have naturally drawn their knowledge and inferences from written authorities, none of which are contemporaneous with the events they relate and all of which have been avowedly altered and falsified in later times. My authorities, on the contrary, have been mainly the imperishable records in the rocks or on sculptures and carvings, which necessarily represented at the time the faith and feelings of those who executed them, and which retain their original impress to this day. In such a country as India, the chisels of her sculptures are, so far as I can judge, immeasurably more to be trusted than the pens of her authors.—Fergusson.

জন্য অনুসন্ধান-সমিতি ও মূর্ত্তিভবনও গঠন করিতে হয়। পাথর কুড়াইবার জন্য পাথর কুড়াইতে কেহই পরামর্শ দান করেন না। পাথরই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য দলিল বলিয়া,—অনন্যোপায় হইয়াই,—পাথর কুড়াইতে হয়। ফরগুসন ইহাকে অবজ্ঞা করেন নাই, অধ্যাপক হাভেলও ইহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থ-সমালোচক এ বিষয়ে কিছু নূতন কথা শুনাইয়াছেন। যথা ;—

(১) "যদি সাহেবদের ন্যায় মূর্ত্তিসংগ্রহেরই 'বাতিক' আমাদের সম্পূর্ণ 'চাগিয়া' উঠে অথচ মূর্ত্তিপূজার বা মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ লোপ পায়, তবে সবই ব্যর্থ।"

(২) "ইহার পর আমরা আর যেন নিজেকে (?) বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান-সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন করিতে না চলি।"

(৩) "ভারতবর্ষের স্থপতিগণের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি পরিচয়, স্থাপত্য-পাণ্ডিত্যাভিনয়, এবং যাদুঘরের ভেল্কীবাজি আমাদের আসল কাজ নয়।"

যদি সমালোচক মহাশয়ের মনে সত্য সত্যই মূর্ত্তিপূজার অথবা মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগিয়া থাকে, তাহা সুসমাচার। কিন্তু যাঁহারা আমাদের বিলুপ্তপ্রায় শিল্পপ্রতিভার পুনরুজ্জীবনসাধনের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, সেই অধ্যাপক হাভেল প্রমুখ ভারতহিতৈষিগণের মনে মূর্ত্তিপূজার বা মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা না জাগিলেও, তাঁহারা কেহই "সবই ব্যর্থ" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন না। আবার যাঁহাদের মনে মূর্ত্তিপূজার ও মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা চিরদিন সমান জাগরূক আছে বলিয়া, মূর্ত্তিপূজা ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারিতেছে না, তাঁহারা সেই সাধু ইচ্ছা লইয়াও ভারত-শিল্পের "সবই সফল" করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ইহার মূলে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে ; তাহারই তথ্যানুসন্ধানের সময় আসিয়াছে। এ সময়ে তথ্যানুসন্ধান পরিত্যাগের উপদেশ, আমাদের আলস্য-প্রবণ দুর্ব্বল ধাতুর পক্ষে মুখরোচক হইলেও, সুধীসমাজে সদুপদেশ বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকৃত হইবে না। যাঁহারা দেশের দশের সঙ্গে মিলিয়া দেশের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন,—পাথরের দলিলের অনুসন্ধানের

ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া উপায় নাই। তাহাই নবযুগের নূতন ব্রত। অধ্যাপক হাভেল স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া থাকিলেও, তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচককে সে কথা স্বীকার করাইতে পারেন নাই!

যদি তর্কের জন্য তর্ক করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'যাদুঘরে'র সযত্ন-সংগৃহীত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শননিচয়কে 'ভেল্কীবাজি' বলিয়া উপহাস করা সহজ ও স্বাভাবিক। তুলনায় সমালোচনা করিয়া, জ্ঞানলাভ করা অভিপ্রেত হইলে, শিক্ষাগারের ন্যায় 'যাদুঘরে'ও সমুচিত সম্ভ্রমের সঙ্গেই প্রবেশ করিতে হইবে। তথায় ঔদ্ধত্যের স্থান নাই; অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ নাই;—তথায় যাহা আছে, তাহা সাধকের সিদ্ধপীঠ। সে সিদ্ধপীঠে ভক্ত-সমাজের প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি, দেবমূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া, মূর্ত্তি-রচয়িতা শিল্পিগণের পাদপদ্মেই নিয়ত স্তূপীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশের লোক অধুনা আত্মবিস্মৃত;—তাই তাহারা ভারতবর্ষের পুরা-পরিচিত 'চিত্রশালা-গৃহে'র নাম রাখিয়াছে 'যাদু-ঘর,—সুতরাং তাহা এখন 'ভেল্কাবাজি'র আধার বলিয়া আমাদের সাহিত্যেও উল্লিখিত হইতেছে! আমাদের 'আসল কাজ' যাহাই হউক, তাহা উপহাস-লোলুপতা হইতে পৃথক্।

আমাদের দেশ বচনবাগীশের দেশ। এ অখ্যাতি অনেক দিনের অখ্যাতি। সৌভাগ্যক্রমে তাহার দিন ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে একে একে অনেক অনুসন্ধান-সমিতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্বদেশের বিদেশের সদাশয়গণ আমাদের দেশের এই অভিনব আত্মচেষ্টায় উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এ সময়ে ইহাকে অবজ্ঞা করা,—'বাতিক চাগা' বলিয়া উপহাস করা,—অনুসন্ধান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ দান করা যে সময়োচিত হয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

যে পথ তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃত পথ বলিয়া সমগ্র সভ্যসমাজে এক-বাক্যে স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইয়াছে,—যে পথে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ অধ্যাপক হাভেলের পক্ষে ও অন্যান্য শিল্পাচার্য্যগণের পক্ষে ভারতশিল্পের আলোচনা অল্পায়াস-সাধ্য হইয়াছে,—যে পথে এখনও অনেক দূর অগ্রসর হইতে না পারিলে, ভারতশিল্পের মূলপ্রকৃতি যথাযোগ্যভাবে নির্ণীত ও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিবে না,—সে পথ পরিত্যাগ করিতে হইলে, ভারত-শিল্পকে আবার নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা কত

কঠিন হইয়া পড়িবে, তাহা বাঙ্গালা দেশে কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার জন্য এখন আর আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—তর্কে বহু দূর।"

এখন আর সকল প্রকার সাধনার পক্ষেই এই প্রবাদবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। এখন যে যুগ আসিয়াছে, তাহা বিচারণার যুগ। এখন তথ্যানুসন্ধানের পথ পরিত্যাগ করিতে হইলে, গৃহকোটরে আবদ্ধ হইয়া, কল্পনাকেই সারসত্য বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে;—শিল্পকলার স্বেচ্ছাচারকে ক্রমোন্নতি মনে করিয়া, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে। তাহাতে অবশ্যই আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না,—মৃত্তিকা-খননের অকীর্ত্তিকর শ্রমস্বীকারে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে না;—ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন-সংরক্ষণের জন্য অর্থব্যয়ও করিতে হইবে না। কিন্তু জ্ঞান-সাম্রাজ্যের বিজয়-যাত্রায় অনেক দূর পিছাইয়া পড়িতে হইবে।

যাহার দলিল নাই, সে মর্য্যাদাহীন। আমাদের দলিল—পাথর। এ কথা এখন আর তর্কসঙ্কুল নাই। গ্রীস-রোম অতিক্রম করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এখন মিশরে, ক্রীটে, সিরিয়ায়, সাইবেরিয়ায়,—আমাদের দেশে ও আমাদের পূর্ব্বতন প্রভাব-পরিপুষ্ট প্রাচ্য ভূমণ্ডলে,—পাথর কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাকে 'বাতিক চাগা' বলিয়া উপহাস করা সহজ; তাহার অনুসরণ করা কঠিন।

যে সকল যিষয় সত্য সত্যই তর্কসঙ্কুল, সেই সকল বিষয়ে কোনও কথাই দৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করা চলে না। যাহার প্রমাণ অল্প বা দুর্ব্বল,—যাহা ব্যাখ্যাকৌশলে উভয়পক্ষেই "প্রমাণ" বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে,—তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতে পারে,—দৃঢ়স্বর অ-চল। কিন্তু সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ফার্গুসন প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যে সকল ভারতীয় ইমারতগুলিকে (?) আরব্য, নহে ত পারস্য বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিয়া বোকা বুঝাইয়া গিয়াছেন, সেগুলা যে সম্পূর্ণ—কি নির্ম্মাণ-কৌশলে কি ভাবভঙ্গীতে—আমাদের, এটা আজ আমরা প্রথম হাভেল সাহেবের নিকট হইতে লাভ করিলাম।" কি লাভ করিলাম, তাহা বুঝাইবার জন্য সমালোচক মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন,—"কি সুন্দর করিয়া হাভেল বুঝাইয়াছেন যে তাজ, আরব্য-উপন্যাসের স্বপ্ন দিয়া গড়া নয়, কিন্তু আমাদের বহু শিল্পীর বহু

সাধনার চরম সার্থকতা; এবং তাহার আত্মন্ত সমস্তটা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁম্' এই মহামন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ফরগুসনের ও অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থে এত দৃঢ়স্বর ব্যক্ত হইতে পারে নাই। কাহাকেও "ধোঁকা দিয়া বোকা বুঝাইয়া" যাওয়া ফরগুসনের মতলবের মধ্যে আসিবার কারণ ছিল না। অধ্যাপক হাভেলও তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থানেই বলেন নাই,—"তাজের আত্মন্ত সমস্তটা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁম্' এই মহামন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" তাজের "আত্মন্ত সমস্তটা" অনেকটা; —অধ্যাপক হাভেল ততটার আদৌ আলোচনা করেন নাই। তিনি যতটার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রধানটা তাজের গম্বুজটা;—সেটার গঠন-কৌশলটা সর্ব্বাংশে আমাদের কোন্‌টার সঙ্গে "সম্পূর্ণ" মিলিয়া যায়, অধ্যাপক হাভেল সমগ্র উত্তর-ভারতটা তন্ন তন্ন করিয়াও তাহা বাহির করিতে পারেন নাই!

অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দেশের নানা সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ ভারত-সংসর্গে অনেক দেশ প্রকারান্তরে ভারত-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে সম্পর্ক কি কেবল প্রদানের সম্পর্ক ছিল,—আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল না? ইহা বড় ধীর ভাবে—বড় নিরপেক্ষ ভাবে—বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। সে ভাবে ইহার বিচার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, অধ্যাপক হাভেল সত্য সত্যই একটি নূতন কথা প্রথম শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"মোগল-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-শিল্পে পারসীক প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মুসলমান-প্রাধান্যের অভ্যুদয়লাভের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র পশ্চিম এসিয়া-খণ্ডে,এবং আরও বহুদূরে যে বৌদ্ধ-প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে অনেকাংশে তাহারই প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া মনে করিতে হইবে।" (৮) ইহা আমাদের আত্মগৌরব চরিতার্থ করিবার পক্ষে যতই উপযোগী হউক না কেন, ইহা সত্য কি না, তাহার অনুসন্ধান-আলোচনার প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই। অধ্যাপক হাভেল বরং তথ্যানুসন্ধানের একটি নূতন পথের সন্ধান প্রদান করিয়া-

(৮) The Persian influence which flowed into India with the founding of the Mogul Empire, was largely a return wave of the Buddhist influences which spread from India into Western Asia and far beyond, centuries before the Mahomedan supremacy —p.99

ছেন। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক হাভেলের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে এ কথার প্রচার করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা যায় না। তিরস্কার, উপহাস, অভিসম্পাত এখনও ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে, পাথরের দলিলের উপর নির্ভর করিয়াই, সুপণ্ডিত ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"মুসলমান-শাসন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রভাবে, ভারত-স্থাপত্যরীতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।" অধ্যাপক হাভেলের নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিচার-নিপুণ অধ্যাপক হাভেল ইহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল নানা ভাবে এই সিদ্ধান্তটি অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া,—মোগল-শাসনকালে "পারসীক প্রভাবে"র অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে না পারিয়া,—"পারসীক প্রভাব"কে ভারতীয় বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার ফলে, মুসলমান-শাসন-সময়ের জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তিস্তম্ভ—তাজমহল—ভাব-সম্পদে হিন্দু-প্রতিভাপ্রসূত, [অথবা নিতান্ত পক্ষে] ভারত-প্রতিভা-প্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধ্যাপক হাভেল এ বিষয়ে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ (৯) প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

যে যুগে তাজমহল রচিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের ভাব-সমন্বয়-যুগ। সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এক হইয়া গিয়াছিল,—কথোপকথনের ভাষা এক হইয়া গিয়াছিল,—উৎসব আনন্দ এক হইয়া গিয়াছিল,—ভাবস্রোত একই খাতে সম্মিলিত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছিল। সে যুগে কি কেবল ভারত-স্থাপত্যেই ভাব-সমন্বয়ের প্রভাব কিছু-মাত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই? তাজ দেখিলে স্বতই মনে হয়,—তাজ 'হিন্দু'র নহে, 'মুসলমানে'রও নহে,—তাজ 'হিন্দু-মুসলমানের'। তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের রচনা-প্রতিভা বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-বন্ধনে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে! পরলোকগত ওকাকুরা লিখিয়াছিলেন,—শিল্পের ভাব-সম্পদে "সমগ্র এসিয়াই এক"। (১০) তাজ তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া কথিত হইতে পারে।

(৯) Handbook to Agra and the Taj.

(১০) Art ideals of the East.

যে তাজ দেখিয়াছে, তাহাকেই আত্মহারা হইতে হইয়াছে। তাজ অদ্বিতীয় মর্ম্মর-স্বপ্ন,—যেমন সুন্দর, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। নিস্তব্ধ নিশীথে,—কৌমুদী-বিধৌত নীল নভোমণ্ডলের সুবিন্যস্ত চারু চন্দ্রাতপতলে,—তাজের শুভ্র সুষমা যখন ধীরে ধীরে স্বচ্ছ শিশিরাবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে আপন অঙ্গলাবণ্যের আভাস প্রদান করে, তখন তাহা যেমন অনির্ব্বচনীয়,—তাহার দীপ্ত-দিবালোক-পুলকিত প্রসাদ-প্রফুল্ল সুবিমল হাস্যচ্ছটাও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। উষায়, প্রদোষে,—প্রভাত-তপনের প্রথম কিরণপাতে,—সায়াহ্নের স্তিমিত-রশ্মির আরক্তিম অন্তিম অন্তর্ধানে,—তাজের শোভাই তাজের শোভার একমাত্র তুলনা-স্থল। সে শোভা কেবল অট্টালিকার শোভা নয়,—ভারতবর্ষের নীল নভোমণ্ডলের নৈসর্গিক শোভার সঙ্গে তাজতটবাহিনী কলিন্দ-নন্দিনীর নীলসলিলধারার নৈসর্গিক শোভাও, কৃত্রিমের সঙ্গে অকৃত্রিমের অপূর্ব্ব সম্মিলনে, মোহবিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। (১১)

এমন অদ্বিতীয় স্থাপত্য-সুষমার রচনা-গৌরব যদি কেবল ভারতবর্ষেরই প্রাপ্য হয়, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মগৌরব সংস্থাপনার আমোঘ অস্ত্র হইতে পারে। অধ্যাপক হাভেল বলেন,—স্থাপত্য-বিজ্ঞানের প্রমাণে ভারতবর্ষই এই গৌরবের একমাত্র অধিকারী। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছেন;—তাহা বুঝিতে হইলেও, অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, অধ্যাপক হাভেল বলেন,—"তাজ ইস্লামের নহে, তাজ ভারতবর্ষের"। (১২)

তাঁহার তর্ক-প্রণালীতে নূতনত্ব আছে। তাহা কিয়ৎপরিমাণে কবিত্বময়; সুতরাং তাহাকে সর্ব্বাংশে বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালী বলিয়া অভ্যর্থনা করিবার উপায় নাই। অভ্যন্তরের বিচিত্র কারুকার্য্য নিরতিশয় শোভাময় হইলেও,

(১১) * Beautiful as it is in itself, the Taj would lose half its charm if it stood alone. It is the combination of so many beauties, and the perfect manner in which each is subordinated to the other, that makes up a whole which the world can not match, and which never fails to impress even those who are most indifferent to the effects produced by architectural objects in general.—Fergusson's History. vol. II. P. 313.

(১২) The Tajmahall belongs to India, not to Islam. P. ৫৯

বাহ্য শোভাই তাজের প্রধান শোভা। তাহা রচনা-সামঞ্জস্যের অপূর্ব্ব পরিণাম। অধ্যাপক হাভেল বলেন,—শাহজাঁহা-দয়িতা মমতাজ-মহলের অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গলাবণ্য প্রতিবিম্বিত করিতে গিয়াই, (১৩) ভাব-প্রবণ ভারতশিল্পী অজ্ঞাতসারে এই অনন্য-সাধারণ স্থাপত্য-সুষমা উদ্ভাবিত করিয়া থাকিবেন। ইহা ইতিহাস নহে;—কাব্য। ইহা সত্য কি না, তাহা জ্ঞানগম্য নহে, ধ্যানগম্য। কারণ, তাজের ভুবনবিখ্যাত কারুকার্য্যের মধ্যে [শাহজাঁহা-দয়িতার?] শাড়ীখানি পর্য্যন্ত নাকি দেখিতে পাওয়া যায়! (১৪) তাজ মর্ম্মরবিরচিত গীতি-কাব্য। কবি না হইলে, তাহার এই শ্রেণীর সকল সৌন্দর্য্য সকলে অনুভব করিবার আশা করিতে পারেন না। বরং যাঁহারা অরসিক, তাঁহারা 'পেশোয়াজে'র পরিবর্ত্তে 'শাড়ী'র কথায় থতমত খাইয়া, কিঞ্চিৎ রসভঙ্গেরই আশঙ্কা উপস্থিত করিতে পারেন!

সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সে সৌন্দর্য্য কোনও নির্দ্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে না। তাজের সৌন্দর্য্য সেরূপ নহে। তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সমানভাবে সৌন্দর্য্যময়,—তাহাদের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য সেই জন্য এত মোহ বিস্তার করিতে পারে। অধ্যাপক হাভেল বলেন,—ইহার সহিত ইস্‌লামের সম্পর্ক নাই। যে যমুনার "নীল সলিলে" তাজের "ধবল সৌধছবি" প্রতিবিম্বিত হইয়া, "নভ-অঞ্জনে"র অনুকরণ করিতেছে, সে যমুনা যেমন কেবল ভারতবর্ষের, তাহার তটতল-সমুত্থিত এই মর্ম্মর-কীর্ত্তিও সেইরূপ কেবল ভারতবর্ষের। এক হিসাবে ইহা সত্য;—কেন না, তাজ কেবল ভারতবর্ষেই অবস্থিত। আর এক হিসাবেও ইহা সত্য;—কেন না, তৎকালে ভারতবর্ষেই সমগ্র এসিয়ার কলা-কুতূহল কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

তাজ এক সময়ে ইতালীয় শিল্পীর অতুল কীর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষের রচনা-প্রতিভায় আস্থাস্থাপন করিতে

---

(১৩) If they could not carve her statue, they could satisfy Shah-Jahan's desire for a movement which should be one of the world's wonders by creating an unique architectonic symbol of her loveliness.—P. 29

(১৪) As if to simulate a matchless loom-embroidered *Sari*.—P. 92

সাহস করিতেন না। এখন ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক হাভেল তাজের প্রধান প্রধান কারিগরগণের পরিচয়-প্রদানের জন্য লিখিয়াছেন,—"কান্দাহারের মহম্মদ হানিফ,—মুলতানের মহম্মদ সইদ ও আবুতোরা,—রুমের ইস্‌মাইল খাঁ,—সমরকন্দের মহম্মদ সরিফ,—লাহোরের কাজিম খাঁ,—তাজ-নির্ম্মাণের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের সঙ্গে অনেক হিন্দু শিল্পীও মিলিত হইয়াছিলেন। যিনি সকলের কার্য্যপরিদর্শক ও কার্য্যপরিচালক ছিলেন, তাঁহার নাম ওস্তাদ ঈশা। কেহ বলেন,—তিনি আগ্রা-নিবাসী ছিলেন; কেহ বলেন,—তিনি সিরাজ হইতে আসিয়াছিলেন।"

এই সকল প্রমাণে, তাজের নির্ম্মাণ-কার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুসলমান-শিল্পীর প্রধান সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা প্রকাশিত হইলেও, অধ্যাপক হাভেল বলেন,—"তাঁহারা ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও, ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিরই উপাসক ছিলেন।" ইহার অনুকূল লিখিত প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে,—রচনার মধ্যেই ইহার প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রমাণ উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য, কয়েকটি গম্বুজের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের বাহিরের কোনও স্থানের গম্বুজের সহিত তাজের গম্বুজের সাদৃশ্য নাই। যাহার সহিত সাদৃশ্য আছে, তাহা ইস্‌লামের নহে,—তাহা ভারতীয় বৌদ্ধ-শিল্পের। বৌদ্ধ-স্তূপের গম্বুজের আদর্শেই তাজের গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

এই সিদ্ধান্ত বিচার-সহ কি না,—কিংবা এই সিদ্ধান্ত কত দূর বিচারসহ,—তাহা সহসা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। সুধীগণ তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিতে পারিবেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতে পারিলে, ভারতবর্ষকে এক নূতন গৌরব দান করিতে পারিবে,—ভারত-স্থাপত্যের ইতিহাসও নূতন ভাবে সঙ্কলিত করাইবার প্রয়োজন উপস্থিত করিবে। অধ্যাপক হাভেল এ সম্বন্ধে যতটুকু লিখিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা সহর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেই, সকলে ইহাকে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, এমন বোধ হয় না। অন্ততঃ ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসিগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবেন!

সকল গ্রন্থেরই প্রয়োজন থাকে। অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থেরও প্রয়োজন আছে। তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারত-স্থাপত্যের ধারাবাহিক আলো-

চনার প্রয়োজন হইতে পৃথক্। তাহা আর কিছু নয়,—দিল্লীর নবরাজনগর-নির্ম্মাণে ভারত শিল্পীকে নিযুক্ত করাইবার জন্য রাজপুরুষগণকে প্রবৃত্তি-প্রদান। গ্রন্থশেষে একখানি আবেদনপত্রে তাহা স্পষ্টাক্ষরেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি প্রদান করিতে চাহিলেই তর্ক উঠিতে পারে,—সত্য সত্যই তর্ক উঠিয়াছেও,—এখন আর ভারত-শিল্পী কোথায়—ভারত-স্থাপত্যের পুরাতন আদর্শই বা কোথায়? সে প্রাণ নাই,—সে আত্মত্যাগ নাই,—সে একনিষ্ঠা নাই,—সে ভক্তিবিশ্বাস নাই,—অথচ সে পুরাতন শিল্পাদর্শ আছে,—এরূপ সম্ভাবনায় সকলে আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং এই শ্রেণীর তর্ক নিরস্ত করিবার জন্য দেখাইতে হইবে,—অনাদরে অবহেলায় জীবন্মৃত ভারত-শিল্পী, নবযুগের নবীন পরিবর্ত্তন-স্রোতে বিপর্য্যস্ত হইয়াও, ভারতভূমি হইতে এখনও চিরপ্রস্থান করে নাই; তাহাদের হৃদয়ে এখনও ভারতবর্ষের চিরপুরাতন স্থাপত্যের আদর্শ বর্ত্তমান আছে। আরও দেখাইতে হইবে,—সুদীর্ঘ মুসলমান-শাসনে পুরাতন আদর্শের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, পুরাতন আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই;—মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়া কেবল শিখিয়াছে, কিছুই শিখাইতে পারে নাই। গ্রন্থের প্রয়োজন-সাধনের জন্য একটি একটি করিয়া এই সকল কথার অবতারণা করিতে হইত। অধ্যাপক হাভেলও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তর্কগুলি নিরস্ত হইয়াছে কি না, তাহা পৃথক্ কথা। কিন্তু ইহাই যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা গ্রন্থ পাঠ করিবামাত্র প্রতিভাত হয়।

এরূপ গ্রন্থ, যতই সুলিখিত হউক না কেন, অজ্ঞাতসারে একদেশ-দর্শী হইয়া পড়ে;—উদ্দেশ্যের অনুকূল সামান্য প্রমাণকে প্রধান প্রমাণ বলিবার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে না,—উদ্দেশ্যের প্রতিকূল প্রধান প্রমাণকেও উল্লিখিত বা আলোচিত হইবার যথাযোগ্য অবসর দান করে না। এরূপ গ্রন্থের বিশ্লেষণ-ব্যাপার আয়াসসাধ্য; সতর্ক দৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিতে না পারিলে, রচনা-লালিত্যে আত্মহারা হইবার আশঙ্কা থাকে;—ইহার অতি-স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সমালোচনা ভাবপ্রবণ হইয়া সমালোচনার প্রকৃত পারে।উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে

সুদীর্ঘ মুসলমান-শাসনসময়ে ভারতবর্ষে একটি অভিনব স্থাপত্য-রীতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ 'ইন্দো-সারাসানিক', কেহ বা 'ইন্দো-ইস্লামিক' বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন! এই নামকরণের বিরুদ্ধে

অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইহাকে সর্ব্বাংশে বৈজ্ঞানিক প্রথার নামকরণ বলা যাইতে পারে না। তথাপি মুসলমান-শাসন-সময়ে একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য-রীতি যে সত্য সত্যই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, অট্টালিকার অভ্রান্ত দলিলে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক হাভেল নিজেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহাই কি ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে তাজের রচনা-চেষ্টাকে চরিতার্থতা দান করে নাই? মুসলমান-শাসন-সময়ে মুসলমান স্থলতানগণের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে যে ভাবের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সহিত পুরাতন ভারত-স্থাপত্য-রীতির অনেক সম্পর্ক থাকিলেও, তাহাকে কি "সর্ব্বাংশে" পুরাতন ভারত-স্থাপত্য-রীতির "সম্পূর্ণ" নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায়?

অধ্যাপক হাভেল গুজরাতকে ও গৌড়কে এই অভিনব স্থাপত্য-কলার প্রধান সৃষ্টিকেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া, প্রকারান্তরে ইহার স্বাতন্ত্র্য বিঘোষিত করিয়াছেন। (১৫)গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল অট্টালিকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা মুখ্যতঃ ইষ্টকালয় হইলেও, রচনা-গাম্ভীর্য্যে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অট্টালিকার এবং অন্যান্য অট্টালিকার অনেকগুলি সচিত্র বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া অধ্যাপক হাভেল বলিয়াছেন,—তাহার মূলে হিন্দুর স্থাপত্য-রীতি, অথবা তাহার মূলে যে স্থাপত্যরীতি, ভারতবর্ষই তাহার উদ্ভবক্ষেত্র।

(১৫) মহামনা আকবরের আদেশে আগ্রায় কিল্লামধ্যে অনেকগুলি গৌড়ীয় রীতির প্রাসাদও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিজয় রাজ্যের চতুর্দ্দশ সংবৎরে আকবর আগ্রায় আসিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন। তাহা আইন-ই-আকবরিতে "বেঙ্গলী মহল" নামে উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন,—এখন যাহা "জাহাঁগীরি মহল" নামে পরিচিত তাহারই নাম ছিল "বেঙ্গলী মহল" এই নামকরণ সম্বন্ধে-আইন-ই-আকবরিতে (দ্বিতীয়ভাগ ১৮০পৃষ্ঠায়, যাহা লিখিত আছে, তদনুসারে ১৯০৩—৪ খৃষ্টাব্দের "আরাকিত্ত লজিকাল সরভে অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—"The reason for the name Bengali Mahall may he found in the statement made in the Ain to the effect that Akbar's fort in Agra contains more than five hundred stone edifices in the five styles of Bengal and Gujrat." সুতরাং গৌড়কে এবং গুজরাতকে স্থাপত্য রচনার সৃষ্টিকেন্দ্রস্থ বলিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেল কোনও নূতন তথ্যের আবিষ্কার সাধন করেন নাই; যাহা ইতিহাসে উল্লিখিত ও সুপরিচিত, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। তাজের রচনা-রীতিতে গৌড়ীয় রচনারীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় কি না, অধ্যাপক হাভেল তাহার আলোচনা করেন নাই।

এই সকল অট্টালিকার গম্বুজগুলি যে ভাবে গঠিত, সে ভাবের গম্বুজের আদর্শে তাজের গম্বুজ গঠিত হয় নাই। মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের গম্বুজ অপেক্ষা শেষ আমলের গম্বুজ কিছু পৃথক্;—রচনা-কৌশলে পৃথক্, ভাবভঙ্গীতেও পৃথক। এই পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। এরূপ পার্থক্যের কারণ কি?

অধ্যাপক হাভেল বলেন,—প্রথম আমলের স্থাপত্যকীর্ত্তি যেন "মহাকাব্য", এবং শেষ আমলের স্থাপত্য-কীর্ত্তি যেন "গীতিকাব্য";—একটি গঠনগাম্ভীর্য্যে অচল অটল; অপরটি লাস্য-বিকাশে টলটল-ঢলঢল। তাজের মূল গম্বুজের এইরূপ টলটল-ঢলঢল-ভাবই তাহাকে স্বপ্নবিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহাতে মূল প্রশ্নের মীমাংসা সাধিত হয় নাই। এক যুগে যাহা "মহাকাব্য" ছিল, তাহা পরবর্ত্তী যুগে "গীতিকাব্যে" পর্য্যবসিত হইল কেন, তাহার কারণ জানিবার জন্য কৌতুহল থাকিয়া গেল। তাহা কি ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির চরম চরিতার্থতা,—অথবা বিদেশাগত শিল্পাদর্শের প্রভাব-পরিপুষ্টতা,—অথবা পুরাপরিচিত বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণলব্ধ কলা-কমনীয়তা? ইহার মীমাংসায় মতভেদ ঘটা বিচিত্র নহে। ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা; সুতরাং মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, তাহার অনুকূল প্রমাণ আবশ্যক।

বৌদ্ধযুগে স্তূপের উপরিভাগ কিয়ৎপরিমাণে গম্বুজাকারে গঠিত হইত, ইহা সত্য কথা। তাহা "গম্বুজাকার" হইলেও "গম্বুজ" নহে;—মাটীর ঢিবির উপর ইষ্টকের বা প্রস্তরের আচ্ছাদন,—স্বতন্ত্র প্রয়োজনে, স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভাবিত। তাহারও আদর্শ বা রচনাস্মৃতি মুসলমান-শাসনসময়ে উত্তর-ভারতে কত দূর বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণও অনায়াসলভ্য নহে। উত্তর-ভারতের কোনও স্থানে তাহার আদর্শ বর্ত্তমান থাকিলে, অধ্যাপক হাভেল তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। তিনি যে দুইটি আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটি যবদ্বীপে, আর একটি দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত। তাহাও যে পুরাতন বৌদ্ধস্তূপের আদর্শে গঠিত, তাহারও প্রমাণাভাব। তাহার কথা যে উত্তর-ভারতে সুপরিচিত ছিল, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ উল্লিখিত হয় নাই।

মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলে যাহারা গম্বুজগঠনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বতন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের সহিত সত্যসত্যই সুপরিচিত থাকিলে,

একটি গম্বুজকেও বৌদ্ধস্তূপের কলা-কমনীয়তা দান করিতে পারে নাই কেন, তাহা একটি ব্যাসকূট। অধ্যাপক হাভেল তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অনেক কথা,—বুঝিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিলেও,—বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়াই বোধ হয়।

মুসলমান-শাসনের প্রথম আমলের অনেক গম্বুজ, সমুচ্চ অট্টালিকার উপরে অবস্থিত হইয়াও, ডুবিয়া রহিয়াছে;—ভাসিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাতে বৌদ্ধস্তূপের পূর্ব্বাদর্শের অনুকরণচেষ্টা অপেক্ষা একটি নবাগত রচনা-লালসাই অধিক অভিব্যক্ত। জাহাঁগীরের আমল পর্য্যন্ত যত গম্বুজ রচিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে, স্বতই মনে হয়,—

"ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।"

প্রথম আমলে যাহারা গম্বুজ গড়িবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা নানারূপ "মক্‌স" করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা গৌড়ীয় ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা ইহার অনেক নিদর্শন দেখিয়াছেন। প্রথম আমলের গম্বুজকে, [অধ্যাপক হাভেলের ভাষায়] "মহাকাব্য" বলিতে হইলে, ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে,—তখনকার "মহাকাব্য" সগর্ব্বে অঙ্গ ফুলাইয়া আকাশে মাথা তুলিতে সাহস করিত না;—রণপরাভূত কুম্ভকর্ণের মত, বিপুলায়তন অট্টালিকার উপরে, চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিত! শের শাহের সমাধি-মন্দিরের গম্বুজই প্রথমে মাথা তুলিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—প্রথম চেষ্টা বলিয়া, তাহাতেও সফলতা অপেক্ষা আয়াস-স্বীকারের ভাব অধিক অভিব্যক্ত। হুমায়ুঁ বাদশাহের সমাধি-মন্দিরের গম্বুজ তাহা অপেক্ষা অধিক সাহস-পূর্ণ।

মোগল-শাসন ভারতবর্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই দুইটি গম্বুজ রচিত হইয়া থাকিলেও, ইহা মোগল স্থাপত্যরীতির নিদর্শন বলিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহার একটু কারণ আছে। বাবরের আত্ম-কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি প্রতিদিন বহুসংখ্যক স্থপতিকে ভারতবর্ষের নানা নগরে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বাবরের শাসন-সময়ের একটি অট্টালিকাও বর্ত্তমান নাই। অথবা বর্ত্তমান থাকিলেও, বাবরের অট্টালিকা বলিয়া কথিত হয় না। তাঁহার মৃতদেহ

কাবুলের নিকটে সমাধি-নিহিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে তাঁহার সমাধি-মন্দিরও রচিত হয় নাই। তাঁহার পুত্র—হুমায়ূঁ—বিপ্লববেষ্টিত হইয়াও, দশ বৎসর ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ফেরেস্তার গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—অনেক অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বিপ্লবে মোগলের ভারতাধিকারের প্রথম প্রয়াস কিয়ৎকালের জন্য বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছিল, সে বিপ্লবে ভারতবাসী শেরশাহ ও তাঁহার পুত্রই কিয়ৎকালের জন্য বিজয়লাভ করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল কার্য্যেই মোগলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে ইতিহাসে সুপরিচিত; তাঁহারা স্থাপত্য-শিল্পেও মোগলের কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য স্থাপত্য-সমালোচকগণ শের-শাহী স্থাপত্যরীতিকে মোগল-রীতির প্রথম উন্মেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। তৎকালে মোগলের সমরকন্দ নগর প্রাসাদ-শোভায় খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল,—তাহাকে পরাভূত করিবার আশায় শেরশাহী স্থাপত্যরীতি পুরাতনে পরিতৃপ্ত না হইয়া, নূতনের পক্ষপাতী হইয়া থাকিবে।

সমরকন্দের গম্বুজগুলির টলটল-ঢলঢল-ভাব এসিয়াখণ্ডের সকল স্থানেই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তাহার সহিত "পারসীক প্রভাবে"র সম্পর্ক ছিল। যে যুগে সমরকন্দের মোগলবংশের সহিত ভারতবর্ষের শেরশাহী-বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হইয়াছিল, ঠিক সেই যুগেই ভারতবর্ষেও টলটল-ঢলঢল-ভাবের গম্বুজের প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করিয়া, সুধীগণ শেরশাহী-স্থাপত্যরীতিকে সমরকন্দী-স্থাপত্যরীতি বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অনুমান যে ভিত্তিহীন, তাহা দেখাইতে হইলে, সমরকন্দী-গম্বুজের চিত্র প্রকাশিত করিয়া, তাহার সহিত ভারতীয় মোগলরীতির গম্বুজের পার্থক্য দেখাইয়া দিতে হয়। অধ্যাপক হাভেল তাহা করেন নাই। সমরকন্দের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাগুলি এখন রাসিয়ান্ পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা তাহার অলোচনায় ও চিত্রসংগ্রহে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানফল প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ের শেষ কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইতে পারে। তখন যদি ভারতবর্ষই তাজের একমাত্র উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, তবেই আমরা "লাভ" করিতে পারিব। এখনই "পাইয়াছি" বলিয়া, অনুসন্ধানচেষ্টা পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই! এখন বরং—আইস—যদি সম্ভব হয়,—অধ্যাপক হাভেলের স্বপ্ন সফল করিবার জন্য, তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

হুমায়ুঁ বাদশাহের সমাধি-মন্দিরের রচনারীতির সঙ্গে তাজের রচনারীতির সাদৃশ্য আছে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অধ্যাপক হাভেলও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি বরং স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন,—"সাদৃশ্য বড় সুস্পষ্ট অভি-ব্যক্ত; তাহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা মুর্খতামাত্র।" (১৬) কিন্তু অধ্যাপক হাভেল বলেন,—"সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহা কোনও বিদেশাগত শিল্প-প্রভাবের পরিচয় প্রদান করে না। রচনা-রীতি যে ভারতবর্ষেই উদ্ভা-বিত হইয়াছিল, হুমায়ুঁ বাদশাহের সমাধি-মন্দির তাহারই প্রমাণ-শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থিমাত্র; অন্যান্য গ্রন্থিও ভারতবর্ষেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, পারস্যে নহে,—মধ্য-এসিয়ায় নহে।" (১৭) এইখানে ফরগুসনের সঙ্গে মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—"ফরগুসন এই গ্রন্থি-শৃঙ্খলা ধরিতে না পারিয়াই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।" ইহাই অধ্যাপক হাভেলের নবাবিষ্কৃত ভারত-স্থাপত্য-রহস্য। সত্য হইলে, ভারত-স্থাপত্যের ইতিহাসে ইহা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিতে পারিবে।

যে পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থি আবিষ্কৃত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত, ফরগুসনকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিতৃপ্ত হইবার উপায় নাই। তিনি বহুকাল পূর্ব্বে সমর-কন্দী গম্বুজগঠনের সহিত তাজের গম্বুজ-গঠনের সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞের পক্ষেই তাহা সম্ভব ছিল। তখন তাজের কারিগরগণের নামধাম অপরিজ্ঞাত ছিল,—তখন বরং এসিয়া অপেক্ষা ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক-আবিষ্কারের লালসাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন জানা গিয়াছে, তাজনির্ম্মাণের সময়ে, গম্বুজ-গঠনে সিদ্ধহস্ত বলিয়া, রূমের ইস্‌মাইল খাঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল;—গম্বুজের শীর্ষদেশ-রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া,সমরকন্দের মহম্মদ সরিফকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এবং সমস্ত কার্য্যের পরিচালন-ভার ওস্তাদ ঈশার উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। অধ্যাপক হাভেলের

(১৬) * It would be foolish to make such an attempt, for the connection between the two buildings is obvious.—P 29.

(১৭)* Fergusson's mistake is in not recognising that Humayun's tomb is only one link in the evolution of the Taj, and that the remaining links must be sought for in India, not in Persia or Central Asia.--PP. 29 – 30.

গ্রন্থেও এই সকল বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। (১৮) তাহাতে কেবল একটি কথাই উল্লিখিত হয় নাই। তাহাও এই সঙ্গে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (১৯) তাহা এই যে, সর্ব্বকার্য্য-পরিচালক ওস্তাদ ঈশার প্রধান সহায় ছিলেন—তাঁহার পুত্র মহম্মদ সরিফ,—সমরকন্দ হইতে সমাগত,—গম্বুজশীর্ষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া আমন্ত্রিত,—সেই মহম্মদ সরিফ! ভারত-স্থাপত্য-রীতির সহিত এই পিতা-পুত্রের কত দূর পরিচয় ছিল, তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুসলমান-শাসনের প্রথম আমল হইতে শেষ আমল পর্য্যন্ত পুরাতন বৌদ্ধ-স্থাপত্যের আদর্শ উত্তর-ভারতে সুপরিচিত থাকিলে, এবং সেই আদর্শে তাজের গম্বুজ রচিত হইয়া থাকিলে, এই সকল বিদেশী কারিগর ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কেন, তাহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের ও আলোচনার প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই; সে প্রয়োজন বরং অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক হাভেল তাহার পথ-প্রদর্শন করিলেন বলিয়া বন্দনীয়।

যাঁহারা নূতন চিন্তা-প্রবাহের পথ-প্রদর্শন করেন, তাঁহারা মানব-জ্ঞান-বিকাশের সহায়। তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বসংস্কারের

---

(১৮) Ismail Khan Rumi, an expert in dome construction, also received 500 rupees. Two specialists for making the piannacle surmounting the dome, whose names were Mahammad Sharif of samarkand and Kazim Khan fo Lahore, were paid respectively 500 rupees and 295 rupees a month.-P. 31

(১৯) The chief designer and draughtsman was Ustad (or Master) Isa, otherwise called Mahammad Isa Effendi, who drew a salary of 1000 rupees a month, and was assisted by his son, Mahammad Sharif. The Agra copy, in the possession of the hereditary custodians of the monument says, that he came from Rum, interpreted to mean Turkey or Constantinople, and that his son came from Samarkand.-Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon. P. 417.

প্রতিকূলে একাকী সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হয়। এই অসুবিধার মধ্যেও যিনি বীরের ন্যায়, আমাদের হইয়া, আমাদের বিজয়-গৌরব উপার্জ্জন করিয়া দিবার জন্য, জীবন-সন্ধ্যার বিশ্রাম-লোলুপ শেষ সময়টুকু অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সুধীবর্গের অনুকরণীয় হউক॥ শুভমস্তু।

বিজয়া-দশমী, ১৩২০।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রকৃতি ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি।

আশ্বিনের "ভারতী" পত্রে চিত্রকলাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কলার নিদর্শন-সংগ্রাহকগণকে "কপিল মুনির রোষাগ্নি-সঞ্জাত ভীষণ অভিসম্পাতের" ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্বিনের "ভারতী" পত্রেই আবার বিজ্ঞবর বীরবল অবনীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত-নবচিত্রকলার প্রতিকূল সমালোচকগণের "কলাজ্ঞান-নয়-সাধারণ-জ্ঞানের-উপর-প্রতিষ্ঠিত" আপত্তির প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে, কাব্যকলার ন্যায় চিত্রকলাও নব জাগরণের অন্যতম নিদান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বীরবল যে চিত্রকলা-পদ্ধতির সমর্থন করিবার জন্য বীরদর্পে আগুয়ান হইয়াছেন, সেই চিত্রকলা-পদ্ধতির যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারাও জাতীয় চিত্রকলার অভ্যুত্থানের আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সমালোচনা "কলাজ্ঞান-সম্মত" না হউক, কলা-সম্ভোগ-লালসা-প্রসূত। সুতরাং বীরবল যে "অব্যবসায়ী"র অযথা নিন্দাবাদেরও বিচার করিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। এই "অব্যবসায়িগণে"র পক্ষেও কিছু বলিবার আছে। তিনি যদি "সাধারণ জ্ঞানে"র দিক্ দিয়া তাহার বিচার করেন, এবং যত দিন প্রশ্নটার একটা কিনারা না হয়, অন্ততঃ ততদিন তাঁহার চিত্রশিল্পী বন্ধুগণকে "বিদ্রোহী ভাব" অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে আরও সুখের বিষয় হয়।

রস্কিনের আলোচনার ফলে ইংরেজদিগের চিত্রকলা-রুচির পরিবর্ত্তন

ঘটিয়াছে ;—ইংরেজেরা এক সময়ে যে সকল চিত্রকলার অনাদর করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আজ তাঁহাদের জাতীয় চিত্রশালার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। (১) বীরবল বা আর কোনও কলা-বলীয়ান্ যদি সেই ভাবে নব্যবঙ্গের নবচিত্রকলার মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে আমাদেরও কল্যাণ হইতে পারে। যাঁহারা চিত্রশিল্পী, তাঁহাদের নিকটেও "অব্যবসায়িগণ" একটি বিনীত নিবেদন জানাইতে পারেন,—

"কর্ত্তা যানি ন পশ্যতি তানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ।"

আমাদের দেশের এই পুরাতন নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া, তাঁহারা যদি "নিজেদের দোষগুলিকেই গুণভ্রমে বুকে আঁকড়িয়া ধরে রাখ্‌তে না চান্,"—"অব্যবসায়ী"র নিন্দাবাদের মূলে কিছু সত্য আছে কি না, অবসর-মত তাহারও আলোচনা করেন,—তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতিকূল সমালোচকগণের সম্বন্ধে বীরবল বলেন,—

"এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এ দেশের চিত্রশিল্পীদের কর্ত্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে তার অনুকরণ করাটাই যে পরম পুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিনে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটান কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্চে আর্টের ধর্ম্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি নর্ত্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুসরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্চে, প্রতিভার চরণে শিকল পরাণো।"

"প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি" বীরবলের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, ইহা সুসমাচার বটে। কিন্তু "য়ুরোপ নামক ভূভাগে" এখন চিত্রকলা কি আকার ধারণ করিয়াছে, এবং চিত্র সমালোচকগণ কি সুর ধরিয়াছেন, তাহা কি "বীরবল" একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন? আমরা অব্যবসায়ী, সুতরাং যে

---

(১) "His (Ruskin's) personal and literary influence turned the taste of the age towards what the French call the "Primitives," and assured for them an adequate place in our National Gallery and public and private collections."—Frederic Harrison.

সকল ইংরেজী পত্রিকা কেবল য়ুরোপীয় চিত্রকলার আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, সে সকল দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের ঘটে না। কিন্তু যে সকল পত্রিকা অব্যবসায়ীরাও দেখিয়া থাকেন, তাহাতেও কখনও কখনও ব্যবসায়ীর লিখিত চিত্রকলা-বিষয়ক প্রবন্ধ বাহির হয়। এক জন লেখক গত বৎসর "শিল্প কি বিফল?" নামক প্রস্তাবের গোড়ায় লিখিয়াছেন,—

"এখনকার নানা শ্রেণীর নব্য তন্ত্রের চিত্রকরেরা বলেন,—য়ুরোপের প্রাচীন চিত্রকলা বিফল হইয়াছে। প্রাচীনকালের বড় বড় চিত্রকরেরা সকলেই ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্র বিংশ • শতাব্দে কোনও কাজে আসিবে না।"

এই নব্যতন্ত্রের চিত্রকলাও নাকি নিত্যই নূতন আকার ধারণ করিতেছে। বৎসরে বৎসরে, এমন কি মাসে মাসে, কলারীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে! আজ যিনি শিক্ষা-গুরু বলিয়া অভিনন্দিত, কালই হয় ত তিনি "সেকেলে" বলিয়া পরিত্যক্ত। কিন্তু এক বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর নব্যতন্ত্রের চিত্রকরগণের মধ্যেও. মতের ঐক্য আছে। ইঁহারা সকলেই প্রকৃতির অনুসরণের ঘোর বিরোধী; এবং যাহা মনে লয়, তাহাই আঁকিবার পক্ষপাতী। পূর্ব্বোদ্ধৃত লেখক এই সকল শিল্পীর মধ্যে আট জনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমি তিনটি উদ্ধৃত করিব।

I

He (the artist) is urged in by his very perception of the beautiful to embody in some sort of way what he has seen floating before his inward eye ....In so doing, he first of all reaches for himself, and afterwards discloses to others, a higher kind of truth than a realistic perception of fact, or a study of science, can yield."

II

In seeking after truth and endeavour never to be unreal or affected, it mus' not be forgotten that this endeavour after truth si to be made with materials altogether unreal and different from the object to be imitated. Nothing in a picture is real; indeed the painter's art is the most unreal thing in the whole range of our efforts.

111

We don't want Nature—what we want is the mind and soul of the artist.

এই সকল ইংরেজী বচনের স্বতন্ত্র অনুবাদ না দিয়া, বীরবলের প্রবন্ধ হইতে আরও কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেই অনুবাদের কাজ হইবে। যথা,—

"যে ঘোড়া দৌড়বে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী।"

আর এক জন বাঙ্গালী শিল্পীর (৩) বচন উদ্ধৃত করিলে ইংরেজীর ভাব আরও সুব্যক্ত হইবে,—

"আমরা যখন ভারতের কথা, ভারতের উপাখ্যান চিত্রে লিখিতে বসি, তখন কোনও প্রচলিত সৌন্দর্য্যের আদর্শে তাহা লিখিতে চেষ্টা করি না, মুক্তচক্ষে অন্তরের মধ্যে অবগাহন করিয়া যে ধ্যানমূর্ত্তির আভাস পাই তাহারই রূপকল্পনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি।"

এই সকল য়ুরোপীয় এবং বাঙ্গালী মনীষীর মতের তুলনা করিলে দেখা যাইবে,—য়ুরোপভূমিও [কলাজ্ঞতার হিসাবে] বাঙ্গালার ন্যায় রত্নপ্রসবিনী। য়ুরোপের কলাবিৎগণ যে কেবল বাঙ্গালী কলাবিৎগণের মত সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন নয়, য়ুরোপের নব্য চিত্রকরগণ (৪) বাঙ্গালার নব্য চিত্রকরগণের মত এমন ছবিও আঁকিতে পারেন, যাহা দেখিলে অনেকেই স্তম্ভিত হয়েন। প্রবীণ ইংরেজ চিত্রকর কলিয়ার (Hon. John Collier) গত মার্চ্চ মাসের "নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী" পত্রে নব্য তন্ত্রের প্যাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অনুভূতির পরপার-গমনতন্ত্রতা যাঁহারা প্রথম অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাঁহারা এখন প্রাচীন কলাচার্য্য বলিয়া গণ্য, তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কার কিছু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন;—তাঁহাদের চিত্রগুলি কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ চিত্রের অনুরূপ ছিল;—প্রভেদ এই ছিল যে, তাঁহাদের

---

(২) "A talk for an hour with some symbolist, Cubist or Post-Impressionist will go far to convince one of the futility of all the Art of the past, as far as Europe is concerned at least. They may be forced to concede that there have been great men in the past but they were all on wrong lines' and of 'no use to us of the twentieth century'.—"Robert Fowler R. I. Nineteenth Century and After, 1912, p. 125.

(৩) শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—প্রবাসী ১৩১৬, ৪৫৬ পৃঃ।

(৪) Gangin, Van Googh, Malisse, and Pi Casse.

চিত্রগুলি কদাকার ছিল, এবং চিত্রাঙ্কনে অক্ষমতারই পরিচয় দিত। কিন্তু পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা শীঘ্রই ইঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নবচিত্রকলা স্বপ্নদৃষ্ট বিভীষিকাময় শ্বাসরোধকর প্রাণীর আকার ধারণ করিয়া উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। পাগ্‌লা-ফাটকে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও পদার্থের সহিত এই সকল চিত্রের কোনও সাদৃশ্য নাই।" (৫)

কলিয়ার যে কি প্রকার চিত্র দেখিয়া এই তীব্র সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা জানি না। ভরসা ছিল, কোনও বাঙ্গালী চিত্রকর এ পর্য্যন্ত এরূপ চিত্র লিখিতে সমর্থ হয়েন নাই, এবং কখনও হইবেন না। কিন্তু আশ্বিন মাসের "ভারতী" পত্রে কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর স্বাক্ষরযুক্ত এমন কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা [টীকা টিপ্পনী ব্যতিরেকে] অজ্ঞ অব্যবসায়ীর নিকট নৈশ স্বপ্নের বিভীষিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে।

য়ুরোপের নব্য তন্ত্রের চিত্রকলা এখনও উন্নতির শেষ সীমায় পদার্পণ করে নাই। নূতন "ফিউচারিষ্ট (Futurist) সম্প্রদায়" "পোষ্ট-ইম্‌প্রেসনিষ্ট"দিগকে আসর হইতে অপসারিত করিবামাত্র "কিউবিষ্ট" (Cubist) নামক আর এক সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়া, "ফিউচারিষ্ট"দিগকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন! চিত্রসমালোচকগণ নূতনতম চিত্রকলা সম্বন্ধে 'ইহার ভিতরও কিছু আছে' এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (৬)

১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিখ্যাত পৌরাণিক (classical) চিত্রকর টেডেমা (Sir L. Alma-Tadema) পরলোকে গমন করিয়াছেন। এবার

(৫) "In its (Post-impressionism) earlier exponents (who have now become old masters and are considered almost classic by their followers) there was some remnant of tradition ; that is, their work bore some resemblance to ordinary painting—they were only extremely ugly and ill-drawn. Of course, these were soon left behind, and the movement advanced by a series of nightmares which looked like nothing in the world except the drawings and paintings executed in lunatic asylums, to which indeed they bore a striking resemblance (P. 598)."

(৬) They are again beginning to use the blessed formula that 'there is something in it.'

লণ্ডন নগরে "রয়াল একাডেমী"তে টেডেমার চিত্রনিচয়ের প্রদর্শনী হইয়াছে। দেশ বিদেশের ধনীর গৃহে বা সাধারণ চিত্রশালায় টেডেমার যে সকল চিত্র স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা অনেক কষ্টে ধার করিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা এই প্রদর্শনী সাজান হইয়াছে। এই প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করিয়া, নব্য তন্ত্রের শিল্প-সমালোচকগণ যেরূপ কার্পণ্যের সহিত টেডেমার চিত্রকলার সমালোচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদ করিবার জন্য, মাননীয় জন কলিয়ার উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। নব্য সমালোচকগণের কার্পণ্যের কারণস্বরূপ কলিয়ার লিখিয়াছেন,—

"(টেডেমার চিত্রপ্রদর্শনীতে) এই সকল হতভাগ্য বিক্ষিপ্তচিত্ত সমালোচক হঠাৎ একত্র বহুসংখ্যক স্থিরবুদ্ধির পরিচায়ক, সুন্দর, সুখকর চিত্র দেখিতে পাইলেন। চিত্রগুলি এমনই সেকেলে ধরণে অঙ্কিত যে, ইহাতে মাংসপেশী মাংসপেশীর মতই দেখায়;—কাপড় চোপড় কাপড়-চোপড়ের মতই দেখায়, মারবেল পাথর মারবেল পাথরের মতই দেখায়,—এবং কিছুই কেবল বর্ণলেপের মত দেখায় না! এই সকল চিত্রে লিখিত মানুষগুলি দেখিতে সুখকর,—দুষ্কি য়ারত উন্মত্তের সহিত সাদৃশ্যবিহীন এই সকল চিত্রের সকল অংশই এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। সুতরাং হতভাগ্য সমালোচকগণ যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?" (৭)

এই সকল বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যায়,—বাঙ্গালার নব্য চিত্রকরগণের ও তাঁহাদের অনুকূল সমালোচকগণের মনে চিত্রকলা সম্বন্ধে যে সকল নূতন ভাব ফেনাইয়া উঠিতেছে, তাহা য়ুরোপীয় বুদ্ধির অনধিগম্য নহে; বরং সে দেশে প্রকৃতিদ্রোহী চিত্রকরের ও নব্যচিত্রকলার নবরসে রসিক সমালোচকের সংখ্যা অনেক অধিক। সুতরাং এই সকল চিত্রকরের ও সমালোচকের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রতিকূল সমালোচকগণ বীরবলকে বলিতে পারেন,—"প্রকৃতিনিষ্ঠা ছাড়িয়া, স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইলেও, নিস্তার নাই; তাহাতেও

---

(৭) "And suddenly these poor harassed creatrcs have sprung upon them a whole collection of sane, beautiful, and wholesome works, painted in such an old-fashioned way that flesh looks like flesh, draperies like draperies, marble like marble, and nothing look like paint; in which human beings are pleasant to look upon and bear no resemblance whatever to criminal lunatics, and in which all details are so painted that there is no difficulty at all in finding out what they are meant for. No wonder the poor critics did not know what to make of these pictures."

য়ুরোপের অনুকরণ-কলঙ্কের দাগ এড়াইবার উপায় নাই ; য়ুরোপের বাজে চিত্রকরগণের স্বেচ্ছাচারের অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ, এ কথাও ত কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।"

মূল কথা, এ দেশেও যেমন মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি আছে, "য়ুরোপ নামক ভূভাগে"ও তেমনই মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি আছে। প্রকৃতির ও চিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া ভারতবর্ষে যেমন দলাদলি হইতে পারে, য়ুরোপে তেমনই দলাদলি হইতে পারে, এবং আছে। তবে প্রভেদ কোনখানে? প্রভেদ এইখানে যে, য়ুরোপের ও ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থার ও বৃক্ষ লতা মনুষ্য পশু পক্ষীর আকারে প্রভেদ আছে। তুমি যদি য়ুরোপীয় সেকেলে চিত্রকর টার্ণারের বা টেডেমার 'পন্থা'র অনুসরণ করিয়া, ভারতের পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, অভ্রভেদী হিমাদ্রি, বা চারুচন্দ্রাননা কুললক্ষ্মী ঠিক লিখিতে পার, তবে কোনও ব্যক্তিই উহাতে ইউরোপের গন্ধ পাইবেন না। কিন্তু যে দেশের শিল্পশাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

"লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদিনিরীক্ষণম্।
তথা তথৈব কর্ত্তব্যমূহ্যং যত্নেন দেশিকৈঃ॥" (৮)

যে দেশের কবি "দর্শিতবিশ্বরূপৈঃ* চিত্রভিত্তিভিঃ" পরিশোভিত নগর (কাদম্বরীতে উজ্জয়িনী) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশের অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রে [গ্রিফিথস্, হেরিংহাম প্রভৃতির মতে] যথার্থই বিশ্বরূপ দর্শিত হইয়াছে, সেই যম-নিয়মের দেশে চিত্র লিখিতে গিয়া তুমি যদি প্রকৃতির দ্রোহাচরণ কর, তাহা হইলে লোকে বলিবে,—"তুমি না জানি কোন্ বিদেশীর অনুকরণ, অনুসরণ করিতেছ।"

বিজ্ঞ বিচারক কখনও এক পক্ষের কথা শুনিয়া একতরফা বিচার করেন না ; উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া ন্যায়বিচার করেন। এই জন্য, যাঁহারা চিত্রে প্রকৃতি-নিষ্ঠার পক্ষপাতী, এই শ্রেণীর য়ুরোপীয় সমালোচকগণের অপর পক্ষের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে কি বক্তব্য আছে, তাহাও বীরবল প্রমুখ লেখকগণের বিচারার্থ উদ্ধৃত করিব। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ফাউলার ও কলিয়ার, এই দুই জন লেখকই বলেন,—"যে সকল চিত্রকর প্রকৃতির প্রতিকৃতি-অঙ্কনে অসমর্থ,

(৮) হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্।

তাঁহারাই কেবল চিত্রে প্রকৃতির দ্রোহাচরণকে গুণপণার কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন (৯)

প্রকৃতির ও চিত্রকরের সম্বন্ধ কতকটা ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধের মত। ছাত্র লেখাপড়ায় যত কাঁচা, শিক্ষকের সে তত বিরোধী;—চিত্রকরও যত কাঁচা, [চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ] বিশ্বকর্ত্তার লিখিত বিচিত্র প্রকৃতিপটেরও সে তত বিরোধী। এ কথা অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দাবাদ নয়, ব্যবসায়ীর দৃঢ়স্বর-ঘোষণা। আর এক জন ব্যবসায়ী, চিত্রকলার ইতিবৃত্তের অধ্যাপক, চিত্রকলা বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও "টেট চিত্রশালা"র (Tate Gallery) অধ্যক্ষ ম্যাক্‌কল (D. S. maccoll) চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে অল্পদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

"ব্লেকের সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রাইএর বিরুদ্ধে, আমিও এই মতের পরিপোষণ করি—যিনি স্বীয় কল্পনার অনুকরণ করিয়া উচ্চ অঙ্গের চিত্র লিখিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রকৃতির অনুকরণ শিক্ষা করিতে হইবে।" (১০)

কিন্তু "প্রকৃতির অনুকরণে"র অর্থ পাশ্চাত্য কলাবিৎগণ "বহিরঙ্গের অনুকরণ" মনে করেন না; বহিরঙ্গের সাহায্যে অন্তর্জ্জগতের পারিপাট্য-প্রদর্শনই তাঁহাদের অনুকরণের উদ্দেশ্য। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ওয়াটস্ (G. T. Watts) বলিয়াছেন,—

"ফটোগ্রাফের কাচ যে ভাবে কেবল প্রকৃতির অবিকল নকল করিতে পারে, আমি অথবা অন্য কোনও চিত্রকর তাহা যে কখনও পারিব, এরূপ আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, মানুষ

(৯) Any departure from Nature's standards may safely be put down to mere inability to deal with them ; and the necessity to be content in consequence with the introduction of pictorial standards. (P. 129).

"There is a kind of movement in critical circles now which decries 'representation' in art. If this means anything, it means that objects should be painted to look like something different from what they really are. This theory has obviously a great advantage for bad painters. No bad painters has ever yet succeeded in representing Nature as it really looks. The worse the painter the more certain he is of not representing Nature even if he tries. However, I will not pursue the controversy beyond pointing out that this theory never seems to have occurred to the old masters (P. 604)".

"I hold with Blake against Mr. Fry that a man must learn to copy nature if, to any high purpose, he would copy his imagination. The nineteenth Century and After, Feb. (1912, P. 293)".

চিত্রপটের উপর স্বজাতির আনন্দবিধানের জন্য আত্মার যে প্রতিকৃতি প্রদান করে, কাচকলক তাহা পারে না। সম্পূর্ণ সম্যক ও একই প্রকারের (অর্থাৎ স্বভাবসম্মত) খসড়া চিত্র ভিন্ন আত্মার আলেখ্য-অঙ্কন অসম্ভব। যদি বহিরবয়ব যথাযথ ভাবে দর্শকের সমক্ষে উপস্থাপিত না হয়, তবে এই প্রকার কলাকৌশলের প্রকাশ হাস্যোদ্দীপক ও বিকট হয়।" (১১)

যথেচ্ছভাবে প্রকৃতির বিকৃতিসাধন করিলেই সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না; জড়প্রকৃতিতে জীবাত্মার সঞ্চারই প্রকৃত সৃষ্টিক্ষমতার পরিচায়ক। জড়প্রকৃতি মায়ার প্রহেলিকা। কিন্তু পরমাত্মাও এই মায়ার আবরণ পরিয়াই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা ঈশ্বরের রূপ ধারণ করেন; এবং মায়াময়ী অবিদ্যার আশ্রয়েই জীব-রূপে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করেন। ক্ষুদ্র মানুষ মায়াময়ী প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সৃষ্টি করিবে,—ইহাও কি সম্ভব! দেশভেদে চিত্রে প্রকৃতির অনুসরণের প্রকারভেদ ঘটিয়াছে, এবং তজ্জন্য চিত্রকলারীতিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে ম্যাক্‌কল এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পরীতির পার্থক্যের মূলকারণ পরিস্ফুট হইয়াছে,—

"গ্রীসের খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দের শিল্পকলা একান্ত স্বভাবসঙ্গত ও মানুষভাবাপন্ন, সুতরাং ধর্ম্মভাবব্যঞ্জক নয়; সেইরূপ ফরাসী দেশের গথিক যুগের (ত্রয়োদশ শতাব্দের) এমিয়েনের গির্জ্জার খ্রীষ্টপ্রতিমাও ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত। চিত্রে ধর্ম্মভাব দেখিতে হইলে, টিসিয়েনের (মৃত্যু ১৫৭৬) পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চিত্রের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গ্রীসের প্রাচীন পাষাণ-প্রতিমায়, গথিক যুগের প্রথম ভাগের পাষাণ প্রতিমায়, ইজিপ্টের পাষাণ-প্রতিমায় ও এসিয়া খণ্ডের ব্রোঞ্জ-প্রতিমায় কিছু ঐশ্বরিক ও শাশ্বত ভাব সংক্রামিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিমার নির্ম্মাণ-রীতি গ্রীসদেশীয় ভাস্করদিগের সুশোভন স্বভাবানুকরণ-রীতি হইতে পৃথক, এবং রোমাণ্টিক শিল্পের অঙ্গবিশেষের সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ দ্বারা ভাবব্যঞ্জন করিবার রীতি হইতেও পৃথক। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতিতে, ব্যক্তি-সমষ্টির চিত্রে, সাধারণ গার্হস্থ্যজীবনের চিত্রে ও অচেতন পদার্থের চিত্রে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব-লক্ষণ বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়, দেব-প্রতিমায় তাহা প্রদর্শিত হয় না। যে সকল দেশ ধর্ম্মের জন্মস্থান, সেখানে এই খুঁটানাটীবর্জ্জিত স্থূল অনু-

"The photographic lens will accomplish the mere copying of Nature better and far more accurately than I or any other artist can ever hope to do. But it is the soul that a man puts upon the canvas for the delight and improvement of his fellowmen that the lens cannot accomplish, and this can not be done without full and proper, and I may say the only, study, for the expression of that art could only become rediculous and grotesque if the structure were not truthfully placed before the spectator. (The Nineteenth Century, Jan. 1913, P 120)".

করণ-রীতি দেবতার প্রতিমা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও অবলম্বিত হইয়াছে; যে চিত্রকর ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন, তাঁহার উপরও ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এবং যে শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রিত করেন, তাঁহাকেও মেঘ অথবা সমুদ্র লিখিবার সময় এই রীতি-সঙ্কেত অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে। (১২)

ভারতবর্ষের, চীনের ও জাপানের শিল্প-রীতিতে প্রকৃতি অবজ্ঞাত হয় নাই; স্থূল ভাবে অনুকৃত হইয়াছে; মানবদেহের খুঁটিনাটী পরিত্যক্ত হইয়া পূর্ণতার বিগ্রহ পূর্ণাবয়ব দেবতার প্রতিমায় পরিণত হইয়াছে। দেবমূর্ত্তিগঠনে অভ্যস্ত প্রাচ্য শিল্পী জীব বা জড়পদার্থ লিখিতে বসিয়াও, একই রচনা-রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। যিনি ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অঙ্কিত করিবেন, তাঁহার ভেটীরিনরী কলেজে গিয়া মরা ঘোড়া কাটিয়া দেহতত্ত্ব শিখিয়া আসিবার দরকার নাই; মোটামুটি ঘোড়া আঁকিয়া, তাহাতে স্বর্গাধিপতি দেবরাজের বাহনের যে ভাব, তাহা সঞ্চারিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি সাধারণ সওয়ারের ঘোড়া অঙ্কিত করিবেন, মোগলযুগের চিত্রকরের মানসী ঘোড়া নিজ নামে না চালাইয়া, কিঞ্চিৎ এনাটমী দেখিয়া শুনিয়া, জীবন্ত ঘোড়ার চিত্র অঙ্কিত করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নয় কি? যদি স্বভাবের অনুকরণ দোষার্হ হয়, তবে সৃষ্টিছাড়া চতুষ্পদ আঁকিবারই বা দরকার কি? কাগজের উপর কতকগুলি কালির ফোঁটা ফেলিয়া, এবং কতকগুলি রেখা টানিয়া, নীচে "ঘোড়দৌড়" লিখিয়া দিলেই ত যাহার বর্ণপরিচয় হইয়াছে, সেও বুঝিতে পারিবে, ব্যাপার

"Just as in Greek art true 'classic' period is too realistic and human to be religious, so in Gothic figures like le beau Christ of Amiens are already outside, and in painting we must go back to 'primitives. behind Titian for examples of what we are in search of. In early Greek and Gothic blocks mosaic non-musive golden grounds, in Egyptian granite, in oriental bronze something of the divine and eternal was communicated, And the drawing of such images differs from the choice realism of classic art, the curiosity and personal emphasis of romantic; it sweeps over the minor point of representation that in portrait, in the drama, in general and still-life are properly sought and enforced. In the native lands of religion this synthetic drawing has extended itself beyond the religious subject, has checked the portrait paints when he deals with the individual, and even the landscape painter, tied to symbols when he seeks the freedom of clouds or sea."

কি! ভারতের, চীনের, জাপানের চিত্রকলাকে ও ভাস্কর-কলাকে ইউরোপীয় হিসাবে ঠিক প্রকৃতিনিষ্ঠা (realism) বলা যাইতে পারে না; দেবতা-ধ্যানতৎপর শিল্পীর অনুভূতি-পরতন্ত্রতা বা Impressionism বলা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার নব্য চিত্রকরগণের রীতি পাশ্চাত্য Post-impressionism বা অনুভূতির পর-পারতন্ত্রতার অনুকরণমাত্র। কখনও কখনও সম্প্রসারিত অঙ্গুলিতে বা বাহুতে রোম্যাণ্টিক প্রভাবও ধরা পড়ে।

প্রাচ্য অনুভূতি-পরতন্ত্রতা কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি জাপান, সর্ব্বত্রই এখন মৃত। জাপান পাশ্চাত্য-রীতির আশ্রয়ে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও সফলকাম হয় নাই। পুরাতন ধর্ম্মভাব ফিরিয়া না আসিলে, পুরাতন চিত্রকলা-রীতির পুনরুজ্জীবনের আশা দুরাশা! উন্নত পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি অবলম্বন করিয়া, কেহ কোথাও এ যাবৎ দেবতা গড়িতে পারেন নাই। দেবতা-সৃষ্টি কেবল রীতির কর্ম্ম নয়, তাহার সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ চাই। দেবতা ছাড়া আরও ত অনেক জিনিস গড়িবার আছে, তাহা গড়িতেও প্রতিভার প্রয়োজন—কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টিও আবশ্যক। যাঁহার সেই প্রতিভা আছে, তাঁহার সেই প্রতিভাসঞ্জাত জীবাত্মাকে কলেবর দিবার নিমিত্ত প্রকৃতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। এই প্রকৃতির অনুসরণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিত্রবিজ্ঞান—পাশ্চাত্য রীতিতে নতোন্নত প্রদেশের আলেখ্য-রচনা ও ইঙ্গিতে দূরত্ব-সূচনা বিশেষ কার্য্যকরী। তাই মনে হয়, এ দেশের শিল্প বিদ্যালয় হইতে পাশ্চাত্য চিত্রকলারীতি বড় তাড়াতাড়ি নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে!

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

কমলাকান্তের "এস এস বঁধু এস!"

রজনী গভীর। গ্রাম নিস্তব্ধ। এমন সময়ে কোন এক গৃহস্থের বাটীর সদর দরজা হইতে একটি লোক দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূরে আসিয়া বন্দুকের একটি আওয়াজ করিল; সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুষুপ্ত গ্রামবাসীদিগকে জাগরিত করিয়া চারি দিক হইতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। ঐ গৃহস্থের বাটীতেও ঐরূপ ঢাক ঢোল বাজিল। মহাষ্টমী রাত্রিতে সন্ধিপূজা আরব্ধ হইল। সেকালে সকলের বাড়ীতে ঘড়ি থাকিত না।

সেই জন্ত এই বাটীর গৃহস্থ বন্দুকের শব্দে অন্যান্য পূজাবাটীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে সন্ধিপূজার সময় জ্ঞাপন করাইতেন।

রাত্রি তখন ঠিক কত, তাহা আমার মনে নাই; কেন না, বহুকালের কথা। অনুমান দ্বিতীয় প্রহর হইবে;—অষ্টমীর চাঁদ তখনও অস্ত যায় নাই। এই গৃহস্থের বাটীর ভিতর সর্ব্বত্র আলোকময়। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই আলোকের মালা;—ছোট ছোট প্রদীপের আলো, সন্ধিপূজার আলো। গুটি-কতক বালক ঐ আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, যেটি নিভিতেছে, তৎ-ক্ষণাৎ সেইটি জ্বালিয়া দিতেছিল। পূজার দালানেও ঐরূপ আলো, দশভূজার সম্মুখ হইতে উঠানে নামিবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত ঐরূপ দীপের শ্রেণী। অল্পক্ষণ পরেই ঢাক ঢোল বাজনা বন্ধ হইল, বাটী কতকটা নিস্তব্ধ হইল, কেবলমাত্র দশভূজার সম্মুখে পুরোহিতের ও তন্ত্রধারের মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভিতর-দালানের মধ্যস্থলে সিংহ-পৃষ্ঠে অসুর-মর্দ্দিনী বাড়ী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে স্তূপাকার বিল্বপত্র ও নানাপ্রকার ফুল, তন্মধ্যে পদ্মফুলের ভাগই বেশী, তাহার নিকটে পুরোহিত ও তন্ত্রধার বসিয়া পূজা করিতে-ছিলেন। তাঁহাদিগের সন্নিকটে একটী থামে ঠেস দিয়া পৃথগাসনে আর এক ব্যক্তি বসিয়া,—ইনি দেখিতে সাধারণ মনুষ্যের মত নহেন, তাহাঁকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি যেন সকলের হইতে স্বতন্ত্র। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা, কোনও মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী ইঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কামধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কামধর্ম্মের ব্রত করিয়াছিলেন ইত্যাদি।" এই মহাপুরুষের বয়ঃক্রম, তখন প্রায় অশীতিবৎসর অতীত হইয়া থাকিবে। দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, দেহ না ক্ষীণ না স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটির দৃষ্টি অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন। সেকালের প্রাচীনদিগের যেমন গলায় তুলসীমালা ও নাসিকায় ফোঁটা থাকিত, ইঁহার সে সকল বালাই কিছু ছিল না। কেবলমাত্র একখানি চাদরে গা ঢাকিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে বসিয়াছিলেন। বাড়ীর দালানে কতকগুলি প্রাচীন ভদ্রলোক মাথায় চাদর জড়াইয়া একখানি গালিচায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। প্রতিমার পশ্চিম দিকে, অন্তঃপুরের প্রবেশ-দ্বারের সন্নিকটে কতিপয় সধবা, বিধবা, প্রাচীনা গলায় অঞ্চল দিয়া বসিয়া জপ করিতেছিলেন।

আমি একটি থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কি দেখিতেছিলাম, ঠিক মনে-

নাই। ছেলেগুলি যে আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাছে তাহারা আলোতে কাপড় ধরাইয়া ফেলে, বোধ হয়, তাহাই দেখিতেছিলাম। এমত সময়ে আমার পশ্চাতে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দেখিলাম— বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া টানিলেন, অর্থাৎ সরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, গোঁফের চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, মস্তকের অনেকগুলি কেশ পাকিয়াছে। তখন বঙ্গদর্শনের পূর্ণ-যৌবন, বঙ্গসাহিত্যসমাজে তাঁহার একাধিপত্য। তিনি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনও কথা নাই।

আমি তাঁহার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া অসুরের মাথায় কৃষ্ণবর্ণের একটি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা যে কি, দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারি নাই; পরে জানিয়াছিলাম, উহা বিল্বপত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসুরের মাথায় ওটা কি?" কিছুক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন, "উহা গণেশের ইঁদুর।" আমি বলিলাম, "গণেশের ইঁদুর" অসুরের মাথায় কেন? তিনি উত্তর করিলেন, "ক্ষুদ্র জানোয়ারদের অসুরের ঘাড়ে উঠিবার ঠিক এই সময় হইয়াছে,—দেখ ঐ কার্ত্তিকের ময়ূর অসুরকে ঠোকরাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাই-তেছে,—আর ঐ দেখ প্রতিমার চারিধারে যে সোলার পাখীগুলা আছে, উহারা ডানা ঝাড়িতেছে, উহারা উড়িয়া আসিয়া অসুরের ঘাড়ে বসিয়া ঠোক্‌রা-ইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসুরের অপরাধ?" তিনি বলিলেন, "অপরাধ কিছুই নহে,—যাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত, অপরাজেয়, যাহাদের সকলে ভয় করে, তাহাদের মুমূর্ষু অবস্থাতে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহাদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করে।" আমি বলিলাম, "অসুরের ত এখন মুমূর্ষু অবস্থা নহে, ঐ দেখুন, ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দেবীকে তরওয়াল উঠাইয়া মারিতে উদ্যত।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "বটে, বটে! বীরপুরুষেরা—তেজস্বী পুরুষেরা শত্রুহস্তে ঐরূপেই মরে, ম'রেও মরে না; কিন্তু অসুরের আর কি আছে, অসুর ত মরেছে, সিংহী ভীষণ দন্ত দ্বারা উহাকে কামড়াইতেছে, আর দেবী একটা ভয়ানক সাপ উহার গায়ে ছাড়িয়াছেন, সে মুহুর্মুহুঃ উহাকে ছোবলাইতেছে, আর তিনি স্বয়ং দক্ষিণের এক হস্তে বর্শা দ্বারা সজোরে উহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতেছেন, আর বাকী অষ্ট হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে নানা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন,— অসুর মরেছে, ক্ষুদ্র প্রাণীদের ঘাড়ে চড়িবার এই ত সময়।" কথাগুলি

আমার যত দূর স্মরণ আছে, তাহা আমি আমার নিজের ভাষায় সাজাইয়া বলিলাম।

এই কথোপকথনের পর বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিলাম। সেখানে কেহ তামাক খাইতেছিলেন, কেহ বা খোস গল্প করিতেছিলেন, প্রায় সকলেই বঙ্কিমের প্রতিবাসী। কেহ কেহ প্রথম রাত্রের ফলাহারের পর আর বাটী যান নাই, ঐ ঘরেই ছিলেন। আর কেহ কেহ বাদ্যোদ্যম শুনিয়া আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জন বিদেশীয়,—ঐ গ্রামের কোনও এক গৃহস্থের জামাতা। এই ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে অফিসে চাকুরী করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান চাকুরী কলিকাতার বড়মানুষদিগের মোসাহেবী। যখন ইঁহার পরিবার পিত্রালয়ে থাকিতেন, তখন ইনি প্রতি শনিবারে ও অন্যান্য ছুটীতে কাঁঠালপাড়ায় আসিতেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতেন। এই বাবুটির কথা এই স্থানে উল্লেখের কারণ পরে প্রকাশ পাইবে। আর একটি বিদেশী লোক অতি কুণ্ঠিতভাবে বসিয়াছিল। ইহার নাম বলহরি দাস, রাণীহাটী পরগণায় ইহার বাটী, যে স্থানের কীর্ত্তন "রেণিটী"র কীর্ত্তন বলিয়া বিখ্যাত। এই লোকটি ভাল কীর্ত্তন গাইতে শিখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজের নিকটেই সে থাকিত। অদ্য তাঁহারই আদেশানুসারে উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পরে সকল ভ্রাতা উপস্থিত হইলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও আসিলেন। বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কোনও মজলিসে প্রবেশ করিলে সভাস্থ সকলের গায়ে যেন electricity ছড়াইয়া দেয়, সকলেই উল্লসিত হয়। আমি দেখিয়াছি এই গুণটি যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তাহা নহে। দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রেরও ছিল; মধুসূদনের কিয়ৎপরিমাণে ছিল বটে, কিন্তু সে অন্যরূপ। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র মজলিস সরগরম হইল, যাঁহারা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন, হাসির হর্‌রা উঠিল, তামাকের ধোঁয়াতে ঘরের আলো মিট্‌মিট্‌ করিতে লাগিল। অনেকে শুনিয়া চমকিত হইবেন, কেহ কেহ বা বিরক্ত হইবেন, আমরা চার ভ্রাতা একত্র বসিয়া তামাক খাইতাম—অতিরিক্ত তামাক খাইতাম, এমন কি, মুখ হইতে নল নামিত না। শুনিলে আরও হাসিবেন, আমি এ প্রাচীন বয়সে ধূমপান করিয়া জীবিত আছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরে ঐ মোসাহেব বাবুটি তাঁহাকে আত্মীয়তাভাবে অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। কলিকাতার লোকে বঙ্কিম-চন্দ্র সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছিল, তাহাই শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ এই যে, তাঁহার বঙ্গদর্শনে "উত্তর চরিতের" সমালোচনা করিতে গিয়া পুরাতন লেখকদলের চাঁইকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

পুরাতন দলের লেখকগণ ও তাঁহাদের ভক্তেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে যেরূপ গালি-গালাজ করিয়াছিল, মোসাহেব বাবু তাহা শুনিয়া আসিয়া সেই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু গালি শুনিয়া কোনও উত্তর দিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল—দুই ভ্রূ এক হইল। আর সজোরে ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। খুব বেশী পরিমাণে ধূম উদ্গীরণ হইতে লাগিল।

এই "উত্তরচরিত"-সমালোচনা সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গদর্শনের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক এক দিন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "পুরাতন দলের চাঁইকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে কেন?" উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "পুরাতন মন্দিরগুলিকে নাড়াচাড়া করা উচিত নয় কি?" লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করি-লেন, "নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঐ মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, উহার স্থানে নূতন মন্দির উঠিবে।" তাহাতে লেখক কি বলিলেন, তাহা ঠিক মনে নাই। তবে উহাঁর মর্ম্ম এই যে "উহা বড় কঠিন।" বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর ছিল, "দেখা যাউক।" বঙ্কিমচন্দ্র একে "উত্তরচরিতের" সমালোচনায় পুরাতন দলের প্রধানকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িবেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, এই দুই কারণে পুরাতন দলের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই উহারা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার বিরোধী ছিলেন। যখন "দুর্গেশ-নন্দিনী" প্রথম প্রকাশিত হয় তখন হইতেই তাঁহারা বিরোধী। "সোমপ্রকাশ" কাগজে দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা বঙ্কিমের ব্যাকরণ দোষ, ভাষা ও উপন্যাসখানি ইংরাজী গল্পের অনুকরণ, এই কয় দোষ ধরিয়া বিদ্রূপ করি-য়াছিলেন! বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকরণ-শিক্ষা ভালরূপই হইয়াছিল। ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।*

---

* এই প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে বিদ্রূপের কথাগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

তবে কেন যে লিখিতে বসিলে সকল সময়ে ব্যাকরণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাহা বোধ হয় আধুনিক লেখকদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সুহৃৎ দীনবন্ধু সোমপ্রকাশের সমালোচনার উত্তর দিয়া কিছু দিনের জন্য পুরাতন লেখকদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইত, আর তাঁহারা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লেখা বন্ধ হয়। কেননা, উহা অসাধু ভাষায় লিখিত, এবং বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ, উহা পাঠ করিলে লোকের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা দুর্দ্দমনীয় বেগে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। ঐ ভাষার নামকরণ হইল বঙ্কিমীভাষা, এবং তাঁহার পুস্তকের "দূষিত বিদেশীয় ভাব?" জাতীয় উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিল।

যাউক, এবারে মহাষ্টমীর সেই রাত্রের কথা বলি। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল। আলস্য বোধ হওয়াতে আমি একটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিলাম, ঘুমাইয়া পড়িলাম, কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, জানি না। হঠাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অতিদূরনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার যে কি সুখানুভব হইল, তাহা যাঁহারা নিশিতে অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর পূর্ব্বোল্লিখিত কীর্ত্তনগায়কটি ঐ ঘরে একটি গীতগায়িতেছিল। যেমন মধুর গীত, তেমনই মধুর স্বর। আমি স্থিরভাবে রহিলাম, পাছে নড়িলে এ মোহ ঘুচিয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া গায়ক গীতটি গায়িল গীতটি এই :—

"এসো এসো, এসো বঁধু, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মনি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন-পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥"

অনেকক্ষণ পরে গীত বন্ধ হইল, গায়ক বাহিরে উঠিয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া বসিলাম, এ দিক ও দিক চাহিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র বামহস্তে মস্তক রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছেন, মুখ হইতে নল অনেকক্ষণ খসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি কোথায়?—একখানি ছবির প্রতি। ছবিখানি বিলাতী ছবি, একটি অনুপমা সুন্দরী একছড়া মতির মালা গলায়; আর এক ছড়া মতির মালা একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে অতি সঙ্কুচিত ভাবে তুলিতেছেন, আর হাসি-হাসি-মুখে বাম দিকে অপাঙ্গে কাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, যেন তাহার অমতে উহা তুলিতেছেন। অলঙ্কারপ্রিয়া সুন্দরীর এক ছড়া মতির মালায় মন উঠে নাই, আবার একছড়া তুলিতেছেন, যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে ব্যক্তি ঐ পটে অঙ্কিত নাই। ছবিখানি বড় সুন্দর, সকলেই উহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কি ঐ ছবির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন?—তাহা নহে। কে বলিবে তাঁহার মনে তখন কি হইতেছিল। মানবের স্বভাব এই, একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার সময় সাধারণতঃ সে অনন্য মনে একটা পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টি একস্থানে আবদ্ধ থাকে। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখে ঐ ছবিটি ছিল, সেই জন্য দৃষ্টি উহার প্রতি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়া গিয়াছেন—

"যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টি কুশলী কবির সৃষ্ট দৈব বংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না; সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন পারিব না।"

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গান শেষ হইলে ছবির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র গীত শেষ হইলে শয়ন করিয়া কড়ি বরগার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। তিনিও প্রতিভাশালী, তাঁহারও মনে কত কি উদয় হইতেছিল, কে জানে? গায়ক পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল, আবার গান আরম্ভ

হইল, এবার অন্য গান হইল, "এস তোমায় নয়নে লুকাইয়া থোবো" ইত্যাদি। ভাবিলাম, ইহা অন্য কবির রচিত। এমন সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "এ অন্য কারিগরের হাতের।" তার পরে অনেক বৈষ্ণব কবির, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতির রচিত গীত চলিল। অবশেষে "এস এস, এস বঁধু এস" গাইবার ফরমাস্ হইল, আবার সেই স্বরের তরঙ্গ উঠিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সকলে নীরব নিঃস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিল—গান শেষ হইল। ইতিমধ্যে, কে এক জন আমার নিকটের জানালা খুলিয়া দিল, জানালার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভোর হইয়াছে, কিন্তু তখনও একটু অন্ধকার আছে, নীলাকাশে নক্ষত্রগণ হীনজ্যোতি হইয়াছে, কেবল পূর্ব্বদিকে একটা তারা বড় দপদপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—উহা বুঝি শুকতারা। বঙ্কিম-চন্দ্রের বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠ ছিল, তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে আম্র-কানন ছিল, উহার গাছগুলির উপরে অসংখ্য পাখী কলরব করিতেছে, ক্রমে ফরসা হইল, পাখীগুলি আহারান্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া গেল, আর বৈঠকখানার বাবুরা আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। এইরূপে মহাষ্ট-মীর রাত্রিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র "এস এস, বঁধু এস" গানটি প্রথম শুনিলেন। ইহার বহুদিন পরে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীকে "বঙ্গদর্শনে" এই গান শুনাইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়

বস্ত্র—কন্থা।

বর্ত্তমান সময়ে কন্থা বা কাঁথা গরিবের শীতনিবারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমৃদ্ধ বিলাসীর সহিত ইহার সম্পর্ক দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের মেয়েমহলে প্রসূতির শিশুপোষণে ইহার কতক ব্যবহার দেখা যায়। বঙ্গের কোন কোন স্থানে ভদ্রলোকের ব্যবহারেও ইহার সামান্য উপযোগ ছিল, এবং অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ইহাতে মেয়েদের শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু অল্পমূল্য কম্বলের আমদানীতে এই শিল্প ক্রমশঃ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। মধ্যযুগের কবিও জীর্ণপটনিবদ্ধ কন্থাকে

দরিদ্রের উপকরণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। (১) কিন্তু পুরাকালে এই জিনিস ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এমন কি ইহার সম্পর্কে অনেক দেশ পরিচিত হইত, পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র এবং কাশিকাবৃত্তি প্রভৃতির উদাহরণ এই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। উক্ত ব্যাকরণের অনেকগুলি সূত্রের সহিত কন্থার সম্পর্ক রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সূত্রের অর্থ এইরূপ "যদি উশীনর দেশীয় কন্থা বুঝায়, তবে কন্থা শব্দ যাহার পরে আছে, এমন তৎপুরুষ সমাস ক্লীবলিঙ্গ হয়। উদাহরণ "সৌশমিকন্থম্" "সংজ্ঞায়াং কন্থোশীনরেষু" পাং। ২।৪।২০। এই স্থলে পাণিনীয় ভাষাবৃত্তিকার স্মৃষ্টিধরাচার্য্য লিখিয়াছেন "সৌশমিকন্থ" শব্দের অর্থ সৌশমি কর্ত্তৃক কল্পিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত "কন্থা" শীতত্রাণ বিশেষ (২)

অপর একটি সূত্রে বলা হইয়াছে, কন্থা প্রভৃতি শব্দ যাহার উত্তরপদে রহিয়াছে, দেশবাচক তাদৃশ বৃদ্ধিসংজ্ঞক প্রাতিপদিক হইতে শৈষিক ছ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ দাক্ষিকন্থীয়ং ইত্যাদি। "কন্থাপলদ নগরগ্রাম হ্রদোত্তরপদাৎ। —পাং। ৪।২।১৪২।

অন্য একটি সূত্র "বর্ণৌ বুক্"। পাং। ৪।২।১৪৩। বর্ণু নামক একটী নদী, এই নদীর সমীপবর্ত্তী দেশ বর্ণু নামে অভিহিত হয়। এই বর্ণুদেশের কন্থা বুঝাইলে কন্থা শব্দের পর বুক্ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ "তথাহি জাতং হিমবৎমুকান্থম্". (কাশিকা) ব্যাকরণেও যাহার ভূরি নিদর্শন দেখা যায়, যাহার নামে দেশ পরিচিত সে জিনিস শিল্পের উন্নত পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কালে যাহা লেপ নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে হয় ত তাহাও কন্থা নামেই পরিচিত হইত, সংস্কৃত সাহিত্যে লেপের স্বতন্ত্র নাম দেখা যায় না, অথচ যে দেশে শীতের প্রাচুর্য্য, তুলা সুপরিচিত এবং সুলভ, সে দেশের লোক লেপের ব্যবহার জানিত না, এইরূপ কল্পনাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান কালে মুর্শিদাবাদের বালাপোষ যেমন নানা দেশে সুপরিচিত, পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ এইরূপ শীতনিবারক যাবতীয় সূচীবিদ্ধ জিনিসই কন্থানামে অভিহিত হইয়া শিল্পের নৈপুণ্য-

(১) ভিক্ষাশনংভবনমায়তনৈক দেশঃ! শয্যাস্তরঃ পরিজনো নিজদেহভারঃ॥
বাসশ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা হাহাতথাপিবিষয়ং ন জহাতি চেতঃ।—শান্তিশতক।

(২) শোভনঃ সমঃ শান্তিরষা, সুশমঃ তস্যাপত্যং সৌশমিং তৎকল্পিতা কন্থা, সৌশমিকন্থ শব্দে নোচ্যতে।

বশতঃ নিজের উদ্ভাবক দেশকে সভ্যসমাজে সুপরিচিত করিয়াছিল। মহর্ষি হারীতের একটী বচনেও শীতনিবারণে কন্থার বিশেষ উপযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময়ে কোনও ভোগোপকরণ গ্রহণ করিবে না, কেবল আচ্ছাদনার্থ কৌপীন শীতনিবারণী কন্থা এবং পাদুকা এই কয়টি বস্তুর সংগ্রহ করিবে (৩)।

কুথ।

কুথ নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার আস্তরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আস্তরণ হস্তীর পৃষ্ঠে ব্যবহৃত হইত। অমরকোষে ইহা [হস্তীর] আস্তরণ পর্য্যায়েই পঠিত হইয়াছে (৪) "নানার্থধ্বনিমঞ্জুরী" নামক অর্ব্বাচীনকোষে "কুথ" করিকম্বল নামে অভিহিত হইয়াছে।(৫) মেদিনীকোষের মতে "কুথ" শব্দের অর্থ বর্ণকম্বল [চিত্রকম্বল] (৬) শিশুপালবধে নারদের গাত্রস্থিত বিচিত্র মৃগচর্ম্ম ঐরাবতের আস্তরণ "কুথের" সহিত তুলিত হইয়াছে। (৭) এই সকল প্রমাণানুসারে বুঝা যায় "কুথ" নানাবর্ণে রঞ্জিত কম্বলজাতীয় আস্তরণ, ইহা সাধারণতঃ হস্তীর পৃষ্ঠেই ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান সময়ে হস্তীর পৃষ্ঠে দৃশ্যমান "ঝুল" নামক আস্তরণে নানাবর্ণের সমাবেশ এবং শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র কম্বল জাতীয়তা দেখা যায় না। তাহাতে বোধ হয়, আধুনিক শিল্পীগণ কেবল নানাবর্ণের সমাবেশ বিষয়েই প্রাচীনের অনুকরণ করিয়াছে।

এই "কুথ" পূর্ব্বকালে বিশিষ্ট উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইত। সিংহলদেশের "কুথ" জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের "রাজসূয়" যজ্ঞে পৃথিবীস্থ ভূপতিবৃন্দ যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সিংহলদেশীয় কুথেরও উল্লেখ দেখা যায়।(৮)

(৩) কৌপীনাচ্ছাদনংবাসঃ কন্থাং শীত নিবারিণীম্।
পাদুকেবাপিগৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহং॥—হারীত সং। ৫৩।

(৪) প্রবেণ্যাস্তরণং বর্ণঃ পরিস্তোমঃ কুথোদ্বয়োঃ। [ক্ষত্রিয়বর্গ]

(৫) কুথঃ স্যাৎ করিকম্বলঃ।

(৬) কুথঃ স্ত্রীপুংসয়ো বর্ণকম্বলে পুংসিবর্হিষি।

(৭) নিসর্গচিত্রোজ্জ্বল সূক্ষ্মপক্ষ্মনা, লসদ্বিসচ্ছেদসিতাঙ্গ সঙ্গিনা।
চকাসতং চারুচমূরু বর্ম্মণা কুথেন নাগেন্দ্রমিবেন্দ্র বাহনম্। ১।৮।

(৮) শতশশ্চ কুথাং স্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরণ।—সভাপর্ব্ব। ৫৩অ।৩৬।।

যদিও অভিধানে হস্তিপৃষ্ঠেই কুথের একচেটিয়া ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এই জিনিসটাকে প্রয়োজনান্তরে বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের তথ্য-নির্ণয়ে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা।

কারণ, কবিশিরোমণি বাণভট্ট আহারসময়ে চন্দ্রাপীড়ের জন্য দ্বিগুণীকৃত কুথাসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। (১) যদি কোষের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ স্থলের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে কবির অভিপ্রায় তিরোহিত হইবে, পক্ষান্তরে অপূর্ব্ব মতের আবির্ভাব হইবে, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

নানার্থধ্বনিমঞ্জরীতে "কুথা" অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ কুথ শব্দ কন্থা অর্থে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, কন্থার প্রয়োজন [শীতনিবারণ] কুথের দ্বারাও সম্পাদিত হইত, অল্পার্থে স্ত্রীত্বনিবন্ধন কুথ হইতে কুথার আবির্ভাব হইতে পারে; ইহাতে প্রাকৃতের প্রভাব আছে কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে,—যে জিনিস হাতীর পৃষ্ঠে শোভা পাইত, তাহাই কালান্তরে বা দেশান্তরে ভোজনাসনে ও শীতনিবারণেও অধিকারলাভ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানেও দেখা যায়, শীতকালে যানারূঢ় শ্বেতাঙ্গদিগের চরণাচ্ছাদনে ব্যবহৃত "রাগ্" কৃষ্ণাঙ্গের শীতনিবারণে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুকম্বল।

পাণ্ডুকম্বল নামক আর এক প্রকার রাজাস্তরণ কম্বলের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পাণ্ডুকম্বলের দ্বারা আবৃত রথ' পাণ্ডুকম্বলী নামে অভিহিত হইত, পাণিনি ব্যাকরণে ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। "পাণ্ডুকম্বলাদিনি" পাং। ৪।২।১২। এই পাণ্ডুকম্বল শব্দ যে রাজাস্তরণ বর্ণকম্বল অর্থাৎ চিত্রকম্বল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কাশিকা-বৃত্তি-কার তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "পাণ্ডুকম্বলশব্দো রাজাস্তরণস্য বর্ণকম্বলস্য বাচকঃ।"

পটমণ্ডপ।

পটমণ্ডপ বা বস্ত্রগৃহ, যাহা বর্ত্তমান কালে তাঁবু নামে পরিচিত, তাহা অতিপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সচরাচর দেখা যায়, যে সকল জিনিস অর্ব্বাচীন, তাহার নাম প্রায় যোগার্থের অনুসরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে,

(১) আহারমণ্ডপমগচ্ছৎ। তত্র চ দ্বিগুণীকৃতকুথাসনোপবিষ্টঃ * * * * * * আহারবিধিমকরোৎ।—[কাদম্বরী।]

এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ মশারির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে মশারির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত মশকনিবারণে ধূম-প্রয়োগের নিদর্শন ব্যাকরণাদিতে প্রসিদ্ধ। [মশকার্থোঽয়ং ধূমঃ।]

পটমণ্ডপের যদিও বস্ত্র-বেশ্ম বস্ত্রগৃহ প্রভৃতি যৌগিক নাম দেখা যায়, তথাপি ইহার "দূষ্য" নামটি খাঁটী রূঢ় তালিকায় গণ্য হইবে। অমরসিংহ ইহার অর্থনির্ণয়ে বলিয়াছেন—"দূষ্যাস্তং বস্ত্রবেশ্মনি"।

যে কালে "যাযাবর" শ্রেণী গৃহস্থের পরিচয় পাওয়া যায়, (১০) সে কালে পট-মণ্ডপের উদ্ভাবন সহজেই অনুমেয়। কারণ, "যাযাবর"দিগের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। অদ্যাপি যাযাবরদিগকে পুত্রকলত্রাদি সহ মণ্ডপেই জীবনযাপন করিতে দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের ব্যবহারে নিযুক্ত পটমণ্ডপে বায়ুসঞ্চালনার্থ কাণ্ডপট সন্নিবেশিত হইত। শিশুপালবধে তাহার নিদর্শন দেখা যায়। যুধি-ষ্ঠিরের যজ্ঞে প্রস্থিত কৃষ্ণের সহযাত্রী রাজদারগণ পথিমধ্যে "কাণ্ডপটে"র অব-কাশে (ফাঁকে) সঞ্চারী মন্দ বায়ুর দ্বারা শ্রমজনিত স্বেদজল নিবৃত্ত হইলে বস্ত্রগৃহমধ্যে সহজ দূর্ব্বাস্তরণে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াছিলেন। (১১) মল্লিনাথ "কাণ্ডপটক" শব্দের অর্থনির্ণয় করিয়াছেন—"দূষ্যাধোলম্বিবায়ুসঞ্চারার্থঃ পটঃ।" শিশুপালবধেই শুক্লবর্ণ (১২) ও তাম্রবর্ণ বস্ত্রে (১৩) নির্ম্মিত পটমণ্ডপের পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাও যে বিলাসোপকরণের সামগ্রীর পর্য্যায়ে গণ্য হইত, তাহা বলা যাইতে পারে।

বিতান।

বিতান বা চাঁদোয়ার সহিত আর্য্যজাতির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিলাসের উপকরণরূপে ও ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গরূপে, বিতানের ভূরি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞভূমি বিতানে পরিশোভিত হইত। অদ্যাপি বৃষোৎসর্গাদি

---

(১০) দ্বিবিধো গৃহস্থো যাযাবরঃ শালীনশ্চ।—মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায়; ১২৮ শ্লোক-টীকা। দেবল।

(১১) উৎক্ষিপ্তকাণ্ডপটকান্তরনীয়মান-
মন্দানিলপ্রশমিতশ্রমঘর্ম্মতোয়ৈঃ।
দূর্ব্বাপ্রতানসহজাস্তরণেষু ভেজে
নিদ্রাসুখং বসনসদ্মসু রাজদারৈঃ। ৫। স। ২২।

(১২) শুক্লাংশুকোপরচিতানি নিরন্তরাভি-
র্বেশ্মানি রশ্মিবিততানি নরাধিপানাম্। ৫। ৫২

(১৩) উন্নম্রতাম্রপটমণ্ডপমণ্ডিতং তৎ। ৫। ৬৮

কার্য্যে এই রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তান্ত্রিক উপাসনাতেও বিতানের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্ম স্থান মন্ত্র দ্রব্য ও দেহ, ইহাদের শুদ্ধি না হইলে দেবতার অর্চ্চনা হইতে পারে না।

বিতান ধূপ দীপ পুষ্পমালা প্রভৃতির দ্বারা শোভিত স্থানে পঞ্চবর্ণ চূর্ণের দ্বারা বিচিত্র মণ্ডল অঙ্কনের নাম স্থানশুদ্ধি। (১৪)

বিলাসোপকরণ বিতান ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। "কাদম্বরী"তে বর্ণিত শূদ্রকনরপতির স্নানভূমিতে সিত বিতানের পরিচয় পাওয়া যায়। (১৫)

বস্ত্রের পরিধানপ্রণালী।

কি ভাবে বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, আর্য্যশাস্ত্রে তাহারও একটা নিয়ম দেখা যায়। কুলবধূদিগের প্রতি উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন, নাভি এবং স্তনদ্বয় সংবৃত করিবেন। (১৬) পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পুরাকালে রমণীদিগের দুইখানি বস্ত্র ও স্বতন্ত্র অবগুণ্ঠনধারণের ব্যবস্থা ছিল। তদনুরূপ আবরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালী মহিলাগণ একখানা কাপড় পরিধান করিয়া থাকেন। এই একখানা কাপড় পরিধানেও নাভিস্তনাবরণ ও আগুল্‌ফাচ্ছাদন রূপ প্রাচীন স্মৃতিশাসনের সম্মান রক্ষিত হইতেছে। পুরুষগণের ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্রপরিধানের উপদেশ আছে। (১৭) শরীরের বামভাগে, পৃষ্ঠদেশে ও নাভিতে কক্ষত্রয় নিহিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই নিয়মের অন্যথা হইলে বৈধকার্য্যে অধিকার হয় না। (১৮) প্রাচীনদিগকে এই রীতিতে কাপড় পরিধান করিতে দেখা যাইত। বর্ত্তমান সময়ে এই রীতির অনুসরণ সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কেবল জ্ঞাতসারগণ বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে ত্রিকচ্ছ রীতিতে বস্ত্র পরিধান করেন। কাছা খুলিয়া রাখা

---

(১৪) আত্মস্থানমন্ত্রদ্রব্যদেহশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ। (৬ নং ১৬)
বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমালোপশোভিতম্।
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা। (১৯)

(১৫) বিততসিতবিতানাম্।

(১৬) "ন নাভিং দর্শয়েৎ কুলবধূরাগুল্‌ফাভ্যাং বাসঃ পরিদধ্যাৎ, ন স্তনৌ বিবৃতৌ কুর্য্যাৎ।
শঙ্খলিখিত, আহ্নিকতত্ত্ব।

(১৭) বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষত্রয়মুদাহৃতম্।
এভিঃ কক্ষৈঃ পরীধত্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ।—আহ্নিকতত্ত্বে স্মৃতি।

আসুরী রীতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (১৮) কিন্তু বর্ত্তমানকালে যুবকদলে মুক্তকচ্ছতার ক্রমবিকাশ দেখা যাইতেছে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

অমরতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

এই সকল জন্ম মৃত্যুর সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের শিশুসুলভ কল্পনাই যে রহিয়া গিয়াছে,—ইহা একটি মুখ্য সত্য। প্রায় আর সকল বিষয়েই কল্পনা যুক্তির অগ্রবর্ত্তিনী; কিন্তু এই ক্ষেত্রে যুক্তি আদিম যুগের কল্পনালীলা এখনও ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যে সকল স্বপ্ন ও বর্ব্বর-কামনা গুহাগহ্বরের মানুষের চিত্তকে ভয় ও আশায় আন্দোলিত করিত, আমাদের কল্পনা এখনও সেই সকল স্বপ্ন ও কামনায় পরিবেষ্টিত। এই কল্পনা কতকগুলা অসম্ভব জিনিস প্রার্থনা করে, কেন না, জিনিসগুলা খুবই ক্ষুদ্র;—এমন কতকগুলি বিশেষ অধিকারে দাবী করে, যে অধিকার পাইলে, ঐকান্তিক বিনাশের দরুন আমরা যে মহা বিবাদের আশঙ্কা করি, ঐ অধিকারগুলি তাহা অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র চৈতন্যের মধ্যে সমস্ত অনন্তকাল অবরুদ্ধ—এ কথা ভাবিলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কি কাঁপিয়া উঠে না? এই সমস্ত সিদ্ধান্তে আমাদের যুক্তিহীন খেয়ালেরই পরিচয় পাই। আজ রাত্রির-নিদ্রার পর, এক শত বৎসর পরে,—আজ যেমন আছি, ঠিক্ সেই অবস্থায়,—সেই শরীর লইয়া—আবার জাগিয়া উঠিব—ইহা যদি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ভর করিয়া, আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, (এমন কি, পূর্ব্বজন্মের বিস্মৃতির করারটা সত্বেও) তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আমাদের দৈনিক ক্ষণস্থায়ী নিদ্রার ন্যায় এই শতবর্ষব্যাপী নিদ্রাকে বিশ্বস্তচিত্তে আহ্বান করিবে না? ভয় করা দূরে থাক্, ইহার

(১৮) বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ।

শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্ন শ্চিন্তয়েদপি।—আহ্নিকতত্ত্বে ভৃগু।

বিকচ্ছপরিধানাসংবৃতকচ্ছঃ।—রঘুনন্দন।

পরিধানাদ্বহিঃকক্ষা নিবদ্ধা হ্যাসুরী মতা।—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

পিতৃমাতৃহীন।

চিত্রকর—টমাস বেঞ্জামিন কেনিংটন

অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কি সে কুতুহলী হইয়া উঠিবে না? জীবনটা কোন অলৌকিক উপায়ে দীর্ঘতা লাভ করিল, এই বিশ্বাসে, এই দেব-নিদ্রার বিধাতার উপর শত শত ধন্যবাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে কি অস্থির করিয়া তুলিবে না? তথাপি, এই নিদ্রার পর তাহার কি অবশিষ্ট থাকিবে? জাগরণের পর সে আপনার কোন্‌টুকু ফিরিয়া পাইবে? যে মুহূর্ত্তে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল—এবং তার পর যখন সে পূর্ব্বস্মৃতিবিরহিত, অজানা, এক নূতন জগতে জাগিয়া উঠিল—এই দুই অবস্থার মধ্যে যোগবন্ধনটি কি? নানাবিধ আশা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া এই সুদীর্ঘ যামিনীতে সে যে প্রবেশ করিতে সম্মত হইয়াছিল—সে কিসের করারে?—কোন বন্ধন থাকিবে না, এই করারে। বস্তুতঃ, প্রকৃত মৃত্যু ও এই নিদ্রার মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ,—এক শত বর্ষ বিলম্বে এই নিদ্রার জাগরণ, যে ঘুমাইয়াছিল, তাহার পক্ষে এই জাগরণ, মরণোত্তরভাবী শিশুর মর্ম্মের ন্যায়ই অভাবনীয়।

(৮)

আর এক কথা,—আমাদের সম্বন্ধে নহে—পরন্তু অন্য ইতর জীব জন্তুদের সম্বন্ধে যখন এই প্রশ্নটি উঠে, তখন আমরা কি উত্তর দিব? ইতর জীব জন্তুদের অস্তিত্ব মৃত্যুর পরেও থাকে কি না এ বিষয়ে কি আমরা একটুও চিন্তা করিয়াছি? যে কুকুর এমন বিশ্বাসী, এমন স্নেহশীল, এমন বুদ্ধিমান, সেই কুকুর মরিবামাত্র, তাহার শবকে আমরা একটা ঘৃণিত জঞ্জালমাত্র মনে করিয়া যত শীঘ্র পারি, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য ব্যস্ত হই। ঐ কুকুরের জীবনের যে সাত্ত্বিক অংশটুকুকে আমরা ভালবাসিতাম, তাহা আমাদের স্মৃতি ভিন্ন আর কোথাও থাকিবে কি না, কুকুরদের জন্যও কোনও পরলোক আছে কি না—এই প্রশ্নটি সম্ভব বলিয়াও আমরা মনে করি না। যে কুকুর কতকগুলি মর্ম্মস্পর্শী গুণের সমষ্টি, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রার বশীভূত, সেই কুকুর বেচারীর আত্মা অনন্তকাল পর্য্যন্ত নক্ষত্রদিগের সঙ্গে অসীম ব্যোমপ্রাসাদে সুরক্ষিত হইবে,—ইহা মনে করিলেও হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তা ছাড়া, যে পাশব আত্মা কেবল কতকগুলি সামান্য দৈহিক অভাব উপাদানে গঠিত, তাহার দেহ নষ্ট হইলে তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে? যে অতলস্পর্শ ব্যবধান খনিজ ও উদ্ভিজ্জের মধ্যে নাই, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর মধ্যে নাই, সেই অতলস্পর্শ ব্যবধান আমাদের ও জীব জন্তুদের মধ্যে আছে—এরূপ কল্পনা করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? অন্যান্য পার্থিব জীব হইতে

আমরা সুদূরে অবস্থিত—আমরা খুবই ভিন্ন,—এই যে আমাদের অভিমান, ইহা কত দূর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিচার করা আবশ্যক।

(৯)

আমাদের শরীর মৃত্যুর পর ভস্মসাৎ হইবে, ইহা জানিয়াও আমরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকি। আমরা কখন আশা করি না যে, আমাদের এই শরীর অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। বরং আমরা দুঃখিত হই, যদি আমরা জানি যে, আমাদের ইহজীবনের সমস্ত শারীরীকি কষ্ট দোষ ও কদর্য্যতা অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদের সাথের সাথী হইবে। কেবল আত্মাই আমাদের সঙ্গে যাইবে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে;—এই আত্মা—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক বৃত্তি,—আরও যদি কিছু বলিতে চাও—সংস্কার; অব্যক্ত চৈতন্য, ব্যক্ত চৈতন্য—এই সমস্তের সমষ্টি ভিন্ন কি আর কিছু? ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া আমরা কি কল্পনা করিতে পারি? ইহার আমরা কি উত্তর দিব? আমরা জরাগ্রস্ত হইলে যখন আমাদের উক্ত বৃত্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন—দৈহিক শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আমরা যেমন হতাশ হই না—ঐ সকল বৃত্তির ক্ষয়েও আমরা সেইরূপ হতাশ হই না। তখনও মৃত্যুর পরে আমার থাকিব, এইরূপ আমাদের একটা অস্পষ্ট আশা ও ধারণা থাকে। দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের উপর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি যে নির্ভর করে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা মনে করি। যাঁহাদের আমরা ভালবাসি, তাঁহাদের শরীরের সমস্ত শক্তিই যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনও আমরা তাঁহাদিগকে হারাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করি না—আমরা মনে করিতে পারি না,—তাঁহাদের আমিত্ব,—তাঁহাদের নৈতিক ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়াছে। মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শোক আর ক্রন্দন করি না, তিনি যে আর নাই, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যদি মৃত্যুকালীন দৈহিক ধ্বংসকে এবং জীবদ্দশায় বুদ্ধিবৃত্তির ধ্বংসকে তেমন গুরুতর বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলে আমাদের কোন্ অংশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুর নিকট প্রার্থনা করিব, এবং কোন্ অসম্ভাব্য স্বপ্নকে আমরা বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য দাবী করিব?

(১০)

বাস্তবপক্ষে—অন্ততঃ আপাততঃ—অমরতার প্রশ্নটি সম্বন্ধে এমন কোন

উত্তর আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যাহা যুক্তির নিকঠ গ্রাহ্য হইতে পারে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? মনে কর, এই প্রদীপটি আমার টেবিলের উপর রহিয়াছে; ইহার মধ্যে কোন প্রকার গুহ্য রহস্য নাই; বাড়ীর মধ্যে এই জিনিসটি সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে বিদিত, সব চেয়ে পরিচিত। আমি উহাতে দেখিতেছি একটু তৈল, একটি পলিতা, একটি কাচের আবরণ; এবং ঐ সমস্ত হইতে আলোক বাহির হইতেছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ আলোক পদার্থটি কি?—জ্বালাইবার সময় উহা কোথা হইতে আসে? নিবাইবার সময় উহা কোথায় চলিয়া যায়, তখনই প্রহেলিকার আরম্ভ হয়। এবং তখন হইতেই, যে জিনিসটা আমি তুলিতেছি, নামাইতেছি, এমন কি, নিজের হাতে গড়িতেও পারি, সেই ক্ষুদ্র জিনিসের চারিপার্শ্বে একটা দুরবগ্রাহ্য প্রহেলিকার উদ্ভব হয়। এই টেবিলে, পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যকে জড়ো কর, এক জনও বলিতে পারিবে না—যে লঘু অগ্নিশিখাটিকে আমার ইচ্ছানুসারে জন্মদান করিতে পারি ও ইচ্ছানুসারে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে পারি—উহা স্বরূপতঃ কি-পদার্থ। উহাদের মধ্যে যদি কেহ, সাহসপূর্ব্বক উহার একটি তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যার প্রত্যেক শব্দ অজ্ঞাত পদার্থের অজ্ঞেয়তা আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং চতুর্দ্দিক হইতে অসীম অন্ধকারের অপূর্ব্ব দৃষ্ট আরও নব নব দ্বার উন্মুক্ত করিবে বৈ আর কিছুই নহে। যাহার সমস্ত উপাদান আমাদের দ্বারা বিরচিত, যাহার উৎপত্তি, যাহার নিকট-বর্ত্তী কারণ ও কার্য্যগুলি একটি চীনে-মাটির পেয়ালার মধ্যে অবস্থিত, সেই সুপরিচিত একটুখানি আলোর স্বরূপ, নিয়তি [illegible] জীবন সম্বন্ধে আমরা যখন সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, তখন সেই জীবনের অজ্ঞাত অংশের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমরা কি প্রকারে আশা করিতে পারি, যে জীবনের অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলিও, আমাদের বুদ্ধি হইতে কোটী কোটী বৎসর ও কোটী কোটী যোজন দূরে অবস্থিত?

(১১)

যখন হইতে মানুষের আবির্ভাব, তখন হইতে মানুষ, আমরা যে রহস্যের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই রহস্যের পথে একপদও অগ্রসর হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করি,— যে স্তরে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অবস্থিত, সেই স্তরটিকে উহা কোন দিক্ হইতেই স্পর্শ করে না,—বুদ্ধিবৃত্তি এ স্থলে একেবারেই মরু। যে বৃত্তিটি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে, এবং যে বাস্তবতা

হইতে আমরা উত্তরের আশা করি—এই দুয়ের মধ্যে এমন কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা সম্ভবপর এবং যাহা আমরা কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারি। আধুনিক কালের উদ্যমশীল কঠোর গবেষণা এ সম্বন্ধে আমাদিগকে একটুও জ্ঞানালোক প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। সুপণ্ডিত সত্যনিষ্ঠ প্রেতাত্মিক সভাসমিতি (বিশেষতঃ ইংলণ্ডের) এই সম্বন্ধে প্রভূত তথ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার দ্বারা কতকটা এইরূপ সপ্রমাণ হয় যে, কোন আধ্যাত্মিক বা স্নায়বিক জীবের জীবন, ভৌতিক জীবের বা দেহের মৃত্যুর পরেও কিয়ৎকালের নিমিত্ত থাকিয়া যায়। স্বীকার করিলাম, এই সকল তথ্য অসম্বাদিত বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা কয়েক পংক্তিমাত্র, কয়েক ঘণ্টার মাত্র রহস্যের আরম্ভটাকে সরাইয়া দেয়। যদি কোন প্রিয়জনের ছায়ামূর্ত্তি এমন স্পষ্ট আকারে আমার নিকট প্রকাশ পায় যে, উহার সহিত আমি বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হই, এবং ঐ ছায়ামূর্ত্তি যদি আজ রাত্রে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার ঘরে প্রবেশ করে, যে মুহূর্ত্তে, তাহার আত্মা আমা হইতেই শত যোজন দূরে অবস্থিত, তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, যে জগতের প্রথম বর্ণটিও আমরা জানি না, ইহা সেই জগতের একটি অতীব অদ্ভুত ব্যাপার, সন্দেহ নাই; বড় জোর উহা এইমাত্র সপ্রমাণ করে যে, ঐ আত্মা, ঐ অন্তরাত্মা, ঐ প্রাণবায়ু, ঐ স্নায়বশক্তি, আমাদের জড় দেহের ঐ ধারণাতীত সুসূক্ষ্ম অংশটি, আমাদের জড় দেহ হইতে ক্ষণকালের জন্য বিযুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতে পারে। যেরূপ কোন দীপের অনলশিখা নির্ব্বাপিত হইলেও, মুহূর্ত্তের জন্য, সলিতা হইতে বিযুক্ত হইয়া কখন কখন রাত্রির অন্ধকারে ভাসমান হইয়া থাকে। অবশ্য, এই ব্যাপারটি বিস্ময়জনক; কিন্তু এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকৃতি যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে বরং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যাপার আমাদের ইচ্ছামত ও আমাদের জীবদ্দশাতেই, আরও ঘনঘন কেন সংঘটিত না হয়? যাহাই হউক, উহা এই সমস্যাটির উপর কিছুমাত্র আলোক নিক্ষেপ করে না। এরূপ একটিও প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় নাই, যাহার নবজীবন সম্বন্ধে, অতি-পার্থিব জীবন সম্বন্ধে ইহজীবন হইতে বিভিন্ন কোন নূতন জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যুত, জড় শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবন কোথাও আরও বিশুদ্ধ হইবে, না যে সময়ে জড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, সে সময়কার জীবন হইতেও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অধিকাংশ ছায়ামূর্ত্তিগুলি, একপ্রকার স্বপ্নাটন-সুলভ মূঢ়তা-সহকারে অতি

নগণ্য পূর্ব্বাভ্যাসের যন্ত্রবৎ অনুসরণ করিয়া থাকে। কেহ বা একটা আস্‌বাবের উপর তাঁহার যে টুপিটি রাখিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই টুপিটির অন্বেষণ করিতেছেন, কেহ বা একটা ক্ষুদ্র ঋণের কথা এইমাত্র অবগত হইয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু একটু পরেই যখন প্রকৃত মরণোত্তর জীবন আরম্ভ হইবার কথা, সেই সময়েই প্রায় সকলেই আকাশের মধ্যে বিলীন হইয়া চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়। আমি স্বীকার করি, উহা মরণোত্তর-জীবনের সত্যতার পক্ষেও যায় না, বিরুদ্ধেও যায় না। এই ক্ষণিক ছায়ামূর্ত্তিগুলি, পারত্রিক জীবনের প্রথম-রশ্মি কি শেষ-রশ্মি, তাহা আমরা জানি না। হয় ত মৃতেরা অন্য উৎকৃষ্টতর উপায়ের অভাবে, এই বন্ধন-সূত্রটির প্রয়োগ করিয়া, আমাদের গোচরীভূত হয়। হয় ত বা, ইহার পরেও উহারা জীবিত থাকিয়া আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নসত্ত্বেও আমাদের নিকট আত্ম-পরিচয় দিতে পারে না, অথবা তাহারা যে উপস্থিত আছে, এ কথা আমাদিগকে জানাইতে পারে না। কেন না, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে ইন্দ্রিয় আবশ্যক, সে ইন্দ্রিয়টি আমাদের নাই। এই একই কারণে, হাজার চেষ্টা করিলেও, কোনও জন্মান্ধ আলোক বা বর্ণের লেশমাত্র ধারণা করিতে পারে না। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত, ইংরাজেরা যাহাকে "সীমান্ত প্রদেশ" বলেন, সেই সীমান্ত প্রদেশের এই অভিনব বিজ্ঞান এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু মানব-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সময় এই সমস্যাটি যে অবস্থায় ছিল, এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে।

(১২)

আমাদের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ, আমাদের দুর্জ্জয় অজ্ঞতা,—সুতরাং আমাদের পারলৌকিক গতি কি হইবে, তাহার নির্ব্বাচন করিবার ভার এখন কল্পনার হাতেই পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে যত প্রকার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে এমন একটি সম্ভাবনাও দেখিতে পাই না, যাহা আমাদের নিকট বাস্তবিকই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বপ্রথম অনুমানটি—জীবনের ঐকান্তিক ধ্বংস। দ্বিতীয় অনুমান যাহা আমাদের অন্ধ-সংস্কার আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া থাকে—সেই অনুমানটি আমাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দেয় যে, আমাদের চৈতন্য, আমাদের বর্ত্তমান "আমি"টি, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্রভাবেই সংরক্ষিত হইবে। এই অনু-

মানটিও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। প্রথমটির অপেক্ষা একটু বেশী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও উহা মূলে এরূপ অকিঞ্চিৎকর ও বালকোচিত, মূঢ়ভাবের কথা যে,—কি মানুষ, কি বৃক্ষলতা, কি জীবজন্তু, উহাদের জন্য, অসীম আকাশ ও অসীম কালের মধ্যে কি উপায়ে যুক্তি-সঙ্গতভাবে স্থান করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আমরা আরও এই কথা বলি,—আমাদের যত প্রকার অন্তিম গতির সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে এই গতিটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ; ইহা অপেক্ষা নিছক্ ধ্বংসও শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

আর একটি বিকল্পাত্মক অনুমান আছে। হয় আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা বিনা-চৈতন্য বাঁচিয়া থাকিব, অথবা আমাদের চৈতন্য এরূপ বর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইবে যে, আমরা এক্ষণে তাহার কোন ধারণাও করিতে পারি না, আমাদের বর্ত্তমান চৈতন্যই হয় ত উহার ধারণার পক্ষে অন্তরায়। আমাদের চক্ষুর তারা এক্ষণে যে আলোক ও বর্ণ গ্রহণ করে, উহা অন্য প্রকার আলোক ও বর্ণ গ্রহণ করিতে হয় ত অসমর্থ—সে আলোক ও বর্ণ গ্রহণ করিবার জন্য হয় ত এই চক্ষু অন্যরূপে গঠিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম দৃষ্টিতে এই অনুমানটি বিকল্পাত্মক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ইহা একই—ইহা আবার সেই চৈতন্যের সমস্যার মধ্যেই আমাদিগকে আনিয়া ফেলে। তাহার দৃষ্টান্ত—এ কথা যদি বলি যে, বিনা-চৈতন্যে বাঁচিয়া থাকিবার নামই ধ্বংসপ্রাপ্তি, তাহা হইলে বিনা বিচারে আগে ভাগেই চৈতন্যের সমস্যাটিকে এককোপে ছেদন করা হয়। কিন্তু এই চৈতন্যের সমস্যাটি যারপরনাই দুর্ব্বোধ, এবং ইহার মত ঔৎসুক্যজনক আলোচ্য বিষয়ও আর কিছুই নাই। বিষয়টি যতই দুরূহ হৌক না, দর্শনশাস্ত্রমাত্রই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে যিনি জিজ্ঞাসু, তিনি নিজেই সেই জ্ঞানের বিষয়। অতএব যে দর্পণটি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহার উপর তাঁহার নিজের অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কি পড়িতে পারে? তাহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তবে কেহ বলিবেন, যদিও তাঁহার নিজের বহুল আবৃত্তি ছাড়া এই প্রতিবিম্ব হইতে আর কিছুই বাহির হইতে পারে না, তথাপি ইহাতে এমন একটি রশ্মি প্রসুপ্ত আছে, যাহা আর সমস্তকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ। এখন উপায় কি? চৈতন্যকে অস্বীকার করা ভিন্ন চৈতন্যকে এড়াইবার আর উপায় নাই;—এই পার্থিব-জ্ঞান আমাদের দেহতন্ত্রের একটা ব্যাধিবিশেষ; ইহার প্রতীকারচেষ্টা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

এইরূপ চেষ্টা উন্মাদের প্রচণ্ড চেষ্টা বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু এই মায়া-জগতের অপর পারে হয় ত ইহাই সুস্থ চিত্তের নিদর্শন।

(১৩)

কিন্তু এই চৈতন্যকে এড়ান অসম্ভব; আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই চৈতন্যের চারি ধারেই—স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই চৈতন্যের চারি ধারেই আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হই। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের এই স্মৃতি-বৃত্তিও যার-পর-নাই ক্ষণস্থায়ী। আমরা এই কথা বলি,—যেহেতু কিছুরই ধ্বংস হয় নাই; অতএব ইহজন্মের পূর্ব্বেও অবশ্য আমরা জীবিত ছিলাম। কিন্তু যেহেতু বর্ত্তমান জীবনের সহিত সেই পূর্ব্ব জীবনের একটা যোগসূত্র নিবদ্ধ করিতে পারি না, অতএব সেই পূর্ব্বজীবন আমাদের নিকট থাকা না থাকা দুই-ই সমান,—এই হেতু পূর্ব্বজন্মের সমস্ত তত্ত্বই আমাদের হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আর এক কথা, কি জীবনের পূর্ব্বে কি মৃত্যুর পরে, আমাদের এই স্মৃতিমূলক "আমি"টি যদি কিয়ৎকালের জন্য আবির্ভূত হয়,—এই ক্ষণিক আবির্ভাব এতই কি একটা গুরুতর ব্যাপার যে, কেবল উহা হইতেই আমরা অমরত্বের সমস্যাটির মীমাংসা করিতে পারি। তবে, আমরা এক্ষণে যে আমির আমিত্ব উপভোগ করিতেছি, সেই আমিটি একটি বিশেষ আকারের মধ্যে বদ্ধ; এবং সেই আকারটিও অতীব অসম্পূর্ণ, অতীব ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু ইহা হইতে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ইহা ছাড়া জ্ঞানের অন্য কোন পন্থা নাই,—জীবন-উপভোগের অন্য কোন উপায় নাই? যাহারা জন্মান্ধ, তাহাদিগকে যদি বলা যায়, কোন বিশেষ উপায়ে তাহারা আলোকের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে,—তাহারা ইহা সম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিবে না,—ইহা তাহাদের কল্পনার অতীত। আমাদের সম্বন্ধেও ইহা কি এক প্রকার নিশ্চিত নহে যে, ইহলোকে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বোধের মধ্যে স্মৃতিমূলক চৈতন্য অপেক্ষা আরও একটি উচ্চতর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব আমাদের আছে,—যাহার দ্বারা আমাদের আমিত্ব আমরা আরও বিপুল ভাবে, আরও নিশ্চিতরূপে উপভোগ করিতে পারি? ইহা কি বলা যাইতে পারে না যে, অঙ্কুরাকারে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একটা অস্পষ্ট বা অপুষ্ট রেখাচিহ্ন আমরা কখন কখন ধরিতে পারি? অন্ততঃ, একটিমাত্র চেতনবিন্দুর মধ্যে আমাদের পার্থিব জীবনের সমস্ত বিবর্ত্তন কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, আমাদের এই পার্থিব জীবনতন্ত্রই সম্ভবতঃ ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উৎপীড়িত বা একেবারে উন্মূলিত করিয়াছে। আমাদের অহং-

বোধকে কঠোর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার পরেও, কোন কোন অস্পষ্ট মুহূর্ত্তে, এমন একটা কিছু কি থাকিয়া যায় না, যাহা সম্পূর্ণ রূপে নিঃস্বার্থ, যাহা অন্যের সুখেই তৃপ্তি লাভ করে? ইহাও কি সম্ভব নহে,—উদ্দেশ্য-হীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে যে শিল্পকলার আনন্দ আমরা উপভোগ করি, একটি সুন্দর প্রতিমা-দর্শনে,—একটি নির্দ্দোষ কীর্ত্তিস্তম্ভ-দর্শনে আমরা যে প্রশান্ত সন্তোষ অনুভব করি, যাহার দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—ইহা কি সম্ভব নহে, এই আনন্দ, এই চিত্ত-পরিতোষ আমাদের আর এক চৈতন্যের পূর্ব্বাভাস—আর এক চৈতন্যের ক্ষীণরশ্মি, যাহা আমাদের এই স্বার্থমূলক চৈতন্যের একটা ফাটাল দিয়া অল্প অল্প প্রকাশ পাইতেছে? আমরা আপাততঃ এইরূপ ভিন্ন প্রকারের চৈতন্য কল্পনা করিতে *পারি না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে একেবারে অস্বীকার করিতেও পারি না। এমন কি, আমরা ইহাও বিশ্বাস করি,—অন্য প্রকার চৈতন্যের* অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পক্ষে উহা যে একটা প্রবর্ত্তক হেতু—ইহা প্রতিপাদন করাই অধিকতর সঙ্গত।

আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে এক সঙ্গে আমাদিগকে না দিয়া যদি বৎসরে বৎসরে একাদিক্রমে আমাদিগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, এমন কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে আমাদের জীবন সঞ্চরণ করিবে, যাহা আমরা কখন কল্পনাও করিতে পারি না। তা ছাড়া, যে কামবৃত্তি, যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে কখনই জাগ্রত হয় না, এবং যে বৃত্তির প্রথম অভ্যুদয়ে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন জগৎ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, জীবনের সমস্ত মেরুদণ্ড যেন স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই কামবৃত্তি আমাদের দৈহিক গঠনের একটা আগন্তুক কারণের উপর নির্ভর করে মাত্র।

যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মত্ততা বয়স্ক লোকদিগের চিত্তকে বিচলিত করে, সেই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মত্ততার একটি অভিনব জগতের অস্তিত্ব আমাদের বাল্যদশায় আমরা স্বপ্নেও মনে করিতে পারি না। যদি সেই বাল্যকালে এই সকল মত্ততার জনশ্রুতি দৈবাৎ কখন আমাদের অবোধ ও কুতূহলী কর্ণে আসিয়া পৌঁছে,—আমাদের জ্যেষ্ঠগণ কি প্রকার মত্ততায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হই না; এবং আমরা হয় ত তখন আপনাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিই যে, আমাদের ঐ বয়সে আমরা উহাঁদের অপেক্ষা বেশী ধীরতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইব; কিন্তু যৌবনারম্ভে

যে দিন কন্দর্পদেব হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হন,—তখন আমাদের সমস্ত ভাব ও অধিকাংশ ধারণাই কেন্দ্রভ্রষ্ট ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে, কোন বিষয় ধারণা করিতে পারি বা না পারি, উহা যে একেবারে কল্পনাতীত,— ইহা প্রতিপাদন করিবার অধিকার আমাদের নাই।

(১৪)

আমরা কুলপরম্পরাক্রমে অদৃষ্টের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তির অন্ধ-কারাগারে যে ভাবে বাস করিতেছি,—উহা বিশ্বের রত্নভাণ্ডার হইতে আমা-দিগকে বিমুখ করিয়া রাখিতেছে, এবং বহুকাল বিমুখ করিয়া রাখিবে। আমাদের এখনকার কল্পনাও অতি সহজে এই বন্দী অবস্থার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লয়, আপোস করিয়া লয়। এ কথা সত্য, এই কল্পনা আমাদের প্রবৃত্তিসমূহের একান্ত অনুগতা দাসী; প্রবৃত্তিরাই উহাদের পোষণ করে, উহার খাদ্য যোগায়। কিন্তু এই কল্পনার অভ্যন্তরে যে সব সহজ সংস্কার ও ভাবী অবস্থার পূর্ব্বাভাস নিহিত আছে, তাহারা আমাদের এই কল্পনাকে বলে—এই কারাগারের মধ্যে বদ্ধ থাকা তোমার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত, তথা হইতে বাহির হইয়া আরও বৃহত্তর—আরও অসীমতর গণ্ডি তোমার অনুসন্ধান করা উচিত। ক্রমশঃ কল্পনার অন্তরে এই প্রশ্ন স্বতই জাগিয়া উঠে, হয় ত তাহার সর্ব্বোচ্চ দুঃসাহসী ও স্পর্দ্ধিত স্বপ্নসমূহ হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে বাস্তব জগতের আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে অতটা দুঃসাহসিক হইবার অধিকার সে আর কখন পায় নাই। আকাশ ও কালের মধ্যে, সে যত কিছু প্রকাণ্ড জিনিস গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা বাস্তব জগতে বিদ্যমান, তাহার তুলনায় উহা কিছুই নহে। জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে, বিজ্ঞান যাহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতেই আমাদের কল্পনা জানিতে পারিতেছে, বাস্তব জগতের সহিত সে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাস্তব জগতের একটি পাথরের মধ্যে, একখণ্ড লবণের মধ্যে, এক পাত্র জলের মধ্যে, একটি গাছের মধ্যে, একটি কীটের মধ্যে যে সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কল্পনাকে নিয়ত ছাপাইয়া উঠিতেছে, তাহার উজ্জ্বল প্রভায় কল্পনার দৃষ্টি অন্ধীভূত হইতেছে, কল্পনা বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে। বিজ্ঞানের এই তথ্যটি হইতে আমাদের অজ্ঞতার বেড়াটি যদি অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া যায়, অন্ততঃ আমাদের মনের ভাবটি যদি এই বিশ্বাসের অনুরূপ হয়, কল্পনার সাহায্যে

যতটা মনে করিতে পারি, বাস্তব জগৎ তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণে আশ্চর্য্য, এই কথাই যদি আমাদের বিশ্বাস জন্মে—সেটুকুও মন্দ লাভ নহে। কেন না, তাহা হইলে আমরা এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারি যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কোন সুনিশ্চিত বাস্তব সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারে না—ঐ সকল সত্য উহা হইতে আরও দূরে অবস্থিত। মানুষ যদি সত্যের দৃষ্টি লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাহার এইরূপ মনে করা উচিত:—হঠাৎ যদি আমি বিশ্বের সমস্ত বাস্তব সত্যের মধ্যে স্থাপিত হই, তাহা হইলে বিশ্বে একটি পিপীলিকার সহিত আমার তুলনা হইতে পারে। আমরা পিপীলিকার মত পূর্ব্বে সিধা পথগুলিই জানিতাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তেরই সহিত পরিচিত ছিলাম, আমাদের বল্মীকের ক্ষুদ্র দিগন্তই আমাদের দৃষ্টির সীমা ছিল, এখন হঠাৎ আমরা যেন অ্যাটলাণ্টিকের মধ্যবর্ত্তী অসীম তৃণভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যে পার্থিব কারাগার, অতি-কল্পনার বাস্তব সত্যের সংস্পর্শে আসিতে আমাদিগকে এক্ষণে নিবারণ করিতেছে, সেই কারাগার হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই কল্পনার অতীত জিনিস কল্পনা করিয়া, দৈবাৎ কখন কখন, আমরা সত্যের দুই এক টুকরা লাভ করিয়া থাকি। অতএব যখনই কোন নূতন কল্পনার স্বপ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, আমরা যেন আমাদের চক্ষু হইতে পার্থিব জীবনের বন্ধনটা সরাইয়া ফেলি। এই কথা যেন আমরা মনে করি, এখনও বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের নিকট হইতে যে সকল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে জীবন-উপভোগের নূতন প্রণালীর সম্ভাবনাটি—আরও উন্নত ভাবে, বিস্তৃত ভাবে জীবন-উপভোগের সম্ভাবনাটি তেমন দুরাশার জিনিস নহে, সম্ভাবনার অতীত জিনিসও নহে; প্রত্যুত আমাদের বর্ত্তমান চৈতন্য আমাদিগকে যাহা প্রদান করে, তাহা অপেক্ষা আরও সুনিশ্চিত, আরও স্থায়ী, আরও সম্পূর্ণ। এই সম্ভাবনাটী যদি আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের অমরতা আর অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না,—অন্ততঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে অমরতাসমস্যার এক প্রকার সামাধান হইয়া যায়। এখন কেবল আমাদের ভাবিবার বিষয়,—এই অমরতা কি আকারে কি প্রণালীতে প্রকাশ পাইবে; আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান ও নীতির কোন্ কোন্ অংশ আমাদের নিত্যকালের জীবনে, আমাদের সার্ব্বভৌমিক জীবনে প্রবেশলাভ করিবে। এ কাজটি অদ্যকারও নয়, কল্যকারও নহে—ইহা অন্য দিনের * * *।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি।

প্রীতি, বিশ্বাস ও আশা।

২

সমাজ না থাকিলে সাহিত্যের বিকাশ হয় না। সাহিত্য যে সকল ভাব লইয়া ক্রীডা করে, যে সকল চারু চিন্তা লইয়া সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করে, যে সকল রমণীয় ভাব লইয়া সুতান গান গায়িতে থাকে—তাহা, মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত সমাজের যে সম্পর্ক, হৃদয়ে হৃদয়ে যে সুখ দুঃখের সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে সংস্পর্শে যে উল্লাস বা ব্যথা,—তাহা হইতে সমুত্থিত হয়। সাহিত্য সেই সমাজসম্বন্ধজাত সুখ দুঃখের সুচারু অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির মূলে যখন বিশাল সমাজপ্রীতি নিহিত থাকে, তখন সেই অভিব্যক্তি কখনও বা পদ্যের মধুর ঝঙ্কারে নিনাদিত হয়, কখনও সমাজের আনন্দের জন্য, শিক্ষার জন্য, এমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, যাহাতে নরনারী নিরবধি সুধা পান করিতে থাকে, কখনও বা পদ্যের গম্ভীরনাদিনী বাক্যপরম্পরা নায়গারা জল-প্রপাতের ন্যায়, বর্ষার পদ্মার ন্যায় ছুটিতে থাকে, সমাজকে আলোড়িত করিতে থাকে।

সাহিত্য এক প্রকার সংগ্রাম—উত্তমের সহিত অধমের সংগ্রাম, পুণ্যের সহিত পাপের সংগ্রাম, মূর্ত্ত পাপ-রাবণের হস্ত হইতে পুণ্যরূপিণী জানকীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, অমঙ্গলের কবল হইতে মঙ্গলকে রক্ষা করিবার প্রয়াস। সংক্ষেপে, সাহিত্য মানব জাতির মঙ্গলগীতি। যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, যাহাতে সুচিন্তা ও মহৎ ভাব সমাজের হৃদয়কে উন্নত করিয়া, বিশুদ্ধ করিয়া, মার্জ্জিত করিয়া, মনুষ্যকে পরস্পরের প্রেমে পরস্পরকে ডুবাইয়া দিয়া, মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারে—তাহাই সাহিত্যের ধর্ম্ম, সাহিত্যের লক্ষ্য, সাহিত্যের প্রাণ। বাল্মীকির রামায়ণ বল, হোমারের ইলিয়দ বল, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্ষপিয়ারের নাটক বল, ডিমস্থীনিস, সিসিরো, বর্ক, এমেটের বক্তৃতা বল, এমার্সন, কার্লাইল, রস্কিনের প্রবন্ধ বল—বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তাহাদিগের ভিতর মানবপ্রীতি রহিয়াছে; এই মানবপ্রীতিই এই রচনাগুলিকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ভাবুক পাঠক তাহা পাঠ করিবার সময় দেখিতে পান, যেন জীবন্ত মনুষ্যপ্রেম এই সকল রচনার ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া স্পন্দিত হইতেছে।

সকল বিষয়েই প্রয়োজন দেখিয়া আয়োজন করিতে হয়, অভাব বুঝিয়া পূরণ করিতে হয়, রোগের নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়; গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতে হয়। সাহিত্যেও তাহাই। সমাজের অভাব কি, প্রয়োজন কি, সাহিত্যিকগণ তাহা বুঝিবেন, বুঝাইবেন; তাহা পূরণ করিবার উপায় বলিয়া দিবেন। সমাজের উপস্থিত পীড়া কি, সাহিত্যকে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সাহিত্য তাহা বলিবেন, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিবেন, ত্বরিত সমুচিত চিকিৎসা করার জন্য সমাজকে প্রবৃত্তি দিবেন। সমাজের গন্তব্য স্থান কোথায় কোন তীর্থে যাইতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া, তদনুযায়ী পথে চলিবার জন্য সমাজকে সম্মত করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে, তীর্থযাত্রীদিগের সাথী বা পাণ্ডার ন্যায়, সমাজকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

সুতরাং বঙ্গদেশে এক্ষণে সাহিত্যিকগণকে সমাজের অবস্থা, অভাব, আধি-ব্যাধির পর্য্যালোচন করিতে হইবে; পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিন্তা করিয়া, তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে এবং সমাজকে তাহা বুঝাইতে হইবে, নিদ্রিত অবসন্ন সমাজকে জাগাইতে হইবে, আত্মরক্ষার জন্য উৎসাহিত উত্তেজিত করিতে হইবে, আত্মরক্ষার উপায় সাধ্যমত বলিয়া দিতে হইবে।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বিশেষ দুঃখ ও অভাব—ম্যালেরিয়া জ্বর, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট; বর্ত্তমান সামাজিক রোগ, বিলাসোন্মাদ, বিবাহে পণ, মামলাব্যসন। ধনীদিগের মধ্যে নিঃস্বার্থদানবিমুখতা, অন্নজলদান-কাতরতা, উপাধিপ্রিয়তা ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব; শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ ও পণ্ডিতাভিমানসর্ব্বস্ব ধর্ম্মচর্চ্চা।—

ইহার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ ম্যালেরিয়া বিষয়টি লইলাম। ডিমস্থিনিস, ম্যাসিডনের ফিলিপের উদ্যত আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য এথিনিয়ানদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। বর্ক অত্যাচারী হেষ্টিংসকে দমন করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সিসিরো ক্যাটলাইনের ষড়যন্ত্র বিদীর্ণ করিবার জন্য, রোমকদিগকে উত্তেজিত করণার্থ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ম্যাটসিনি, ইতালীকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ইতালীর মধ্যে চতুর্দ্দিকে তাঁহার রচনাবলী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। আর আমাদের ভীষণ নির্দ্দয় শত্রু ম্যালেরিয়াকে দমন করিবার জন্য, দূরীভূত করিবার জন্য আমাদের সাহিত্যিকগণ স্বদেশকে উত্তেজিত উৎসাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না কি? প্রবন্ধমালা লিখিবেন না কি? তাঁহারা

স্বদেশবাসিগণের কি দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দেখুন। গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদ যন্ত্রণা, ঘরে ঘরে অকাল মৃত্যুর শোক, সুস্থ নরনারীপূর্ণ কোলাহলময় জনপদ-সমূহ শ্মসানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, যেখানে পূর্ব্বে সুরম্য হর্ম্মরাজি বিরাজ করিত, পল্লবীথিকায় রাজবর্ত্ত সুশোভিত ছিল—যেস্থান দিবসে ব্যবসায়িগণের গুঞ্জনে মুখরিত হইত, রজনী সমাগমে, যেস্থান পৌরজনের সুখময় গীত বাদ্যে, সেতার তানপুরা মৃদঙ্গ ধ্বনি মিশ্রিত কলকণ্ঠ গীতিতে নিনাদিত হইত—যেস্থানে সখীজনের মধুর সঙ্গীত পল্লীপথে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশে সমুত্থিত হইয়া চারিদকে পল্লীবাসীগণের উপর সুধাবর্ষণ করিত—অদ্য সেই স্থানে শৃগাল-ব্যাঘ্র-সর্প-সঙ্কুল অরণ্য বিরাজ করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের ভীষণ গর্জ্জনে শব্দিত হইতেছে। যেখানে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, যেখানে শাস্ত্রকলাপ অনুশীলিত হইত; যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর, মন্দির, ঘণ্টা কাঁসর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইত, আরতির পবিত্র আলোকে আলোকিত হইত, পুরুষগণ ও অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূগণ দেব পূজার জন্য দলে দলে সম্মিলিত হইত—অদ্য সেস্থানে ভগ্নমন্দিরারূঢ় অশ্বত্থ বৃক্ষে পেচকের ঘুৎকার শব্দিত হইতেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকারে চর্ম্মচটকা উড়িতেছে, মূষিক ও সরীসৃপ-গন বাস করিতেছে। আর চতুর্দ্দিকে অরণ্যে বায়ু, যেন অবসাদের ও দুঃখের নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, অসংস্কৃত প্রেতাত্মার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। আর ভগ্নগৃহসমূহের ইষ্টকস্তুপ হইতে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৃহস্থের মৃত্যু যন্ত্রণা ধ্বনি, শোকক্ষিপ্ত স্বজনের আর্ত্তনাদ, যেন আজিও থাকিয়া থাকিয়া নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, আকাশ মার্গে ঘুরিতেছে! যে সকল পল্লীগ্রাম আজিও জনশূন্য হয় নাই, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ লোকবিরল হইতেছে, পল্লীবাসীগণ ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া মরিতেছে তাহাদিগের রোগযন্ত্রণা—তাহা কি বলিব! আমার কখন কখন মনে হয় যে বঙ্গদেশে যত নগর ও গ্রাম ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন যাইতেছে, এই সকল নগর ও গ্রামে, অসংখ্য নগরবাসী ও গ্রামবাসী; সকলে একটী নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঠিক দুই প্রহর রজনীতে, সকলে এক সময় সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে যদি ভগবানকে ডাকে, দুই দণ্ড কাল চীৎকার করিয়া, হাত জোড় করিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে বলিতে থাকে "ভগবন্ রক্ষা কর, আর সহ্য করিতে পারি না।" "ভগবন্, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর—" তাহা হইলে আমার বোধ হয়, সেই সম্মিলিত স্বরং সেই গভীর বেদনানিঃসৃত বিরাট প্রার্থনা, সেই আর্ত্তনাদের বজ্র-নির্ঘোষ শুনিয়া, সহানুভূতিতে সমুদয় দেশ কাঁপিয়া উঠিবে, সমুদয় সভ্য জগৎ

শিহরিয়া উঠিবে। কৈলাসে হর’পার্ব্বতীর আসন টলিবে—পার্ব্বতীর হৃদয় দয়ায় দ্রবীভূত হইবে, রোগের মুক্তির জন্য স্বয়ং মহাদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন, এবং বিবিধ বিধানে বঙ্গবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য লাভের জন্য, উত্তেজিত করিবেন, উপায় বলিয়া দিবেন। তখন চতুর্দ্দিকে ঘোর তপস্যা আরব্ধ হইবে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, হোমের পবিত্র ধূমে দেশ ভরিয়া যাইবে—স্বর্গ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বাস্থ্যের কমণ্ডলু লইয়া বঙ্গদেশে অবতরণ করিবেন।

ওরে সাহিত্যক মন! তোর এমন কৃষি কাজ আসে না এতদিন যদি এই পতিত জমি আবাদ কর্ত্তিস তা হলে সোনা ফল্‌তো। একবার নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের, স্বদেশ-প্রীতির বেড়া, কালী নামের বেড়া দিয়ে, সুচিন্তার বীজ ছিটিয়া দেনা। মুক্তকেশীর শক্তবেড়া এর কাছে যম ঘেসে না। সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে সৎকার্য্যের প্রবৃত্তি দেয়, সমাজসেবায় লোককে নিযুক্ত করে, তাহারই অভাবে দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যদি কোন জনপদ রোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহা দৈহিক রোগযুক্ত হইবার পূর্ব্বে নৈতিক রোগযুক্ত হইয়াছিল। তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে সেই ধ্বংসোন্মুখ সমাজে সাহিত্য তাহার কর্ত্তব্য পালন করে নাই, লোককে ধর্ম্মপথে যাইবার জন্য উদ্বোধিত করে নাই।

বাল্মীকি দশাননবধ উপলক্ষ করিয়া রামায়ণ রচনা করিলেন। কালিদাস তারকাসুরবধ উপলক্ষে কুমারসম্ভব লিখিলেন। হেমচন্দ্র বৃত্রনিধন অবলম্বন করিয়া বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিলেন। হে সাহিত্যিক মহারথিগণ! আপনাদিগের মধ্যে কেহ কি ম্যালেরিয়া রাক্ষসবধ অবলম্বন করিয়া এক মহাকাব্য লিখিতে পারেন না। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে কাব্যে যেমন ভবিষ্যতের পথ সূচিত হইয়াছে, আপনাদিগের নূতন কাব্যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের পথ সূচিত হইবে। মনুষ্যের স্থায়ী ভাব ও প্রবৃত্তির উপর নূতন কাব্য স্থাপিত করুন। মহতী ভাষায় অভিব্যক্ত হইলে, রসাত্মক বাক্যপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, তাহা জগতে স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমি এখানে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা বঙ্গদেশের অন্যান্য কষ্ট,অভাব সম্বন্ধে প্রযুজ্য। অগ্নিস্পর্শ করিবামাত্র জল ফুটে না, কিছুকাল ব্যাপিয়া জলে অগ্নি সংযোগ করিতে হয়, তবে জল টগ্‌ বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে, বাষ্প উঠিতে থাকে, এবং তাহাতে এমন শক্তি উদ্ভূত হয়, যে তাহা বিষম গুরুভার-

বাহী রেলশকট শ্রেণী পবনবেগে লইয়া যায়। তেমনি, কোনবিষয় চিন্তা করিবা-মাত্র তৎসম্বন্ধে সাহিত্যনামযোগ্য প্রবন্ধ নির্গত হয় না। সেই বিষয়টী ভাবিতে ভাবিতে, মনে আন্দোলন করিতে করিতে, চমৎকারিণী শক্তির উদ্ভব হয়, মস্তিষ্ককক্ষ মনোহারিণী মঙ্গলদায়িনী চিন্তায় ভরিয়া যায় তখন সেই মস্তিষ্ক হইতে, নির্ম্মল নির্ঝরের ন্যায়, সারবান্ সাহিত্য ঝর্ ঝর্ করিয়া নির্গত হয়। কখন বা, জ্বালামুখীর নিস্রবের ন্যায়, ভাবের স্রোত প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়।

হে সাহিত্যিকগণ! সৌখীন বিলাসিনী রচনার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন থাকিবেন না। গবেষণা, ভাল, আবশ্যক। জীর্ণ পুঁথি উদ্ধার করিতেছেন—বেশ। কিন্তু বঙ্গবাসীর জীর্ণদেহ উদ্ধার করা তাহাও কি আপনাদের আলোচ্য বিষয় নহে, গুরুতর কার্য্য নহে? পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বাহির করিতেছেন, করুন, নিরস্ত হইতে বলি না। কিন্তু বর্ত্তমান তত্ত্ব, বর্ত্তমান জীবনমরণাত্মক সমস্যা, তাহাও আলোচনা, সমাধান করুন। সাহিত্য বিজ্ঞানকে টানিয়া আনিবে, তখন দেশে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, চৈতন্য ও নিমাইয়ের ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণীর ন্যায়, শিবও শক্তির ন্যায়, মিলিত হইয়া স্বদেশবাসিগণকে উদ্ধার করিবে, জীবন দিবে, মুক্তি দিবে।

হে সাহিত্যিকগণ! তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একটা কথা বলিয়া থাকবে যে যে সাহিত্যের কার্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। আমি তাহা স্বীকার করি, সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে এত আনন্দ পাইয়াছি, জীবনে বুঝিবা আর কিছুতেই তত আনন্দ পাই নাই, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সমুদয় শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে, হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়াছে। কিন্তু আমার বো[illegible] হয় "সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবির কার্য্য" এই কথাটার অনেকেই অপব্যবহার করেন ও এই সকল লোকের মতে কার্লাইল এমার্সন, রস্কিন প্রভৃতির রচনা সাহিত্য নহে। কারণ, তাঁহাদিগের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের হিত-সাধন করা, কিন্তু সৌন্দর্য্য'সৃষ্টির অর্থ কি এমন রচনা যাহাতে রসোদ্ভাবন হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, যে বাক্যে রসাবির্ভাব হয়, সেই বাক্যকে বা রচনাকে সাহিত্য বা কাব্য বলে। তাঁহাদিগের মতে কতকগুলি রস স্থায়িভাব, কতকগুলি ব্যভিচারিভাব। বঙ্কিমবাবু প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের এই রসবিভাগ লইয়া কথঞ্চিৎ উপহাস করিয়াছেন। আমি তাহার বিষয় কোন মত দিতে চাহি না। তবে আমার বোধ হয়, বঙ্কিমবাবু দুইদিক রাখিতে, চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের ও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের

গৌণ উদ্দেশ্য চিত্তোৎকর্ষসাধন" তাঁহারমতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিদ্বারা চিত্তরঞ্জন কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, চিত্তোৎকর্ষসাধন অপ্রধান উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, সত্য জগৎ, কাব্যের উদ্দেশ্য যে ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত ও মহৎ, তাহা শীঘ্র আনিবে। কাব্যের প্রশস্ত ও মহৎ ও পূর্ণ উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দ্বারা, হৃদয়গ্রাহী রচনা দ্বারা, রসোদ্ভাবন দ্বারা,—(১) চিত্তরঞ্জন করা, (২) চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদন করা, (৩) সমাজের মঙ্গল সাধন করা। ইউরোপ ইহার মধ্যেই এই পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপের প্রধান উপন্যাস, যথা ভিক্টরহুগো ও তলস্তয়ের উপন্যাসে, সমাজের সমস্যা সকল মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার পরিণত বয়সের উপন্যাস আনন্দমঠ, সীতারাম প্রভৃতিতে সমাজের মঙ্গলসাধন উপায় প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিম প্রভৃতি মহাত্মা অতি উচ্চসাহিত্বিকগণ সমাজের সংস্কারের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছেন। সাহিত্যের এক নব যুগ আরব্ধ হইয়াছে।

জন ষ্টুয়ার্টমিল Leberty সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আশা করি কোন সৌন্দর্য্যধ্বজী তাহাকে সাহিত্যের রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবেন না। বোধ করি আমাদিগের দেশের প্রবন্ধলেখকগণ ঐ মহামূল্য গ্রন্থকে সাহিত্যের অবমাননা বিবেচনা করিবেন না। যখন দেবীসদৃশী মার্কিন রমনী দাসগণের প্রতি লোমহর্যণ অত্যাচারে মর্ম্মাহত, স্তম্ভিত হইয়া, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া, দেবাবিষ্ট ভাবে, Uncee Tom's Cabin লিখিয়া স্বদেশ-বাসিগণের বিবেক জাগরিত করিলেন, রসাত্মক'বাক্যপরম্পরায় কোথাও পাঠক হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন, কোথায়ও বা প্রপীড়িতের উদ্ধার করিবার জন্য রৌদ্ররসে প্রদীপ্ত করিলেন, যেন ঐ উপন্যাসের ভিতর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইতে লাগিল—তখন যে গ্রন্থ রচিত হইল তাহা কি অপূর্ব্ব সাহিত্য নহে? তাহা সাহিত্যের অবমাননা না গৌরব? তাহা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য। সাহিত্য Uncle Tom's Cabin কে মস্তকে গৌরব কিরীট স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতে একদিকে ভাবাত্মক রস প্রচুর পরিমাণে আছে, অন্যদিকে ব্যবহারিক মাঙ্গল্যও আছে।

বস্তুতঃ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে, একটা বিশ্বাস থাকে যে তাহা ভবিষ্যতে সমাজকে উন্নত করিবে, ক্রমবিকাশের পথে লইয়া যাইবে তাহার ভিতর এমন একটী আশা জাগিয়া থাকে। আশা উন্নতির অগ্রশালিনী সখী। যে উন্নতি আজিও হয় নাই, কিন্তু যাহা হওয়া উচিত, এবং হইবে, আশা তাহাকে অঙ্কিত করে, মানস নেত্রে তাহা বর্ত্তমান ঘটনার মত দেখিতে পাই। সাধারণ লোকে

যাহা অসম্ভব অলীক প্রলাপ বাক্য বিবেচনা করে, প্রতিভাপন্ন সাহিত্যিকের আশা তাহাকে ভবিষ্যতের ধ্রুব সত্য বিবেচনা করে, এবং বাল্মিকীর ন্যায় রাম না হইতে রামায়ণ রচনা করে। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যক ভবিষ্যদ্বক্তা বা prophet এই জন্য কার্লাইলকে Seer of Chelsea বলে। রস্কিন Seer, তলস্তয় Seer। তাঁহাদিগের কোন কোন রচনা ও প্রস্তাব প্রথমে উপহসিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে শনৈঃ শনৈঃ তাহা আদরে গৃহীত সম্মানিত অনুস্মৃত হইতেছে।

তাই বলি হে সাহিত্যিক। তোমার ঈশ্বরদত্ত শক্তির অপব্যবহার করিও না। সাহিত্যিকগণ সমাজের উপদেষ্টা নেতা ও ত্রাতা। আমি এই প্রবন্ধে সেই সকল প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণকে সম্বোধন করিতেছি যাঁহাকে ইচ্ছা করিলে মূসার ন্যায়, আমাদিগকে ফেরোয়ার ব্যাধি ও অভাবের অমঙ্গল রাজ্য হইতে প্রতিশ্রুত স্বাস্থ্য ও সিদ্ধির মঙ্গল রাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

অবশেষে।

[১]

সরলা ও তাহার দাদা প্রফুল্ল বড় ব্যস্ত। জিনিসপত্র গোছান হইতেছে। পুরাতন ও নূতন বস্ত্রাদি, ছবি, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, বড় ও ছোট বাক্স, খেলনা প্রভৃতির 'প্যাকিং' প্রায় এক সপ্তাহ হইতে চলিতেছে। বিরাম নাই। কি রকম করিয়া অল্প আয়তনের মধ্যে সুচারুরূপে, কতগুলি সামগ্রী, স্তরে স্তরে, পাশাপাশি স্থাপিত হইতে পারে তাহা লইয়া বহু পরামর্শ, বহু তর্ক ও বিতর্ক হইতেছে প্রফুল্লের আইনের বহি অপেক্ষা সরলার কাঁচের ও পাথরের খেলনা অধিক স্থান অধিকার করিল।

উভয়েই পিতৃমাতৃহীন। জনক-জননীর দুইখানি ফটোগ্রাফ কাহার বাক্সে থাকিবে, তাহা স্থির না হওয়াতে সরলা পিতার ফটো লইল, প্রফুল্ল জননীর ফটোখানি রেশমের ফিতায় বাঁধিয়া আল্‌বমের মধ্যে রাখিল।

পাটনার অনতিদূরে গঙ্গাতটে দ্বিতল গৃহ। সম্মুখে উদ্যান। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রায় সাত বিঘা জমী। জাহ্নবীকল্লোলমুখরিত প্রশান্ত তট। পাড়ের নীচে সুন্দর বাঁধা ঘাট। আফিমের কারখানায় বহুদিন চাকরী করিয়া প্রফুল্লের পিতা ক্রমে ঐ সম্পত্তিটুকু অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উদ্যান প্রফুল্লের

মাতার প্রস্তুত। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যারিষ্টার প্রফুল্লচন্দ্র অনেকটা পড়্তি জমী লইয়া একটা 'লনের' সূত্রপাত করিতেছিলেন।

বাটীর পার্শ্বেই মিসেস্ ডমিঙ্গোর অনাদিকাল হইতে বসতি। বড় মিস্ ডমিঙ্গো খুব লম্বা ও চিরকুমারী। ছোট মিস্ ডমিঙ্গো ক্ষুদ্রাকৃতি, এবং তাঁহার শীঘ্রই বিবাহ হইবার খুব সম্ভাবনা। সরলা তাঁহাদের নিকট ইংরাজী সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা ও পিয়ানো শিখিত এবং তাহার পরিবর্ত্তে ছোট মিস্ ডমিঙ্গোকে হিন্দী ও বাঙ্গালা শিখাইত। বিহার অঞ্চলে বাস করিয়া, এবং বিহারী বালিকাগণের সহিত একত্র স্কুলে পড়িয়া, সরলার তের বৎসরের মধ্যেই হিন্দী ভাষায় অসাধারণ দখল জন্মিয়াছিল।

হৃদয়ে চিরাঙ্কিত, জনকজননীর পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাদিগের অসীম স্নেহ, ভ্রাতার অবিশ্রান্ত যত্ন ও আদর, জাহ্নবী-তটবিস্তৃত পবিত্র দৃশ্য ও বিদূষীর সহিত সখ্যতা, সরলার জীবনকে অপূর্ব্বভাবে সংগঠন করিয়াছিল।

সেই বিমল প্রভান্বিত সুন্দর ক্ষুদ্র মুখখানির শোভা-বর্দ্ধন করিয়া দুইটি চিন্তান্বিত আঁখি সর্ব্বদাই কাহাকে অন্বেষণ করিত।

'দুই বৎসর পূর্ব্বে বাবা এইখানে বসিয়া শেফালিকা বৃক্ষের তলে পূজা করিতেন। তাঁহার আসনে বসিয়া আমি পূজা করিয়াছি। দাদা, এ স্থান কি করিয়া ছাড়িবে?' কিন্তু সরলা আবার বলিল—'না। বোধ হয়, বৌদিদিকে লইয়া তুমি আবার এখানে আসিবে, কেমন দাদা?'

প্রফুল্লের দেশে যাইবার উদ্দেশ্য কেবল বিবাহ নহে। বিহার অঞ্চলে বাঙ্গালীর আর পয়সা [illegible] উকীল ও বারিষ্টারের সংখ্যা নাই;—তাহারা সেই দেশীয়।

'সরলা, তোমাকে লুকাইবার দরকার নাই। তোমার সম্ভাবিতা বৌদিদি এখানে বাস করিতে চাহিলেও, অন্নবস্ত্র জুটিবে কিনা সন্দেহ। ইহাই প্রথম সমস্যা। এবং তুমি ভবিষ্যতে যাহার করে সমর্পিতা হইবে, সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ অন্ততঃ পাটনায় পাটের ব্যবসা আরম্ভ না করিলে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। ইহাই দ্বিতীয় সমস্যা।'

প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর করিয়া আবার বলিল—'সরলা, আপাততঃ এই স্থান কাহাকেও বিক্রয় করিব না। কেহ যদি ভাড়া না লইতে চাহে, মিস্ ডমিঙ্গোর হাতে থাকিবে। যাঁহাদের চিরন্তন করুণা ও সন্তানবাৎসল্য এই পবিত্র নিবাসকে পবিত্রতর করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ

জীবনকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের স্মরণচিহ্নার্থ ইহা উৎসর্গ করিব।

"উৎসর্গের' কথা শুনিয়া সরলার নয়নে জল আসিল। কিন্তু ভ্রাতার নিকট তাহা লুকাইয়া শেফালিকা বৃক্ষের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। অস্তগত সূর্য্যের শেষ ক্ষীণ রক্তিমাভা ধূসর সন্ধ্যার সহিত মিশিয়া দিবসের অস্তিত্ব তখনও প্রতিপন্ন করিতেছিল।

সরলা বৃক্ষের অগ্রভাগে দেখিল—তাহার আদরের কাঠবিড়ালী স্থির, নিঃস্পন্দ, বোধ হয় সন্ধ্যাসমাগমে নিদ্রাগত।

'জেমি! জেমি! জেমি!'

কিন্তু জেমি নিরুত্তর। ক্রমে একটি ছায়া, এবং ছায়া দলিয়া একটি যুবক অগ্রসর হইল।—ছিন্ন বস্ত্র, মলিন টুপি মস্তকে, এবং হস্তে একটি ক্ষুদ্র লৌহশৃঙ্খল।

'কেও, কিষন্?'

কিষন্ কহিল 'হাঁ'। সরলা! আমার একটি অনুরোধ, যাইবার সময় কাঠবিড়ালীটি আমাকে দিয়া দাও।' সরলা নয়নের জল আর রুদ্ধ করিতে পারিল না। কিষন্‌লাল তাহা মুছাইয়া দিল।

'ভাই কিষন্, তুমি বাবাকে ফুল তুলিয়া দিতে, আমার মনে আছে। আমরা গেলে ঐ ফুল প্রত্যহ তুলিও এবং কাঠবিড়ালীটিকে পালন করিও। 'জেমি' তোমাকে চিনে।'

কিষন্ কহিল, 'সরলা, আজ আমার বি. এল্, পাশের খবর বাহির হইয়াছে।' কিষন্ সরলার বাল্যসখা।

সেই নিরানন্দের মধ্যেও সরলার কত আনন্দ। চক্ষের জলের মধ্যে স্নেহভরা হাসি। কিষন্‌লাল অনেক কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কি ছাই বলিবে? সে ভাবিল, দেবীর নিকটে কি তুচ্ছ মানুষের কোনও কথা সাজে?

কিষন্-লাল কেবলমাত্র বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যাও; কিন্তু ইহাই কি—সরলা—আমাদের শেষ দেখা? না—কখনই না।' মুখ ভারি করিয়া, শ্যামবর্ণ সবল বাহু জাহ্নবীর দিকে প্রসারিত করিয়া কিষন্‌লাল কহিল 'কখনই না।'

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া ভ্রাতা ভগ্নী চলিয়া

গেল। কিন্তু বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমীদার কিষন্‌লালের পুত্র কিষন্‌লাল নদীতটে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল।

[২]

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মিসেস্ বসু এখন প্রফুল্লের সংসারের অধিকারিণী। সরলা তাহাকে গান শিখাইয়া, চিত্র শিখাইয়া মানুষের মধ্যে একটা মানুষ করিয়া তুলিতেছে। বৌ খুব সৌখীন। অতিশয় হাসে, কারণ, দন্তপংক্তি কুন্দনিন্দিত। মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে ছাড়ে না, এবং সেটা প্রফুল্লের দৈনিক পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লইবার পূর্ব্বে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'কারণ নাই বলিয়াই কাঁদি, আমি কোনও কাজের নয়।' মিসেস্ বসু ভয়ানক হাবা মেয়ে বলিয়া বিখ্যাত, এবং যাহা হাতে আসে, হয় বিলাইয়া দেয়, নয় হারাইয়া ফেলে। পাড়াপড়শী সকলেই তাহা চাহে, এবং বলে, 'এমন বৌ আর হবে না।'

উড়িষ্যার কোনও মহকুমার প্রফুল্ল 'প্রাকৃটিস্' জমাইতে গিয়াছেন। সেটা পয়সর ক্ষেত্র। কিন্তু খরচ এত যে, ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সরলা বলিত, "দাদা, অত খরচ করিও না, ভবিষ্যতে হবে কি?" কিন্তু প্রফুল্ল বলিত, "মান সম্ভ্রম প্রথমে, তাহার পর ভবিষ্যৎ।"

প্রফুল্লের মহাজন হাজারী বাবু। হাজারী বাবু উড়িয়া, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু-স্থানী, তাহা ঠিক কেহ জানিত না। তবে তিনি জাতিতে কায়স্থ, এবং তাঁহার বহু সম্পত্তি। হাজারীর পিতা দুই লক্ষের অধিক টাকা বস্ত্রব্যবসায়ে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। হাজারী তা[illegible] করিয়া তুলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় হাজারী বহুবিধ সুন্দর বেশভূষা[illegible] সজ্জিত হইয়া প্রফুল্লের গৃহাভিমুখে গতিশীল হইত, এবং একবার সরলাকে না দেখিয়া সে ফিরিত না।

হাজারীবাবুর খুব বিশ্বাস ছিল যে, তাহার মুখখানি অতি সুন্দর, এবং কথাবার্ত্তা অতি মধুর, এবং অধিক বাক্যব্যয়ের পূর্ব্বেই সরলা তাহার সঙ্কল্প বুঝিতে পারিবে। কারণ তিনি অবিবাহিত। কিন্তু হাজারি বাবু যে অবিবাহিত সে খবর লইবার কোন দরকার কাহারও নাই, সুতরাং বহুদিন যাতায়াত করিয়াও যখন হাজারী-বাবু বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কৌমার অবস্থা এবং দারপরিগ্রহের ঘোরতর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া না ব্যক্ত করিলে কোন স্ত্রীলোকের বুঝা অসম্ভব তখন একটা শুভদিন দেখিয়া, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই প্রফুল্লের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ বসু হাজারী বাবুকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

হাজারী। 'আপনার জন্য একখানা নূতন পার্শী শাড়ী লইয়া আসিয়াছি। মিষ্টার বসু বোধ হয় পছন্দ করিবেন। যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহার ভগ্নীর জন্যও—

মিসেস বসু। হাজারীবাবু! আপনার স্ত্রী পুত্রাদি ভাল ত!'

হাজারী। কি সর্ব্বনাশ! আপনি এতদিন জানেন না যে, আমি অবিবাহিত? আমার বয়স কেবল পঁচিশ। তবে পঁচিশ বৎসর বয়সে অনেকের গোঁপ পাকিয়া যায়, আমার কিন্তু পাকে নাই, ইহা কেবল—কুন্তলীনের গুণে বোধ হয়!'

মিসেস বসু। নিশ্চয়—কিন্তু আপনি বিবাহ করেন না কেন? আপনার ত অনেক টাকা আছে!'

হাজারী। টাকা আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই; অর্থাৎ, আমার বলিবার মানে ইহাই যে, কায়স্থ হইলেও আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়াই মনঃস্থ করিয়াছিলেন। মনঃস্থ করিয়াছিলেন মাত্র। তাহাতেই তিনি সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে বাস করিতেন। এখন সমস্যা, বিবাহ করি কাহাকে?

মিসেস বসু। কথাটা শোচনীয় বটে। আচ্ছা, আপনী 'চা' ও 'টোষ্ট' খান, আমি চিন্তা করিয়া দেখি।

হাজারী। (চা খাইতে খাইতে) আপনার চিন্তা যাহাতে গভীর না হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহার লাঘব করিবার জন্য—(চা শেষ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে)—দুইটি কথা বলিতে চাহি।

মিসেস বসু। বলুন।

হাজারী। আমার দেহ মন, প্রাণ। এবং বোধ হয় আত্মাও, যাহার হাতে সর্ব্বস্ব যাঁহাকে সঁপিতে চাহি, সে, অনিন্দ্য, অতুল্য, স্বর্গের অপ্সরা এই বাটীতেই বাস করেন, তাহা কি এতদিন বুঝিতে পারেন নাই? এখন কি তিনি এখানেই—

মিসেস বসু। (সভয়ে) কোথায়? কোথায়?

হাজারী। কি আশ্চর্য্য! আপনার ননদিনী। আপনি কি জানেন না? সুদ না লইয়া মিষ্টার বসুকে দশহাজার টাকার উপর ধার দিয়া আসিয়াছি, এবং সে ঋণ কখনও শোধ হইবে না—তাহাও জানি। এ সব কাহার জন্য? কাহার জন্য দোকান ছাড়িয়া প্রত্যহ এখানে আসিয়া, অতৃপ্তনয়নে বসিয়া থাকি? একবার তাঁহাকে আসিতে বলুন। কি নিষ্ঠুরা তিনি, আমাকে দেখিয়া

পাশ কাটাইয়া যান, আমি চাহিলে একবার হাসেন না, আমি হাসিলে একবার চাহেন না—

মিসেস বসু। (সজলনয়নে) মার্জ্জনা করুন, আমি বুদ্ধিহীনা বলিয়া বিখ্যাত। আপনার হৃদয়ের এই উদ্বেগ, আপনার এই সকল মহান্ উদ্দেশ্য আমি এতদিন বুঝি নাই—আপনি দাঁড়ান।

মিসেস্ বসু উঠিয়া সরলার ঘরের দিকে গেল। সরলা বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সরলার মুখ অতিশয় মলিন।

'দিদি, তুমি একদিন বলিয়াছিলে না? না, তোমার দাদা বলিয়াছিলেন যে, যদি কোনও ব্যবসাদার ভদ্রলোক পাটনায় পাটের ব্যবসায় করেন, তবে তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত, হাজারী বাবু আমাদের মহাজন।

(বাতায়নের অপর পার্শ্ব হইতে হাজারী বাবু।—'আমি জুতার ব্যবসা পর্য্যন্ত করিতে রাজি আছি।)

সরলা। বৌ, উঁহাকে এখনই এ বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বল, যদি ভাল কথায় না যান, তবে বোধ হয় আমাকে এবাটী হইতে যাইতে হইবে।

ক্রোধে সরলার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

হাজারী বাবু ব্যবসাদার লোক, কথার ভাবেই অবিলম্বে অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'আচ্ছা, ইহার ফলফল আগামী পূজার মধ্যেই বুঝিতে পারিবেন।'

মিসেস বসু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। সরোষে হাজারী বাবুর গমনের পর প্রফুল্ল বাটী ফিরিয়া আসিল। প্রফুল্ল বলিল, 'সরলা, করিয়াছ কি? হাজারী বাবু রাগিলে যে একবারে সর্ব্বনাশ,—স্থাবর অস্থাবর সকলই বিকাইয়া যাইবে, আমরা দাঁড়াইব কোথায়?'

'এত দূর?'—বলিয়া সরলা গৃহের মধ্যে গেল—অর্গল বন্ধ করিল—লুটাইয়া কাঁদিল। মিসেস বসু ডাকিল, 'দিদি, আয়, আমি গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা শোধ দিব'। কিন্তু সরলা গ্রাহ্য করিল না।

সে চারি বৎসরের মধ্যে কিষন্‌লাল বিলাতে গিয়াছিল। অতি সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পাস্ করিয়াছে। কিন্তু সে খবর সরলা পূর্ব্বে জানিত না। মিস্ ডমিঙ্গো (জুনিয়র) বিবাহিতা হইয়া এলাহাবাদে। বৃদ্ধা ডমিঙ্গো পরলোকে। কেবল বড় মিস্ ডমিঙ্গো সরলাকে খবর দিত।

শেষ পত্র।

"ভগ্নী সরলা! আমি একটি স্কুল খুলিয়াছি। আমার প্রধান ছাত্রীর মধ্যে জমীদার বিষণলালের সাত বৎসরের মেয়ে কমলাকুমারী। বিষণলাল স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কিষন্‌লালকে মনে পড়ে?—সেই যে অতি শান্ত সুশীল শ্যামবর্ণ সুশ্রী যুবা—যে শীঘ্রই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবে। তোমার কাঠবিড়ালী কমলার নিকট যত্নে ও স্নেহে লালিত হইতেছে। কমলা তাহার দাদার মত কালো নহে, বড় গৌরবর্ণা, আমাদের মত। ভবিষ্যতে সমগ্র বিহারকে দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

তোমার বাটীর শোভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন। তোমরা যাইবার পরে ক্বচিৎ চন্দ্রালোকে একটি ছায়াদেহ সেফালিকা বৃক্ষের গোড়া হইতে নদীতট পর্য্যন্ত দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে বিচরণ করিত। আমরা ভুত বলিয়া ভয় পাইতাম, কিন্তু বোধ হয় কিছুই নয়, মনের ভ্রমমাত্র।

তুমি একবার আসিও, একবার দেখিয়া যাইও।

তোমার বাল্যসাথী,
যারা ডমিঙ্গ (সিনিয়র)।

ইতিমধ্যে সুচতুর হাজারীলাল নানা অনুসন্ধানের পর একটা মতলব আঁটিয়াছিল। সে পনের হাজার টাকা ডিক্রীজারী করাইয়া লইল। অচিরাৎ পাটনার সম্পত্তি ক্রোক হইল। শীঘ্রই নিলামের দিনও ধার্য্য হইল।

মিস্ ডমিঙ্গো প্রফুল্লকে লিখিলেন, 'প্রফুল্লবাবু, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, আপনাদের পাটনার বাটী নিলাম ··রলা আমার পত্রের উত্তর দেয় না, আপনিও চুপ করিয়া আছেন, র অর্থ কি?'

প্রফুল্ল জানিয়াও সরলাকে জানিতে দেয় নাই। টাকা শোধ করা অসম্ভব, কিন্তু সরলার হৃদয়ে আঘাত দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হইবার তাহা হউক, সরলাকে পরে বলিলে চলিবে। ইহা, মনে করিয়া প্রফুল্ল হাল ছাড়িয়া বসিয়া ছিল।

শরৎঋতু উপস্থিত। গঙ্গাতট হইতে জল অপসৃত হইয়া প্রকাণ্ড বালুকা-সৈকত পড়িয়া গিয়াছে। মিস্ ডমিঙ্গো ছাত্রীদিগকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। অদূরে একখানি নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তীরবেগে ঘাটে আসিয়া লাগিল। মিস্ ডমিঙ্গো কহিলেন, 'কি সুন্দর বজরা! বোধ হয়। জমীদারদিগের। কমলা চীৎকার করিয়া কহিল, 'ঐ যে ভইয়া।'

নৌকারোহী আনন্দে তটে লাফাইয়া অবতীর্ণ হইল। কমলাকে কোলে লইল। মিস্ ডমিঙ্গো কিষণলালের সহিত 'শেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, 'কমলা এখন ইংরাজীর 'প্রাইমার সিরিজ' শেষ করিয়াছে।' 'কমলা তোর কাঠবিড়ালী কই?'

মিস্ ডমিঙ্গো গৃহ হইতে সূক্ষ্মসুবর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ 'জেমি'কে শীঘ্র লইয়া আসিলেন। 'জেমি' কিষনুলালের স্কন্ধ বাহিয়া মস্তকে উঠিল, এবং হ্যাটের এক কোণে লুকাইয়া রহিল।

'কমলা চল্, আমরা ঐ বাটী দেখিয়া আসি।'

মিস্ ডমিঙ্গো। উহা তালাবদ্ধ, আদালতে ক্রোক হইয়াছে, কল্য নিলাম হইবার কথা।

কিষনলাল গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'ইহার অর্থ কি? প্রফুল্ল বাবু কোথায়? তিনি কি জানেন না?'

মিস্ ডমিঙ্গো। জানেন বৈ কি। তাঁহারা ময়ুরভঞ্জে। মিসেস্ বসুও সেখানে। সরলা আমার পত্রের উত্তর দেয় না।

কিষন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, 'সরলার বিবাহ হইয়াছে কি?' কিন্তু মিস্ ডমিঙ্গোর সম্মুখে সেটা অসভ্যতা প্রকাশ করা হয় মাত্র, তাই চুপ করিয়া গেলেন।

মিস ডমিঙ্গো কহিলেন, 'সরলার খবর এখানে কেহ জানে না। আপনার ম্যানেজার জহরমল্ মাড়োয়ারী নিলামের কথা জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।'

কমলাকে নৌকায় তুলিয়া [illegible] চলিয়া গেল। কমলা বলিল, 'ভইয়া, ঐ বাগানে আমি রোজ ফুল কুড়াইতাম, চারি দিন হইল, তালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহারা কি নিষ্ঠুর!'

কমলার মুখ চুম্বন করিয়া কিষণলাল কহিল, 'ঐ বাটী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, সেও কবুল, কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিতে অন্য কেহ লইতে পারিবে না।'

তাহার পরদিন আদালতে অনেক লোক। 'বসু-কুটীর নিলাম হইতেছে'। তিন হাজারের উপর ডাক উঠিল না। ডিক্রীদার হাজারীবাবু কহিলেন, 'আমার ডাক্ সাড়ে তিন হাজার।' এমন সময় এক জন আগন্তুক উপস্থিত।

'জহরমল্ ভোয়ারার ডাক্ পাঁচ হাজার।' ক্রমে দশ হাজার, পনের হাজার। উভয় পক্ষে রোষারেষি হইয়া ডাক বিশ হাজারে উঠিল।

হাজারীলাল। আপনি কে? এ জমী ও বাটীর দাম দুই হাজারও হইবে না, এত ডাক হাঁক কেন? (আদালতের প্রতি) বোধ হয় ইহার টাকা দাখিল করিবার পারগতা সম্বন্ধে তদন্ত করিলে ভাল হয়।

জহরমল্ দন্তব্যাদানপূর্ব্বক আদালতের দিকে তাকাইলেন।

আদালত। অনাবশ্যক, বিহার প্রদেশে জহরমল্‌কে সকলেই জানে।

ক্রমে পঞ্চাশ হাজারের পর হাজারী বাবু আর ডাকিলেন না। চমৎকৃত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া মনে করিলেন, সম্মুখে স্বয়ং কাল উপস্থিত। হাজারীর উকীল কানে কানে কহিল, 'বৃথা ডাকা, এ জমীদারী সমস্ত রায় কিষন্‌লালের; আপনার প্রজাস্বত্ব হইলেও তাহারা এখানে তিষ্ঠিতে দিবে না। আপনি কুক্ষণে ইহাতে হাত দিয়াছেন।'

ডিক্রীর টাকা লইয়া হাজারী বাবু চম্পট দিলেন। বাকি পঁয়ত্রিশ হাজার প্রতিবাদী প্রফুল্ল বোসের নামে আদালতে জমা রহিল।

৪

বসুকুটীর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। নদী-উপকণ্ঠে শ্বেত-প্রস্তরের অসংখ্য সোপান, এবং তারই দুই পার্শ্বে দুইটি চূড়া। ডমিঙ্গো বিদ্যালয়ের বালিকাগণের ক্রীড়ার্থ প্রকাণ্ড রেলিংবেষ্টিত বিস্তৃত 'লন'। দেওঘর হইতে আনীত অসংখ্য গোলাপের চারা, এবং থাকে থাকে বহুবর্ণের পুষ্পিত লতা।

ফুলের বাগানের সমগ্র ভার মিস্ জ্যানের উপর। বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিবার ভার কমলার ও তাহার সখীগণের। বাটীর অভ্যন্তরে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল শেফালিকা বৃক্ষের নিম্নে একটি বেদী স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে অন্য কাহারও যাইবার হুকুম নাই।

যে ঘরে সরলা থাকিত, সেই ঘরে খানকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুমূল্য ইতালীয় চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এ দিকে আর বিলম্ব নাই। ছুটীর মধ্যেই প্রফুল্ল কলিকাতায় আসিবে। এমন সময়ে সরলা কহিল 'দাদা, যাহা শুনিলাম, তাহা কি সত্য?'

প্রফুল্লের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। 'সে বাড়ী নিলাম হইয়া গিয়াছে। কোনও মাড়ওয়ারী কিনিয়াছে—কিন্তু—'

সরলা। আমারও বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জগতের সহিত যে মায়া লইয়া সম্বন্ধ ছিল, তাহা চুকিয়া গিয়াছে। দাদা, ঐখানে দাঁড়াইবার স্থান ছিল। ভক্তি স্নেহ, প্রীতি সকলই ঐখানে ছিল। ঐ শিউলী গাছের তলায় বসিলে বাবাকে মনে পড়িত, এবং তিনি যাঁহার চরণপ্রান্তে লীন হইয়াছেন, সেই বিশ্বপিতাকে মনে পড়িত। তুমি তাহার পথ রুদ্ধ করিয়াছ। আর কোথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিব ?—

গভীরশোকবিজড়িতস্বরে সরলা আবার বলিল 'কোথায় ?' সাত বৎসর পূর্ব্বে প্রফুল্ল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার জননী পাগলিনীর ন্যায় নদীতটে দৌড়াইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কৈ, প্রফুল্ল কোথায় ?' সেই স্বরের সহিত ইহার কত সাদৃশ্য! কঠোর সংসারাবরণ ভেদ করিয়া সরলার স্বর প্রফুল্লের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে আঘাত করিল।

'সরলা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

সরলা। দাদা, পাপ নাই, এ সব মায়ার খেলা। ইহারা পথ দেখাইতেছে। সেই পথ, যাহা আমরা এখনও দেখিতে পাই না। অন্ধ, চিরান্ধ আমরা।

প্রফুল্ল সরলার মুখ দেখিয়া ভয় পাইল। প্রায় মাসাবধি সরলার জ্বর হইতেছিল, তাহার সহিত কাশী। ডাক্তারের মতে 'কাশীটা ভাল নয়।'

প্রফুল্ল। সরলা, এখনও নিরাশ হই নাই। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলি। ঋণ শোধ হইয়াও আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আদালতে জমা আছে; অদ্য নোটীশ পাইয়াছি। কথাটি কিন্তু বড় রহস্যময়। ঐ পড়তি জমী ও বাড়ীর দাম নিলামে [illegible] হাজার টাকা কি করিয়া উঠিল, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আসিতেছে না।

সরলা। দাদা, ঐ টাকা দিয়া বাড়ী ফিরাইয়া লওয়া যায় না।

প্রফুল্ল। চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পাগলী! যে অত টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছে, সে কম দামে ছাড়িয়া দিবে কেন ?

সরলা। আমরা দশ বৎসরে শোধ করিয়া দিব।

প্রফুল্ল। দেখা যাউক, সুদের লোভে মাড়ওয়ারী তাহা দেয় কি না।

সরলা। কোন্ মাড়ওয়ারী ? বাবার সহিত কি আলাপ ছিল না ? আমি অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিলে শুনিবে না ?

প্রফুল্ল। না। আমরা পাটনায় যাইব।

সরলা সাদরে প্রফুল্লের হাত ধরিয়া কহিল, 'দাদা, ষ্টীমার করিয়া চল। রাজমহল হইতে ষ্টীমার পাওয়া যায়। এখান হইতে আমরা রেলে যাইব।

চারি বৎসর পূর্ব্বে জিনিসপত্র গুছাইতে যে সময় লাগিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে সরলা সব গুছাইয়া লইল। সরলা মিসেস্ বসুর হাত ধরিয়া কহিল, 'বৌ, এই আমার শেষ ভ্রমণ।' আমার জীবন রাখিবার সেই স্থান ছাড়া আর অন্য কোথায়ও নাই।

মিসেস্ বসু। দিদি, গঙ্গার হাওয়া লাগিলে তোর কাশী সারিয়া যাইবে।'

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে।

শারদীয়া নবমী নিশি। অসংখ্য আলোকমালায় শোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরী গঙ্গাবক্ষে। অদূরে বসু-কুটীরের মর্ম্মরসোপানাবলীর উপর বসিয়া কতিপয় বন্ধু পিয়োনো লইয়া গান করিতেছিল। মিস্ ডমিঙ্গোর করুণ স্বর গঙ্গাবক্ষ ছাইয়া বহুদূরে প্রতিধ্বনিত, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ক্রমে মধুর হইতে মধুরতর হইল। কিষণলাল রুমাল লইয়া একবার নয়ন আবৃত করিল।

'জহরমল্, আজ কোনও নূতন ঘটনা ঘটিবে।'

জহরমল নস্য লইয়া কহিল, 'খুব সম্ভব। সংসারই ঘটনাময়, এবং প্রত্যেক ঘটনা নূতন।'

অনতিবিলম্বে একখানি ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৫)

আদালত হইতে টাকা লইয়া প্রফুল্ল জহরমল্ মাড়ওয়ারীকে একখানি পত্র লিখিলেন।

'মান্যবরেষু—অতি কষ্টে পড়িয়া এই '[illegible]' লিখিতে বাধ্য হইলাম, পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এখন দিতে পারি, যদি অবশিষ্ট পনের হাজার টাকা দশ বৎসরের দলীল লইয়া বাকী রাখিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। আমার ভগ্নীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।'

জহরমলের উত্তর।—মান্যবরেষু। আমি যাঁহার জন্য ও যাঁহার টাকা লইয়া এই বাটী খরিদ করিয়াছি, তিনি স্বয়ং টাকা লইতে আজি সন্ধ্যাকালে আপনাদের ষ্টীমারে যাইবেন ও দলিলপত্রাদি যাহা রেজিষ্টারী করিতে হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন। তিনি বিহার প্রদেশের এক জন শ্রেষ্ঠ জমীদার, অতিশয় গণ্য মান্য, এবং কৌন্সিলের মেম্বর।'

বহু চেষ্টার পর প্রফুল্লের নয়নাবরণ উন্মুক্ত হইল। 'তাই ত, কিষণলালই ত

এ সম্পত্তির খরিদ্দার! কিন্তু মিষ্টার লাল ত এখন আর কিষণলাল নহে, আমাদের অনুরোধ রাখিবে কি? কি বল বিনোদ?

মিসেস বসু। আমি তাঁহার মতলব চট্ করিয়া বুঝিয়া লইব। তুমি কোনও কথা কহিও না। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক চালাকচতুর হইয়াছি।

বাস্তবিক মিসেস বসুর বুদ্ধি অনেক খুলিয়াছিল, কারণ, মিষ্টার লাল আসিবামাত্র তাঁহার যত্নে ও অভ্যর্থনায় মোহিত হইয়া পড়িলেন।

মিসেস বসু। আমি শুনিয়াছি, আপনি সরলার বাল্যবন্ধু, সুতরাং আমারও বন্ধু। (প্রফুল্লের প্রতি) দিদি কোথায়?

প্রফুল্ল। ঘুমাইয়া। আমি চা আনি।

কিষণলাল। বড় দুঃখ, আপনার বিবাহের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, আমি তখন বিলাতে!

মিসেস বসু। যদি আপনার বিবাহের সময় আমরা থাকিতে পারি, তবে সে দুঃখ মিটিয়া যাইবে। সে সৌভাগ্যবতী হয় ত মেম, কিংবা হিন্দুস্থানী নিশ্চয়—অর্থাৎ, আমি এখনও ঠিক বলিতে পারি না।

কিষণলাল। এইবার আপনি ঠকিয়াছেন! কারণ, সে স্বপ্ন আমার হৃদয়ে এখনও উদিত হয় নাই।

মিসেস বসু। আমি সংসারের কতকগুলি লোককে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই,—যেমন সরলা দিদি। তাহারা বিবাহের নামে চটিয়া যায়। অথচ ঘরসংসার না পাতিয়া মানুষ কি করিয়া থাকিতে পারে?

কিষণলাল। ইহাতে [illegible] বখেড়া ও যন্ত্রণাও আছে, বোধ হয়, আপনি তাহা ভোগ করেন নাই। [illegible]চা তৈয়ারি করিয়া আনিল। চা শেষ হইয়া গেলে প্রফুল্ল কহিল 'এবাটীরপুনর্বিক্রয় সম্বন্ধে বোধ হয় আমার ভগ্নী সরলা কিছু কহিতে চাহে, আপনি একবার ঐ ঘরে চলুন।'

কেবিনের একপার্শ্বে কৌচের উপর সরলা উপবিষ্টা। সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত জলরাশি সান্ধ্যবায়ু সহিত মিশিয়া কলস্রোতে বহিতেছিল। অসংখ্য তারকা আকাশে। দূরে ঘনীভূত দশমীর বিসর্জ্জন কোলাহল মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া হৃদয়ে পুরাতন স্মৃতি এবং নূতন আশা সঞ্চারিত করিতেছিল। কিষণলাল ধীর পদবিক্ষেপে কম্পিত হৃদয়ে কেবিনের নিকট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"সরলা! তোমার কি রকম কাশী?" সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! সরলার

মুখ তুলিবার সাহস হইল না। কিষন্‌লাল দেখিল সে আর বালিকা সরলা নহে। সপ্তদশবর্ষীয়া সরলা। দেবমূর্ত্তি। আলুলায়িত রুক্ষকেশ গুচ্ছে গুচ্ছে হেলিয়া কোচখানির অর্দ্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কি ধীর, কি মধুর, কি শান্তি-মাখা বিষাদময় চক্ষু দুটী!

অনেকক্ষণ পরে সরলা কি ভাবিয়া কম্পিত হস্তে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার নোট কখানি কিষনলালকে দিয়া কহিল 'আপনি কিছু মনে করিবেন না, বাকি টাকার সম্বন্ধে—'

কিষনলাল। সরলা! তুমি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পার নাই। তাহার পর কিষনলাল ঈষৎ হাসিয়া, নোট কখানি লইয়া, এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া, জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিল।

অবাক হইয়া সরলা কিষনলালের মুখের দিকে চাহিল। কিষনলালের মুখ কোন অভিনব জ্যোতির্দ্দীপ্ত। চারি বৎসরের পূর্ব্বেকার মুখ হইতে এ মুখ সুন্দরতর। বড়ই সুন্দর!

সরলা। কিষন লাল! করিলে কি?

কিষন্। সরলা! তোমার কাশী কি রকম?

সরলা। যেরকম হইলে, পরলোকের পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু তুমি করিলে কি?

কিষন্। যাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার তাহাই করিয়াছি। সরলা, তোমার বাল্যসখাকে ভুলিয়া গিয়াছ।

সরলা। অতি কম্পিত স্বরে কহিল 'না'। সেই 'না'টির মধ্যে কত বেদনা, কত দুঃখ-স্মৃতি, এবং কত স্নেহ!

কিষণলাল নিকটে আসিয়া কহিল, তবে ছাগান্ধ্যের কথা তোল কেন সরলা?

সরলা অধীর হইয়া বলিল, তুমি কোন্ দেশের দেবতা কিষণ্!

কিষণ। আমি দেবতা নহি ভিখারী, তবে যে দেশের ভিখারী, সেখানে এখনও যাইতে পারি নাই। আমার বলিতে সাহস হয় না।

'সাহস হয় না?'

সরলা সব ভুলিয়া গিয়া কিষণলালের হাত ধরিল 'কিষণ্—তোমার কথা কেমন নূতন বোধ হইতেছে। তুমি—তুমি—কোন কথা কহিতেছ?

কিষণ সরলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া কহিল—'হৃদয়ের কথা—আজীবন প্রত্যেকশোণিত-সঞ্চিত, প্রত্যেকস্বপ্নজড়িত, প্রত্যেক দীর্ঘনিশ্বাস-প্রবাহিত, প্রেমের কথা।'

সরলা কাঁদিল। কিষনলালের বক্ষে মুখ লুকাইল। 'কিষন্! আমার জগতে কেহ ছিলনা বলিয়াই জানিতাম।

অনেকক্ষণ পরে কিষণ কহিল—

সরলা তোমার বাটীতে তুমি সকলকে লইয়া যাও, দশমীর নিশি যেন পোহাইয়া না যায়।

সরলা কিষন লালের হস্তযুগল স্বীয় করবদ্ধ করিয়া কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। 'কিষন—বোধ হয় আমি বাঁচিব'।—কিষনলাল সাদরে সরলার কেশে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কহিল 'সে ভার আমার'।

এমত সময় মিসেস বসু—সাড়া দিয়া 'ডেকে' আসিলেন—'দলীল দস্তাবেজ সম্বন্ধে যাহা ওজর আপত্তি থাকে তাহা মিষ্টার বসুর সহিত এই বেলা ঠীক করিয়া লউন। খাবার তৈয়ারী। অবশেষে বোধ হয়---

কিষণলাল। কি অবশেষে?

মিসেস বসু কুন্দনিন্দিত দন্তশোভা চন্দ্রালোকে বিকীর্ণ করিয়া কহিলেন সেই পুরানো গল্প।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুজুদার।

নোবেল-পুরস্কার।

'পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে।'

গুণ ভক্তির উদ্রেক [illegible]য়। [illegible]ক্র মিত্র উদাসীন, সকলের উপরই গুণ আত্ম-প্রাধান্য স্থাপন করে। বু[illegible]তয়ারি ব্যক্তিমাত্রই গুণের পূজা করিয়া থাকেন। আধুনিক জগতে ভাবময় সাহিত্যে কোন কবির স্থান সর্ব্বোচ্চ, বিচারনিপুণ গুণিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যে ভাবাঢ্যতা দেখিয়া এই বৎসর তাঁহাকে জগদ্বিখ্যাত নোবেল-পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। গুণী ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ সমাদার প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা গুণ-গ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে চিরস্মরণীয় দানবীর মহা-পুরুষ এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র বিশ্বে অতুলকীর্ত্তি লাভ করিয়া মরিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণী পুরুষের জীবন-কাহিনীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। তাঁহার গুণকীর্ত্তনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই অমর-কীর্ত্তি মহাপুরুষের নাম অ্যালফ্রেড্ নোবেল। য়ুরোপ খণ্ডের সুইডেন প্রদেশে ষ্টক্ হলম্ নগরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা নোবেল জন্ম-গ্রহণ করেন। রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটারস্‌ব্যর্গে তিনি প্রথমতঃ বিদ্যা-শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা যন্ত্রকলাভিজ্ঞ Engineer ছিলেন। কিছুকাল বিদেশে বিদ্যা-উপার্জ্জনের পর, নোবেল যন্ত্রকলা-চর্চ্চায় পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্ফোটনদ্রব্যের নির্ম্মাণ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরেই রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নোবেল শীঘ্র-দাহ্য ডাইনা-মাইট দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। এই দাহ্য দ্রব্যের আবিষ্কারই তাঁহার বিপুল ধনাগমের মূল কারণ। আর্ডিয়ার, আয়ারসায়ার প্রভৃতি স্থানে স্ফোটন দ্রব্যের বৃহৎ কারখানা খুলিয়া, তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করি-লেন। এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায়, তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, স্যান রেমো নামক স্থানে নোবেল পরলোকে গমন করেন।

নিজের বিদ্যাবুদ্ধিবলে উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ভাগ মানবসমাজের কল্যাণের জন্য কিরূপে ন্যস্ত হইবে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সার্দ্ধ দুইকোটির কিঞ্চিৎ অধিক টাকা, নোবেল কয়েকজন কৃতবিদ্য "ট্রষ্টী"র হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। এই বিপুল অর্থের সুদ প্রতি বৎসর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান যে, ইহা দ্বারা সমভাবে বিভক্ত পাঁচটি পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমগ্র জগতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যে নিম্নলিখিত ভাবে পাঁচজন কর্ম্মবীর নির্ব্বাচিত করিয়া প্রত্যেককে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে। (১) পদার্থ বিজ্ঞানে, (২) রসায়ন বিজ্ঞানে, (৩) চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, অথবা দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানে যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাই প্রথম তিনটি পুরস্কারে অধিকারী হইবেন। (৪) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবময় সাহিত্য গ্রন্থের প্রণেতাই চতুর্থ পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। (৫) জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ-স্থাপনকল্পে, রাজ্যের স্থায়ী সৈন্যবিভাগের সম্যক্-নিয়মন বা হ্রাস-বিধান ও তদ্দ্বারা জগতে শান্তিসংস্থাপন কার্য্যে যে ব্যক্তি অত্যধিক আত্ম-নিয়োগ করিবেন, তিনিই পঞ্চম পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। এই পঞ্চ কর্ম্মবীরের নির্ব্বাচন-ভারও উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত আছে। সুইডেনের "বিজ্ঞান-সমিতি"র নির্ব্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদত্ত হয়; সেই

দেশেরই "চিকিৎসা-সমিতি" তৃতীয় পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচিত করেন; চতুর্থ পুরস্কারের পাত্র-নির্দ্ধারণ সুইডেনের "সাহিত্য-সমিতি"র হস্তে অর্পিত আছে; এবং সুইডেনের প্রতিনিধি-সভা-নির্ব্বাচিত পাঁচ জন যোগ্য ব্যক্তিই পঞ্চম পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচিত করেন।

পুরস্কারের পাত্র-নির্ব্বাচন ব্যাপারে এই "সমিতি"গুলির কাহারও উপর কোনও পক্ষপাত দেখাইবার কারণ নাই। তাঁহারা বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে নিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। কেবল যে সুইডেনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই এই সমস্ত বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; ফরাসী, জার্ম্মাণ, পোল, বেলজিয়ান্ প্রভৃতি য়ুরোপের নানাজাতির ও মার্কিণের গুণীরাও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানের সমাদর করিতে গিয়া, এইসকল সমিতি অবিচারের আশ্রয় লইবেন, এরূপ সন্দেহের কোনও কারণই থাকিতে পারে না। পুরস্কার-প্রতিষ্ঠাতা নোবেল-পুরস্কার প্রদান বিষয়ে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, কিংবা দেশভেদের বিচার না করিয়া নির্ব্বাচিত উপযুক্ত পাত্রেই পুরস্কার বিতরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পুরস্কার-বিতরণ-সমিতিগুলিও সকল সময়েই নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সাহিত্যক্ষেত্র কিছু অনুর্ব্বর, এই নিমিত্ত বিচারকগণ সময়ে সময়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া নাট্যকার ঔপন্যাসিক ও ঐতি-হাসিককেও এই চতুর্থ পুরস্কারটি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে সাহিত্যজগতে তাহারাও যে সর্ব্বজনসম্মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

কি মহৎ-উদ্দেশ্যে দান[illegible]বেল জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই পাঁচটি পুর-স্কার-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গি[illegible]ছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য। যে কর্ম্মবীর স্ফোটন দ্রব্য প্রভৃতি নরঘাতী বস্তু-জাতের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি কেন বিগ্রহ-নিগ্রহের ও সমগ্র জগতে শান্তি সংস্থাপনের সহায়তাকারী বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাঁহার পঞ্চম পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন? বুঝি বা মহাপুরুষের মনে দাহ্য দ্রব্যের আবিষ্কারের জন্য পশ্চাত্তাপ হইয়াছিল। তাহাই বা কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ও পরাজিত শত্রুর রাজ্যে স্ফোটন দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে, জগতের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে যুদ্ধলোলুপ জাতির হৃদয়ে এই-রূপ ভীতিসঞ্চার করিতে পারে বলিয়া, এই নূতন আবিষ্কার জগতে শান্তি সংস্থাপনের সহায়তাই করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, সৎ পাত্রে এই বিপুল

অর্থের বিনিয়োগ-ব্যবস্থার অপর একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই হয় যে, সমগ্র জগতের বিশেষজ্ঞগণ যদি এই পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে, বিশ্ব-মানবের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের সম্ভাবনা অধিক হইতে পারিবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে জগজ্জন-হৃদয়গ্রাহী করিয়া যিনি ভাবময় গ্রন্থের রচনা করিতে পারিবেন; তিনিই চতুর্থ পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারিবেন —ইহাই ত নোবেলের উদ্দেশ্য ? সমস্ত জগদ্বাসী যদি একই ধর্ম্ম-তত্ত্ব একভাবেই বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ভাবের একতা-নিবন্ধন জগতে শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে, প্রাচ্য প্রতীচ্যে সম্মিলন অসম্ভব, তাঁহাদের সে মত ভ্রান্ত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের এক-তানতা সম্ভাবিত মনে করিয়াই বোধ হয়, নোবেল এই পুরস্কার-গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়া থাকিবেন। এই একটি সদনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য করিয়াই জগতে ভাবের আদান-প্রদান বিশেষ ভাবে সাধিত হইতে পারিবে; প্রাচ্য প্রতীচ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার বিনিময় চলিতে পারিবে। মনে হয়, নোবলের এই দান প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সখ্যতা-বন্ধনের সুদৃঢ় গ্রন্থি। তিনি এত অর্থ উদারভাবে পুরস্কারে দান করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই পুরস্কার-বিতরণ কার্য্য অবসান প্রাপ্ত হইবে, তাহার আশঙ্কা নাই। কাজেই সমগ্র জগতের এই বন্ধন-গ্রন্থি ছিন্ন হইবারও কোনও সম্ভাবনা নাই।

বহু-গ্রন্থ রচনা করিয়া, বহু বক্তৃতা করিয়া, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব-সংস্থাপনের চেষ্টা করা অপেক্ষা, এই প্রকার দানক্রিয়া দ্বারা জগতের অধিক উপকার সাধিত হইতে পারে! যে দানে স্বজাতি বিচার নাই, যে দানে পাশ্চত্য জগৎ-প্রিয়তা নাই, সেদানে জাতি বর্ণ বিদ্বেষ নাই, সেই দানই মহদ্দান। নোবেল যথার্থই বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যাতেই মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়; অভিমান সমূলে বিনষ্ট হয়, অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয়; এবং পরার্থতত্ত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই মহাপ্রাণ দাতার প্রাণে বুঝি উল্লিখিত ভারতীয় শাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রতিগ্রহ-পাত্রের কথা উদিত হইয়াছিল,—

"প্রজ্ঞা-শ্রুতাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ।
গামশ্বং বিত্তমন্নং বা তাদৃশে প্রতিপাদয়েৎ॥"

বুদ্ধিবিদ্যাবিশারদগণের জন্যই অর্থ-প্রতিপাদন করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতেও বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিবিধানের জন্য ধন-কুবের বৈশ্যগণ অম্লান-বদনে অর্থব্যয় করিতেন। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণও সর্ব্বদা জ্ঞানের সমাদর করি-

তেন। তাই মহাপুরুষগণ মানব-হিততৎপর হইয়া, নিশ্চিন্তমনে অলৌকিক কার্য্যসাধনে সমর্থ হইতেন।

দেশে বিদেশে কোটীশ্বর ত কতই আছেন। মহামনা নোবেলের মত সদনুষ্ঠান করিয়া জগতে "শান্তি ও সখ্যতার" স্থাপনের জন্য কয়জন ধনাঢ্য ব্যক্তি অগ্রসর হয়েন? তাঁহারা যদি ক্ষুদ্রচিত্ততা, স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি হীনতা পরিত্যাগ করিয়া মহানুভব উদার-হৃদয় নোবেলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, বিদ্যার গৌরবের জন্য, এইপ্রকার পুরস্কারাদির ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তাহা হইলে, বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদগণের বিদ্যা-প্রভায় জগৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাঁহারা যদি "ত্যাগায় সম্ভৃতার্থ" হয়েন, তাহা হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

জ্ঞান-ক্ষেত্র জগদ্ব্যাপী থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য জগৎও যে এক সময়ে জাতিনির্ব্বিশেষে জ্ঞানের সমাদর করিতে জানিত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই বরাহমিহিরের বিখ্যাত শ্লোকটিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

"ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যস্তে কিং পুনর্ব্বেদবিদ্ দ্বিজঃ॥

যাহাদিগকে অনেকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারাও বিদ্যার গৌরবে এক সময় আর্য্য জাতির নিকট ঋষিবৎ পূজ্য ছিলেন। "নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা" প্রভৃতি সুভাষিত সকল এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল।

বঙ্গের কৃতীসন্তান রবীন্দ্রনাথকে এই বৎসর পাশ্চাত্য-সাহিত্য-সমাজ এই পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষভাবে উৎফুল্ল হইবার কারণ এই যে, প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম "নোবেল"-পুরস্কার লাভ করিলেন। ইহাতে আমাদের বঙ্গসাহিত্য জগৎ-সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিল বলিয়া, বঙ্গ-বাসীর জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

হৃদি আকাশে।

প্রাচীন স্মৃতিগুলি মেঘের গুরু ডাকে,
বেদনা-বায়ু-ভরে ঘুরিছে চারি দিকে।

হৃদি-প্রান্তরে।

কোথাও নাহি আলো, কোথাও নাহি তারা,
হৃদি-প্রান্তরে আমি একাকী পথহারা
বায়ু সে শব্দহীন, অন্ধের আঁখিবৎ,
নিঃস্পন্দ অন্ধকার, কোথাও নাহি পথ!

কেবলই মনে হয়, কোথায় আছে যেন,
ঝটিকা ঘুমাইয়া—নিদ্রিত শূর সম।
নিঃশ্বাসে উঠি বায়ু বুঝি বা ঝড় হয়ে'
চেতনা যাবে মোর মেঘ-বজ্রে ভাঙ্গিয়ে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্।*

"কাব্যং কল্পান্তর-স্থায়ি জায়েত সদলঙ্কৃতি"।

অভিনবগুপ্ত [ধ্বন্যালোকলোচনে] ভট্টনায়কের একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"শব্দ-প্রাধান্যমাশ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথক্ বিদুঃ।
অর্থ-প্রাধান্যমাশ্রিত্য বদন্ত্যাখ্যান মেতয়ো-
র্দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপার-প্রাধান্যে কাব্যধীর্ভবেৎ।"

এতদ্দ্বারা শাস্ত্রের এবং আখ্যানের এবং কাব্যের লক্ষণা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রে "শব্দে"র প্রাধান্য,—যে শব্দের যেটি মুখ্যার্থ, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। আখ্যানে "অর্থে"র প্রাধান্য,—শব্দের দ্বারা যাহা গৌণভাবেও সূচিত হইতে পারে, তাহাও গ্রহণীয়। কাব্যে এই দুইটি গৌণ বিষয়;—মুখ্য বিষয় "ব্যাপার"।

ভট্টনায়ক বলেন,—অভিধা, ভাবনা, চর্ব্বণ,—এই তিনটিতে 'কাব্য' হয়। চর্ব্বণের অর্থ 'রসোৎপত্তি'। উদাহরণ,—

"ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।"

এখানে শোকই [শ্লোক] কাব্য। তাহাতেই "রসোৎপত্তি"। তাহারই নাম "ব্যাপার,"—কাব্যে তাহাই প্রধান স্থান অধিকার করে। অনেক কথা একত্র গাঁথিলে "কাব্য" হয় না; আবার গাঁথিতে জানিলে, অতি অল্প কথাতেও "কাব্য" হইতে পারে। আসল কথা—"ব্যাপার"—"রসোৎপত্তি"।

মহাকবি ভাসের যে কয়খানি দৃশ্যকাব্য পাঠ করিয়াছি;—সমস্তগুলি পাঠ করিবার সুযোগ এখনও হয় নাই। তাহাতে দেখিয়াছি, তাঁহার রচনায় শব্দ বা অর্থ প্রাধান্য লাভ করে নাই,—প্রাধান্য লাভ করিয়াছে "ব্যাপার"। আমাদের আধুনিক কাব্যে ইহার স্থান বড় নীচে নামিয়া পড়িতেছে। সুতরাং মহাকবি ভাসের কাব্যালোচনায় আমরা আবার কাব্যের প্রকৃত

---

* রাজসাহী—শাখা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

লক্ষ্য ধরিতে পারিলে, আমাদের সাহিত্য লাভবান্ হইতে পারিবে। "রাজসাহী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ" এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়া, ধন্যবাদভাজন হইলেন।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য-শিল্পাদি ললিত-কলার উদ্ধারের জন্য জিজ্ঞাসুর ও অনুসন্ধিৎসুর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রযত্নে লুপ্তরত্নের অধিগম-ব্যবস্থা যতই অধিক হইতে থাকিবে,—এবং তাঁহারাও সে বিষয়ে যতই অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন,—ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব-প্রভা ততই আধুনিক লোক-হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমির-ভেদে সমর্থ হইয়া, অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া, সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া ফেলিবে। ভারত এখনও মৃত হয় নাই, পূর্ব্বাচার্য্য-গণের কাব্যামৃত ও কমনীয়-কলা-কলাপ-সুধা পান করিয়া অমৃত ভারত কখনই মৃত হইতে পারে না,—বহু কারণে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে—উপযুক্ত শুশ্রূষায় পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বস্থ হইতে পারিবে।

সম্প্রতি সংস্কৃত রূপক-সাহিত্যের প্রাচীন পারদর্শিতার এক অচিন্তিতপূর্ব্ব নিদর্শন সভ্য জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। নিমজ্জন-কুশল ব্যক্তি যেমন গভীর অতলস্পর্শ রত্নাকরের অভ্যন্তর হইতে ভা-সমন্বিত মহামূল্য মুক্তাবলী লইয়া সাগর-বক্ষে ভাসিয়া উঠে,—মহারাজ ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির পুস্তকাগারের প্রাচীন গ্রন্থ-রক্ষক পণ্ডিতবর গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ও সেইরূপ প্রাচীন-গ্রন্থ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এক পুরাতন মহাকবির নাটকাবলী লইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছেন। এই নাটকাবলীর অভিনব আবিষ্কার ভারতবাসিগণের পক্ষে মহাগৌরবের সমাচার। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায়, বিশেষতঃ সংস্কৃত রূপক-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব-পর্য্যালোচনায় এই নবাবিষ্কৃত নাটক-চক্র এখন প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হইতে পারিবে। ইহাতে ভারতীয় দৃশ্য কাব্যের চিরবিলুপ্ত প্রথম পরিচ্ছেদটি বহু শতাব্দীর পর আবার আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। এই আবিষ্কারের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়, সমগ্র ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর, ধন্যবাদভাজন হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কাব্যামৃত-রসাস্বাদ-লোলুপ সুধীগণের পক্ষে এই নাটক-চক্র চিত্ত-বিনোদনের উপায় হইবে।

প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের নানা স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া, গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় পদ্মনাভপুরের উপকণ্ঠে, মণ-লিক্কর

মঠে, প্রাচীন কৈরলী-লিপি-নিবদ্ধ তাল-পত্রাত্মক এক গ্রন্থ-সম্পুটক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ-সম্পুটকে নিম্নোল্লিখিত একাদশখানি রূপক ছিল, যথা,—স্বপ্ননাটকম্, প্রতিজ্ঞা-নাটিকা, পঞ্চরাত্রম্, অবিমারকম্, বালচরিতম্, চারুদত্তম্, মধ্যম-ব্যায়োগঃ, দূতকাব্যম্, দূত-ঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্ ও ঊরুভঙ্গম্। কিছুদিন পরে, অন্য আর এক যাত্রায়, শাস্ত্রী মহাশয় এই নাটক-গুলির সমানজাতীয় "অভিষেকনাটকম্" ও "প্রতিমা" নামক আরও দুইখানি রূপকগ্রন্থ গোবিন্দ পিষারোটী নামক কোনও এক জ্যোতিষিকের গৃহে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রশংসনীয় অনুসন্ধান-কৌশলে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর ত্রয়োদশখানি নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে "চারুদত্তম্" ও "প্রতিমা" নাটকদ্বয় ব্যতীত, অবশিষ্ট একাদশখানি নাটক সুচিন্তিত উপোদ্-ঘাত ও লঘুটিপ্পনী সহ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অনন্ত-শয়ন [ত্রিভান্দ্রাম্]-নগর হইতে রাজকীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিগত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

এই নাটক-চক্রের পরস্পরের আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে। আকৃতি-গত সাদৃশ্য ব্যতীত বাক্যগত, বাক্যাংশগত ও শব্দগত সাদৃশ্যেরও অভাব নাই। আকৃতিগত সাদৃশ্যের মধ্যে যাহা সর্ব্বপ্রথমে পরিলক্ষিত হয়, তাহা এই যে,—নাটকচক্রের কোনটিরই আদিতে নান্দী-শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। শূদ্রক-কালিদাস-শ্রীহর্ষ-ভবভূতি-বিশাখদত্ত-প্রমুখ মহাকবিগণের রচিত নাটকসমূহে প্রথমতঃ নান্দীশ্লোক, তৎপরে "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নবাবিষ্কৃত নাটকসমূহে এই বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। তাহাতে "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এই প্রকার নির্দ্দেশের পর মঙ্গল-শ্লোক লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈলক্ষণ্য এই যে,—অন্যান্য মহাকবিগণ যাহা 'প্রস্তাবনা' নামেই অভিহিত করিয়াছেন, তাহা 'স্থাপনা' নামে কথিত হইয়াছে। উত্তর কালের কবিগণ প্রস্তাবনাতে আত্মনামের ও স্বপ্রণীত নাটক-নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য নাটকসমূহের স্থাপনায় কবির বা কাব্যের নাম কীর্ত্তিত হয় নাই। নাটক-গুলির ভরত-বাক্যেও একটি স্বতন্ত্র নিয়ম লক্ষিত হয়; সর্ব্বত্রই "মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ" এইরূপ, অথবা ইহার সমানার্থক একটি প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সর্ব্বশেষে অমুকনামা নাটক "অবসিত" হইল বলিয়া, নাটকের নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থসমাপ্তি

বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। পরস্পরের এইরূপ রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, এই নাটক-চক্র একই কবির কৃতি বলিয়া, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। স্থাপনাতে কবি নিজনাম ও কাব্যনাম লিপিবদ্ধ করেন নাই;—কেবল ইহা দেখিয়াই গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপোদ্ঘাতে লিখিয়াছেন যে,—প্রস্তাবনায় বা স্থাপনাতে কবির ও কাব্যের নাম-সন্নিবেশের নিয়ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই, এই নাটক-চক্রের উদ্ভবকাল নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। উত্তরকালীন নাটকের সহিত এই নাটক-চক্রের আরও অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তি-কালে আলঙ্কারিকগণ নাটক-রচনা সম্বন্ধে যে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং যে সকল বিধি-নিষেধের ব্যতিক্রম হইলে নাটক-রচয়িতার গৌরবের লাঘব হইত, এই নাটক-চক্রের রচনা-কালে সেই সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে না। উত্তর কালে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের "সাহিত্য-দর্পণে" একটি নিয়মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গো মৃত্যু রতং তথা॥"

এই সমস্ত ক্রিয়া দৃশ্যকাব্যে সম্পাদ্য নহে। প্রাচীনকালের ভরত-মুনির ন্যাট্যশাস্ত্রেও [১৮শ অধ্যায়ে] আমরা এই নিয়মটির উল্লেখ দেখিতে পাই. যথা,—

"যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগরোপরোধনং চৈব।
প্রত্যক্ষাণি তু নাঙ্কে প্রবেশকৈঃ সংবিধেয়ানি॥"

কিন্তু নবাবিষ্কৃত নাটক-সমূহের কোনও কোনও স্থানে এই নিয়ম সর্ব্বাংশে রক্ষিত হয় নাই। "অভিষেক" নাটকে বালির মৃত্যু-দশা এবং "বালচরিত" নাটকে কংসবধ অঙ্কমধ্যে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য নাটক-চক্রের রচনা-কাল এই সমস্ত বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই ধরিয়া লইতে হইবে। নাটকসমূহের ভাষা-ভঙ্গি, রচনা-রীতি ও অন্যান্য কাব্যগুণ-গ্রামের প্রকৃত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রচয়িতা প্রাচীন ও মহাকবি-শ্রেণীভুক্ত।

মহাকবি ভাস।

কবি কুত্রাপি তাঁহার নামের উল্লেখ করেন নাই। তিনি কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা অনায়াসসাধ্য। কবির নাটকচক্রের মধ্যে "স্বপ্নাটক"ই

আয়তনে একটু বৃহৎ। এই একখানি নাটকের তিনখানি আদর্শ পুঁথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার একখানির শেষে, অবসান-বিজ্ঞাপক বচনে গ্রন্থের নাম "স্বপ্নবাসবদত্তম্" বলিয়াই উল্লিখিত রহিয়াছে। গ্রন্থপাঠেও অবগত হওয়া যায় যে,—বৎসরাজ উদয়ন কর্তৃক স্বপ্নে অধিগত বাসবদত্তার কথা এই নাটকের একটি প্রধান কথা। অভিনবগুপ্ত-বামন-প্রমুখ মধ্যযুগের আলঙ্কারিকগণও তাঁহাদের অলঙ্কার-গ্রন্থে "স্বপ্ন-বাসবদত্তাখ্য" এক নাটকের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদাহরণ সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন। দশম-শতাব্দীর কবি রাজশেখরের "সূক্তিমুক্তাবলী" নামক গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়,—"স্বপ্নবাসবদত্ত" নাটকের রচয়িতার নাম ভাস। যথা,—

> "ভাস-নাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
> স্বপ্ন-বাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥"

"কাব্যকলা-বিচার-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভাস-রচিত নাটক-চক্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন—অগ্নিদেব "স্বপ্ন-বাসবদত্ত" নাটকখানিকে দগ্ধ করেন নাই।" অন্ততঃ "স্বপ্নবাসবদত্ত"-নাটকের প্রণেতা যে মহাকবি ভাস, তাহা এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। রাজশেখরের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, উত্তরাপথের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক মহাকবি বাণভট্টও স্বরচিত "শ্রীহর্ষচরিতে"র প্রাস্তাবিক শ্লোকাবলীর মধ্যে একটি শ্লোকে পূর্ব্ব কবি ভাসের ও তাঁহার নাটকসমূহের অসাধারণ ধর্ম্মের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

> "সূত্রধার-কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
> সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥"

"কেহ যেমন সূত্রধারের [শিল্পীর] কৌশল-নির্ম্মিত, বহুভূমিক [বহুতলবিশিষ্ট], পতাকা-[বৈজয়ন্তী]-সুশোভিত, দেবভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশোলাভ করেন, সেইরূপ মহাকবি ভাসও সূত্রধার-[নট]-মুখে আরব্ধ, বহুভূমিকা-[পাত্র]-সমন্বিত পতাকা-[প্রাসঙ্গিক কথা]-যুক্ত নাটকসমূহের রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।" বাণভট্ট-কথিত অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ভাস-নাটক-চক্রের "সূত্রধারকৃতারম্ভত্ব" লক্ষণটি সর্ব্বপ্রথম স্বতঃই সকলের নিকট প্রতিভাত হইতে পারিবে;—কারণ, সর্ব্বত্রই

"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এইরূপ বাক্য লইয়াই নাটকের আরম্ভ সূচিত হইয়াছে। ভরত-মুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে "ভূমিকা" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে; যথা—

"অন্যরূপৈ র্যদন্যস্য প্রবেশঃ স তু ভূমিকা।"

"একই ব্যক্তির বহুরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন পাত্র সাজিয়া প্রবেশ করার নাম 'ভূমিকা'। মহাকবি ভাসের নাটকের এইরূপ "বহুভূমিকত্ব" গুণটিও সহজেই প্রতীয়মান হয়। "প্রতিজ্ঞা"-নাটিকায় যৌগন্ধরায়ণ কখনও প্রধান সচিবরূপে, কখনও বা উন্মত্তকবেশে অভিনয় করিতেছেন। "স্বপ্ন-নাটকে"ও যৌগন্ধরায়ণ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণরূপে ও শেষ অঙ্কে সচিবরূপে অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল প্রমাণবলে নিঃসন্দেহে ..। যাইতে পারে যে,—ভাস নামক মহাকবিই নবাবিষ্কৃত নাটক-চক্রের রচয়িতা। মহাকবি কালিদাসও স্ব-প্রণীত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের প্রস্তাবনায় ভাসপ্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রখ্যাত কবিগণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"ভাব। তাবৎ প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমান-কবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ।"

পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"মহাশয়! বিদিত-কীর্ত্তি ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদি কবিগণের নাটক অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচিত নাটকে এই বিদ্বন্মণ্ডলীর এত সমাদর দেখিতেছি কেন?" পারিপার্শ্বিকের এই বাক্যের উত্তরে সূত্রধার যে শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে,—ভাস প্রভৃতি কবিগণ কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। সূত্রধারের প্রত্যুক্তিটি এইরূপ—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ॥"

আত্মকাব্যের প্রশংসাচ্ছলে কালিদাস সূত্রধারমুখে বলিয়াছেন যে,—কাব্য পুরাতন হইলেই যে সৎ-কাব্য হইবে, তাহা নহে; আবার কাব্য নূতন হইলেই যে নিন্দার্হ হইবে, তাহাও নহে;—পুরাতনই হউক, বা

নূতনই হউক, সদসদ্বিবেকিগণ পরীক্ষা করিয়াই অন্যতরের গ্রহণ করেন; কিন্তু মূর্খজনেরা পরের বিশ্বাসেই নিজবুদ্ধি পরিচালিত করিয়া থাকে।” ভাসাদি পূর্ব্বতন কবিগণের রূপক অপেক্ষা তাঁহার রূপক যে অধিক-গুণ-যুক্ত, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কালিদাসও ভাস-কবিকে “প্রথিত-যশা” বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এত কাল পর্য্যন্ত এই মহাকবির নামমাত্রই পরিচিত ছিল,—তাঁহার নাটকাবলী যে কখনও আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। মহাকবি ভাসের প্রাচীনতা-প্রতিপাদন কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু অবিসংবাদিত-ভাবে তাঁহার অভ্যুদয়কালের নির্ণয় সহজ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। অল্পদিন হইল, স্বদেশে বিদেশে এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। কালিদাসের কাল লইয়াই কত মতভেদ রহিয়াছে,—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভাসের উদ্ভব-কালের নিশ্চিত নির্দ্দেশ যে অতীব দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয়, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বিচার-সমর্থন-বিধায়ক বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণাবলী সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে, সম্পূর্ণভাবে সফল-কাম হইবার প্রত্যাশা করা যায় না। তবে মহাকবি ভাসের ভাষা সংস্কৃত-ভারতীর যৌবনের ভাষা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। (১) সংস্কৃত-ভাষার যৌবনকাল—মহাকবি ভাসের অভ্যুদয়কাল যে কোন্ কাল?—(২) মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা মহাকবি শূদ্রক ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য কবিগণের কাব্যে ভাসের প্রভাব কত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল?—(৩) ভাসের সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি কিরূপ ছিল?—ক্রমশঃ এই সকল প্রশ্নের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ ভাসের অনন্য-সাধারণ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, “প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ” নাটিকার কথা-বস্তুর কিছু বিবরণ প্রদান করিব।

কাব্যগুণ-সমৃদ্ধি।

ভাসের নাটক-চক্রে কাব্যগুণ-সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার রচনায় ভাবসম্পৎ-প্রাচুর্য্যের ও সরল ভাষায় ভাব-প্রকাশ-শক্তির পরিচয় পাইয়াই বুঝি কালিদাস তাঁহাকে “প্রথিত-যশা” কবিকুলের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এই প্রদীপ্ত-প্রতিভা-সম্পন্ন মহাকবির কল্পনার বিশালতা, উৎপ্রেক্ষাশক্তির আতিশয্য, মানব-

চিত্তবৃত্তির সম্যগ্‌জ্ঞান ও তদ্বর্ণনে সামর্থ্য প্রভৃতি গুণাবলী অল্প ছিল না। মানব-চিত্তবৃত্তির চিত্রাঙ্কণ করিয়া মানবকে মহত্তর হইতে শিক্ষা প্রদান করাই নাটক-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য,—এই বিষয়ে ভাসের লেখনী-ধারণ সার্থক হইয়াছিল। অবস্থাভেদে বর্ণনীয় বস্তুর সূক্ষ্মতা ও বিভিন্নতার প্রতিপাদনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রসৈক-দৃষ্টি কবি কুত্রাপি রসানুকূল শব্দ-নির্ব্বাচনে ব্যর্থচেষ্ট হয়েন নাই,—রসের অনুরোধে প্রতিপাদ্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। ভাসের নাটকে বীর-রসেরই প্রাধান্য অধিক। চরিত্রাঙ্কন গ্রন্থ-রচনা-কালের উপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং কবির রচনা হইতে সমসাময়িক জন-সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ভাসের সময়ে শৌর্য্য-বীর্য্য-শৌটীর্য্যে ভারতবাসিগণের মানসিক প্রবৃত্তি কোন্ প্রণালীতে পরিচালিত হইত, রস-বর্ণনা দ্বারা ভাস তাহার অনেক আভাস দিয়া গিয়াছেন। এই নাটক-চক্র-পাঠে রসজ্ঞ ব্যক্তির উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, নাটকগুলিতে অতিপ্রাকৃত সংস্থান বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবপ্রিয়তা বর্ত্তমান যুগের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভাসের বাস্তবপ্রিয়তায় বর্ত্তমান যুগের পাঠকও মুগ্ধ হইবেন। দুঃখবাদ বা নির্ব্বেদ যেন এই কবির কাব্যে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই,—মানব-জীবনের ক্রমোন্নতি-কামনাই যেন কবির বীজ-মন্ত্র ছিল।

ভাসের ভাষা সরল ও সুললিত। শব্দবিন্যাসে কোনও কৃত্রিমতা নাই। দণ্ডী স্বপ্রণীত "কাব্যাদর্শ" নামক অলঙ্কারগ্রন্থে দশটি কাব্যগুণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

> "শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
> অর্থ-ব্যক্তিরুদারত্বমোজঃকান্তি-সমাধয়ঃ॥"

ভাসের রচনা-কৌশল দেখিয়া মনে হয়,—এই গুণগুলি তাঁহার রচনা-রীতিতে স্পষ্টই দেদীপ্যমান। শব্দ-সৌষ্ঠব অর্থগৌরব নষ্ট করে নাই। ভাসের নাটকে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। কবি যেন অল্লায়াসে বা অনায়াসে স্থানে স্থানে সুরস ভণিতি দ্বারা তাঁহার রচনাটি রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাসের ভারতীতে প্রাণবত্তা আছে। পরবর্ত্তী কবিগণ কৃত্রিম-শব্দ-বিন্যাসে ও দীর্ঘ-সমাস-ব্যবহারে অর্থ-বোধের দুরূহতা বাড়াইয়াছেন, এবং আলঙ্কারিকগণের উল্লিখিত ও পর্য্যালোচিত বহুভেদযুক্ত অলঙ্কা-

য়ের ব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান কালের পাঠকবর্গের পাঠানুগ্রহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, ভাসপ্রণীত নাটকচক্রের পাঠসময়ে অর্থবোধে ও রসগ্রহণে কোনও ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু কালিদাস-ভবভূতি প্রমুখ পরবর্ত্তী কালের কবিগণের কাব্যে যেমন নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—ভাসের নাটকে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বভাব-শোভার বর্ণনায় কালিদাসাদির কৃতিত্ব অধিক বলিয়াই মনে হয়।

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ।

প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ নাটিকার উপাখ্যান-বস্তু কোনও মূলগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে নাটিকার নায়ক বৎসরাজ উদয়ন—নায়িকা অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তা। ইঁহারা যে ঐতিহাসিক নরনারী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পালিভাষায় লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—অবন্তি-পতি প্রদ্যোত, বৎসরাজ উদয়ন ও কোশলাধিপ প্রসেনজিৎ—ইঁহারা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ "ধর্ম্মপদে"র—

"অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদম্।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥"

"অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর দ্বার; প্রমত্ত ব্যক্তিগণ যে প্রকার মৃত্যুপথে পতিত হয়েন, অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ সেইরূপে মৃত হয়েন না।" ইত্যাদি শ্লোকাবলীর টীকাতে প্রসঙ্গক্রমে প্রমাদের ও অপ্রমাদের উদাহরণ-রূপে টীকাকার "বাসুলদত্তা ও উদেন" [বাসবদত্তা ও উদয়ন]-সংক্রান্ত যে উপাখ্যানটির* (১) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ ভাগ আলোচ্য নাটিকাতে বর্ণিত কথা-বস্তুর সঙ্গে মিলিয়া যায়। বোধ হয়, প্রাচীন কবি ভাসের সময়ে উদয়ন-বাসবদত্তা-সম্বন্ধীয় কথা জনসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী কালেও অনেক কবি নিজ নিজ কাব্যের স্থানে স্থানে উদয়ন কর্ত্তৃক বাসবদত্তার অপহরণ-বৃত্তান্তের এবং মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কর্ত্তৃক উদয়নের কারামুক্তি-বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "মৃচ্ছ-কটিক" প্রকরণের চতুর্থাঙ্কে একটি শ্লোকাংশ এইরূপ,—

"উত্তেজয়ামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায়
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ।"

---

* (১) Buddhist India—Rhys Davids pp. 4—7.

কালিদাসও তাঁহার মেঘদূত কাব্যে অবন্তিদেশবাসিগণকে উদয়ন-কথা-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

"প্রাপ্যাবন্তীমুদয়ন-কথা-কোবিদ-গ্রামবৃদ্ধান্।"

মেঘদূতে অন্যত্র বর্ণিত আছে,—

''প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্‌ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পাদ্
ইত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ॥"

"কথিত আছে, এই স্থান হইতেই বৎসরাজ [উদয়ন] প্রদ্যোতের প্রিয়-দুহিতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন; এই স্থানেই সেই রাজা [প্রদ্যোতের] সুবর্ণ-নির্ম্মিত তালদ্রুম-বন ছিল; এই স্থানেই নলগিরি নাম [প্রদ্যোতের] হস্তী বন্ধন-স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল;—ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অভ্যাগত বন্ধুবর্গের চিত্ত-রঞ্জন করিতেন।" বলা বাহুল্য, আলোচ্য নাটিকার তৃতীয়াঙ্কেও আমরা "নলগিরি" নামক হস্তীর উদ্‌ভ্রান্তির কথা উল্লিখিত দেখিতে পাই।

"প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নাটিকা চারি অঙ্কে বিভক্ত। মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কৃত দুইটি প্রতিজ্ঞার কথা অবলম্বন করিয়া নাটিকার নাম "প্রতিজ্ঞা-নাটিকা" বা "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবে। এই নাটিকাতে বীর-রসই প্রধান ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাটিকায় বিবৃত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কাল-ব্যবধান অত্যল্প। কার্য্য-পরম্পরার শীঘ্র সম্পাদন বিহিত হওয়ায় দর্শকের ও পাঠকের মন মুগ্ধ থাকে।

কথা-বস্তু।

গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে অবন্তী-রাজ্যই প্রধান। অবন্তিদেশের রাজার নাম প্রদ্যোত। বৃহৎসংখ্যক "সেনা" ছিল বলিয়া, তাঁহার অপর এক নাম "মহাসেন"। রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে। মহারাজ প্রদ্যোতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই সময়ে বৎস দেশেও উদয়ন নামা অপর এক নরপতি ছিলেন। যমুনা-নদী-তীরস্থ কৌশাম্বীনগরে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। অশেষ-নৃপগুণ-সম্পন্ন উদয়ন বীণাবাদন-কৌশলে হৃদয়াকর্ষণ করিয়া, মত্তহস্তিগণকেও স্ববশে আনিতে পারিতেন। "ঘোষবতী" নামক বীণারত্ন

তাঁহার বংশপরম্পরাগত। ঋষিবচনোচ্চরিত মন্ত্রবিদ্যার ন্যায়, তাঁহার এই বীণারত্ন সর্ব্বদাই গজ-বশীকরণে সফলতা লাভ করিত। সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য নরপতিগণ অবনতমস্তকে প্রদ্যোতের পরাক্রম স্বীকার করিতেন; কিন্তু বৎসরাজ উদয়ন প্রদ্যোতের প্রতাপ গ্রাহ্য করিতেন না। প্রশস্ত ভারতবংশে তাঁহার জন্ম বলিয়া, উদয়নের উৎসেক;—বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় তিনি পারদর্শী বলিয়া, তাঁহার দর্প;—বয়সানুরূপ রূপ ছিল বলিয়া, তাঁহার চিত্ত-বিভ্রম; এবং তদীয় ভীমকান্ত রাজগুণে মোহিত পৌরবর্গ তাঁহার অনুরক্ত ছিল বলিয়া, তিনি প্রজাদিগের বিশ্বাসভাজন। এই সকল কারণে পৃথিবীর কোনও রাজার নিকটেই তিনি মস্তক অবনত করিতে অভ্যস্ত হয়েন নাই।

মহারাজ প্রদ্যোতের এক অলৌকিকলাবণ্যবতী কন্যা ছিল; তাঁহার নাম বাসবদত্তা। বিবাহ-যোগ্য কাল উপস্থিত। সম্বন্ধাভিলাষী হইয়া বহু নৃপতি অবন্তি-রাজকুলে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। কিন্তু বৎসরাজ উদয়ন এই সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা করিয়া একটি প্রাণীকেও প্রদ্যোত-পাদ-প্রান্তে প্রেরণ করেন নাই। এই নিমিত্ত মহারাজ প্রদ্যোত উদয়নের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তিনি ভাবিতেছিলেন,—

> "মম হয়-খুরভিন্নং মার্গরেণুং নরেন্দ্রাঃ
> মুকুট-তট বিলগ্নং ভৃত্য-ভূতা বহন্তি।
> ন চ মম পরিতোষো যন্ন মাং বৎসরাজঃ
> প্রণমতি গুণশালী কুঞ্জর-জ্ঞান-দৃপ্তঃ॥"

"আমার অশ্বের খুরোৎক্ষিপ্ত পথরেণুকণা সকল নরপালই ভৃত্যভাবে স্বমুকুটে ধারণ করেন; কিন্তু বহুগুণোপেত বৎসরাজ [উদয়ন] হস্তিগ্রহণ-শিক্ষাজ্ঞানে দৃপ্ত হইয়া আমার নিকট প্রণত নহেন, ইহাই আমার অপরিতোষের কারণ।" কন্যা বরের রূপ কামনা করেন; মাতা বিত্ত চাহেন; পিতার অভিলাষ জামাতা বহুশ্রুত হয়েন; এবং বান্ধবগণের দৃষ্টি বরের কুল শ্রেষ্ঠ কি না, সেই দিকে। কেবল বৎসরাজেই এই সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য, প্রদ্যোতের প্রধান চিন্তা—কি প্রকারে ছলপূর্ব্বকও বৎসরাজকে নিজরাজ্যে ধরিয়া আনিয়া কন্যার পাণি প্রদান করিবেন। নাগবনে কপট নীল হস্তীর "উপন্যাস" করিয়া বঞ্চনা-বলে বৎসরাজকে উজ্জয়িনীতে ধরিয়া আনিবার জন্য, প্রদ্যোত তাঁহার

অমাত্য শালঙ্কায়ণকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া, বিপুল সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া, তাঁহাকে নাগবনে প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যোতের এই নীল-হস্তি-রচনাব্যাপারের কথা চারমুখে অবগত হইয়া, বৎসরাজের প্রধান সচিব মহামনাঃ যৌগন্ধরায়ণ আত্মপ্রভুর রক্ষার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া উদয়ন সৈন্যাধ্যক্ষ রুমণ্বান ও অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বেণুবনে হস্তী ধরিতে গিয়াছিলেন। বেণুবন হইতে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নাগবনে প্রবেশের কথা ছিল। তথায় প্রবিষ্ট হইলে উদয়নের মহাবিপদের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত, প্রদ্যোতের ছলনা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ লোক প্রেরণ করিয়া রাজাকে নাগবনে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবেন, এইরূপ স্থির করিতেছিলেন, এমন সময় প্রতীহারী আসিয়া মন্ত্রিবরের নিকট নিবেদন করিল যে, নাগবন হইতে মহারাজ উদয়ন অশ্বারোহী হংসককে প্রেরণ করিয়াছেন। হংসকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে বড়ই ব্যাকুল হইলেন। ইতিপূর্ব্বে হংসক কখনই প্রভুর সন্নিধান পরিত্যাগ করে নাই; তবে আজ ভর্তৃপাদমূল হইতে হংসক না জানি কি অশুভ বার্ত্তাই বহন করিয়া লইয়া এই স্থানে আসিয়া থাকিবে। হংসকের সহিত সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই যৌগন্ধরায়ণ নিজ মনোভাব বর্ণনা করিতেছেন,—

"যথা নরস্যাকুল-বান্ধবস্য গত্বান্যদেশং গৃহমাগতস্য।
তথাহি মে সম্প্রতি বুদ্ধি-শঙ্কা শ্রোষ্যামি কিন্নু প্রিয়মপ্রিয়ং বা॥"

"বান্ধব-কুলকে আকুল করিয়া, দেশান্তর যাইয়া গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির মনে যেরূপ আশঙ্কা হয়, না জানি [গৃহে প্রবেশ করিয়া], কি প্রিয় বা অপ্রিয় কথাই শুনিতে হইবে; সেইরূপ আজ আমারও মনে আশঙ্কা হইতেছে।" উদয়ন গতরাত্রিতেই নাগবনে প্রবেশ করিয়াছেন—হংসকমুখে এইমাত্র শ্রবণ করিয়াই যৌগন্ধরায়ণ হংসককে বলিলেন "আর বলিতে হইবে না,—আমরা ছলিত হইয়াছি; আর প্রত্যাশা নাই; প্রাণ-পরিত্যাগই বাঞ্ছনীয়; নিশ্চিতই প্রভু উদয়ন শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন; ভাগ্যবলে প্রদ্যোতের অভিলাষই পূর্ণ হইল।" রুমণ্বান্ প্রভৃতি অশ্বারোহী সৈন্য সকল সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও, কি প্রকারে রাজা শত্রুহস্তে ধরা পড়িলেন, ইহা ভাবিয়াই মন্ত্রিবর অস্থির। এই জন্য তিনি হংসককে সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত

বিবৃত করিতে বলিলেন। হংসক বলিতে লাগিলেন,—"সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমরা দূর হইতে এক বিষম-দর্শন নাগযূথ দেখিতে পাইলাম। এক জন পদাতি আসিয়া রাজপাদমূলে সংবাদ দিল যে, 'নাতিদূরে মল্লিকা ও শালবৃক্ষে প্রচ্ছাদিত-শরীর এক নীলহস্তী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।' নীল-কুবলয়তনু নামক চক্রবর্ত্তী হস্তীর কথা উদয়ন হস্তিশিক্ষা শাস্ত্রে পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া, তিনি সংবাদ-বহনকারী পদাতিকে সুবর্ণশতক পারিতোষিক প্রদান করিয়া, কেবল বীণাযন্ত্রটি ও বিংশতি-মাত্র পদাতি সঙ্গে লইয়া নীলহস্তীটি ধরিয়া আনিবার জন্য বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনুসরণের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেও উদয়ন রুমণ্বানকে সঙ্গে লইতে অস্বীকার করিলেন। সহগামী পদাতিগণের মধ্যে আমিও এক জন ছিলাম। বহুদূর অগ্রসর হইয়া, দূর হইতেই আমরা সেই দিব্য বারণটি লক্ষ্য করিতে পারিলাম। রাজা হস্তে বীণাগ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় এক মহা 'কণ্ঠীরব' শ্রুত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখিলাম যে, আমরা শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়াছি। এতক্ষণে মহারাজ উদয়ন বুঝিতে পারিলেন যে,এই ছলনা প্রদ্যোতেরই প্রয়োগ। আত্মপরিক্রমী শত্রুর বিষমারম্ভ এই প্রয়োগের সমীকরণমানসে রাজা সেই অল্পসংখ্যক অনুচর-বর্গকে সমাশ্বস্ত করিয়া, শত্রুসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যের প্রখর কিরণে প্রদ্যোতের সেনামণ্ডলীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত মহারাজ উদয়ন উগ্রাতপবেলায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। আমি ব্যতীত অন্যান্য সকলেই পলায়নপর হইলেন। শত্রুসৈন্যেরা অতিনির্ষ্ঠুরভাবে আমাদের প্রভুকে সেই মোহাবস্থায়ই কর্কশলতা দ্বারা হস্তপদাদিতে বন্ধন করিয়া ফেলিল। শেষ বেলায় মহারাজ চৈতন্যলাভ করিলেন। কত লোকই যে আমাদের মহারাজকে প্রহার করিল, মন্ত্রিবর, তাহার আর কি বর্ণনা করিব? কিন্তু প্রদ্যোতের অমাত্য শালঙ্কায়ন আত্মপক্ষের যোদ্ধৃপুরুষদিগকে সাহসিকের কার্য্য হইতে বিরত হইতে আদেশ করিয়া, আমাদের প্রভুর পাদপ্রান্তে উপনীত হইয়া তৎকালে দুর্লভ একটি প্রণাম করিলেন। শালঙ্কায়নের এই সাধু ব্যবহারে যেন প্রভুর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইল। তৎপরে শালঙ্কায়ন সেই অবস্থায়ই আমাদের মহারাজ উদয়নকে উজ্জয়িনীতে লইয়া গেলেন। এই সুদুঃসহ অনর্থের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। উদয়নের মাতার নিকটই বা কি প্রকারে

তিনি এই বিপদের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিবেন? প্রতীহারীকে তিনি ডাকাইয়া লইয়া বলিলেন,—

"বিজয়ে! ন খলু ত্বয়াত্রভবত্যৈ 'গৃহীতঃ স্বামী' ইতি সহসা নিবেদিতব্যম্।
স্নেহ-দুর্ব্বলং মাতৃ-হৃদয়ং রক্ষ্যম্" ॥

"বিজয়ে! 'স্বামী ধৃত হইয়াছেন' এই সংবাদ তুমি সহসা ভর্তৃমাতার নিকট নিবেদন করিও না,—স্নেহবশতঃ মাতৃহৃদয় অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার রক্ষা করিতেই হইবে।" যুদ্ধ-বিষয়ক দোষাদির কথা বলিতে বলিতে, শুনিয়া শুনিয়া

"রূঢ়ে শোকে কার্য্যতত্ত্বং নিবেদ্যম্।"

"তাঁহার হৃদয়ে শোকের আবেগ লক্ষ্য করিলেই, এই অপ্রিয় সংবাদের নিবেদন করিতে হইবে"—প্রতিহারীকে এইরূপ আদেশ দিয়া তিনি তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। শালঙ্কায়ণ হংসককে উজ্জয়িনীতে যাইতে নিষেধ করিয়া, বৎসরাজের বন্ধন-সংবাদ লইয়া কৌশাম্বী নগরে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ হংসককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভু উদয়ন কোনও আদেশ পাঠাইয়াছেন কি না? হংসক বলিলেন, মহারাজ উদয়ন এইমাত্র বলিয়া দিয়াছেন যে,

"দ্রষ্টব্যো যৌগন্ধরায়ণঃ।"

যৌগন্ধরায়ণের সাক্ষাৎকার চাহি। প্রদীপ্তবুদ্ধি নীতিকুশল যৌগন্ধরায়ণ মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রচ্ছন্নবেশে সহকারিগণকে পূর্ব্বেই উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পুরুষান্তরবেশে তথায় যাইয়া প্রভুর মুক্তিসাধনের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি হংসককে বলিলেন,—

"পুরুষান্তরিতং মাং দ্রক্ষ্যতি স্বামী,—
রিপু-নগরে বা বন্ধনে বা বনে বা
সমুপগত-বিনাশঃ প্রেত্য বা তুল্য নিষ্ঠম্।
জিতমিতি কৃত-বুদ্ধিং বঞ্চয়িত্বা নৃপং তং
পুনরধিগত-রাজ্যঃ পার্থতঃ শ্লাঘনীয়ম্।"

"মহারাজ উদয়ন যৌগন্ধরায়ণ-রূপে আমার আর দর্শন পাইবেন না। অন্যপুরুষ-রূপেই দেখিতে পাইবেন।—রিপুনগরেই হউক, কারাগারেই হউক, বনেই হউক, অথবা তিনি যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রেতলোকেই হউক;—সর্ব্বত্রই তিনি আমাকে তুল্যনিষ্ঠ দেখিতে পাইবেন। বিজয়লাভে দৃপ্ত রাজা [প্রদ্যোতকে] বঞ্চিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতি-

স্থিত হইলে পর তিনি আমাকে আবার নিজপার্শ্বেই শ্লাঘ্য মন্ত্রিপদে আরূঢ় দেখিতে পাইবেন।" যৌগন্ধরায়ণ সঙ্কটে পড়িয়া কখনই বিষণ্ণ হইতেন না,—বিষমে পড়িয়াও চিন্তাবস্থানে অসমর্থ হইতেন না, বঞ্চিত হইলেও নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইতেন না,—প্রতিঘাতেও আত্ম-প্রাণ-পরিত্যাগের সংকল্প করিতেন না। সেই জন্যই, ভর্তৃমাতা পুত্রাপহরণে দুঃখিতা হইয়াও, পুত্র-বয়স্য মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণের উপরই পুত্রোদ্ধারের ভার অর্পিত করিলেন। যৌগন্ধরায়ণও প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

"যদি শত্রুবলগ্রস্তো রাহুণা চন্দ্রমা ইব।
মোচয়ামি ন রাজানং নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ॥"

"রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্য-গ্রস্ত হইয়াও যদি আমি আমাদের রাজাকে মুক্ত না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নহে।" এই প্রতিজ্ঞার পর তিনি "উন্মত্তকে"র বেশে [উজ্জয়িনীতে] স্বামি-সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া অন্যান্য সহচর কর্ম্মবীর-গণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য শান্তিগৃহে চলিয়া গেলেন। কারণ, তিনি জানিতেন,—

"কাষ্ঠাদগ্নির্জ্জায়তে মথ্যমানাদ্
ভূমিস্তোয়ং খন্যমানা দদাতি।
সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং
মার্গারব্ধাঃ সর্ব্বযত্নাঃ ফলন্তি॥"

"মথিত হইলেই কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, খনিত হইলেই ভূমি জল প্রদান করে। উৎসাহসম্পন্ন হইলেই মানবের অসাধ্য কিছুই থাকে না। উপায়সহকারে আরব্ধ হইলে সকল চেষ্টাই ফলবতী হয়।"

এ দিকে বাসবদত্তার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত দেখিয়া, জনক প্রদ্যোত ও জননী অঙ্গারবতী, উভয়েই চিন্তাকুল। সৎপাত্রে কন্যাকে প্রদান করিতে হইবে, অথচ অনুরূপরূপ-গুণবিশিষ্ট বর নির্ব্বাচিত করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি কোশলরাজ সম্বন্ধ ইচ্ছা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু,

"দুহিতুঃ প্রদানকালে দুঃখশীলা হি মাতরঃ।"

"কন্যাপ্রদান-কালে মাতাই অধিক দুঃখিতা হয়েন,"—এই জন্য, পরামর্শ করিবার জন্য প্রদ্যোত মহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—

"অস্মৎসম্বন্ধো মাগধঃ কাশিরাজো
বাঙ্গঃ সৌরাষ্ট্রো মৈথিলঃ শূরসেনঃ।
এতে নানার্থৈ র্লোভয়ন্তো গুণৈর্মাং
কস্তে বৈতেষাং পাত্রতাং যাতি রাজা॥"

"মগধ-রাজ, কাশিরাজ, বঙ্গপতি, সুরাষ্ট্রপতি, মিথিলাধিপ ও শূরসেনাধিপ, ইঁহারা, সকলেই আমাদের সম্বন্ধ ইচ্ছা করিতেছেন। ইঁহারা নানাগুণে আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন নরপতিকে তুমি পাত্র-রূপে ধার্য্য করিতে চাহ।" বর-নির্ব্বাচনের পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় মহারাজের নিকট সংবাদ আনিল যে, বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে ধৃত হইয়া-ছেন। এবং অমাত্য শালঙ্কায়ণ তাঁহাকে লইয়া অনতিবিলম্বেই মহারাজ-সমীপে উপস্থিত হইবেন।

ভারত-কুলোপভুক্ত ঘোষবতী নামক বীণারত্নটিকে শালঙ্কায়ণ সর্ব্বাগ্রে রাজ-পদমূলে উপহাররূপে পাঠাইয়া দিলেন। বাসবদত্তা আচার্য্যের নিকট বীণাবাদ্য শিক্ষা করিতেছিলেন; সেই জন্য প্রদ্যোত সমরাবর্জিত এই বীণাটি বাসবদত্তাকে দিবার জন্য দেবীর হস্তে প্রদান করিলেন। প্রদ্যোতের প্রধান সচিব ভরতরোহক আজ্ঞাপিত হইলেন যে, সকলেই যেন আকার ইঙ্গিত বুঝিয়াই বৎসরাজের প্রীতিসাধনে যত্নপর থাকে; অতিক্রান্ত যুদ্ধাদির কথা যেন কেহ তাঁহার নিকট না উত্থাপিত করেন; এবং সর্ব্বদা সকলেই যেন উপযুক্ত সৎকার ও স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন রাখেন। মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন যে, বৎসরাজের হস্তেই কন্যা সমর্পণ করিবেন। মহিষী অঙ্গারবতীরও তাহাই অভিলাষ।

উদয়ন উজ্জয়িনীতে নীত হইয়াছেন শুনিয়া, বিচিত্রকর্ম্মকুশল যৌগন্ধরায়ণ স্থিরভাবে কৌশাম্বীতে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বামি-বিমোক্ষের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া, প্রচ্ছন্নবেশধারী কর্ম্মঠ পুরুষগণকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া নিজেও উন্মত্তকের বেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে চলিয়া গেলেন। সেনাসচিব রুমণ্বান বৌদ্ধশ্রমণক সাজিলেন; উদয়নের কর্ম্মসচিব বসন্তক ডিণ্ডিক-বেশ ধারণ করিলেন, এবং অন্য একটি কর্ম্মচারী পাত্র-সেবক-রূপে বাসবদত্তার অন্তঃপুরে হস্তিপকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কার্য্যোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণ উজ্জয়িনীর নানা স্থানে অন্যান্য পুরুষদিগকেও পাঠাইয়া দিলেন। যৌগ-

ন্ধরায়ণের উপদেশক্রমে বসন্তক প্রভুর কারামুক্তির উপায়-বার্ত্তা লইয়া উদয়ন-সমীপে গিয়াছিলেন। উদয়নের প্রত্যুত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, শ্রমণকরূপী রুমণ্বানের ও উন্মত্তক-বেশধারী স্বয়ং যৌগন্ধরায়ণের সহিত পথমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিন সচিব মিলিত হইয়া নির্জ্জন স্থানে যাইয়া মন্ত্রণা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনতিদূরে এক জন-শূন্য অগ্নিগৃহে যাইয়া, তাঁহারা পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন। যৌগন্ধরায়ণ বসন্তককে পুনরায় উদয়নসমীপে একটি বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। প্রভুকে বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে লইয়া প্রয়াণের যেরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে, তাহার প্রয়োগ-কাল আগামী দিবসে; এবং শঙ্খদুন্দুভিপ্রভৃতির শব্দ উৎপাদন করিয়া, প্রদ্যোতের প্রসিদ্ধ গজরাজ নলাগিরির চিত্তোদ্ভ্রান্তি ঘটাইবার জন্য, নিকটস্থ দেবকুলে শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি সংস্থাপিত করা হইয়াছে। হস্তীর অগ্নিত্রাস অধিক,—অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নলাগিরির ত্রাস-সম্পাদনের ব্যবস্থাও বিহিত হইয়াছে। শব্দ-শ্রবণে ও অগ্নি-দর্শনে উন্মত্ত হইয়া, নলাগিরি বন্ধন-মুক্ত হইয়া ছুটিবার উপক্রম করিলে, অবশ্যই মহারাজ প্রদ্যোত হস্তি-বশীকরণ-বিদ্যায় পারদর্শী প্রভু উদয়নের শরণাগত হইবেন। সেই সময়ে তাঁহাকে কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দিলে, তিনি বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত ঘোষবতী নামক বীণারত্নটি হস্তগত করিয়া, নলাগিরিকে আত্ম-বিদ্যা-কৌশলে বশে আনিতে যাইবার ছলে, সেই হস্তীতেই আরোহণ করিয়া,—

"যেনৈব দ্বিরদ-চ্ছলেন নিয়তস্তেনৈব নির্ব্বাহ্যতে।"

প্রদ্যোতের "যে গজ-চ্ছলে তিনি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সেই গজচ্ছলেই বিমুক্ত হইবেন।" উদয়নসমীপে এই সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে বসন্তক একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর বসন্তক বলিলেন,—"বৎসরাজের নিজদোষেই এক কার্য্য-বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। একদিবস কেবল ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া বাসবদত্তা আবরণ-শূন্য শিবিকাতে আরোহণ করিয়া কারাগারের নিকটস্থ যক্ষিণী-পীঠে পূজা দিবার জন্য যাইতেছিলেন; উদয়ন বন্ধন-দ্বার হইতে সেই রাজপুত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত-করিয়া, অনুরাগরক্ত-চিত্তে তাঁহার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করিতে-ছিলেন। তদবধি উভয়েই রাগ-লীলার পর, প্রচ্ছন্ন দাম্পত্য উপভোগ করিতে-ছেন। এমন কি, তিনি মন্ত্রি-সমীপে আমাকে ইহাও বিজ্ঞাপিত করিতে

আদেশ দিলেন যে, যে উপায়ে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার কারামুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে মহারাজ প্রদ্যোতের সবিশেষ অপমাননার সম্ভাবনা আছে।”. বসন্তকের এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বানকে ও বসন্তককে বলিলেন,—

"অনেনৈব বেষেণ জরা গন্তব্যা।"

“আমরা প্রত্যেকে যে বেষ ধারণ করিয়াছি, সেই বেষেই জরাগ্রস্ত হইব।” তাঁহাদের আর বৎসরাজের দেশে ফিরিয়া যাইবার অভিলাষ রহিল না। কিছুক্ষণ পরে যৌগন্ধরায়ণ ভাবিলেন, স্বামি-বিমোক্ষের জন্য আবদ্ধ কার্য্যের সিদ্ধি দেখিতেই হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,—

''সুভদ্রামিব গাণ্ডীবী নাগঃ পদ্মলতামিব।
যদি তাং ন হরেদ্ রাজা নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ॥
যদি তাং চৈব তং চৈব তাং চৈবায়তলোচনাম্
নাহরামি নৃপং চৈব নাস্মি যৌগন্ধরায়ণঃ॥"

“অর্জ্জুন যেমন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন, নাগ যেমন পদ্মলতাকে হরণ করে, সেইরূপ উদয়ন যদি বাসবদত্তাকে অপহরণ না করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নহে। অপি চ,—যদি আমি নিজে ঘোষবতী বীণা, নলাগিরি গজ ও বাসবদত্তাকে লইয়া, আমাদের রাজা উদয়নকে হরণ করিতে না পারি, তাহা হইলেও আমি যৌগন্ধরায়ণ নহি।” এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, আত্ম-কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য যৌগন্ধরায়ণ প্রচ্ছন্নবেশেই সহকারিগণকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

রাজপুত্রীর মনে ইচ্ছা হইল, তিনি হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জলক্রীড়া করিবেন। এই জন্য বাসবদত্তা গাত্রসেবকের নিকট আদেশ পাঠাইলেন যে, শীঘ্র ভদ্রবতী নামক করেণু লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। গাত্রসেবক যৌগন্ধরায়ণের লোক; আত্মপক্ষের কার্য্যোদ্ধারের সহায়তাকল্পে তিনি ইতিপূর্ব্বেই ভদ্রবতী নাম্নী হস্তিনীকে যৌগন্ধরায়ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অন্তঃপুর হইতে লোক আসিয়া গাত্রসেবককে ভদ্রবতীকে লইয়া রাজকন্যা-সমীপে উপস্থিত হইতে বলিলে, তিনি সুরাপান-মত্ততার ভাণ করিয়া স্খলিত-কণ্ঠে উত্তর দিলেন যে, রাজবাহক ভদ্রবতীকে শুণ্ডিকিনীর নিকট বিক্রয় করিয়া, সুরা পান করিয়াছেন। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে,

এমন সময় চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী শব্দ শ্রুত হইল,—"বৎসরাজ উদয়ন রাজপুত্রী বাসবদত্তা" লইয়া ভদ্রবতীতে আরোহণপ " নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।" অভিলষিত শব্দ শুনিয়া গ' বকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাজান্তঃপুরের লোকটির নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলি লাগিলেন,—"আমরা কেহই প্রমত্ত নহি; আমরা চার-পুরুষ; আমাদের মহারাজ উদয়নের কারামুক্তির সহায়তায়, মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ আমাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়া, নিজেও এই নগরেই বাস করিতেছেন।" মন্ত্রিনিযুক্ত সকল চার-পুরুষই এখন নিরোধ-মুক্ত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ইতস্ততঃ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। আত্মপ্রভুর কল্যাণার্থ কোন্ ভৃত্য অগণিত-তনুপাতভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান না করে। কারণ,

"নবং শরাবং সলিলৈঃ সুপূর্ণং
সুসংস্কৃতং দর্ভকৃতোত্তরীয়ম্।
তত্তস্য মা ভূন্নরকং স গচ্ছেদ্
যো ভর্ত্তৃ-পিণ্ডস্য কৃতে ন যুদ্ধ্যেৎ॥"

"প্রভু-পিণ্ডে প্রতিপালিত হইয়া, [বিনিময়ে] যে ব্যক্তি প্রভুর জন্য যুদ্ধ না করে, সে নরাধম যেন সলিল-পূর্ণ, সুসংস্কৃত, দর্ভকৃত-ভূষণ নব শরাবের অধিকারী না হয়, এবং সে যেন নরক-বাসই ভোগ করে।"

প্রদ্যোত নলাগিরি হস্তীটিকে বৎসরাজের পশ্চাদনুসরণে প্রেরণ করিলে, উদয়ন স্বকৌশলে তাহাকেও হস্তগত করিয়া উজ্জয়িনী নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎপরে উজ্জয়িনীতে উভয় পক্ষের যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রদ্যোতের অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ কত হস্তীর, কত অশ্বের, কত যোদ্ধৃপুরুষের নিধন সাধন করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষের একটি হস্তীর দন্ত-মুষলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যৌগন্ধরায়ণের একটি বাহু ভগ্ন হইলে পর, তিনি ভ্রষ্টায়ুধাবস্থায় শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন। পুরুষকারাভাবে নহে, আয়ুধ-দোষে তিনি আজ অরি-করতলগত হইয়া পড়িলেন। আহতাবস্থায় ফলকাসনে বসাইয়া বদ্ধ-বাহু যৌগন্ধরায়ণকে প্রদ্যোত-রাজকুলে আনা হইল। বৎসরাজের দুঃখরজনী আজ প্রভাত হইয়াছে,—সেই জন্য শত্রুহস্তে ধরা পড়িয়াও যৌগন্ধরায়ণ আজ প্রফুল্লচিত্ত। নিষ্ফলত্র ব্যক্তির কান্তার-প্রবেশ সুখকর, পূর্ণ-মনোরথ ব্যক্তির বিনিপাত রমণীয়, সঞ্চিতধর্ম্ম ব্যক্তির মৃত্যু অপশ্চাত্তাপ-

কর,—নিজের বুদ্ধিবলে, নীতিকৌশলে, ও পরাক্রমপ্রয়োগে, শত্রুর যশঃ ও সুহৃদ্‌গণের অযশঃ বিলুপ্ত করিয়া যৌগন্ধরায়ণ নির্ভীকহৃদয়ে বলিতেছেন,—

"পশ্যন্তু মাং নরপতেঃ পুরুষাঃ সসত্ত্বা
রাজানুরাগ-নিয়মেন বিপদ্যমানম্।
যে প্রার্থয়ন্তি চ মনোভিরমাত্য-শব্দং
তেষাং স্থিরীভবতু নশ্যতু বাভিলাষঃ।"

প্রদ্যোতের "প্রবল-পরাক্রান্ত পুরুষেরা, রাজভক্তিবশতঃ বিপন্ন আমাকে এই [বন্ধন] অবস্থায় দেখুক্, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আর, যাহাদের মনোমধ্যে অমাত্য-পদ-লাভের আশঙ্কা বর্ত্তমান আছে, আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের সেই আশঙ্কা হয় স্থিরীভূত হউক, নয় ত বিনষ্ট হইয়া যাউক"। তৎপরে যৌগন্ধরায়ণকে আয়ুধাগারে রক্ষিত করা হইল। প্রদ্যোতের প্রধান সচিব ভরতরোহক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিছুকাল হস্তি-ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলিল। পরে ভরত-রোহক যৌগন্ধরায়ণকে বলিলেন যে, মহারাজ প্রদ্যোত আত্মদুহিতা বাসবদত্তাকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া উদয়নের শিষ্যা করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার হস্তে কন্যার সম্প্রদান হয় নাই। সুতরাং অদত্তার অপনয়কে তস্কর-বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন যে, ভারত-কুলোৎপন্ন মহারাজ উদয়ন দার-নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বাসবদত্তাকে কখনই উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। এমন সময় প্রদ্যোত কঞ্চুকি-মুখে ভরতরোহককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সুবর্ণপাত্র প্রদান-পূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তৎপরে মহারাজ প্রদ্যোত চিত্রফলকে বৎসরাজের ও বাসবদত্তার প্রতিকৃতি আঁকাইয়া উজ্জয়িনীতে তাঁহাদের বিবাহ-মঙ্গল সম্পন্ন করাইলেন। শোকাভিভূতা মহিষীও আশ্বস্ত হইলেন।

এইরূপে যৌগন্ধরায়ণের নীতি-নৈপুণ্যে বৎসরাজ উদয়নের কারামুক্তি সাধিত হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

যামগাঁর বরযাত্রী।

১

বেশী দিন নয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। আমরা তখন চাঁপাতলায় অখিল মিস্ত্রীর গলিতে বাস করিতাম। এক দিকে

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী, অন্য দিকে হরেন্দ্রকৃষ্ণ, একটেরে চাটুজ্যে ও তাহারই পার্শ্বে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লেখক ৺রজনীকান্ত গুপ্তের বাটী। বন্ধুগণের মধ্যে নন্দী সিনিয়র ও জুনিয়র, কালীকৃষ্ণ ও অবিনাশচন্দ্র বসু। অবিনাশের বোধ হয় মামার বাটী। আমাদের বাসাবাটী ঠিক মাঝখানে। অনতিদূরে একঘর ময়রা বাস করিত। সে লোকটা অতি কোপনস্বভাব, এবং চার্ব্বাকদর্শনের বিরোধী। ঘৃতের দরুণ পাঁচ টাকা মোটে দশবার তাগাদা করিয়া না পাওয়াতে হতভাগা ছোট আদালতে আমাদের নামে নালিশ করিয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে আড়াই টাকায় রফা হইয়া যাওয়াতে কাহাকেও সাক্ষী সবুত দিতে হয় নাই। ধীর শান্তিময় জীবনের মধ্যে এই যে একটু তেজস্কর ঘটনা, তাহার শেষ তরঙ্গ লীন হইবার অব্যবহিত পরেই আর একটি উৎসাহময় ঘটনার সূত্রপাত! তাহা বন্ধুবর———— অমুকের বিবাহ। নামপ্রকাশ করাটা যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাহাতে গল্পের মাধুর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। একে বর, তাহাতে আবার বন্ধুবর। আমরা সকলেই ভাল কয়খানি পোষাকী ধুতি, সার্ট ও চাদর বীরু ধোপার কর-কমলে কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক সপ্তদিনের কড়ারে সমর্পণ করিয়া সম্ভাবিত আনন্দস্বপ্নে মগ্ন হইয়া পড়িলাম।

বরের পিতা অতিশয় ব্যগ্রতাসহকারে রজনীকান্ত বাবুকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রজনী বাবু কানে কিছু কম শুনিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে বুঝানো গেল যে, রাস্তা অতি সোজা, পেঁড়ো ষ্টেশন হইতে মোটে তিন ক্রোশ, খুব দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত থাকিবে। পাঁচটার ট্রেণে গিয়া নয়টার মধ্যে ফিরিবার খুব সম্ভাবনা। নিতান্ত পক্ষে রাত্রি বারটা, কিংবা ভোর। খুব দেরী হইলে তাহার পর দিন বেলা এগারটার লুপ মেলে নিশ্চয় যাওয়া যাইতে পারে। না গেলে উপায় নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর রজনী বাবু স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তিনি ডাবের জল ছাড়া অন্য কোনও জল ব্যবহার করিবেন না, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমরা তিন কুড়ি ডাব বোরাবন্দী করিয়া রাখিয়া দিলাম।

দলটা বেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ ব্যাধির প্রতীকারার্থ হরি ডাক্তার তাঁহার মেহগ্নির হোমিওপ্যাথিক বক্স আটচল্লিশ রকম ঔষধে সুসজ্জিত করিয়া লইলেন। তখনকার বঙ্গের উদীয়মান কবির কাব্যমুগ্ধ

এবং স্বয়ং কাব্য-রচনা-নিপুণ ভক্তিমোহন জোয়াদ্দার মহাশয় বরযাত্রীর মধ্যে এক জন। তিনি আগ্রহপূর্ণ সহাস্য আননে খণ্ডকাব্যের পুঁটুলি, পেন্সিলও নগদ পাঁচ টাকা সঙ্গে করিয়া যখন আসিলেন, তখন সকলের হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। পাড়ার মধ্যে অনেকগুলি লোক ছিল, পূর্ব্বে জানা যায় নাই; কারণ, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের এক জন বিখ্যাত টীকাকারের প্রপৌত্র খুদিরাম মহলানবিশ মহাশয় সেই দিন আত্ম-প্রতিভা প্রকাশ করিয়া এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। অমনই তাঁহাকে বরযাত্রীর ফর্দ্দসাৎ করা গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরের 'টোপর' হস্তে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সকলের বাটী গিয়া যাত্রার শুভক্ষণ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার হ্রেষারবের আভাস পাইয়া (কারণ, পূর্ব্বদিনের দর দস্তরের পরিশ্রমে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়াছিল!) অনেকে নাসিকানিনাদ ত্যাগ করিয়া সজাগ হইয়া পড়িল। সকলে নিজের নিজের ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক লইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। যাওয়ার বেশী দেরী নাই। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে বর ও বরকর্ত্তার সহিত রজনীকান্ত বাবু ও ডাক্তারকে চড়াইয়া দিয়া আমরা থার্ডক্লাসগুলি বাছিয়া লইলাম। কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মালাকার ও নাপিত, চাটুর্য্যে মহাশয়দের বাটীর গাড়ীতে পূর্ব্বেই স্থিরভাবে আসীন হইয়া হরিনামে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, 'বোধ হয় লাহিড়ী মহাশয় এখনও পৌঁছেন নাই।'

বাস্তবিক তাই ত! নচেৎ একটা 'সীট্' এখনও খালি কেন?

আমরা তিন জন তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত। ব্যাপারটা সোজা নয়। প্রায় দশ বৎসরাবধি তাঁহার 'পিরাণ'-গুলি অবব্যহৃত ভাবে পড়িয়া থাকায়, এবং ইতিমধ্যে এ পক্ষে বিরাট বপু ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে, প্রথমটার মধ্যে শেষটাকে প্রবিষ্ট করানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বাকী ছিল একটা পঞ্জাবী, সেটা সেকালের ঢঙ্গের। কিন্তু তাহাও তিনটি ঘোর অভাববিশিষ্ট। সম্মুখের বোতাম নাই, পশ্চাতে খানিকটা কীটদষ্ট, এবং একটী আস্তীন তাঁহার গৃহিণী সম্প্রতি কাটিয়া লইয়া খোকার 'পাশ বালিসের ওয়াড়ে' পরিণত করিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্যা সকলে মিলিত হইয়া একটা খাটো পিরানের

মাথা লাহিড়ী মহাশয়ের মাথা হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। এ দিকে গৃহিণী সচন্দন তুলসী ও দূর্ব্বা লইয়া শুভ যাত্রায় মঙ্গলবাণীকণ্ঠে উৎকণ্ঠায় দণ্ডায়মানা। ভৃত্য তৈয়ারী তামাকু লইয়া দ্বারদেশস্থ। আমাদিগকে দেখিয়া সকলেই কিছু ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। লাহিড়ী মহাশয় মস্তকজড়িত বস্ত্রের অন্তরাল হইতে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'থাক্, আর কাজ নাই, এত গ্রীষ্মে পিরাণ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।'

অনেক কষ্টে মস্তক বাহির হইলে পর লাহিড়ী মহাশয় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও উদ্গারাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে বলিলেন, 'বাবা! পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এ রকম একটা ব্যাপারে ছেলে ছোকরা ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে কষ্ট সহ্য করা সাধ্যাতীত; যাহা হউক, যখন কথা দিয়াছি, তখন চারা নাই।'

আমি। এমন কথা বলিবেন না, আপনার ন্যায় গণ্যমান্য কুলীন সভাস্থলে উপস্থিত না থাকিলে বিবাহ যজ্ঞই বৃথা।

লাহিড়ী-গৃহিণী আমার প্রতি সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'বাবা! ওঁকে সাবধানে নিয়ে যেও, কখনও পশ্চিমে যান্ নাই, আর প্রাতঃ-কালে একটু খাঁটী দুধের যোগাড় করিয়া দিও।' আমি বিনীতভাবে সাহস-বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলাম, 'অবশ্য! আমি যখন আছি, আপনার কোনও ভাবনা নাই।'

ষ্টেশন পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই; তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গাড়ী পিছাইয়া পড়াতে তিনি যূথভ্রষ্ট হইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে কোচ-ম্যানকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জ্ঞান ছিল যে, শিয়ালদহ হইয়া পাণ্ডুয়া যাইতে হয়। বোধ হয়, ইহা লইয়া নাপিত, মালাকার ও কোচম্যানের মধ্যে বহু বাকবিতণ্ডা হয়। তাহা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বসংস্কার প্রবল ভাবে সকলকে পরাস্ত করিয়া একটা মহা বিভ্রাটের সূত্রপাত করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে পথে কোনও ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রম দূর করিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাতে অর্দ্ধঘণ্টার বেশী দেরী হয় নাই।

হাবড়া ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ী ছাড়িয়া দিলে একটা কেমন অনির্ব্বচনীয় স্বাধীন ও উদার ভাব আসিয়া পড়ে! যখনকার কথা বলিতেছি, তখন কলি-

কাতার কোনও বাসিন্দা ভদ্রলোক নিতান্ত বিপন্ন না হইলে সহর হইতে এক পদ অগ্রসর হইতে চাহিতেন না। ক্রমে বঙ্গের আকাশ, বঙ্গের ক্ষেত্র. ও অস্তমিত রবিকরের মধ্য দিয়া আমরা আটচল্লিশ জন বরপক্ষীয় পুরুষ সন্ধ্যার পর পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে আসিয়া পড়িলাম।

২

যেমন অগ্রহের সহিত যাত্রা করা গিয়াছিল, পেঁড়ো ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ততোধিক নৈরাশ্য ভোগ করিতে হইল। মোটে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ও তিনখানি গোযান ছাড়া বেশী কোনও আয়োজন তখনও হয় নাই। গোযানের ভারপ্রাপ্ত কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যেই আসিবে, কোনও ভাবনা নাই'। তখন প্রায় সাতটা। বিবাহের লগ্ন রাত্রি বারোটার সময়। এক জন চটিয়া বলিল, 'মহাশয়, এ কেমন ভদ্রতা ? একে ত আমরা গরুর গাড়ীতে পূর্ব্বে কখনও চড়ি নাই, তার পর যদি বা যোগাড় করিলেন, তখন আপনাদের বুঝা উচিত ছিল যে, আটচল্লিশ জন লোক তিনখানা গাড়ীতে ধরা অসম্ভব।' কন্যা-পক্ষীয় ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে কহিলেন, 'সম্প্রতি গরুর মধ্যে একটা মড়ক হওয়াতে, অনেক কষ্টেও গাড়ীর গরু পাওয়া যায় না।' কথাটা শুনিয়া ছেলেপুলেদের মধ্যে একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল, 'গরুর মড়ক হইয়াছিল ত বলদের কি ?' অন্য কেহ (সক্রোধে), কন্যাপক্ষীয়গণের মধ্যে ভদ্র ও বিজ্ঞ লোকেরও কি মড়ক হয়েছিল ?' আমি সকলকে থামাইয়া কহিলাম, 'দাদা, থাম। বিপন্ন হইলে ক্ষমা করিতে হয়।' মড়কের কথা শুনিয়া ডাক্তার 'ইউকেলিপ্টস্' তৈলের শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তৈল সকলের রুমালে মাখাইয়া অসাবধানতার বিনাশ করিতে লাগিলেন।

গরুর আশায় পথ চাহিয়া অনেকে বসিয়া রহিলেন। কেবল গুরুবর্গ বরকর্ত্তা ও বরের সহিত রওনা হইয়া গেলেন। একখানি শকটে তৈজসপত্র রক্ষা করিয়া আমরা জন কতক পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় দেখিলাম,অনতিদূরে গ্রাম্য কদলী বৃক্ষের শীর্ষভাগ সহসা আলোকিত, মাঠঘাট স্নিগ্ধ মধুর রশ্মিজালে প্লাবিত ও আমাদিগের গন্তব্য পথ উজ্জ্বলিত করিয়া চতুর্দ্দশীর বৃহৎ চন্দ্র গগনমণ্ডলে উদীয়মান।

কবিবর জোয়াদ্দার মহাশয় অতিগম্ভীরভাবাবিষ্ট হইয়া সেই চন্দ্রোদয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের টীকাকার খুদিরাম

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন

Mohila Press, Calcutta.

মহলানবিশ মহাশয় জোয়াদ্দারের মুখভঙ্গী পর্য্যালোচন করিতে করিতে ধূমপানে রত হইলেন। ঐতিহাসিক রজনী বাবু মাঠের দিকে একটা পুষ্করিণীর পাড়ে চলিয়া গেলেন। অনেকে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। গ্রাম্যপথ সঙ্কীর্ণ হইলেও আমরা অতিশয় জেতৃভাবে উৎসাহিত, কারণ সেই পাঁচ ছয় মাইল হাঁটিয়া মারা কি সামান্য বীরের কর্ম্ম! "প্রশস্ত রাস্তায় ত সকলে হাঁটিয়া যায়, কিন্তু সঙ্কীর্ণ রাস্তায় জুতাসহকারে—বিশেষতঃ চটিজুতা পায় কয়টা লোক মাথা সোজা রাখিয়া হাঁটিতে পারে?" হরি ডাক্তারের এবংবিধ উৎসাহ-বাণীতে আমরা আনন্দে এবং গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া পথকষ্ট ভুলিতে লাগিলাম। ক্রমে পথের মাঝে, মধ্যে মধ্যে কর্দ্দমে পদতল বসিয়া যাওয়াতে অনেকে মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া জুতা খুলিয়া হস্তে লইলেন। জোয়াদ্দার মহাশয় কহিলেন, 'ইহাতে ব্যালেন্‌স্ থাকে।' ডাক্তার কহিলেন, 'হাঁ, বিপন্ন হইলে মানবজাতির অসাধারণ আত্মরক্ষার উপায়োদ্ভাবনাশক্তি আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। জানোয়ার হইলে জুতা লইয়া কর্দ্দমে বসিয়া পড়িত, কিংবা জুতা পরিত্যাগ করিয়া যাইত। এই জন্য শাস্ত্রকার কহিয়াছেন,—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" ইহাতে খুঙ্কিরাম বাবু অনেকটা আশ্বাসিত হইলেন, কারণ শ্রমাধিক্যবশতঃ তিনি একবার দক্ষিণ হস্তে জুতা এবং বাম হস্তে হুকা এবং তাহাই ওলটপালট করিয়া লইতেছিলেন। তামাক পুড়িয়া যাইবার পরে কেহই তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। ইহাতে বন্ধুত্বের কোনও অভাব প্রতিপন্ন হয় নাই; কারণ, সে স্থানটি রাজদ্বার, কিংবা শ্মশান, কোনটার অন্তর্গতই নহে।

প্রান্তর জনহীন হইতে লাগিল। একটা শুভ্র পদার্থে মাঠ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, 'ওটা গ্রাম্যগোশালার ধূম ও চন্দ্রকর-স্নাত সদ্যঃশিশিরের মিক্‌শ্চার, অতীব স্বাস্থ্যকর।' ইহাতে আমরা নাসিকার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলাম। বোধ হইল, শরীর তাজা হইতেছে।

কিয়ৎকাল পরে সেই ধূম্রজালের মধ্য দিয়া একটা অট্টালিকার শীর্ষ-ভাগ দৃষ্ট হইল। কি অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার! প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের টীকাকার খুঙ্কিরামবাবু বলিলেন, 'কি অপদার্থ জীব আমরা! সামান্য পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের স্থল খুজিতেছি। যাহারা আজীবন এই সংসারের দীর্ঘপথশ্রান্ত, তাহারা মরিয়া কোথায় গিয়া বিশ্রাম পায়?' ডাক্তার

কহিল, 'মরিবার কথা যদি বলিলে ভাই, তবে একটা কাহিনী শুন। অক্রুর দত্তের গলিতে সাতকড়ি নামক এক জন বামুনঠাকুর থাকিত। সে যদিও বেদ উপনিষদাদি পড়ে নাই, কিন্তু যে ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রথম বেদের তর-জমা করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে সে এক জন ব্রাহ্মণের শ্যালক। গতবৎসর শীতকালে কাশরোগে আক্রান্ত হইয়া সাতকড়ি একটা প্রকাণ্ড মোলায়েম লেপ আশ্রয়পূর্ব্বক তন্ময় হইয়া পড়িল। মরিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সে বলিয়া-ছিল, "ডাক্তার! যদি মরি, তবে যেন এই লেপের মধ্যেই মরি। এ লেপ পরিত্যাগ করিয়া আমার কাশীবাস করিবারও ইচ্ছা নাই।" লেপের মধ্যে শীতকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া যে কি সুখের, তাহা সাতকড়ির জীবনেই বুঝা যায়।'

খুদিরাম তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'এইরূপে জীব ক্রমে বদ্ধ হইয়া পড়ে। কি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী বিরাট মায়া'!

জোয়াদ্দার মহাশয় কহিলেন, 'যে ভক্ত, তাহার সুখদুঃখ সমান। শরশয্যাও ভীষ্মদেবের নিকট কুরুক্ষেত্রে দুগ্ধফেননিভ কোমল।

ডাক্তার বলিলেন, 'জীবজগতে আবর্ত্তনবাদিগণ কহেন যে, যতপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ও আরাম সম্ভব, তাহা কোনও সময়ে সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। কেবল দুঃখভোগেই জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় না, সুখভোগও তাহার একটি উপকরণ। উভয়ে মিলিত হইয়া মোহনভোগ কিংবা কর্ম্মভোগের আকার ধারণ করে। এই যে গ্রাম্য কৃষকগণ, তাহারাও এককালে চা খাইয়া সিগারেটের ধুমপান করিয়া কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নবরসপূর্ণ কথাবার্ত্তা ও কবিতায় গা ঢালিয়া দিয়া জীবনের সার্থকতা ও অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিবে। পূর্ব্বের মেজাজ কড়া করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, সেবা ও দাসত্ব বর্জ্জন করিয়া আমাদের মস্তকে আরোহণ করিবে। আমাদিগকে কহিবে, "তোমরা এতদিন বিনা কষ্টে বিনা ব্যয়ে আরাম করিয়াছ, এখন একবার পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ মাথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিব।" সকলেরই এক একটা সময় আছে। তখন আমরা বলিতে বাধ্য হইব, "আচ্ছা দাদা, তোমরা এখন লেপের মধ্যে মর, আমরা নিমতলার ঘাটে স্কন্ধে বহিয়া লইয়া যাই।" ইহারই নাম সৌজন্য ও সভ্যতা।'

রজনী দাদা ইতিমধ্যে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি

তেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, নিম্নগা নদনদীও পলী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহে। বিপ্লবের মূল সূত্রই ইহা।'

জোয়াদ্দার মহাশয় ইহার কাব্য মনে মনে রচনা করিতে লাগিলেন। খুঙ্কিরাম বলিলেন, 'ইহার কি কোনও চারা নাই?'

ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এটা বিশ্বের কূট নীতি। অধুনাতন মতাবলীর মধ্যে হোমিওপ্যাথিক মতে আমাদিগের পূর্ব্ব হইতে পথ প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। অর্থাৎ আমরা বলিব, "বৎস বিদ্রোহিগণ! তোমরা পুত্রসন্তানবৎ, আমাদিগের তিন কাল গিয়া শেষকাল উপস্থিত, এখন তোমরা খট্টাঙ্গে বসিয়া হাত পা ছুড়িতে থাক, আমরা ধর্ম্মশালায় কিংবা অরণ্যে গিয়া রোমন্থন করি"।'

সকলেই স্বীকার করিলেন, 'ধর্ম্মতঃ ইহাই ঠিক, নচেৎ পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণ করিবেন কেন?'

রজনী বাবু বলিলেন, 'ভগবান কাহারও পক্ষপাতী নহেন। বাস্তবিক পক্ষে সকলের আকাঙ্ক্ষাও অতি ক্ষুদ্র। আমার ঘোড়া পূর্ব্বে কেবল ঘাস খাইয়া চাট্ মারিত, ক্রমে পুনঃ পুনঃ যব ও ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে অপূর্ব্ব মধুর ও শান্তস্বভাববিশিষ্ট হইয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।'

৩

ডাক্তার কহিলেন, 'লিবারেল ও কন্জার্ভেটিভ্ দলের মধ্যে ঐটুকু তফাৎ। কন্জার্ভেটিভ আশ্রয় দিতে স্বীকৃত, কিন্তু প্রশ্রয় দিতে চাহে না।'

ক্রমে আমরা কন্যাপক্ষীয় বাটীর সম্মুখীন। রাত্রি প্রায় দশটা। আমরা বোধ হয় খুব গম্ভীর ভাবে চলিয়া আসিয়াছিলাম, কারণ আমাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী গরুর গাড়ীর আরোহিগণও ষ্টেশন হইতে সেই সময়ে আসিয়া নিরাপদে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার কহিলেন, 'হিংসা করার কারণ নাই,, উভয় পক্ষেরই পথকষ্টে লঘেগো হইবার সম্ভাবনা।' কারণ, গরুর গাড়ীতে বিচালি বিছানা প্রভৃতি ছিল না, অতএব সকলেই পার্শ্ববর্ত্তী বাঁশের খুঁটা ও আড়া ধরিয়া দেহের ঋজুভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, কেবল লাহিড়ী মহাশয় স্থিতিস্থাপকতার গুণে দেহের সারাংশ রজনী বাবুর ভাবের বোঝার উপর সংলগ্ন করিয়া নিদ্রাদেবীর কোমল-ক্রোড়ে কালযাপন-সুখে নিমগ্ন ছিলেন।

অতি রমণীয় অতিথিশালা। চতুর্দ্দিকে নারিকেল গাছ, তন্মধ্যে দুই একটা সুপারি। সম্মুখে সুন্দর সারি সারি ফুলের চারাগাছ, ফুল থাকিলে অধিকতর শোভনীয় হইত। লাহিড়ী মহাশয় শকট হইতে অবরোহণ করিয়াই কহিলেন, 'বাবা, তোমাদের খপ্পরে পড়িয়া অদ্য চতুর্দ্দশী তিথি, মূলানক্ষত্র, মার্গশীর্ষমাসে আমার জাতি গিয়াছে।' ডাক্তার ইজিচেয়ারে পদ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, 'ইহার কারণ?' লাহিড়ী মহাশয় একখানা জলচৌকিতে উপবিষ্ট হইয়া কাতরভাবে কহিলেন, 'ডাক্তার, কন্যাপক্ষীয়গণ এতাধিক বিবেকহীন যে, বলদের অভাবে দুগ্ধবতী গাভীদ্বয়কে শকটে জুড়িয়া এই তিন ক্রোশ রাস্তা আমাদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে।' রজনীবাবু কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া কহিলেন, 'ইহা দেশের গৌরবের কথা। এই সংসার-রথ যখন স্ত্রীলোকেই টানিতেছে, তখন গাভী দ্বারা শকট-চালন যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? ইহা উন্নতিকল্পে বুঝিতে হইবে।' ইহা লইয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী মনু ও পরাশর প্রভৃতির বচনের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আমরা পদ ধৌত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জলযোগের বিলম্ব কত?'

কন্যাকর্ত্তা সাদরে কহিলেন, 'জলযোগের সকলই প্রস্তুত, তবে বিবাহের লগ্নের অধিক দেরী নাই, এখন যজ্ঞস্থানে আপনারা উপস্থিত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলে উভয় কর্ম্মই সম্পন্ন হয়।' 'উভয় কর্ম্মটা' কি, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কন্যাদানের স্থানেই কি জলখাবারের আয়োজন হইয়াছে?' লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, 'এটা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, বিশেষতঃ স্ত্রী-আচারের সময় অন্তঃপুরে বরকে লইয়া গেলেই তৎক্ষণাৎ ফলার আরম্ভ। এই প্রকারে একবার জলযোগ, একবার ফলার, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত; এইরূপ নানাবিধ উৎপাত বিঘ্নসঙ্কুল এবং শ্রমসাপেক্ষ। অতএব আমরা অপাততঃ ডাবের জলমাত্র পান করিয়া সভায় যাইতে চাহি।'

লাহিড়ী মহাশয়ের স্ত্রীর অনুনয়-বাক্য স্মরণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে খাঁটী দুগ্ধ পাওয়া যায় ত?' কন্যাকর্ত্তা কহিলেন, 'এটা গরুরই দেশ, প্রায় বার মন টাট্‌কা ক্ষীর নূতন গুড় দিয়া প্রস্তুত হইতেছে।' ইহাতে আমাদিগের মুখ-গহ্বর জলাকীর্ণ হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয় সহাস্য-আননে কহিলেন, 'যে গরু গাড়ীতে জুড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার বৎস

সমভিব্যাহারে থাকিলে পথেই দোহন করিয়া লইতাম'। কন্যাকর্ত্তা সলজ্জে কহিলেন, 'পূর্ব্বে সংবাদ পাই নাই, মার্জ্জনা করিবেন, যেরূপ দোহন অগ্রেই করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে আর সাহস হয় নাই।' ডাক্তার চটিয়া কহিলেন, 'কি ? যামগাঁর———বাবু কি কন্যার আভরণ পাঁচ হাজার মাত্র দিয়াই দোহনের দোহাই দিতেছেন ? এ রকম পাত্র কি দশ হাজার টাকায় মেলে ?' আমি বলিলাম, 'থাক্, ও সব কথায় কাজ নাই, এখন সভাস্থ হওয়া যাউক। কুটুম্বের সহিত প্রথম হইতেই বিবাদ অতিশয় অমঙ্গলজনক।'

সভামণ্ডপ অতিযত্নে সুসজ্জিত। সমাগত কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকগণের মধ্যে কন্যাকর্ত্তার শ্যালক দুইটি উল্লেখযোগ্য। শ্যালক নং ১ অনুরূপবাবু চিররুগ্ন। অম্লরোগই তাহার প্রধান কারণ। রোগাধিক্যবশতঃ দেহের মধ্যে মুখখানিই সর্ব্বপ্রধান। বড় বড় চক্ষু, নাসিকা ও গোঁফ প্রথম পরিচয়স্থল। সর্ব্বদা জাগ্রত, এবং সাক্ষিস্বরূপ স্থিরভাবে রাজধানীর পাহারাওয়ালার ন্যায় স্বীয় পদপ্রতিষ্ঠিত। বামহস্তের সহিত গোঁফের অতিশয় সখ্যভাব। দুই একবার বাক্যালাপ করিয়াই ডাক্তার তাঁহার 'পেশেণ্টে'র নাড়ীনক্ষত্র বুঝিয়া লইলেন। খুঙ্কিরাম মহাশয় শ্যালক নং ২ ভূতনাথের সহিত ভাবে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। ভূতনাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের পর আর বিবাহ করেন নাই। সংসারের প্রতি বৈরাগ্যভাব প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্যক্ত। 'দাদা! তেমনটি আর হবে না। কেন যে আসে, কেন যে মরমে ব্যথা দিয়া চলিয়া যায়, তাহার কোনও তথ্য জান ?' খুঙ্কিরাম বলিলেন 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের টীকায় ইহার সবিশেষ আলোচনা পাইবেন। স্ত্রী-বিয়োগ একটা মহাপ্রলয়ের লক্ষণ। সতীর দেহত্যাগে মহাদেবের উন্মাদ অবস্থা তাহার প্রমাণ।' জোয়াদ্দার মহাশয় কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'এটা একটা মহাকাব্য বই আর কিছুই নহে। মরণটাই একটা কাব্য, এবং জীবন-সঙ্গিনীর মরণ সকল কাব্যের শীর্ষস্থানীয়।'

শ্যালক নং ১ প্রকাণ্ড গোঁফ বাম হস্ত দ্বারা অপসৃত করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, 'দাম্পত্য জীবন যে কাব্যের অন্তর্গত, তাহা আমি স্বীকার করি; তাহার অভাব যে মহাকাব্য, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহার কপালে অস্তিত্ব ও অভাব এক সঙ্গে, যেমন আমার মত অম্লরোগীর, তাহার বিধান কি ? কি বল ডাক্তার ?' ডাক্তার আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আপনার কোনও ভাবনা নাই; যে ঔষধের কথা বলিলাম, তাহাতে আপনি

নবীন বল পাইবেন, নূতন রক্তকণার সঞ্চার হইবে। ইহার একটা কাহিনী আপনাদিগকে বলি। যখন বিহারী ভাদুড়ী মহাশয় বাঁচিয়া, এবং শম্ভু মুখুর্য্যে মহাশয় অসাধারণ জোরের সহিত 'রয়িস ও রাইয়ত' নামক সংবাদ-পত্র এবং 'মুখুর্য্যের ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকায় 'কেরাণীজীবনের স্মৃতি' নামক প্রবন্ধ বাহির করিতেছিলেন, তখন মাণিকতলা ষ্ট্রীটে 'হিন্দু ফ্যামিলী এন্নুইটী ফণ্ডে'র এক জন কেরাণী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। লোকটার মাসাবধি নানাবিধ সংবাদ-পত্রে ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ার যুদ্ধবার্ত্তা পাঠ করিয়া অতি উৎকট শিরঃপীড়া সঞ্চিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ ভৎর্সনাপূর্ব্বক বলিলেন, 'বাঙ্গালীর ছেলের সংবাদপত্র পড়া উচিত নয়, তার পর আবার যুদ্ধের খবর! তোমার আসন্ন দুরবস্থা। ইহার উপায়—কেবল গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া তাহার ধূমগ্রহণ।

'ঔষধের গুণে লোকটার মস্তকের অভ্যন্তর পূর্ব্ববৎ শ্লেষ্মাবিহীন হইয়া বলীয়ান হইয়া পড়িল। তাহার পর সে কেবল মাসিকপত্র, এবং তাহারও মধ্যে কেবল মিঠা গল্প স্বল্পপরিমাণে পাঠ করিত। আমার বেশ বিশ্বাস যে, মিঠা গল্প অনেকটা 'সানাটোজোনে'র মত ফলদায়ক। মধ্যে সারপদার্থ না থাকিলেও আমাদিগের অসামান্য দৌর্ব্বল্যের গুণে সারবান হইয়া পড়ে।'

খুঞ্চিরাম ইহার অনুমোদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'যেমন সংসার। সংসার যে সম্পূর্ণ অসার, তাহা শাস্ত্রে প্রকাশ। অথচ এই অসার সংসারই মানবের মুক্তি ও উন্নতির পথ। এই যে বিবাহ-লীলা, এটা কি?'

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় অবলীলাক্রমে সময় কাটাইয়া ক্রমে আমাদিগের ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হইয়া পড়িল। এমত সময় লাহিড়ী মহাশয় আনন্দসহকারে সংবাদ দিলেন,—'পাতা পড়িয়াছে।' এই মহা সুসমাচার সভামণ্ডলীতে প্রচারিত হইবামাত্র জড় ও নির্জ্জীব হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। যাহারা তন্দ্রার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণবায়ুর সহিত মস্তকের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারা সহসা সজাগ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, বালিকা ও ভৃত্য,—সকলেরই অসামান্য উৎসাহ। বামগ্রামের লুচি ও ক্ষীর বিখ্যাত। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাব্যসাহিত্যাদির সম্পূর্ণ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়।

সেই উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার খাঁটী ঘৃতে ভাজা লুচি ও বেগুন, এবং

খাঁটী গব্য ক্ষীর! সে অপূর্ব্ব সামগ্রী এখন কোথায়? তোমরা এখন তাহা পরিপাক করিতে পারিবে না।

৪

'একটা কথা বড় সমস্যাপূর্ণ। মানব আবর্ত্তনের পথে ক্রমে বৃক্ষ হইতে নিম্নে অবরোহণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন এবং আহারাদির বন্দোবস্ত কেন করিয়াছিল, তাহার কোনও সম্যক উত্তর পাওয়া যায় না।'

ডাক্তারের এবংবিধ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় খুঞ্চিরাম মহলানবিশ মহাশয় বলিলেন, 'একত্র বসিয়া সামাজিক আহার সম্বন্ধে কোনও মৌলিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বানরের ন্যায় বৃক্ষে বসিয়া দলবদ্ধ মানবের পক্ষে সামাজিক আহার অসম্ভব। আমরা নানাবিধ খাদ্য খাইয়া থাকি। বৃক্ষে বসিয়া তাহার ফলমাত্র বানরগণ আহার করে। আমাদিগের রন্ধনশালা চাহি। আবার ভাবিয়া দেখুন যে, পরিবেশনের সময় এক ডাল হইতে অন্য ডালে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করা কি কঠিন ব্যাপার!' ডাক্তার বলিলেন, 'পূর্ব্বপক্ষে তাহাই, কিন্তু সভ্যতার বিকাশে আহারের সময় দন্তপাটী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়া থাকে, সেটাও একটা কারণ। যাহারা দ্বিতল অট্টালিকায় টেব্‌লে বসিয়া, কাঁটা ও চামচের সাহায্যে বানরগণের অনুকরণ করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। আমার বোধ হয়, কোনও আদিমকালে প্রথম বৃক্ষচ্যুত বন্য মানুষের দল নন্দনকানন হইতে বিদায় লইয়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়াছিল। সেই সনাতন পরিব্রাজকগণ দগ্ধ এবং সিদ্ধ পক্কান্নের প্রবর্ত্তক। প্রত্যেক জাতিরই আহার-কালের 'মেনু' (খাদ্য-তালিকা) পরীক্ষা করিলে অনেকটা মর্ম্ম বুঝা যায়। যথা :—

১। কদলীপত্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তার। তদুপরি উপবেশন, এবং অন্য এক খণ্ডে আহার্য্য-পরিবেষন। ইহা সনাতন পূর্ব্বসংস্কার।

২। শাক সবজী সিদ্ধ এবং লবণাক্ত। দ্বিতীয় যুগের।

৩। ছ্যাঁচড়া, ভাজা প্রভৃতি। তৃতীয় যুগের।

৪। লুচির সহিত তাহাদিগের শুভসংযোগ। বৈদিক যুগের।

৫। মিষ্টান্ন ও ক্ষীর। তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের।

সমাজের জটিলতার সহিত আহারের বিচিত্রতা যে নানাপ্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়।'

অম্লরোগগ্রস্ত অনুরূপ বাবু দণ্ডায়মান হইয়া কাহার কি দরকার তাহা সেনাপতির ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ভূতনাথের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর হস্তের মুখরোচক খাদ্যাদির কথা এই সময় স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তদীয় চক্ষু অপর্য্যাপ্ত জলভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। শ্যালক নং ১ অনুরূপ বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'ভুতো! ছি! কচ্চিস্ কি? আমার ত থেকেও সেই দশা। অম্লরোগেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।"

এমন সময় আহারমণ্ডপে মহাকোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় প্রায় বত্রিশ খুরি ক্ষীর সাবাড় করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভয়ানক অন্যায়। আমার পার্শ্বেই এক জন রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ বসিয়া! এ কথা পূর্ব্বে বলা উচিত ছিল। জাতি ত গিয়াছেই, অপিচ যাহা খাইয়াছি, তাহা পরিপাক হওয়া দুষ্কর। কন্যাকর্ত্তার এই অপমানের কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।'

সকলে স্তম্ভিত! বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ! কন্যাকর্ত্তা গলবস্ত্রে নিবেদন করিলেন, 'সমস্ত জিনিসই রাঢ়ী ব্রাহ্মণের দ্বারা এ দেশে রন্ধন করা হয়, এবং পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে সকলে একত্র বসিয়া আহার করেন।'

লাহিড়ী মহাশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, 'পাক করায় কোনও দোষ নাই। অভাবে আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের একত্র বসিয়া আহার নীতিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ দোষ মিটিতে পারে না। আপনারা কি বলেন?'

বরযাত্রিগণ তাহাতে সায় দিয়া দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'আপনারা কেহ উঠিবেন না। আমি ইহার মীমাংসা করিয়া দিতেছি।'

ডাক্তার বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের একত্র বসিয়া আহার করার প্রধান বাধা কীটাণুসঞ্চার। সকলের শরীরেই এক এক জাতীয় ব্যাক্‌টীরিয়া কিংবা কীটাণু বর্ত্তমান। ইহাতে নানা রোগের সঞ্চার হয়। ডাক্তার লিষ্টার কর্ত্তৃক নবপ্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে আমরা অস্ত্রচিকিৎসা কালেও যন্ত্রগুলিকে নানাবিধ অ্যান্‌টিসেপ্টিক দ্বারা ব্যাক্‌টিরিয়া-শূন্য করিয়া লই। নচেৎ রোগীর দেহ সেপ্টিক্ বিষ দ্বারা

পরিপূর্ণ হইয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর-কথিত মধ্য-এসিয়ার বিজ্ঞ আর্য্যগণ বর্ণাশ্রমস্থাপনকালে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আহার ও বিহারাদিকালে একটা কিছু অ্যান্টিসেপ্টিক ব্যবধান না থাকিলে প্লেগ প্রভৃতি রোগে আর্য্যাবর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে। সকলেই বোধ হয় জানেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ ও বাম হস্ত কিংবা উরুদেশ হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং পদতল হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীরও যে ব্যাকটীরিয়া-পরিপূর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের মুখরোগ, ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণ হস্ত, বৈশ্যগণের উরু ও শূদ্রের পদরোগ প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণদের মুখের কাছে দাঁড়ানো যেমন অসাধ্য, ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণ হস্ত, বৈশ্যের বাম হস্ত এবং শূদ্রের পদাঘাত ততোধিক গুরুতরভাবাপন্ন। এই জন্য পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল যে, ব্রাহ্মণগণ মৌনী হইয়া আহার করিবেন, এবং অন্যান্য জাতি-গণ দূরস্থ হইয়া স্বীয় দুর্ব্বল স্থান নানাবিধ উপায়ে আচ্ছাদন করিয়া আহার কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করা অসম্ভব বিধায় ক্ষত্রিয়গণ তরবারি ব্যবধান রাখিয়া কার্য্যসমাপ্তি করিতেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ কুশব্যবধান দ্বারা বিজাতীয় ব্যাকটীরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও যখন আচার ব্যবহারের ভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল, তখন কুশের বদলে বংশখণ্ডের ব্যবধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্রমে চটিজুতা প্রচলিত হওয়াতে বংশখণ্ড অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। অশোকের কিংবা মহীপাল নামক রাজার নবাবিষ্কৃত তাম্রলিপিতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, যাঁহারা চটিজুতা পরিধান করিয়া বল্লালসেনের বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই রাঢ়দেশীয়। যাঁহারা কাষ্ঠপাদুকা-পরিধৃত, তাঁহারা মৌলিক বারেন্দ্র। তাম্রলিপি বলিতেছে, 'কি সুন্দর সভা! সারি সারি কাষ্ঠপাদুকা এবং চর্ম্মপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা এবং কাষ্ঠপাদুকা। কাষ্ঠ চর্ম্মের ব্যবধান, চর্ম্ম কাষ্ঠের ব্যবধান!'

মনে করুন, কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। নদনদী শুষ্ক হইয়াছে। বৃক্ষাদি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মানবীয় আচার ব্যবহারের পরি-বর্ত্তনের সহিত পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবধান-প্রণালী এখন পদেই বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি যেমন পদারূঢ়, তাহার ব্যাকটীরিয়াও তথৈব গণ্যমান্য। অতএব কোনও মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য—'মহাশয় কি করেন?'

ডাক্তারের বচন সকলের হৃদয়গ্রাহী হওয়াতে সকলে ঔৎসুক্যসহকারে লাহিড়ী মহাশয়ের পার্শ্বদেশস্থ রাঢ়ীব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়ের নিবাস! মহাশয়ের কি করা হয়?' ইত্যাদি। লোকটি অতিধীরভাবে কহিলেন,'আমার নাম ——চাটুর্য্যে। বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সাকনাড়া গ্রামে আমার নিবাস। আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। এখন পেন্সন-ভোগী।'

পরিচয় পাইয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে স্তম্ভিত।—'বলেন কি? আপনি —চাটুর্য্যে মহাশয়? অহো কি সৌভাগ্য! আমার পিতাঠাকুর আপনারই অনুকম্পায় সেই প্রসিদ্ধ দাঙ্গার মোকদ্দমায় খালাস পাইয়াছিলেন। নমস্কার! মার্জ্জনা করিবেন। পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই।'

সকলে অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া মহোল্লাসে উচ্চধ্বনিসহকারে কহিল, 'অতিসুখের কথা। লুচি,—গরম লুচি দ্বিতীয়বার পরিবেশন কর, ক্ষীর আন।' 'উৎকণ্ঠায় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, ইহা স্বাভাবিক। সিপাহীবিদ্রোহের সময়, কিংবা বর্গীর হাঙ্গামার সময় লোকে দ্বিগুণ আহার করিত।'—ঐতিহাসিক রজনী বাবু এই তথ্য প্রচার করিয়া পুনরায় গণ্ডূষ করিয়া বসিলেন। অনুরূপ বাবু—শ্যালক নং ১ অতি দক্ষতাসহকারে পুনঃপুনঃ ক্ষীর ও লুচি সংগ্রহ করিয়া সকলের আগ্রহ মিটাইতে লাগিলেন। বোধ হয়, এতাধিক পরিমাণে প্রত্যেক লোকের আহার কোনও বিবাহক্রিয়ায় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

৫

অতিশয় গুরুতর আহার করিলে কেমন একটা নিঃসহায় ভাব আসিয়া পড়ে। একটা কি রকম বিপদের আশঙ্কা হয় উপস্থিত হয়। যেন সংসারে আমাদের কোনও দাবী দাওয়া নাই, বল নাই, উদ্যম নাই, আশা নাই। বোধ হয়, সেই জন্য শাস্ত্রে অতিশয় আহার নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই জন্য আহারের পরে একটু মদিরার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হঠাৎ একটা লোক গুরুতর আহার করিয়া কাবু হইয়া পড়িলে জড়তার প্রাবল্যবশতঃ নৈতিক জগৎ ম্লান ও শীর্ণ হইয়া যায়।

গভীর রাত্রি তখন। শয়নের বন্দোবস্ত সুচারু হইলেও আমরা অনেকটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শয্যাগত হইলাম। অনেকের শয়ন করিবার শক্তি ছিল না। খুদিরাম কহিলেন, 'বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু প্রাতঃকালে ট্রেন

অসম্ভব। যে রকম আহার করা হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিদ্রাদেবীর চক্ষুর ত্রিসীমায় পদার্পণের কোনও আশা নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বিবেকচূড়ামণি কহিয়াছেন,'কোনও পাপক্রিয়া সাধিত হইলে বিবেকের উদয় হয়। পুণ্যকর্ম্মে অহঙ্কারের উদয়। "আমি অমুক পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি," এটা স্বাভাবিক দর্পের কথা। কিন্তু "এত অধিক আহার করাটা অন্যায় হইয়াছে," এটা দর্পচূর্ণের কথা। বোধ হয় একটা আসন্ন ভীতি এই ঘরে উপস্থিত।" এমত সময়ে জোয়াদ্দার মহাশয় বলিলেন—

'বিশাল বিশ্বে চারি দিক হ'তে
প্রতি কণা মোরে টানিছে—'

কবিবরের মুখ ও তদানুষঙ্গিক জিহ্বা ও গহ্বরাদি শুষ্ক। কথা অতি ক্ষীণ। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া কহিলেন, 'শীঘ্র হোমিওপ্যাথিকের বাক্স আন। ডাক্তার বেলের মতে এটা ড্রাই সিকা কলেরার পূর্ব্বলক্ষণ।'

নিমিষের মধ্যে এক ডোজ্ আর্সেনিক জোয়াদ্দার মহাশয়ের গলায় ঢালিয়া দেওয়াতে কবিবর কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, 'আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছি, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে—আমি যেন মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছি, যেন এই দেহরূপ অন্ধকারময় কারাগার ভাঙ্গিয়া প্রাণপাখী উর্দ্ধের উদ্দেশে পক্ষপুট বিস্তার কচ্ছে। কি উদার মুক্ত বায়ু! কত শতাব্দীর, হয় ত কত জন্মের হৃদয়ের ব্যথার চাপগুলি ভাঙ্গিয়া, চূর্ণ হইয়া, শিহরিয়া, হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, গগনমণ্ডলে বিকীর্ণ হইতেছে।'

এবংবিধ উচ্ছ্বাস-দর্শনে আমরা চট্ করিয়া অন্য একটি ঘরে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। ইতিমধ্যে গোল উঠিয়া গেল,—'বরযাত্রিগণের মধ্যে এক জনের কলেরা হইয়াছে।' ক্রমে কন্যাযাত্রিগণ এবং বরযাত্রিগণের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ বস্ত্রের পুঁটুলি ও ব্যাগ প্রভৃতি লইয়া রোমনগরীধ্বংস-কালীন নির্ব্বাসিতের ন্যায় গ্রামের মাঠ পার হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেল। কন্যাকর্ত্তার বাটীর কেহ আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট গৃহের দিকে আসিল না। নীরব, নিস্তব্ধ প্রান্তর। কেবল কবিবর ও জন কতক আমরা বসিয়া। অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জন ভৃত্য আসিয়া আমাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'অবস্থা কি রকম?' আমি ইঙ্গিতে অথচ ভয়কাতরস্বরে কহিলাম, 'এখন চতুর্দ্দশপদী চলিতেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ।' ভৃত্য এবং তৎপ্রমুখ ভৃত্যকুল তাহা শুনিয়া এক চম্পটে মাঠ পার হইয়া গেল।

জোয়াদ্দার মহাশয় 'আর্সেনিকে'র তৃতীয় ডোজ্ খাইয়া বলিলেন--

"সুদুর্গম দূর দেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ—
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা'পরে
জরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'—
চারি দিকে শৈলমালা"—

এমত সময় বাতায়ন-পার্শ্ব হইতে 'মা গো !' নামক ভীতি-শব্দ করিয়া একজন কে দৌড়াইয়া গেল।

খুঞ্চিরাম বলিলেন, 'বামাস্বর। বোধ হয়, কোনও স্ত্রীলোক দয়াপরবশা হইয়া রোগীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' পরে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছিল, ঠিক তাই। তিনি এক জন বৃদ্ধা ; নাম শৈলবালা।

ডাক্তার তখন হাস্যসহকারে কহিলেন, 'লাহিড়ী মহাশয়, এখন বেশ করিয়া ঘুমাও। তিনটি গৃহ শয্যাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, প্রহরিশূন্য। তামাক সাজিয়া ফেল। শেষ টান দেওয়া যাউক।'

বাস্তবিক জোয়াদ্দার মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গী ও 'ট্রাণসেন্‌ডেণ্টেল' ধরণের কবিতার আবৃত্তির গুণে এত সুফল প্রসব করিবে, তাহা পূর্ব্বে লেশমাত্র মনে স্থান পায় নাই। জোয়াদ্দার মহাশয় মুখব্যাদান করিয়া বলিলেন, 'দাদা, কবিতা বুঝিবার শক্তি এখনও বাঙ্গালীর হয় নাই! নচেৎ এই সুন্দর উচ্ছ্বাসটাকে তাহারা মরণ-ডাকের সামিল করিয়া লইল ! কি দুর্দ্দশা দেশের ! অহো কি পরিতাপ !'

জোয়াদ্দারের সঙ্গে আমিও সন্ধ্যাকালে একটু সিদ্ধি খাইয়াছিলাম। ক্রমে শেলী ও টেনিসনের নূতন কাব্যগুলির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্যগুলির সমালোচনায় বসিয়া গেলাম।

ডাক্তার বলিলেন, 'ক্লাসিক্যাল কাব্যের সহিত কমিউনিস্‌টিক কাব্যের একটু প্রভেদ আছে। সেকালের কবিতার জীবন সেকালেই ছিল, এখন কেবল তাহার বৃহৎ কঙ্কাল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। একালের কবিতার দেহ খর্ব্ব, কিন্তু ব্যাসিলির মত সজীব, তীব্র ও সূক্ষ্ম। এমন কি, লাগিয়া গেলে এক মিনিটে দেড় লক্ষাধিক অণু প্রসব করিতে পারে। সেকালে দময়ন্তী বনে গিয়াছিলেন ; তাহাতেই সকলে কাঁদিয়া আকুল ! একালে লক্ষ

লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরিলে চিন্তায় কেবল শোনিতকণা শুষ্ক হইয়া যায়। সেকালে একটা মাছি অন্নে বসিলে একটা মহাকাব্যের বিষয় হইয়া পড়িত; এখন ড্রেন হইতে কুরুক্ষেত্রের সৈন্যের ন্যায় অর্ব্বুদ মক্ষিকা অন্ন-ব্যঞ্জন ছাইয়া ফেলিলেও কৈফিয়ৎ দিবার লোক নাই।'

ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিলাম। যদিও ঠিক নিদ্রা হয় নাই, কিন্তু তাহার অভাব স্বপ্নে মিটিয়াছিল। স্বপ্নটা সুখস্বপ্ন। লুচি ও ক্ষীরের স্বপ্ন। দেখিলাম,—সেই উপাদেয় আহার্য্য প্রত্যেক দৈহিক পরমাণুর জন্য ব্যয়িত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই ঘৃতপক্ক লুচি ও পবিত্র ক্ষীর পাকস্থলীতে অভিনব আকার ধারণ করিল। ক্রমে রক্তকণায় পরিণত হইল। সেই রক্তকণা শিরায় শিরায় সঞ্চালিত হইয়া আনন্দময়ী মাতার স্তন্য দুগ্ধের ন্যায় প্রত্যেক ক্ষুধিত শীর্ণ সন্তানকে বলীয়ান করিয়া তুলিল। প্রত্যেক কণা আনন্দ-নৃত্যে মত্ত! আমি তখন কে? দুর্ভাবনাশূন্য বৃদ্ধ জনকের ন্যায় নিদ্রার দ্বারে। অন্তর্জগতের সেই বিশাল আনন্দকোলাহল বীণাধ্বনির ন্যায় আমার নিভৃত গৃহাভ্যন্তরে সঞ্চারিত। মুহূর্ত্তের জন্য আমি জরামরণ-বর্জ্জিত মুক্তাত্মা।

বহরমপুরের মোলায়েম বালাপোষখানা আস্তে ব্যস্তে টানিয়া লইয়া মুড়ি দিয়া পড়িলাম।

বেলা আটটার সময় নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম,—কন্যাপক্ষীয়গণ মহাব্যস্ত! 'সেই রোগীটি কেমন আছেন?' ডাক্তার কহিলেন, 'হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অদ্ভুত ব্যাপার। বিংশ শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্রের কাটাকাটির জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে এমত শান্তিকর পদার্থ আর নাই। মরিয়া গেলেও কোনও ভয় নাই। নির্ব্বিঘ্নে মরণ সকলের কপালে ঘটা ভবিষ্যতে দুষ্কর হইয়া পড়িবে; অতএব এই বেলা হইতে আপনারা সকলে একটা বাক্স কিনিয়া রাখুন।'

বাস্তবিক, জোয়াদ্দার মহাশয়ের আরোগ্যলাভে উভয় পক্ষের কুটুম্বিতা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও কেমন যেন একটা মায়া আমাদিগকে সেই বিবাহ-রাত্রির স্মৃতির সহিত আজীবন বদ্ধ করিয়াছিল। ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম, ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রময়ী চতুর্ব্বেদ সংহিতা; দ্বিতীয়, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস পুরাণ; তৃতীয়, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বা মন্ত্র স্বভাবকবি ঋষির সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধিমূলক; তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য অলঙ্কার-শাস্ত্ররূপ বিজ্ঞানানুসারে কল্পনাবলে সৃষ্ট; ইতিহাস পুরাণে দৃষ্ট মন্ত্র ও সৃষ্ট কাব্য, এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান-সম্মত রচনা, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রচনা-রীতির সুখকর সমন্বয়ের ফল। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য-মণিমালায় ভাষা-জননীর মুকুট মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন; হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র জননীর কমনীয় কণ্ঠ খণ্ডকবিতার মুক্তাহারে সাজাইয়াছেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের যাহা আকারে মহাকাব্য, তাহা খণ্ডকবিতারই সমষ্টি। যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন এই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের কাব্যকলাপ রসজ্ঞের চিত্ত-রঞ্জনে ও শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিকাশ-সাধনে সহায়তা করিবে। রবীন্দ্র-নাথের গীতকাব্য এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহার অধিকাংশই মন্ত্র-সাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্র-সংহিতা। অন্য কোনও শ্রেণীর কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার তুলনা করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ ঋষি, তাঁহার গীতিকাব্য আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারের মন্ত্র।

প্রাচীন ঋষির দৃষ্ট মন্ত্র অতি মহান্। কালের সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান সেই মহিমাকে অলৌকিক ও অপৌরুষেয় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন মন্ত্রসাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের তুলনায় অনেকে শিহরিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু অলৌকিকতা বা অপৌরুষেয়তা সাহিত্যের ইতিহাসের বিচার্য্য বিষয় হইতে পারে না, লৌকিক রচনা হিসাবেই সাহি-ত্যের ইতিহাসে মন্ত্রের স্থান। যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবর্জ্জিত, তাহা মন্ত্র; যে গীতে শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্য, তাহা কাব্যমাত্র। ঋষি সম্বন্ধে আর একটি ধারণা,—ঋষি সংসারী নহেন, সন্ন্যাসী। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, সন্ন্যাস-প্রথার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঋষির অভাব হইয়াছিল। যথা ধর্ম্মসূত্রে আপস্তম্ব (১।২।৫।৪—৬)—

জননী।

চিত্রকর – সার জশুয়া রেণল্ড।

Mohila Press, Calcutta.

"তস্মাদৃষয়োঽবরেষু ন জায়ন্তে নিয়মাতিক্রমাৎ। শ্রুতর্ষয়স্তু ভবন্তি কেচিৎ কর্ম্মফলশেষেণ পুনঃসম্ভবে। যথা শ্বেতকেতুঃ।"

"(ব্রহ্মচর্য্যের) নিয়ম প্রতিপালিত হয় না বলিয়া আধুনিক কালের লোকের মধ্যে [অবরেষু] ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন না। কেহ কেহ পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে সহজে বেদ আয়ত্ত করিয়া (শ্রুতর্ষি হইয়া) থাকেন। যথা শ্বেতকেতু।"

এই শ্বেতকেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের প্রথম শ্রোতা, উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু। উদ্দালক আরুণি বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এক জন প্রসিদ্ধ"ব্রহ্মবাদী"বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং আপস্তম্বের মতে ব্রাহ্মণ-ভাগের বা উপনিষদের রচনাকালে যাঁহারা বেদমন্ত্রের বা যজ্ঞকর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যায় এবং ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা ঋষি নহেন, অবর বা আধুনিক কালের লোকের অন্তর্ভূত। যাস্কের নিরুক্তেও প্রকারান্তরে সেই কথা।—যথা, "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবু স্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ ———।" অর্থাৎ ঋষিরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসাক্ষাৎকারে অসমর্থ অবর বা আধুনিক কালের লোকদিগকে উপদেশের দ্বারা মন্ত্রনিচয় শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ-আরণ্যকের বিচার-বিতর্কের সূচনার পূর্ব্বে ঋষির যুগ। ঋষির অবলম্বন যুক্তি তর্ক নহে, দৃষ্টি ; ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষির চিত্র ঋঙ্‌মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। ঋষি বিরাগী নহেন, ঘোর সংসারী ; দানস্তুতি গান করিয়া দক্ষিণা সংগ্রহে সুনিপুণ। সুদাসের মত দানশীল ও পরাক্রান্ত যজমানের জন্য বশিষ্ঠের ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় বিগ্রহ করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু ঋষির গুণ,—তিনি "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম"। অবর বা পরবর্ত্তী কালের লোকেরা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করেন, এবং মন্ত্রগান করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষানুভূতির পূর্ব্বাস্বাদ প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে যাহা মন্ত্র, তাহাতে আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের যে আলেখ্যের সন্ধান লাভ করি, তাহার দিকে চাহিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহা শোনা বা শেখা কথার প্রতিধ্বনিমাত্র নহে, ইহা দেখা কথা, গানে গাথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ জয়দেবের একটি প্রসিদ্ধ গান স্মরণ করিব—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ
কলিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন এ
মুনিজনমানসহংস জয় জয় দেব হরে।" ইত্যাদি

"গীতাঞ্জলি"তে রবীন্দ্রনাথের—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস গন্ধে বরণে এস গানে।
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে
এস চিত্তে সুধাময় হরষে,
এস মুগ্ধ মুদিত দু নয়নে।"

এই দুইটি "মঙ্গলসমুজ্জ্বল গীতি" গান, শ্রবণ, বা অধ্যয়ন করিতে করিতে কবি, কাব্য ও গায়ক (পাঠক বা শ্রোতা) এই তিনের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন মনে হয়,—"গীতগোবিন্দ"কার বা "গীতাঞ্জলি"কার যেন আমারই প্রাণের গান লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; যেন এই গীত আমারই রচনা। এই দুইটি গীতিই গীতিকাব্যের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। কিন্তু দুয়ের প্রভেদও বিস্তর। জয়দেবের গীত পৌরাণিক কথা লইয়া সৃষ্ট; রবীন্দ্রনাথের গীত যেন সাক্ষাৎদৃষ্ট। এ যুগে উপনিষদ, গীতা, দর্শন, বিবিধ বিচিত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাবের মধ্যে ঋষি-শ্রেণীর কবির অভ্যুদয় একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই অভাবনীয় ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার কাব্যরহস্য বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার শিক্ষাকাহিনী আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথ "জীবন-স্মৃতি" নামক গদ্যকাব্যে তাঁহার শিক্ষার ও কবিত্বশক্তির ক্রমবিকাশ-কাহিনী বিবৃত করিয়া স্বকীয় কাব্য-গ্রন্থাবলীর উৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে, নবভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা সহরের একটি সমৃদ্ধ ও সমুন্নত পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। নর্ম্মাল স্কুলে তাঁহার শিক্ষার সূত্রপাত। কিন্তু নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষক, বা ছাত্র—কেহই বালক রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তথায় ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছিল, এবং বাড়ীতে পাঠ্য ছাড়াইয়া কিছু বেশী পড়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে লাভ হইয়াছিল কি? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সে সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার ত মনে হয় নষ্ট হওয়ার

চেয়ে বেশি; কারণ কিছু না করিয়া যে সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে সময় নষ্ট করা যায় (৪০ পৃঃ)।" ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের নীচের ক্লাস পর্য্যন্ত রীতিমত পড়া যে একেবারে বৃথা হইতে পারে, এ কথা আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষাকে স্বীয় প্রতিভার বিকাশের দিক দিয়া দেখিয়াছেন। সেই হিসাবে স্কুল কালেজের শিক্ষা যে বিফল, এ কথা বলাই বাহুল্য। নর্ম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া বেঙ্গল একাডেমি নামক ফিরিঙ্গি স্কুলে প্রবেশ। এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই বিদ্যালয়ে আমার মত ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখা পড়া করিয়া উন্নতি লাভ করিব সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে ছিল না (৪৩ পৃঃ)।" অবশেষে "নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে সুরু করিলাম। সেণ্টজেভিয়ার্সে আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেখানেও কোনো ফল হইল না (৭৬ পৃঃ)।" অগত্যা ঘরে পড়ার ব্যবস্থা। সেও ঠিক পড়া নয়, কথা-শ্রবণ; শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, ম্যাকবেথের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-শ্রবণ। সতর বৎসর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথকে বিলাত লইয়া যাওয়া হইল। ব্রাইটনের পাব্‌লিক স্কুলে, লণ্ডনে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট, এবং শেষে লণ্ডন ইউনিভার্সিটীতে শিক্ষার উদ্যোগ করা হইল, কিন্তু কোনখানেই উদ্যোগ পর্ব্বের অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। ইউনিভার্সিটী ডিগ্রীর পরিবর্ত্তে রবীন্দ্রনাথ "ভগ্নহৃদয়" পত্তন করিয়া দেশে ফিরিলেন। যদি তিনি সেণ্টজেভিয়ার্সে ফাদার দাঁফোর ক্লাস পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিতেন, বা লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিতেন, তবে রবীন্দ্রনাথ মন্ত্র দেখিতে পাইতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যাঁহারা বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাপে তাঁহার প্রতিভা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত, তাঁহাদের কথা আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার অনুমান হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মানব-সমাজের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, ভারতের গেটে হইতে পারিতেন; কিন্তু ঋষিত্ব বিকাশ লাভ করিবার অবসর পাইত বলিয়া বোধ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত শিক্ষা—মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্প্রসারণ, রবীন্দ্রনাথের আত্মচেষ্টার ফলে অথবা আপনা-আপনি স্বভাবের শাসনে, সম্পাদিত হইয়া-

ছিল। প্রাচীন কালের ঋষিবালকের ন্যায় উপনয়ন সংস্কারেই এই নবীন ঋষির শিক্ষার সূত্রপাত। যথা—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন (৫২ পৃঃ)।"

বৈদিক সাহিত্যও যে প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের মনটাকে প্রসারিত করিবার অবসর পাইয়াছিল, লৌকিক সাহিত্যও সেই ভাবেই তাঁহার আত্মশিক্ষার সাহচর্য্য করিয়াছিল। যথা—

"আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপর একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দাবেশপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলে বেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছু জানিতাম না, তখন প্রচুর ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝি নাই—নিতান্ত আবছায়ার মত মনের মধ্যে কী একটা তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবি গুলা গাঁথিয়াছিলাম,—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া তত বড় শূন্য হয় নাই।

"এক বার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্টউইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মত এক লাইনের সহিত আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।......জয়দেব

সম্পূর্ণত বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীত-গোবিন্দ একখানা খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।

আর একটু বড় বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ।

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনী-নির্ঝর-শীকর" এবং "কম্পিত-দেবদারু" এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূর-পুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম (৫২—৫৪ পৃঃ)।"

পুরাপুরি বুঝিয়া পুস্তক পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় নাই।—"আমরা ছেলেবেলায় এক ধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না,—দুই-ই আমাদের মনের উপর কায করিয়া যাইত" (৮০ পৃঃ)। "বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্প স্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ এক রকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভাল মন্দ দুই প্রকার ফলই আমি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি (১১১ পৃঃ)।" ভাষ্য, টীকা অভিধানের সাহায্যে পুস্তক ভাল করিয়া পড়ার যতই গুণ থাকুক, তাহা মনকে বহির্মুখ করে। রবীন্দ্র-নাথের সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। "জ্যোতিদাদা" রবীন্দ্রনাথের আত্মশিক্ষারীতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "তিনি আমাকে খুব একটা বড় রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল।......যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি

লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে (৯১—৯২ পৃঃ)।" রবীন্দ্রনাথের বই পড়া ঠিক পড়া নহে, আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইবার ছুতা মাত্র। ইহা ছাড়া অন্যরূপ পড়া পড়া দিবার জন্য পড়া, বা পরীক্ষা দিবার জন্য পড়া—তাঁহার আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া পাইবার পথে অন্তরায় হইত, তাই স্কুলের শিক্ষা তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইয়াছিল।

পড়াশুনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আপন শক্তি-বিকাশের আর এক সহায়,—অত্যন্ত প্রবল সহায়—ছিল কবিতা-রচনা। লেখা পড়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই একরূপ তাঁহার কবিতা লেখা সুরু। প্রয়োজন এবং প্রাণের টান এই দুইই তাঁহাকে সেই পথে লইয়া গিয়াছিল। স্কুল ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ "আত্মসম্মানলাভে"র এই একমাত্র পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। "তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না (৯৫ পৃঃ)।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের রচনার অস্পষ্টতা জীবন-স্মৃতিতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। "জীবন-স্মৃতি"তে "কড়ি ও কোমলে"র প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা ও বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই; এ দিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যালোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে। সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে (১৯৪ পৃঃ)।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোকে যাহা "মাটিতে ফসল", তাঁহার কাব্যের যাহা প্রাণবস্তু, তাহা "মাটিতে ফসল" হইলেও মাটির ফসল নহে, ছন্দোবদ্ধ কথার কথামাত্র নহে, তাহা দৃষ্ট মন্ত্রের প্রত্যক্ষ দেবতা। বিশ্বসাহিত্যের প্রথম মন্ত্র-সংহিতা ঋগ্বেদের সূক্তমালা। এই সূক্তমালার দেবতা তথাকথিত ৩৩টি বৈদিক দেবতা। কিন্তু বেদমন্ত্রের দেবতা, পুরাণতন্ত্রের দেবতা, বা

দর্শনের পরমাত্মা পরমপুরুষের মত সাধনার সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্য নহে, প্রত্যক্ষ দেবতা। পুরাণ তন্ত্রের দেবতা তোমার আমার কাছে কাব্য বা চিত্রমাত্র, এবং দর্শনের দেবতা বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত বা মতবাদ। কিন্তু বেদমন্ত্রের ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, মিত্র সেরূপ চিত্র বা সিদ্ধান্তমাত্র নয়,—ভাষায় স্বচ্ছ—অনেক সময় অতি স্বচ্ছ—আবরণে আবৃত ভূলোক দ্যুলোকে প্রকৃতির মঙ্গলময় লীলা-খেলা। ঋষির সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য, পুরুষ-সূক্তের সেই পুরুষ নারায়ণও প্রত্যক্ষ বিষয়, সীমার মধ্যে অসীমের—বহুর মধ্যে একের অনুভব। যথা—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবঃ॥

যাহার একচতুর্থাংশ জীবজগৎ, এবং অপর তিনচতুর্থাংশ অমৃতময় আকাশের অসীমতা, সেই সীমার ও অসীমের মিলনক্ষেত্র নর-নারায়ণই রবীন্দ্রনাথের সকল মন্ত্রের দেবতা। পূর্ব্বোদ্ধৃত "কবির প্রতি নিবেদন" নামক কবিতায় সাহিত্যসমাজরূপ "কোলাহলমরু" হইতে নেত্র সরাইয়া আর এক দিকে চাহিয়া ঋষি গাহিয়াছেন—

"দেখ, হোথা নদী পর্ব্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।"

তার পর উপসংহারে "অসীম বিরাম নিকেতনে"র পানে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া দেখিয়াছেন—

"হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎ-ময়
ওইখানে মিলিয়াছ নর নারায়ণ।"

রবীন্দ্রনাথ "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিয়াছেন, "আমার ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা (১৭১ পৃ)।" ইহার অপেক্ষা মহান্ পালার উদ্ভাবন অসম্ভব। মনুষ্যের চিত্তে তিনটি মহা-

রহস্য অবিরত ঘা দিতেছে—আকাশ-রহস্য, কাল-রহস্য, এবং জীবন-মরণ-রহস্য। অসীমতার গাঢ় অন্ধকারময় বেষ্টন সসীম দেশ, সসীম কাল, সসীম জীবনকে দুর্ভেদ্যরহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের সাহিত্য, মনুষ্যের দর্শন, মনুষ্যের বিজ্ঞান,মনুষ্যের শিল্প এই রহস্যোদ্‌ঘাটনেরই বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টামাত্র। কিন্তু এই সভ্যতার যুগে জীবনের দুর্ব্বহ ভার অধিকাংশ মনুষ্যেরই চিত্তকে এমন কঠিন করিয়া তুলিতেছে যে, বিশ্বব্যাপী রহস্যের ঘা আর তাহাকে স্পন্দিত করিতে পারিতেছে না। যাহাদের চিত্ত এইরূপ নিঃস্পন্দ, তাহারা জীবন্মৃত। আর যাহার চিত্তে রহস্য-বোধ জাগ্রত, রহস্যোদ্‌ঘাটনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহার জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত, সে জীবন্মুক্ত। ধর্ম্মপ্রচারক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, ঋষি, শিল্পী, ইহাঁরা সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে জীবন্মুক্তির পথের সহায়; জীবন্মুক্তির সহায়তাতেই ইহাঁদের জীবনব্রতের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের গীত "পালা" বিংশ শতাব্দের ভীষণ জীবনযুদ্ধে আহত পীড়িত সংশয়াচ্ছন্ন নরনারীর জীবন-ব্যাধির অমৃতোপম ঔষধ, জীবন্মুক্তির পথের মঙ্গলোজ্জ্বল আলো।

যে নব মন্ত্র-সংহিতায় রবীন্দ্রনাথের এই পালা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ঋক্, সাম, অথর্ব্ব, অথবা শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতার মত কেবল মন্ত্রময়ী নহে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মত ব্রাহ্মণভাগ-সমন্বিত। ব্রহ্মসঙ্গীত-শ্রেণীর অধিকাংশ সঙ্গীত ও অনেক গীতি-কবিতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টা মন্ত্র; এবং বিধি ও অর্থ-বাদপূর্ণ আর আর রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রোক্ত ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজসংস্কারক, রাষ্ট্রনীতি-সংস্কারক, শিক্ষানীতি-সংস্কারক, এবং স্বদেশীর এক জন প্রধান পথপ্রদর্শক। সুতরাং তাঁহার রচনায় বিধিনিষেধের বাহুল্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে দিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ রচনা-রাজ্যের রাজা, অধিকাংশ মাসিকপত্রের মুক্তহস্ত প্রতিপালক। অতএব "অর্থবাদ" বা সমালোচনা এবং ব্যাখ্যান-শ্রেণীর অনেক পদ্যগদ্য তাঁহার লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগে আর আর যাহা থাকে—ইতিহাস পুরাণ, নারাসংসীগাথা জীবনচরিত) প্রভৃতি—তাহারও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার রচনার, বা সকল কাব্যের সমালোচনার সময়, সামগ্রী, বা সামর্থ্য আমার নাই। অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রধান দোষ অস্পষ্টতা। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্ট, যথা "গান", "নৈবেদ্য", "গীতাঞ্জলি", তাহাও কি

অস্পষ্ট ? রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচিত অনেক কবিতাও যে আমাদের কাছে অস্পষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিবিষ্ট ভাবে অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, এ অস্পষ্টতা ক্রমশ উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর, হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অস্পষ্টতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ দুইটি কবিতা আলোচনা করিব। আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক ৺মোহিতচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "সোণার তরী"র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে ? 'হৃদয়-যমুনা'য় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে ? এ সব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি" প্রথমোক্ত "সোনার সতী" কবিতা লইয়া মহারথগণের মধ্যে একবার একটা দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। "সুদূর পশ্চিম ছাড়িয়া গান্ধার"—সিরাজের সেখসাদীর নিকট হইতে হাতিয়ার আনিয়া এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, নিষ্কাম ধর্ম্ম—ত প্রয়োগ করা হইয়াছেই। পুঁথিগত বিষয় বা দোষানুসন্ধিৎসা ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,—অসীমের সীমায় পহুঁছিবার জন্য যে তাঁহার গভীর সাধন, সেই হিসাবে দেখিলে—মনে হয়, "সোনার তরী"র কবিতার উদ্দেশ্য ভ্রমজনিত বেদনা-প্রকাশ। গোড়াতেই কৃষকের ভ্রমের কথা ; সে কূলে একা, ছোট ক্ষেতে ধান কেটে মনে করেছে, "রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা", অর্থাৎ সীমার গণ্ডির ভিতর থাকিয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায গুলিকে বড় মনে ক'রে বসে আছে। এমন সময় "তরী বেয়ে" অর্থাৎ একটু আস্তে, "যেন মনে হয় চিনি," কিন্তু ঠিক সনাক্ত করিতে পারিতেছি না,—এই ভাবে মনোমধ্যে অসীমের জ্ঞানের প্রবেশ, এবং অমনি "ভরা পালে" দ্রুত পলায়নের উদ্যোগ। তখন নেয়েকে ডাকিয়া ফিরাইয়া সাহঙ্কারে "এতকাল নদীকূলে যাহা লয়েছিনু ভুলে" তাহা প্রদর্শন। সোনার তরীর নেয়ে সেই সমস্ত লইয়া গেল, অর্থাৎ তাহা লইয়া কৃষকের যে গর্ব্ব তাহা তিরোহিত করিয়া দিল। কিন্তু কৃষক নিজে যখন সেই তরীতে উঠিতে চাহিল, তখন তাহার হৃদয়ে তীব্র বেদনা দিয়া সোনার তরী লইয়া নেয়ে অন্তর্হিত হইল। "সোনার তরী" রবীন্দ্রনাথের সাধন-তরী এবং তাহার নেয়ে অসীমতার অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞান। কৃষকের অপরাধ হইয়াছিল, সে "সোনার তরী" দেখিবামাত্রই নেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া ছোট ক্ষেতের তুচ্ছ ফসল দেখাইয়া বলিয়াছিল, "যত চাও তত লও তরণী পরে।" এই গর্ব্বোক্তি না করিয়া যদি বলিত আগেই "আমারে লহ করুণা করে", তবে শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকিয়া কাঁদিতে

হইত না। রবীন্দ্রনাথ কেবল এই কবিতায়ই যে তাঁহার সাধনাকে সোণার তরীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এমন নহে। "সোণার তরী" নামক নিবন্ধের শেষ কবিতা "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" ও সেই একই কথা—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?
* * *
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি',
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলিছে কিসের
অন্বেষণে?"

"গীতাঞ্জলি"তে সোনার তরীর যাত্রীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে বিহিত হইয়াছে। যথা—

"ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে!
* * *
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে,
তাই যে তোর বারে বারে
ফির্‌তে হল, গেলি ভুলে।
ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার ভেসে যাক্,
জীবন খানি উজাড় করে
স'পে দে তার চরণ-মূলে।"

"হৃদয়-যমুনা"য় কবি বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন। প্রথমতঃ হৃদয়কে দুই তীরে সীমাবদ্ধ যমুনারূপে কল্পনা করিয়া তাহার ভাব-রস যাহারা উপভোগ করিতে চাহেন তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। শেষ অংশে ঋষি কম্পিতহৃদয় যমুনাকে অসীম বিশ্বহৃদয়ে লীন দেখিয়া যাঁহারা "মরণ" বা জীবন্মুক্তি কামনা করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পড়িয়াছেন—

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।

স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর,
নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর
স্থির বিরাজে।

যাও সব যাও ভুলে,
নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে
সকল কাজে।"

এই কবিতায় ভোগীর যমুনার পার্শ্বে যোগীর অতল অকূল সাগরের চিত্রে কবির সৃষ্টি-কৌশল এবং ঋষির দৃষ্টির ফল অতি মধুর ভাবে মিলিত করা হইয়াছে। "মানসীর উপহার" নামক কবিতায় কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া রাখিয়াছেন—

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমে সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী প্রতিমা।"

আবার অসীমের সীমা প্রত্যক্ষ করিয়া গীতাঞ্জলিতে ঋষি গাহিয়াছেন—

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ,
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।"

অরূপের রূপের সুমধুর লীলা দেখা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রহস্য।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এ কেমন দেখা? একি শুধু কথার কথা, না আর কিছু? রবীন্দ্রনাথ বিলাসী জমীদার, সদ্গুরুর উপদেশ মতে যথারীতি সাধন ভজন

করেন নাই,—তাঁহার দেখা কথার কথা বই আবার কি? তোমরা যাহাকে সাধন ভজন বল, তাহা করিলেই যে অরূপের রূপ দেখা যায় বা কেহ কখন তাহার আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ মাসিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা সম্ভব কি? যে অরূপের রূপ দেখিয়াছে তাহার কথা ভিন্ন সেই দেখার আর কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ হাজির করিতে পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে জগতে ধর্ম্মভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ মোটেই উৎপন্ন হইত না।

"তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে।"

তোমার মর্ম্ম যদি রবীন্দ্রনাথের কথা সত্য বলিয়া মানিতে না চায় তাহা বল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সাধন ভজনের তর্ক উত্থাপন করার সার্থকতা কি? তোমরা যাঁহাকে সাধন বল, রবীন্দ্রনাথ তোমাদিগকে জানাইয়া শুনাইয়া সেই সাধন করেন নাই. সুধু এই অছিলায় তাঁহার বাণীকে মিথ্যা বলিলে পাদ্রিসাহেবসুলভ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করা হয় মাত্র,—সেটা কাব্যসমালোচনা হয় না। আমার মনে হয়. রবীন্দ্রনাথের কোন একটি মন্ত্র একমনে গাহিয়া বা শুনিয়া যে বলিতে পারে ইহা সুধু কথার কথা, এমন লোক অতি দুর্লভ। যদি এমন লোক থাকে তবে বলিতে হইবে, তাহার হৃদয়-বীণার তারগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

হৃদয়ে সংশয়, বাহিরে বঞ্চনা আমাদের ইহ-পরকাল অন্ধকারময় করিয়া তুলিতেছে। দেশে কলরব উঠিয়াছে, "দেশের লোক না খেয়ে মল, দেশের অন্ন সংস্থান কর. দেশের ধনবৃদ্ধি কর।" কত শত ব্যাঙ্ক. কত শত কোম্পানী মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, আবার অমনি লিকুইডেসন-লীলা সম্বরণ করিতেছে। দেশের দুঃখদৈন্যের কারণ দারিদ্র্য নয়, যাঁহাদের ধন আছে বা হুজুকে যাঁহাদের ধনার্জ্জনের সুযোগ ঘটিতেছে তাঁহাদের হৃদয়ের দারিদ্র্য। যে ধনে এই দারিদ্র্য ঘুচিবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সেই ধনের অলঙ্কার-ভাণ্ডার। ধন্য ঋষি-

তোমার রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে।"

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

ডিক্রি জারী।

১

আড়াই বৎসর দুই আদালতের মামলা চালাইয়া মাধবদত্ত যে দিন হরিহর-পুরের বামাচরণ ঘোষের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইল, সে দিন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। বুড়া বামাচরণ তাহাকে কি নাকালই না করিয়াছে। মহাজনের দেনা শোধ করিতে না পারিয়া বিপন্ন বামাচরণ তাহার পিতার নিকট হইতে খত লিখিয়া দিয়া হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। সেই টাকা কিনা এখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা! যদি তাহার পিতা সেই বিপদের সময় বামাচরণ ঘোষকে টাকা দিয়া সাহায্য না করিতেন, বুড়া কি তখন দেউলিয়া হইয়া যাইত না? সেই উপকারের পুরস্কার কি আড়াই বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা? বুড়া হাড়ে যে এত ভেল্‌কী খেলিতে পারে, তরুণ যুবা মাধবের কল্পনায় পূর্ব্বে তাহা আসে নাই। সে সরলবিশ্বাসে ভাবিয়াছিল, বামাচরণ ঘোষ নিশ্চয়ই যথাসময়ে ন্যায়সঙ্গত দেনা শোধ করিবে। এজন্য পিতার মৃত্যুর পর, তিন বৎসর সে আদৌ টাকার তাগাদা করে নাই। তার পর তামাদির মুখে সে যখন টাকা চাহিল, বুড়া কিনা অম্লানবদনে বলিল, সে কখনও কোন টাকা কর্জ্জ লয় নাই। যদি বা কখনও লইয়া থাকে, বহুদিন পূর্ব্বে তাহার পিতার জীবদ্দশায় তাহা শোধ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত টাকার কথা সে কিছুই জানে না। আপোষে টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মাধবদত্তকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বুড়া যে বিলক্ষণ মামলাবাজ মাধব তখন বুঝিতে পারিল। প্রকৃত পাওনা সত্ত্বেও প্রথম আদালতের বিচারে মাধবদত্ত মোকদ্দমা হারিয়া গেল। দশজন গ্রামবাসীর সাক্ষাতে আদালতের প্রাঙ্গণে সে দিন বুড়া তাহার নাবালকত্বের উল্লেখ করিয়া যে মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার আঘাতের বেদনা মাধবদত্ত জীবনে কখনও কি বিস্মৃত হইতে পারিবে? অপমানে ঘৃণায় নতমস্তকে রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় সে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেই দিন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ডিক্রীজারী দিয়া বুড়ার স্থাবর অস্থাবর মাল ক্রোক করিবে, বুড়ার চোখের জল দেখিবে, তবেই সে বনমালী দত্তের ছেলে। এই তীব্র অপমানের প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত

তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই। এর জন্য সর্ব্বস্ব পণ। কিন্তু দুই বৎসর লড়িয়াও সে শীঘ্র বুড়াকে কাবু করিতে পারিল না। উপরিতন আদালতে সে মোকদ্দমায় জয় লাভ করিল বটে; কিন্তু শীঘ্র ডিক্রী পাইল না। নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, আইনের বহুবিধ জটিল আপত্তি দায়ের করিয়া বামাচরণ পুনঃ পুনঃ মাধবদত্তকে হয়রাণ করিয়া ফেলিল। শীঘ্র ডিক্রীজারীর অবকাশ না পাইয়া প্রতিশোধ স্পৃহা মাধবকে দিন দিন আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!"

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবার মাধবের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে সদলবলে সদরে হাজির হইয়া মাধব জানিতে পারিল, বুড়া বামাচরণ পীড়িত, সুতরাং কূটবুদ্ধি বৃদ্ধ এবার স্বয়ং মোকদ্দমার তদ্বির করিতে আসে নাই। তাহার পুত্রও রুগ্ন পিতাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে নাই। মাধবদত্তের আনন্দের সীমা রহিল না। এবার প্রতিবাদী পক্ষ হইতে কোনরূপ আপত্তি না হওয়ায় বিনা বাধায় সে ডিক্রীজারীর আদেশ পাইল। কিন্তু মাধব তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বামাচরণ-ভীতি তাহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। সে ভাবিল, একেবারে পরোয়ানা সহ পেয়াদাকে সঙ্গে লইয়া সে দেশে ফিরিবে। কি জানি তাহার অসাক্ষাতে বুড়া যদি আবার কোনও কৌশলে ডিক্রীজারীতে বাধা জন্মায়! পথিমধ্যে কিছু দক্ষিণা দিয়া পেয়াদাকে যদি বশ করে!

অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এবং রীতিমত দক্ষিণা দিয়া মাধব ডিক্রীজারীর পরোয়াণা বাহির করাইল। এবার বুড়া বামাচরণ কোথায় যাইবে? তাহার টিট কারী ও বিদ্রূপের প্রতিশোধ মাধব এবার লইতে পারিবে না? দশজন গ্রামবাসীর সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে সে যখন বুড়ার অস্থাবর সম্পত্তি ঘরের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিবে, তখন লাঞ্ছনা এবং অপমানে শুক্লকেশ বৃদ্ধের মস্তক ভূমিস্পর্শ করিবে না? আঃ! সে কি আনন্দ! এতদিন পরে কি ভগবান সত্যই মাধবের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন?

উত্তেজনার আতিশয্যে সে রাত্রিতে মাধব ভালরূপ আহার করিতে পারিল না।

২

সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দুই দিন পূর্ব্বে প্রবল বারিপাত হইয়াছিল। আজ সকালেও রীতিমত এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মাধবদত্ত আদালতের পেয়াদা সহ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছিল।

মাধবের পিতার চাউল ও আটার বিস্তৃত কারবার ছিল। সে অঞ্চলে বনমালীদত্তের ন্যায় ধনী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক ছিল না। নদীর সন্নিকটে মাধবদত্তের আড়ত। গ্রামের মধ্যে তাহাদের বসতবাটী। মাধব পেয়াদাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। সে তাহাকে কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে নয়নের অন্তরাল করিবে না সংকল্প করিয়াছে।

পেয়াদার আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মাধব তাহাকে বলিয়া রাখিল যে, পর দিবস অতি প্রত্যূষেই যাত্রা করিতে হইবে। হরিহরপুর তিন ক্রোশ দূরে, সুতরাং উষাকালে যাত্রা না করিলে সময়ে তথায় পঁহুছিতে পারা যাইবে না।

ভাবী সাফল্যের উত্তেজনায় মাধবের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আহারাদি সারিয়া দ্বিতলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। ঘরে বড় গরম, বাতায়ন খুলিয়া দিয়া সে একখানি জমাখরচের খাতা বাহির করিল। ধনী ব্যবসাদারের আদরের দুলাল হইয়াও মাধব গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিলেও সে মোটামুটি লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিল। খাতাখানি বাঁধান এবং আয়তনে ক্ষুদ্র। মাধব এক স্থলে লিখিল,—"উদ্যোগপর্ব্ব আজ শেষ হইল। কাল অপমানের প্রতিশোধ লইব। পিতৃঋণ সুদে আসলে এই বার আদায় হইবে!" অদূরে পালঙ্কোপরি তাহার শিশুপুত্র এবং পত্নী নিদ্রিতা। মাধব একবার শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালে ঘড়ী অবিশ্রান্ত টিক্‌টিক্ শব্দে সময়ের নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়াছে। মাধব কি ভাবিয়া আবার বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই গুমট। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। গত রাত্রিতে মাধব ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। আজ সারা দিন সে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু তথাপি আজ তাহার কিছুমাত্র শ্রান্তি বা অবসাদ বোধ হইতেছে না।

বৃদ্ধ বামাচরণের মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছিল। সে যেন তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপভরে হাসিতেছে! দশের সম্মুখে তাহার পরাজয়ে বুড়া যে মর্ম্মান্তিক শ্লেষপূর্ণ কথা গুলি দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিল, আজ তাহার প্রত্যেক বর্ণ যেন মাধবের কর্ণে নূতন করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। মাধব কক্ষমধ্যে দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিল।

"দেখিব বুড়ার দর্প এখন কোথায় থাকে, কাল ইহার প্রতিশোধ!"

মৃদু বাতাসের স্পর্শ যেন ক্রমশঃ মাধব অনুভব করিল। জানালার কাছে আসিয়া দেখিল, গাছের পাতা ধীরে ধীরে নড়িতেছে, আকাশে মেঘমালা দ্রুত চলা ফেরা করিতেছিল। বারিবর্ষণ তখনও বন্ধ হয় নাই। সম্ভবতঃ রাত্রিশেষে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে পারে।

মাধব উদ্বিগ্নচিত্তে মেঘমণ্ডিত আকাশে চাহিয়া রহিল। যদি সকালে বর্ষণ না থামে তাহা হইলে?—নাঃ, আর কত বৃষ্টি হইবে? যদি বড় জোর ঘণ্টাখানেক হয়। কিন্তু মাধব নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, মুহূর্ত্তে আকাশের এ দুর্য্যোগচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলে! এমন কোন মন্ত্র যদি তাহার জানা থাকিত যে, আবৃত্তি মাত্র ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড স্পৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মেঘমালা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়!

ঘড়িতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। চমকিত ভাবে মাধব বাতায়ন-সন্নিধান পরিত্যাগ করিল। এতরাত্রি হইয়াছে? আর নয়, এখন শয়ন করা উচিত। এক গ্লাস জল পান করিয়া সে হস্তপদ ভালরূপে প্রক্ষালন করিল। তারপর চিন্তিত হৃদয়ে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু শ্রান্তিহারিণী সুষুপ্তির কোমল স্পর্শ অবিলম্বে মাধবের চিন্তক্লিষ্ট দেহের চেতনা হরণ করিয়া লইলেন।

৩

সহসা তীব্র আর্ত্তনাদ এবং ভীষণ কোলাহলে মাধবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পত্নীও ভীতচিত্তে উঠিয়া বসিলেন। খোলা জানালা দিয়া উষার প্রথম আলোক-রেখা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কোথা হইতে কোলাহলের শব্দ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া মাধব তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। বাড়ীর ভৃত্যবর্গ এবং অন্যান্য লোকও গোলমাল শুনিয়া তাহার ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। মাধব কোলাহলের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বহির্ব্বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল অনেক গুলি নরনারী প্রাণপণ বেগে তাহারই বাড়ীর দিকে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। মাধব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল।

অগ্রগামী ব্যক্তি মাধবকে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল, "বাঁচাও, দত্ত মশায়! সব গেল, সব গেল!"

তখন সকলে গণ্ডগোল করিয়া উঠিল। মাধব তাহাদের অসংলগ্ন কথা-বার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিল, দামোদারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার প্রবল জলস্রোত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরবাড়ী জলের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

কি সর্ব্বনাশ! বাঁধের কাছেই যে মাধবের আড়ত! সে দৌড়িয়া রাজ-পথে উঠিল। বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "যাবেন না। যাবেন না! বানের জল এদিকেও ছুটিয়া আসিতেছে।" মাধব কাহারও নিষেধ শুনিল না। সে দৌড়িয়া চলিল। কিন্তু অধিকদূর যাইতে হইলনা। এক পোয়া পথ অগ্রসর হইবার পর সে দেখিল, অদূরে জলস্রোত বহিতেছে, রাজপথ, গ্রাম ভাসাইয়া তাহার অভিমুখে বন্যার জল ছুটিয়া আসিতেছে। তখন প্রাণপণ বেগে মাধব ফিরিল। পথে আরও কতিপয় পলাতকের সহিত দেখা হইল। মাবধদত্তের অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান মনে করিয়া অনেকেই তথায় আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। মাধব বাড়ীর বারান্দায় উঠিয়া দেখিল, তাহার আড়তের কয়েকটি কর্ম্মচারীও তথায় আসিতেছে। তাহাদের নিকট মাধব যাহা শুনিল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিল, এত ক্ষণ আড়ত খানি বন্যার জলে ভাসিয়া না গেলেও দ্রব্যাদি সমস্তই যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সর্ব্বনাশ! মাধবের লক্ষ টাকার মাল যে আড়তে মজুদ ছিল! কিন্তু সে কথা ভাবিয়া কাঁদিবার অবসর কোথায়? মৃত্যু প্রবাহ যে সম্মুখে গর্জ্জিয়া আসিতেছে।

মাধবের অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীর উপর অবস্থিত। রাজপথ হইতে ভূমির উচ্চতা অন্যূন দুই ফুট। জমী হইতে পোতার উচ্চতা সাড়ে চারি ফুট। তাহার উপর দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত। আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা অধিক বলিয়া, আশ্রিত প্রতিপালক মাধবের পিতা খুব বড় বাড়ী তৈয়ার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই এত বড় অট্টালিকার নিম্নতল আশ্রয়হীন সর্ব্বস্ব-ভ্রষ্ট গ্রামবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে মাধবের অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বও প্লাবিত হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ বন্যার প্রবাহ বৃক্ষ, পর্ণকুটীর উপাড়িয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সমবেত পল্লীবাসী আতঙ্কবিমূঢ় চিত্তে দেখিল তাহাদের সর্ব্বস্ব দামোদর গ্রাস করি-তেছে!

মাধবদত্ত তখন এত গুলি প্রাণীর আহারের বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন

অনুভব করিল। তাহার লক্ষ টাকার মাল দামোদর গ্রাস করিয়াছে বটে ; কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে বাড়ীতে যে আহার্য্য মজুত আছে তাহাতে কি সে এত গুলি অতিথির সেবা করিতে পারিবেন না।

চারি দিকে ধ্বংস ও মৃত্যুর ভৈরবী লীলা ! হৃতসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় নরনারীর আকুল ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাস শুনিতে শুনিতে মাধব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহারও সর্ব্বস্ব ত দামোদর হরণ করিয়াছে ! মাধব সীমাহীন জলবিস্তারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছিল ? নিরাশ্রয় অতিথিদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া সে একতলের ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আজ কি নির্ম্মল ! প্রকৃতির বক্ষে কি সহস্র কাতর কণ্ঠের বেদনাপ্লুত শোকগাথা বাজিতেছে ? মাধব কি একমনে সেই কথাই চিন্তা করিতেছিল ?

সহসা সে নীচে নামিয়া গেল। বন্যাপ্রবাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার অট্টালিকার পোতার দুই তিন ইঞ্চ নিম্নে প্রতিহত হইতেছিল। প্রাঙ্গণে জল-প্রবাহ। শুধু একটা দ্বীপের ন্যায় সেই বারিবিস্তারের মধ্যে তাহার গৃহখানি জাগিয়া রহিল।

মাধবের আদেশে কতিপয় প্রকাণ্ড শূন্যগর্ভ আলকাতরা ও তৈলের পিপা ভৃত্যেরা ছাদের উপর আনিয়া রাখিল। মাধব স্বহস্তে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে পিপাগুলির ছিদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করিল। তারপর, প্রথমে একটি, ক্রমে দুইটি, তিনটি, চারিটী এই ভাবে পিপাগুলি সাজাইয়া রাখিল। আবার ক্রমান্বয়ে, কমিয়া অপর প্রান্তে একটি পিপা রহিল। গত বৈশাখ মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ী মেরামত হইয়াছিল। ভারার বাঁশগুলি তখনও খুলিয়া লওয়া হয় নাই। মাধব কতকগুলি বাঁশ আনিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিল। তারপর বড় বড় পেরেক ও দড়ি সংগ্রহ করিয়া মাধব স্বয়ং কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্—অবিশ্রান্ত কার্য্য চলিতেছিল। চারি দিকে শোকার্ত্তের হাহাকার, অট্টালিকার চারি পার্শ্বে প্রলয়-বন্যার স্রোতের গর্জ্জন, তার মধ্যে মাধবের এ কি বিচিত্র খেয়াল। আত্মীয় স্বজন সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে গৃহস্বামীর কার্য্য দেখিতে লাগিল। সাহস করিয়া কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কি হইতেছে। মাধবের মূর্ত্তি তখন অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠোর। সাধারণতই, সে রাশভারী লোক বলিয়া কেহ সহসা তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস পাইত না। এখন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই

কোন কথা কহিল না। শুধু নীরবে তাহার কার্য্য-প্রণালী দেখিতে লাগিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল, কিন্তু মাধবের কার্য্যের বিরাম নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ যে তাহার আছে, তাহার ভাব দেখিয়া কাহারও তাহা বোধ হইল না। আশ্রিত গ্রামবাসীদিগের আহার হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর হইতে মাধব-গৃহিণী দুই তিনবার লোক পাঠাইলেন; কিন্তু মাধব আপন মনে কাজ করিয়া চলিল।

প্রভুর সহিত পরিশ্রম করিয়া দুই জন চাকরও ক্রমশঃ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মাধবের সে দিকে দৃষ্টি নাই। গতিক সুবিধাজনক নহে, অথচ মনিবের নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াও নিরাপদ নয়। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। তখন মাধবের পত্নী স্বয়ং বাহিরের ছাদের উপর আসিলেন। পত্নীর আহ্বানে মাধবের চমক ভাঙ্গিল। আকাশের পানে চাহিয়া বলিল, "এত বেলা গিয়াছে। চল যাইতেছি। আর সকলের আহারাদি হইয়াছে ত? যে টুকু বাকি আছে আহারের পর শেষ করিলে চলিবে।"

পত্নী বলিলেন, "তোমার হয়েছে কি? মাথামুণ্ডু ও কি ছাই তৈরি হচ্ছে?"

মাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "ভেলা।" তাহার চক্ষে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা গেল।

স্ত্রী বলিল, "কি হবে?"

মাধব সংক্ষেপে বলিল, "দরকার আছে। দেখ্‌তে পাবে।"

৫

তখনও শুকতারা আকাশে দীপ্তি পাইতেছিল। উষার আলোক-সম্পাতে তখনও ধরণীর অন্ধকার-অবগুণ্ঠন অপসৃত হয় নাই। এমন সময় মাধবের ডাকাডাকিতে চাকরেরা ত্রস্তভাবে শয্যাত্যাগ করিল। আবার কোন নূতন বিপদ আসিতেছে কি?

না; বন্যার জলস্রোত আর ত বাড়ে নাই। বোধ হয় সারারাত্রিতে দুই এক ইঞ্চ জল কমিয়াছিল; কিন্তু সে বিশাল বারিবিস্তারের হ্রাসবৃদ্ধি সহজে অনুমিত হয় না। মাধবের ডাকাডাকিতে অতিথিবর্গের অনেকেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল; নূতন, অতর্কিত কোন বিপত্তির সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া তাহারা কোলাহল করিয়া উঠিল। মাধব তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া পেয়াদাকে ডাকিয়া তুলিল।

"দুঃখিরাম, হাতমুখ ধুয়ে নাও। একটু পরেই আমার সঙ্গে বের হতে হবে।"

সবিস্ময়ে সে মাধবের পানে চাহিয়া বলিল, "কোথায়, মশায়?" তখন তাহার নিদ্রা-ঘোর সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

মাধব বলিল, "তুমি এখানে কি কাজে এসেছ, তা ভুলে গিয়েছ না কি?"

মূঢ়ের ন্যায় পেয়াদা মাধবের পানে চাহিয়া রহিল। কথাটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সে যে সরকারী কাজে আসিয়াছে একথা সে বিলক্ষণ অবগত আছে। কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে, বন্যা-প্লাবিত দেশে, ধ্বংস ও মৃত্যুর মাঝখানে কিরূপে যে কার্য্য হইতে পারে মূর্খ পেয়াদা তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারিল না।

মাধব যখন কথাটা তাহাকে খুলিয়া বলিল, তখন দুঃখিরাম মাধবের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিহান হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিল, "দত্ত মশায়, আপনি কি ক্ষেপেছেন?"

গম্ভীরস্বরে মাধব বলিল, "কেন?"

"কোথায় যাবেন আপনি? এই সমুদ্দুর পার হবেন কি করে? কার বাড়ী যাবেন? বামাচরণ ঘোষের মাটীর বাড়ী কি এই বানের জলে এখনও আছে? তারা এখনও বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে বল্‌তে পারে? আর এমন বিপদের সময় কি পরোয়ানা নিয়ে কেউ কোন মানুষের বাড়ী যেতে পারে? ছি! বাবু, ওসব কথা এখন ভুলে যান। তার সর্ব্বস্ব হয়ত ভেসে গেছে। পরোয়ানা নিয়ে গেলেও যে কিছু পাবেন—

মাধব গৃহমধ্যে দ্রুতপাদচারণ করিতেছিল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। এখন তুমি প্রস্তুত হও। তুমি সরকারী লোক, সরকারের হুকুম মত কাজ করে যাবে। আমি এজন্য তোমায় বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিব। কিন্তু পরোয়ানা নিয়ে আজ যেতেই হবে। পৃথিবী রসাতলে যাক্ বা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক কোন বাধা মানিব না। তোমার ভয় নাই, দুঃখিরাম। যে ভেলা বাঁধিয়াছি, বিশজন লোককে বেশ— নিরাপদে নিয়ে যাওয়া যায়। যাও এখন হাতমুখ ধুয়ে নাও।

পত্নী স্বামীর সংকল্প শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মাধব ভিতরে গেলে তিনি বলিলেন, "এইজন্য বুঝি ভেলা বেঁধেছ? না, না, ওসব কথা এখন ভুলে যাও। এখন কি প্রতিশোধ নেবার সময়!

তোমার এত টাকা দামোদরের গর্ভে গেল, আর দুই তিন হাজার টাকার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃসময়ে পরোয়ানা নিয়ে যাচ্ছ, লোকে তোমায় কি বল্‌বে?"

মাধব বলিল, "লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি আমায় বাধা দিওনা। শুধু টাকার বিষয় নয়। এসব মান ইজ্জত, আত্মমর্য্যাদা নিয়ে কথা। তুমি সব বুঝতে পারবে না।"

পত্নী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাদের এমন কি দুর্দ্দশা হয়েছে ভেবে দেখ দেখি। তোমার কাছেই শুনেছি তাহাদের মাটীর ঘর। বুড়া জরে ভুগিতেছে। আমার মনে নিচ্ছে হয়ত বাড়ীর লোকজনও বানের জলে ভেসে গেছে। ওগো তোমার পায় পড়ি তুমি এ সময় পরোয়ানা নিয়ে যেওনা।"

মাধব দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি চলিলাম, কারও বাধা আমি শুন্‌বো না। আমার বংশের মান, আমার কাছে সব চেয়ে বড়।"

মাধব বাহিরে চলিয়া গেল।

তখন বেশ আলো হইয়াছে। মাধবের আদেশ সকলে মেলিয়া কৌশলে পিপার ভেলা নীচে নামাইল। পথে আহার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে জানিয়া মাধব টিনের বড় বড় কৌটা ভরিয়া হালুয়া, চিড়া গুড় লইল। একটা বড় বোতলে কিছু দুগ্ধও সংগ্রহ করিল। তাহার আদেশে ভৃত্য ইতিমধ্যে দুগ্ধ দোহন করিয়া গরম করিয়া রাখিয়াছিল। দুই জন ভৃত্য এবং পেয়াদা সহ মাধব ভেলায় চড়িল। তাহার বিলম্ব সহিল না। স্বয়ং লগি লইয়া ভেলা বাহিতে লাগিল।

৬

এ জলবিস্তারের কি সীমা নাই? পূর্ব্বে পল্লীর বালকবালিকার কলকণ্ঠে যে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিত, পল্লীবধূরা যে পথে প্রভাতে প্রদোষে কুম্ভ ভরিয়া পানীয় জল আহরণ করিতে যাইত, এখন সে সব স্থান গৈরিক জলস্রোতে পরিপ্লাবিত। শস্যশ্যামল প্রান্তর, জলপূর্ণ, গ্রামের চিহ্নমাত্র নাই, শুধু চারি দিকে সীমাহীন জলরাশি আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। দূরে দূরে দুই একখানি জলমগ্ন গৃহের শীর্ষ-দেশ দেখা যাইতেছেমাত্র। কোথাও কয়েকটি বৃক্ষ চূড়া খাড়া করিয়া তখনও বন্যার স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

মাধব দেখিল, মৃত গরু মহিষ এবং মনুষ্য জলস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। মাধব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল কিন্তু বামাচরণ ঘোষের বাড়ী দেখিতে পাইল না। এই ত হরিহরপুর! ঐ ত সেই বড় ঝাউগাছ! কিন্তু সে বাগান কই?

পেয়াদা বলিল, "তখনই ত বলেছিলুম বাবু, দেখ্‌লেন ত। গ্রামকে গ্রাম ভেসে গিয়েছে। বামাচরণ ঘোষ কি আর বেঁচে আছে?"

মাধব বলিয়া উঠিল, "ঐ যে নারিকেল গাছের সার, ওর পাশেই ঘোষেদের বড় টিনের ঘরের মটকা দেখা যাচ্ছে না? চল্‌ শীঘ্র রামা, লগি গাছা আমার হাতে দে।" মাধব স্বয়ং সবলে লগি চালাইতে লাগিল।

ভেলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিল। ঘোষেদের চারি পোতায় অনেকগুলি বড় বড় গোলপাতার ছাউনিকরা মাটীর দেওয়ালবিশিষ্ট ঘর ছিল, কিন্তু সে সব ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুধু দক্ষিণের পোতার বড় টিনের ঘরের পূর্ব্বার্দ্ধ জলের উপর জাগিয়া আছে। নিকটে গিয়া মাধব দেখিতে পাইল, কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তি সেই মটকার উপর পরস্পর ধরাধরি করিয়া বসিয়া আছে। ভেলা দেখিয়া তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

সম্মুখবর্ত্তী একটা নারিকেলবৃক্ষে ভেলার এক দিক এবং অপর দিক জলমগ্ন টিনের ঘরের একটা বড় খুঁটিতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া মাধব উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল, "খুড়ো"।

সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া এবং ভেলার উপর পেয়াদার মূর্ত্তি দেখিয়া মটকার উপরিস্থ বৃদ্ধের আনন্দধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। তাহার রুগ্ন, দুর্ব্বল দেহ থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। একটা কাঠের বাক্স দুই হস্তে প্রাণপণ-বলে কোলের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া বৃদ্ধ যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মাধব পেয়াদার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখিলে, বুড়ার সব গিয়াছে বটে; কিন্তু বন্ধকী গহনার বাক্সটী ছাড়ে নাই। আমি তখনই বলিয়াছিলাম।"

ক্ষীণকণ্ঠে বুড়া বামাচরণ বলিল, "বাবা, এই কি তোমার শত্রুতা সাধ্‌বার সময়? আজ দুই দিন আমরা অনাহারী। সব ভেসে গেছে বাবা! যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তোমার দেনা শোধ করবো। এখন না খেয়ে আমরা মারা যাচ্ছি বাবা।"

মাধব বলিল, "আচ্ছা, এখন মটকা থেকে নেমে এস, তারপর আমি সব বুঝে নেব।"

বামাচরণের পুত্র বলিল, "মাধব বাবু, এ যাত্রা আমাদের ক্ষমা করুন। যদি বেঁচে থাকি আপনার দেনা শোধ করিব। বাবা সবে জর থেকে উঠেছেন,—এমন সময় এই সর্ব্বনাশ। ছোট ছেলেটা পর্য্যন্ত কাল থেকে এক ফোঁটা দুধও খেতে পায়নি। তার গর্ভধারিণী দামোদরের গর্ভে—"

যুবকের কণ্ঠ অশ্রুভারে রুদ্ধ হইয়া গেল। বামাচরণের স্ত্রী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া আদালতের পেয়াদাটার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

মাধব অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "আমি এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এলাম কি শুধুহাতে ফিরে যাবার জন্য? খুড়া, তুমি যদি না নেমে এস, আমরাই উপরে যাচ্ছি।"

মাধবের ইঙ্গিতে ভৃত্যদ্বয় চাল বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধব সর্ব্বাগ্রে চলিল।

তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি তখন বৃদ্ধের ছিল না। পরিচারকযুগল এবং মাধবের সাহায্যে বুড়া ভেলার উপর চড়িয়া বসিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল।

মাধব বোতল হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া অগ্রে শিশুকে পান করাইল। তার পর বৃদ্ধকেও খানিকটা খাইতে দিল। হালুয়ার টিন খুলিয়া সকলের হাতে কিছু কিছু দিয়া মাধব বলিল, "খুড়া, দামোদর সকলেরই উপর ডিক্রীজারী করেছেন। আমিও বাদ যাই নাই।"

তারপর পেয়াদার নিকট হইতে পরোয়ানাখানা লইয়া শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমিও তাই আজ দামোদরের উপর ডিক্রীজারী করিলাম। চল খুড়া আমার বাড়ীতে এখনও যথেষ্ট স্থান আছে। তোমাদের কটা প্রাণীর থাকবার জায়গা কি হবে না?"

বৃদ্ধ দুইহাতে মাধবকে তাহার শীর্ণ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। পেয়াদা আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

আলোচনা।

ভাস্কর বর্ম্মার তাম্র-শাসন।

আশ্বিনের "সাহিত্যে" সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত রাখাল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভাস্করবর্ম্মার তাম্র-শাসন" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-চনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন লিপি পাঠে একজন অতিশয় পারদর্শী। "ঢাকা রিভিউ" এবং "বিজয়া" পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি পাঠে যে অল্প অল্প বৈষম্য আছে, তিনি তাহার সমাধান করিবেন, এইটাই প্রত্যাশা ছিল। 'বিজয়া'য় প্রকাশিত চিত্র নাকি স্পষ্ট হয় নাই, এই হেতুবাদে, তিনি তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু 'বিজয়া'য় প্রকাশিত সেই চিত্রাবলম্বনেই মনীষি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন মহোদয় দুই পাঠের বিভিন্নতার একটা সামঞ্জস্য বিধানে যত্ন করিয়া এই লেখককে বহু কথা জানাইয়া বাধিত ও উপ-কৃত করিয়াছেন। ফলতঃ দুই পাঠে পার্থক্য ও অতি কম। অনুস্বার-বিসর্গ-ঘটিত কয়েকটি স্থল ছাড়া তিন চারিটি শব্দে সামান্য প্রভেদ ছিল। রাখালবাবু একটু চেষ্টা করিলেই তাহা ধরিয়া তদীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন।

তাম্র-শাসনের আলোচনায় (১) "বর্ত্তমান মালিক কে?" (২) "লেখ-কের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে কি না?"—এই সকল কথা বোধ হয় এমন প্রয়োজনীয় নহে যে প্রবন্ধে তাহার উল্লেখাভাব সমালোচকের লক্ষ্যের বিষয় হইবার যোগ্য। রাখালবাবুর কথার ভঙ্গিতে বোধ হয়, কেহ এ বিষয়ে ফরিয়াদি হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন! তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত ছিল। ফলকথা, শাসনের পাঠ-প্রকাশে কাহারও আপত্তি আছে, এ কথা অন্ততঃ আমি অবগত ছিলাম না;—থাকিলে, প্রকাশ করিতাম না।

রাখালবাবু "সিভিল লিষ্টে" প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের নাম দেখিতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ে এতটুকু না করিলেও হইত। তবে এই সকল কর্ম্মচারীর সঙ্গে "আসামে" প্রাপ্ত তাম্র-শাসনের সম্পর্ক আছে কি না অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিলেই আমরা উপকৃত হইতাম।

অবান্তর ভাবে একটি কথা বলিতে চাই। "ট্রেজার ট্রোভ্ (Treasure Trove)" আইন খাটাইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ভূগর্ভোত্থিত তাম্রফলকাবলীর অধিকারী হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। বরং তাহা হইলে, এই গুলি একত্র সুরক্ষিত থাকিবার সম্ভাবনা, এবং ভবিষ্য প্রত্নতত্ত্বালোচনাকারকগণেরও ইহাতে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারিবে। কিন্তু প্রাপ্তিমাত্রেই যে ঐ সকল কর্ম্মচারী তাহা কাড়িয়া লইয়া যাইবেন স্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সমর্থ ব্যক্তি ইহার আলাচনা করিতে পারিবেন না, ইহাতে আমাদের কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। স্থানীয় ব্যক্তি এমন অনেক

কথা বলিতে পারেন, যাহা ভিন্ন স্থানের লোক বিশেষতঃ ইউরোপীয় কেহ হয়তো স্বপ্নেও মনে না করিতে পারেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা'তে প্রকাশিত করিলে দেশের কয় জন উহা দেখিতে পাইবেন? ফলকথা, স্থানীয় লোকের নিকটে সংবৎসর কাল রাখিয়া তার পরে ইহা সরকারে লইয়া গেলে, কাহারও কোনও আপত্তির কারণ থাকিবে না। ইতিমধ্যে দেশের লোক কেহ না কেহ অবশ্যই শাসনের আলোচনা করিতে সমর্থ হইবেন। যদি নাই হন, তবে সরকারী কর্ম্মচারিগণ যথাকালে পাঠোদ্ধারাদি করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যেরও সহায়তা হয়; দেশেও প্রাচীন-লিপি-পাঠাদি কার্য্য-পারদর্শী ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইতে পারে।

রাখালবাবু তাম্র-শাসনের আলোচনা করিতে গিয়া বলেন,—ইহার "তৃতীয় ফলকখানি হারাইয়া গিয়াছে,সুতরাং ইহাতে কোনও তারিখ নাই।" ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তৃতীয় ফলকের পরবর্ত্তী চতুর্থ অর্থাৎ শেষ ফলকখানি আছে। তারিখ থাকিলে সর্ব্বশেষেই থাকে। রাখাল বাবু যে আমাদের প্রবন্ধাদি মনোযোগ সহকারে পড়েন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। তিনি স্পষ্টই মনে করিয়াছেন,—"তৃতীয় ফলকই বুঝি শেষ ফলক!"

রাখালবাবু ভাস্করবর্ম্মার শাসন ছাড়া অপর নানা শাসনে উল্লিখিত কামরূপরাজগণের বিভিন্ন তালিকা নিতান্ত অবান্তর ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল তালিকাও সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য হয় নাই। রত্নপাল, বনমাল, ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের ভ্রাতা বলা হইয়াছে। রাখালবাবু স্বচ্ছন্দে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের পুত্ররূপে সকল তালিকাতেই দেখাইয়াছেন।

আমরা ভাস্করবর্ম্মার পিতার "পূর্ব্ব পরিচয়" সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া রাখালবাবু দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। "ন হি সর্ব্বঃ সর্ব্বং জানাতি।" তজ্জন্য দুঃখের বিষয় কি? অপিচ পরিচয়চ্ছলে তিনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহা ভাস্করবর্ম্মার পিতার খুব যে একটা উল্লেখযোগ্য গৌরবের কথা, এমনও নহে। আর ফ্লিট্ সাহেবের "গুপ্ত-লিপিমালা" হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও যে একটা অত্যুক্তির পরিচায়ক নহে, তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, "মগধরাজ মহাসেনগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্লাঘ্যম্মন্য হইয়াছিলেন;"—ভালই। ইহাতে আমার একটা অনুমান প্রমাণিত হইয়াছে। হর্ষচরিতে ভাস্করের পিতার নাম "সুস্থির বর্ম্মা" বলিয়া উল্লিখিত; কিন্তু ভাস্করবর্ম্মার শাসনে নামটি "সুস্থিত বর্ম্মা"ই আছে। প্রবন্ধে হর্ষচরিতের নাম অশুদ্ধ এবং তাম্রশাসনোক্ত নাম শুদ্ধ, এ কথা অনুমানতঃ বলিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে প্রমাণিত হইল। তজ্জন্য রাখাল বাবুকে ধন্যবাদ করিতেছি।

যে ভূমি কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কর্ণসুবর্ণেরই অন্তর্গত হইবে, এই "অনুমান" আমি সমীচীন মনে করিয়াছি। তাহার

পরিপোষক আরও কিছু বলিয়াছি। যে স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছে, প্রদত্ত ভূমি যে সেইস্থানে হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু রাখালবাবু এই সকল যুক্তি তর্কের কাছ দিয়া না গিয়া, কেবল একটি মাত্র উদাহরণ প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে,—"যে স্থান হইতে তাম্রশাসন প্রদান করা গিয়াছে, প্রদত্ত ভূমিও সেই স্থানের হইবে, তাহার 'কোনই কারণ নাই', কেন না "গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গগিরি-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে, যে ভূমি-দান করিয়াছিলেন, তাহা মগধ-বিষয়ে অবস্থিত ছিল না।" একটি উদাহরণে সাধারণ সূত্র হয় না। বিশেষতঃ দাতা গোবিন্দচন্দ্রের আপন বনিয়াদি বিষয় হইতে ভূমিদান করিবার বিশিষ্ট কারণও থাকিতে পারে। যাহা হউক, মদীয় অনুমানের খণ্ডন করিতে হইলে তৎপরিপোষক কথা গুলিরও প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। রাখালবাবু বলেন,—"ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।" এতদ্দ্বারা রাখালবাবু বলিতে চাহেন,—কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মার অধিকারভুক্ত ছিল না। কিন্তু ইহার প্রমাণার্থ তিনি কোনও প্রয়াসই করেন নাই। ফলতঃ প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ করা গিয়াছে, তাহা তিনি বোধ হয় মনোযোগ সহকারে পড়িবার অবসর পান নাই।

তাম্রশাসন খানির মূল্য কমাইতে গিয়াই যেন তিনি বলিয়াছেন—"হর্ষ-চরিতে ও হুয়ানচুয়াঙ্গের বিবরণে ভাস্করবর্ম্মার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নূতন তাম্রশাসন হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্থির হইল 'মাত্র'।" কিন্তু হুয়ানচুয়াঙ্গের হর্ষচরিতের কথাই কি ভাস্করবর্ম্মার পরিচয়ের পক্ষে 'যথেষ্ট'? প্রায় তিন শতাব্দি কালের কামরূপরাজগণের নাম যে এই শাসন হইতে পাওয়া গেল, ইহা কি অল্প কথা?' হর্ষচরিত থাকিতেও, শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেবের "আসাম-ইতিহাসে" ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্ব-পুরুষের একটী নামও উল্লিখিত হয় নাই, এবং হুয়ানচুয়াংয়ের গ্রন্থ ও হর্ষ-চরিত পাঠ করিয়াও ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ্ লিখিয়াছেন,—"Almost certainly he (ভাস্কর বর্ম্মা) must have been a hinduized Koch aborigine (Early of History p. 1 341) India তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর স্মিথ সাহেবের এ কথা আর শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে কি? রাখাল বাবু যাহাই বলুন, শ্রীযুত গেইট্ সাহেব 'বিজয়া'র প্রবন্ধ পড়িয়া লেখককে জানাইয়াছেন,—"The find is one of eXtraordinari value" (১) অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

(১) ঢাকা-রিভিউ পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, অধ্যাপক র‍্যাপসন্ প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণও তাঁহাকে এই রূপ মর্ম্মেই পত্র লিখিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

সহযোগী সাহিত্য।

"NATIONALISM."

"সজ্জাত্মিকতা।"

বিলাতের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার ব্যবহারাচার্য্য (Lord Chanceller) ভাইকাউণ্ট হ্যাল্‌ডেন, আমন্ত্রিত হইয়া ক্যানেডার মণ্ট্রিল নগরে ব্যবহার-শাস্ত্রের ব্যাখ্যান করিতে গিয়াছিলেন। গত আগষ্ট মাসে তাঁহার ব্যাখ্যান আরব্ধ হয়। এই ব্যাখ্যানে তিনি Nationalism বা সজ্জাত্মিকতার একটা ইতিহাস ও বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা উহারই সংক্ষিপ্তসার এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

Nationalism এই শব্দের অর্থ কি? মার্কিণ যুক্তরাজ্যে (United States) ইউরোপের সকল দেশের সকল রকমের জাতি যাইয়া উপনিবিষ্ট হইতেছে কিন্তু মার্কিণের প্রজা হইবার পরই তাহারা ইয়াঙ্কী (Yankee) বা মার্কিণ জাতীয় মানবে পরিণত হইতেছে। তাহারা নিজেদের ভাষা, ভাব, ধর্ম্ম ও সমাজ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিলেও তাহারা মার্কিণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এমন কি জর্ম্মণ, ফরাসী, হিস্পানী, ইতালীয়, রুষ, পোল, আইরিষ প্রভৃতি জাতি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্লীতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিলেও, পরিচয় দিবার সময় তাহারা মার্কিণ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছে। ক্যানেডায় এই রূপে ইংরেজ, ফরাসী এবং জর্ম্মণ জাতির সম্মিলন ঘটিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইংরেজ এবং ওলন্দাজ বুয়র এক হইতেছে। ইংরেজ, ফরাসী এবং জর্ম্মণ জাতির উপনিবেশসকলে এই ভাবে নানা জাতির সমন্বয়ে এক একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে। ফরাসী মনীষি মণ্টেস্কু জাতির এবং জাতীয়তার যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও ইউরোপের বিদ্বজ্জন সমাজে মান্য এবং গ্রাহ্য হইয়া আছে, তাহা ইউরোপের সভ্য সমাজে বর্ত্তমান কালে আর টেক্‌সহি হইয়া থাকিতে পারে না। বর্ণ, ধর্ম্ম, ভাষা এবং মূল বীজের ঐক্য বা মমতা থাকিলেই এখন আর এক জাতির সৃষ্টি হয় না। তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ইয়াঙ্কীদিগকে একজাতীয় বলা চলে না। অথচ তাহারা একজাতি; ইউরোপ মার্কিণকে একজাতি বলিয়া গ্রাহ্য করিতেছেন। কাজেই এখন জাতির এবং জাতীয়তার নূতন বিবৃতির নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; বর্ত্তমান কালের জাতিত্বের বিশ্লেষণ করিয়া Nation এবং Nationalismএর নূতন অর্থের নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ এবং নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে আর্য্য-জাতির মধ্যে Nation শব্দটা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিল তাহা বুঝিতে হইবে।

বৈদিক অথবা নর্স (Norse) যুগে, যখন আর্য্যগণ যাযাবর ছিলেন,

তখন বর্ণ, ধর্ম্ম এবং বীজ-সাম্যে জাতির সৃষ্টি হইত—তখন এক পুরাণ পুরুষের বংশধরগণ এক জাতির বা এক শ্রেণীর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন। তখন জাতিত্ব দেশবিশেষের সীমামধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তখন ভূমির সহিত জাতির কোন সম্বন্ধ ছিল না। জাতীয়তা Personal ছিল, territiorial ছিল না। এ ভাবটা আর্য্য জাতি সকলের মধ্যে এখনও প্রবল আছে। ভারতের ব্রাহ্মণ যে দেশেই বাস করুক না সে ব্রাহ্মণ থাকিবে এবং তাহার জাতিগত আচার পদ্ধতি, বিধি নিষেধ সকল দেশেই প্রবল থাকিবে। ইংরেজ যেখানেই থাকুক সে ইংরেজ ব্রিটিশ; তাহার জাতিগত অধিকার এবং দায় সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ভাবে বহন করিবে। আর্য্যের এই ব্যক্তিত্ব জাতি ও সমাজ হিসাবে এই বৈশিষ্ট্য উহার পুষ্টির ও বিস্তারের হেতু। এই ব্যক্তিত্ব উহার মেদমজ্জাপ্রকৃতির সহিত যেন গাঁথা। তাই আর্য্যের মধ্যে জাতিত্বের স্ফুরণ প্রথমে গোষ্ঠীতে (Clan) হইয়াছে; বহুগোষ্ঠী সম্মিলিত হইয়া একটা সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্ঘই জাতি বা "নেশন"; যাহা সঙ্ঘাত্মক তাহাই ইংরেজি ভাষায় Nationalism। সংঙ্ঘের প্রতি আত্মীয় ভাবকেই উদ্দেশ করিয়া এই শব্দের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইয়াছে।

ইউরোপে Feudalism বা ভৌমিকতা প্রকট হইবার পর আর্য্যগণের জাতিবৈশিষ্ট্য দেশের বা ভূমিবিশেষের সীমায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। এক স্থানে কিছুকাল স্থায়ীভাবে বাস করিলেই সেই স্থান বা দেশের প্রতি একটা মমতার ভাব মনে জাগিয়া উঠে। এই মমত্বকেই দেশাত্মবোধ বলা হয়। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ ব্রহ্মর্ষি দেশ এবং ব্রহ্মাবর্ত্তকে আমার দেশ বলিয়া চিনিয়াছিলেন। ইউরোপে নর্সগণ নরওয়ে এবং সুইডেনকে স্বদেশ বলিয়া ওডেনের (Oden) লীলাক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া-ছিলেন। তথাপি ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ—Territorial Nationalism অর্থাৎ দেশজ জাতিপ্রীতি বা সঙ্ঘাত্মিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। যখন এক একটি গোষ্ঠীর এক জন ভূমিপাল নির্দ্দিষ্ট হইল, যখন গোষ্ঠীগত প্রত্যেকের গোত্র ঠিক হইল, তখনই "জননী জন্মভূমি" এই জ্ঞানটা আর্য্য-গণের মধ্যে প্রকট হইয়াছিল। ইউরোপে Feudalism বা ভৌমিকতা প্রচলন হইবার পর, দেশগত জাতীয়তার বিকার ঘটে। ইউরোপের বর্ত্তমান ব্রিটিশ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ইতালীয় এবং রুষ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি Feeudal clans বা ভৌমিক গোষ্ঠী সকলের সমবায়ে ঘটিয়াছে। এই Feudalism বা ভৌমিকতা আর্য্যগণ শক-হূর্ণ শবরাদি জাতির নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। রোম ও গ্রীসের প্রাধান্য-কালে উহা ছিল না। হুন আক্রমণের পর রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচার হইলে এই Feudalism বা ভৌমিকতা ইউরোপে প্রচলিত হয়। এই ভৌমিকতার পরিপাকের ফলে বর্ত্তমান ইউরোপের সৃষ্টি এবং উৎপত্তি। উহা হইতেই আমরা দেশগত জাতীয়তা শিক্ষা করিয়াছি; উহা হইতেই ব্রিটিশ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ইতালীয়, রুষ প্রভৃতি জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

এই খানে একটা কথা বলিয়া রাখিতে হইবে। এই জগতের ইতিহাসে যখন যে জাতি প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছে, তখন সেই জাতি স্বীয় বিশিষ্টতার প্রভাবে অন্য সকল দুর্ব্বল ও হীন জাতিকে দীর্ঘ কালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রোমের প্রাধান্যকালে রোমক ভাব ইউরোপ ও এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ব্বল জাতিসকল অনুচিকীর্ষার বশে, নিজেদের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া রোমের আদর্শে নিজেদের গড়িয়া তুলিতেছিল। পরে ইস্‌লাম-প্রাধান্য-কালে দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফরিকা এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া মোস্‌লেম-ভাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপে, মধ্যযুগে চতুর্থ হেনরী হইতে বোনাপার্টির কাল পর্য্যন্ত ফরাসী জাতির প্রাধান্য থাকাতে, ফরাসী ভাষা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইয়াছিল; লাটীন কেবল রোমান কাথলিক ধর্ম্মের ভাষা হইয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল। এখনও ফরাসী ভাষা না জানিলে ইউরোপের সকল দেশে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা যায় না। যেমন একটা প্রবলচিত্তের মানুষ দুর্ব্বল অন্য জনকে hypnotise বা মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করিতে পারে, তেমনি একটা প্রবল জাতি অন্য সকল দুর্ব্বল জাতিকে কিছু কালের জন্য hypnotise বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। অনেক ক্ষেত্রে Nationalism বা সজ্ঘাত্মিকতা এবম্প্রকারের hypnotism বা সম্মোহন শক্তির ফলস্বরূপ। এক কালে রোম জগৎকে সম্মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তাই জগতের অনেকে রোমক নাগরিক (Roman citizen) হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। যখন ইস্‌লাম এই সম্মোহন অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন অর্দ্ধেক জগৎ ইস্‌লাম-ভাবাপন্ন হইল; এক চতুর্থাংশ মোস্‌লেম হইয়াছিল। এখন ইউরোপের হস্তে ঐ সম্মোহন অস্ত্র ন্যস্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ ব্রিটিশ জাতি উহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাই মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ইউরোপের নানাজাতির সমবায়ে এক নূতন আঙ্গলো মার্কিণ (Anglo-American) জাতির উদ্ভব হইতেছে। জর্ম্মণ মনীষিগণ এবম্বিধ জাতির সম্মোহনের সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের ভাষায় উহার অভিব্যঞ্জনার নিমিত্তে একটা নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

জাতি-সৃষ্টির পক্ষে দুইটি শক্তি অবশ্য প্রযুজ্য। যে জাতির মধ্যে এই দুইটি শক্তি যত প্রবল, সেই জাতি জগতের মধ্যে তত প্রধান এবং প্রবল। ইংরেজিতে এই দুইটির নাম Cohesion এবং Co-ordination অর্থাৎ আশ্লেষণ এবং অঙ্গাঙ্গীকরণ। জাতির সমষ্টি যত দিন সমষ্টির মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া ডুবিয়া থাকে, ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রকট করিবার জন্য কোন চেষ্টা না করে, তত দিন ঐ জাতি প্রবল থাকে। ইহাকেই বলে cohesion অর্থাৎ এক অপরে যেন আটার মতন লেপ্‌টিয়া থাকে, যেন কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। তাই উহার নাম অশ্লেষণ দিয়াছি। গ্রাণ্ট এলেন বলেন যে, এই cohesivenessই জাতীয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলেই জাতি ধূলিমুষ্টির ন্যায় শিথিল হইয়া পড়ে; তখন ফুৎকারে সে জাতি উড়িয়া যায়। এই অশ্লেষণ প্রবল থাকিলে অতিপ্রবল শক্তির সঙ্ঘাতে জাতি

নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে পারে, পরন্তু কখনই পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহপালিত পশুজীবন অতিবাহন করে না। ইহার পরই co-ordination বা অঙ্গাঙ্গীকরণ। বহু অঙ্গ না থাকিলে সমাজ থাকে না। প্রত্যেক অঙ্গ যদি অপর অঙ্গের সহায়তা না করে, তাহা হইলে সমাজ দেহ নষ্ট হয়। দেহীর সমবায়ে সমাজ। দেহের সকল লক্ষণ সুতরাং সমাজে পরিস্ফুট হইবেই। অতএব দেহের রক্ষার নিয়ম সকল ব্যাপক ভাবে সমাজে প্রয়োগ করিতে হয়। co-ordination দেহরক্ষার, সৃষ্টিবিস্তৃতির প্রধান এবং প্রথম নিয়ম। কাজেই সমাজ-শরীরের রক্ষার পক্ষে অঙ্গাঙ্গী-করণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটী গুণ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীবর্গের মধ্যে খুব প্রবল আছে। উহাদেরই প্রভাবে ইউরোপের সকল জাতির সংমিশ্রণে আমেরিকার উর্ব্বর ভূমিতে নবীন প্রবল জাতির সৃষ্টি হইতেছে। ভূমির প্রভাব, জলবায়ুর প্রভাব, প্রতিবেশ-প্রভাব অপরিহার্য্য। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজ এবং নানা উপনিবেশের ইংরেজ চিরকাল এক থাকিতে পারে না। প্রতিবেশ-প্রভাব উপনিবেশের ইংরেজকে বিকৃত করিবেই। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের জলবায়ুর প্রভাবে উপনিবিষ্ট ইউ-রোপীয় জাতি সকলকে পরিবর্ত্তিত হইতে হইয়াছে। ইয়াঙ্কী ইংরেজে এবং ব্রিটিশ ইংরেজে এখনও অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে। আবার মার্কিণের ঔপনিবেশিক অষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রনিউজল্যাণ্ডের ঔপনিবেশকের মত নহে। যতই পরিবর্ত্তন হউক বীজপ্রভাব যুগান্তরব্যাপী। সেই প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাতিত্ব বজায় রাখিতে পারিলে ব্রিটিশ "ন্যাশনালিজম" সনাতন হইতে পারে।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ।

২

নৈতিক বল ও সমাজ-সংস্কার।

দেশ-প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজ-সংস্কারে একান্ত পক্ষপাতীছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পরম পক্ষপাতী হইয়াও নিজের জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করিয়াও তিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীইছিলেন। বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলাল বিনাপরাধে, অকারণে হিন্দুসমাজের প্রায়শ্চিত্যাদির ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত না হওয়ায়, আমি যত দূর জানি, গোঁড়া হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও তিনি কিন্তু আমরণ হিন্দুসমাজের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই

বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। অবস্থা-বিশেষে বিধবাবিবাহ সমাজের দিক্ দিয়া সমর্থনযোগ্য স্বীকার করিতেন; কিন্তু, কি বিধবা কি বিপত্নীক উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য-পালনই সম্পূর্ণ বিহিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

আহার-সম্পর্কে জাতিবিচার রক্ষা করা, তিনি সমাজের পক্ষে শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে—অবশ্য পরিত্যাজ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিলোপ-সাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। জাতি বা বর্ণ-নির্ব্বিচারে বিবাহাদির অনুষ্ঠান তিনি আবশ্যক বা সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেন নাই। কিন্তু, স্পর্শদোষ বা টিকির মাহাত্ম্য তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি স্বীয় পুত্র, মদীয় পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দিলীপ কুমারের উপনয়ন-সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন,—"রক্তসংমিশ্রণের আমি আদৌ কোনও আবশ্যক বা উপকারিতা বুঝিতে পারি না।" দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুপাত্রের অভাব না ঘটিলেও, অদ্যাপি তিনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা কল্যানীয়া শ্রীমতী মায়া দেবীর বিবাহ দিয়া যান নাই। বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না বটে; কিন্তু দস্তুরমত 'কোর্টসিপ' প্রচলিত হওয়ার বিপক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাকে একদিন কথার ছলে তিনি কহিয়াছিলেন—"প্রাপ্তযৌবন পুত্র-কন্যা অনেক সময়ে বয়সের দোষে নিজেদের ভবিষ্যৎ বুঝিয়া, বিবাহ-ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে; এ সম্বন্ধে পিতামাতার ন্যায় তাহাদের যথার্থ হিতার্থী এসংসারে আর কেহই নাই,—তাহারা নিজেরাও নহে।" নিপুণ তার্কিক দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত যথারীতি এ সম্পর্কেও আমার বিচারবিতর্ক হইয়াছিল। পণগ্রাহী লোভপরায়ণ পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের প্রসঙ্গ উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"পণ-গ্রহণ আমি অন্যায় মনে করি না। যে দেশে বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণী দেবীর অভাব নাই, সে দেশে যোগ্য-পণ-দানে অক্ষম দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যা কেন যে দু'দশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে না, বুঝা যায় না। পিতার পক্ষে পুত্র ও কন্যা কেহই কম আদরনীয় নহে। কন্যাকে জন্মের শোধ ফাঁকি দিয়া, পুত্রের জন্য সর্ব্বস্ব রক্ষা করা আমি গর্হিত ও অন্যায় মনে করি। কন্যাটির আজীবন ভরণপোষণের ভার যে লইবে সে কেন যে ন্যায়তঃ পণ-গ্রহণ করিবে না বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। এ দেশে এ প্রথা আজ নূতন নহে, এবং বিলাতেও

Free Love বা অবাধ-প্রণয় প্রচলিত থাকাসত্ত্বেও, সেখানেও এই Dower system পণ-প্রথা যে নাই এমন কথা কেহই বলিবেন না।” সমাজে বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিলে লোকে নিন্দা করে বলিলে, তিনি শুদ্ধ তাঁহার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গহাস্য করিতেন ও বলিতেন—“লোক-নিন্দা! লোকনিন্দা! আগে সমাজের জন-সাধারণ শিক্ষিত হউক। তারপর তাহাদের নিন্দায় কর্ণপাত করা যাইবে।

আমি মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের কোন মত এ স্থলে সমর্থন করিতে আসি নাই। তবে, এই টুকুই আমার কথা যে, লোকাপবাদ বা সমাজের ভয়ে তিনি কখনও নিজের Principle বা লক্ষ্য বিস্মৃত হন নাই। জীবনে যাহা জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে তিনি সত্য, শুভ, ও সুন্দর বলিয়া জানিয়াছেন, স্বীয় সাধ্যানুসারে তাহাই তিনি সম্পন্ন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা-প্রীতি।

আমরা অতি সংক্ষেপে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ক'একটাদিক মাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছি! এখন তাঁহার পবিত্র জীবনের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব (সম্পর্কে আমার বক্তব্য) আপনাদিগকে জানাইব। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম.এ. পাশ করিয়া বিলাত গমন করেন ও সেখানে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, গভের্ণমেণ্ট তাঁহাকে সামান্য ডেপুটির কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সমসাময়িক সহযাত্রী ও সতীর্থগণের মধ্যে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষের নাম আজ সকলেই অবগত আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও জ্ঞানে কোন অংশে হীন না হইলেও, গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করায়, আজীবন দৈব বিড়ম্বনা বশতঃই তিনি সামান্য ডেপুটিই করিয়া গেলেন। আর আজ স্বাধীনজীবি আশুতোষ ও ব্যোমকেশ অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের অধিকারী হইয়া দেশের ও দশের নেতৃপদবাচ্য হইয়া রহিয়াছেন। ডেপুটি-দের মধ্যেও অনেকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ও ঘটিল না। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা-প্রীতির কথা স্বতই আমার মনে উদয় হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটি ছিলেন বটে; কিন্তু

জীবনে তিনি কখনও সেলাম ঠুকিয়া উপরিওয়ালার 'খয়েরখাঁ-গিরি' করেন নাই। গভর্ণমেন্টের ভার-প্রাপ্ত সর্ব্ববিধ কার্য্য অনুগত দাসের ন্যায় তিনি সবিশেষ যোগ্যতার সহিতই সম্পন্ন করিতেন; কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই শেষ। ইংরাজজাতির বিবিধ-গুণ-মুগ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল অকপটেই ইংরাজের অনেক গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু পদ, সম্মান লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে একদিনও কেহ লালায়িত হইতে দেখে নাই। কত ঘটিরাম তৈল-ম্রক্ষণ-দক্ষতায় রায়বাহাদুরি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ স্পৃহনীয় পদবীতে আরোহণ করিয়া যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; কিন্তু তুচ্ছ পদ-মর্য্যাদার জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল কখনও প্রস্তুত ছিলেন না,—বরং তদ্রূপ নীচ-বৃত্তিকে নিতান্তই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এক দিন উক্তবিধ কোন খেতাবী ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলালের কলিকাতার ভবনে শুভাগমন করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বলি Mr. দ্বিজু! তুমি কেমন লোক হে? আমার এই সম্মান-লাভে বিশ্বশুদ্ধ লোক আজ আমায় Congratulate করলে, আর তুমি কি না আপনার লোক হইয়া, আমার একটা খোঁজও নিলে না!" শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্র-লাল তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে যে সরকার বাহাদুর ব্যঙ্গ করেছেন, সেটা বুঝি বুঝলে না? তা না হলে তোমার মত অশিক্ষিত লোকেরও খেতাব মেলে!" শুনা যায়—অতঃপর উক্ত ডেপুটী আর কখনও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু সরল, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল কাহারও নিন্দাপ্রশংসা জীবনে কখনও গ্রাহ্য করেন নাই;—পরন্তু যাহা যখন তিনি সত্য মনে করিয়াছেন, কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাই সঙ্গত বলিয়া তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন-চিত্ত দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বভাবজ এই সকল ব্যবহার সময়ে সময়ে তাঁহাকে অনেকের নিকটে অত্যন্ত অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল; এমন কি, আমি জানি—এ ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী শত্রুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু একদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিতে গিয়া যে উত্তর শুনিয়াছিলাম, তাহা শুনা অবধি আমি আর তাঁহাকে এ সকল ব্যাপারে কোন কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"কি বল তুমি? জীবনে তো কাহারো মুখ চেয়ে চলিনি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কিসের জন্য কার জন্য কি লাভের আশায় বিবেক ও বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া

লোকের মন-রাখা কথা বল্‌তে যাব? অমন নীচ বলে আমাকে ভাববার তোমার কি কারণ আছে?"

গবর্মেণ্টের চাকুরী করিয়া শশকের প্রাণ লইয়া তিনি জীবনধারণ করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার মনীষা, তাঁহার প্রভাব ও শক্তি, তাঁহার অপরিসীম সাহস ও স্বাবলম্বনপ্রিয়তা সমগ্র বঙ্গদেশে এমন কোনও সাহিত্যসেবী নাই, যিনি আজ নত-শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য না হইবেন। আমি তাঁহার স্বাধীনতা-প্রীতির এতই ঘটনা জানি যে, এ স্থলে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলে শেষ করিয়া উঠা অসম্ভব হইবে।

সাহিত্য-সেবা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-শক্তি অতি বালককাল হইতেই স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স তখনই তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। শৈশবে তাঁহার সঙ্গীত-প্রীতি ও কবিত্ব-রস-গ্রাহিতা তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবেই স্বজনগণমধ্যে বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহার জনৈক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে বলিলে, অপরিণতমতি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বল্পকাল নীরব রহিয়া, তারকাপুঞ্জের উদ্দেশে একটি ছোট কবিতা মুখে মুখেই রচনা করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বয়ঃক্রম যখন তের কি চৌদ্দ, তখনকার রচিত কতকগুলি সঙ্গীত তিনি "আর্য্যগাথা" নামক পুস্তকে ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াই মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। "আর্য্যগাথা" গীতিকাব্য হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিল, অদ্যাপি বঙ্গীয় কোনও কবির বাল্য-রচনা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি।

"আর্য্যগাথা" প্রকাশের পর কিছুকাল কবিবর অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং বিংশ বর্ষ বয়সে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে গমন করেন ও তথায় প্রায় তিন বৎসর কাল যাপন করেন। বিলাতে অবস্থিতিকালেও তাঁহার সাহিত্য-সেবার বিরাম ছিল না। তিনি সেখানে "Lyrics of Ind" নাম দিয়া কতকগুলি ইংরাজি কবিতা প্রকাশিত করেন। এই কবিতাপুস্তকখানি পাঠ করিলে কবির ভাব-ব্যঞ্জনা ও কল্পনা-প্রস্ফুরণে অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও এ কাব্য তাঁহার বাল্যরচনা "আর্য্যগাথা"র ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ নহে,

তথাপি বিদেশী ভাষায় বিরচিত তাঁহার এই কাব্যখানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তৎকালে স্বদেশী ও বিদেশী সাময়িক পত্রসমূহ এবং Sir Edwin Arnold প্রমুখ বিখ্যাত সমালোচকগণ এ পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিলে তাঁহাকে হিন্দু-সমাজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান করেন। কিন্তু বিলাত-প্রবাস তিনি কোন রূপেই দূষণীয় বিবেচনা না করায় সমাজের ব্যবস্থা তিনি মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না;—ফলে, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধব, এমন কি, আত্মীয়-স্বজনগণ পর্য্যন্ত যখন তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন, তখন তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তরের অনিবার্য্য ক্ষোভে ও অপমানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া "একঘরে" নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের প্রতি অতিপ্রখর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি সাহিত্য হিসাবে স্থায়িত্বলাভের যোগ্য না হইলেও, ইহার ভাষা ও ব্যঙ্গভঙ্গী সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহার পর কবিবরের "কল্কি অবতার" প্রকাশিত হয়। "কল্কি অবতারে" কবিবরের রচনার অনায়াসগতি ও সরস কৌতুক প্রকৃতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। "কল্কি অবতারে"র সঙ্গে সঙ্গে কবি "আষাঢ়ে" নামক একটি হাস্য-রস-প্রধান কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। এই কাব্যখানি দ্বিজেন্দ্রলালকে বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য দান করিতে পারিয়াছিল; এরূপ অনাবিল হাস্য-চটুল ব্যঙ্গ বঙ্গভাষায় বিরল। নির্দ্দোষ সরল রসিকতার প্রাচুর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে ছিল না বলিলে, বোধ করি, অত্যুক্তি হইবে না। অনেক হাস্যরসিক লেখকের রচনায় হাস্যরসের সঙ্গে অশ্লীলতার অজস্র ও প্রচুর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়; অনেক রচনা হাস্যের পরিবর্ত্তে বীভৎস রসেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা শুচি-স্নাত অম্লান হাস্যরসের নির্ঝর। তাঁহার "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা," "অদল বদল," "ডেপুটীকাহিনী," "নসীরাম পালের বক্তৃতা" প্রভৃতি রচনাগুলি তাহার প্রমাণ।

বহুদিন পূর্ব্বে "ভারতী" পত্রিকায় "আষাঢ়ে" কাব্যখানির এক সুদীর্ঘ সমালোচনাপ্রসঙ্গে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান

লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "হাসির গান" আজ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইতেছে, সুতরাং তৎসম্পর্কে এ স্থলে আমার পক্ষে কিছু বলা না বলা দুই সমান। তাঁহার হাসির গানের বা যাবতীয় হাস্য-রচনারই বিশেষত্ব আছে।

বঙ্গসাহিত্যে হাস্য-রসোদ্রেকে দ্বিজেন্দ্রলাল তুলনারহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়। তাঁহার হাসির গান শুধু যে হাসায়, তাহা নহে,—উহাতে শিক্ষণীয় ও চিন্তনীয় অসংখ্য বিষয় আছে। বিস্তারিত আলোচনার এ স্থান নহে—আমি শুদ্ধ ইঙ্গিতে বলিয়া যাইতেছি।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল "পাষাণী" নামক নাট্যকাব্য ও "বিরহ" "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি প্রহসন প্রচার করেন। তাঁহার প্রহসনগুলি বাঙ্গলা ভাষায় পরম আদরের সামগ্রী। একমাত্র রসরাজ অমৃতলালের "বিবাহ-বিভ্রাট" ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্তে"র ন্যায় অশ্লীলতা-বর্জ্জিত, সভ্যজন-পাঠ্য প্রহসন বঙ্গভাষায় আর আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল "মন্দ্র" নামক একখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশিত করেন। এই কাব্যখানি হাস্য, ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ-গুণে ও গাম্ভীর্য্যে রবীন্দ্র-নাথপ্রমুখ সাহিত্যরথিগণের অজস্র প্রশংসা-সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায়ে "মন্দ্র" কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা ও অলৌকিক প্রতিভার যেরূপ অকপট ও অসঙ্কোচ খ্যাতিবাদ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় নিপুণ ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। তাঁহার নিকট হইতে এত দূর উচ্চ প্রশংসা বঙ্গসাহিত্যে আর কোনও কবি অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই, এ কথা দ্বিধাহীন হইয়াই বলিতে পারা যায়। "মন্দ্রে"র পর "তারাবাই" নামক একখানি নাট্যকাব্য প্রচারিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-রচনার প্রতিভা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষরে গ্রথিত হইলেও, ভাষার হিসাবে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষরের অনুরূপ নহে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, অভিনব অমিত্রা-ক্ষর-রীতি প্রচলিত করিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকটি আদৌ সুশ্রাব্য বা সুমিষ্ট করিতে পারেন নাই। ক্রিয়া পদের প্রসারণে কবিতা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। "তারাবাই" কাব্যে অমিত্রাক্ষরের আমি ইহাই সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী বলিয়া মনে করি। একটু নমুনা দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

"হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে অতিথি দ্বাদশ দিন।" বিলম্বিত ক্রিয়াপদটি পুর্ব্বে না বসাইলে ইহা গদ্য না পদ্য নির্ণয় করা নিতান্তই দুষ্কর হইত। সে যাহা হউক, "তারাবাই"এর ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্রকাব্য' অপেক্ষা শ্রুতিকটু হইলেও ঘটনা-বিন্যাসে ও আখ্যান-বস্তুর হিসাবে রঙ্গমঞ্চে 'তারাবাই' নাটকই দ্বিজেন্দ্র-লালকে দক্ষ নাট্যকাররূপে পরিচিত করাইয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্ত বা বহুৎ আচ্ছা" ষ্টারে ও ক্লাসিক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলেও, নাট্যকার হিসাবে তারাবাই নাটকই দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যসমাজে নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা দান করে। অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল এই অকৃতী সাহিত্য-সেবকের অনুরোধক্রমে কবিতা ছাড়িয়া, গদ্যে নাটকরচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। যথাক্রমে তিনি এই সময় হইতে ছয় কি সাত বৎসরের মধ্যে "প্রতাপ সিংহ", "দুর্গাদাস", "নুরজাহান," "মেবারপতন," সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", ও "পরপারে,"—এই সাতখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটকে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ উদ্দেশ্যে যে সকল অমূল্য আদর্শ ও পন্থার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করা আমার পক্ষে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক নাটক পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিশ্লে-ষণ করিয়া না দেখাইলে, দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ্য সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা একান্তই অসম্ভব হইবে। তাঁহার নাট্যপ্রতিভা এমনই সর্ব্বতোমুখী, বিচিত্র-রস-ময়ী যে, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এক একটি তুলির আঁচড়ে তিনি যে কি অপূর্ব্ব চরিত্রা-ঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ অভিনিবেশের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাগরে অবগাহন না করিলে তাহা কেহই বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার নাটকের ভাষা বঙ্গ-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন, এবং অভাবনীয়রূপেই ঐশ্বর্য্যশালী! তাঁহার উপমা অনেকটা Shelleyর ন্যায় সংহত, শোভন, যথাযথ ও একাধারে বহু-দিক্‌দর্শী। তাঁহার এক একটি চরিত্রের বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির প্রাখর্য্য লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! বস্তুতঃ অনেক স্থলে এই বিশ্লেষণ-শক্তি অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সকালে, বিকালে, রাত্রিকালে—সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে অসংখ্য লোক আসিত, কিন্তু, তাঁহাকে অবসর সময়ের একটুও অপব্যবহার করিতে দেখি নাই। মনে আছে, গয়ায় মনস্বী লোকেন পালিত মহাশয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ

করিতে করিতে তিনি একবারেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সে জ্ঞান নাই। বিচার-বিতর্ক-পাঠ ও আবৃত্তি তুমুলবেগে চলিতেছে। এক রাত্রি মনে পড়ে—প্রায় যখন বারটা বাজে, আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অভাবে একাই আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিয়া গাঢ়নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম, জানি না ; সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখি, ঘড়িতে তখন রাত্রি ৩॥ টা বাজিয়া গিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও সমভাবেই উচ্চকণ্ঠে Byron পড়িতেছেন ও পালিত মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁহাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া Shelley হইতে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন। এই ভাবে সচ্চিন্তা, সদালাপ, ও সৎকর্ম্মেই দ্বিজেন্দ্রলাল এ সংসারে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে এ দেশের আজ যে অনপনেয় ক্ষতি হইল সে অভাব এ দেশে আর কখনও পূর্ণ হইবে কি না, জানি না।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

গান

১

ফুলে গানে প্রেমে আমি জড়ায়ে জড়ায়ে
দিনু মোর হৃদয় ছড়ায়ে ;
আহা, এ কবিতা সম
হ'তো যদি প্রিয়া মম !
তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া
লইতাম আপন করিয়া !

২

বৃথা গাঁথি বনফুল—তুমি কত দূরে,
না জানি কাহার অন্তঃপুরে !
নিশীথে পাপিয়া-তানে
এ গান কি পশে কাণে ?
এ প্রেম কি জাগে প্রাণে—কোন পূর্ণিমায়
হেরি' জ্যো'স্না শূন্য আঙ্গিনায় ?

৩

কোন দিন গানগুলি—দিন যদি পায়,—
হাতে শুয়ে মুখপানে চায় !
আগ্রহে—আশায় ভুলি'
চা'বে কি অক্ষরগুলি ?
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায়—
হৃদি মোর পাতায় পাতায় ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

সাহিত্য ২৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

পরেশের পিসী।

পরাণপুরের পরেশ মণ্ডল নমঃশূদ্র জাতীয় কৃষক। তাহার পিসী করুণা দাসী অপত্যহীনা বিধবা। পরেশের বয়স যখন দেড়বৎসর, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। পিসী করুণাময়ী সেই সময় হইতেই পরেশকে লালনপালন করিয়াছেন। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া অবধি তিনি পিত্রালয়েই আছেন।

পরেশর পিতা গোবিন্দ মণ্ডল পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। অল্পদিন হইল পরেশের পিতা এবং বিমাতা উভয়েরই কাল হইয়াছে। পরেশ এখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তাহার পিসীর বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তিনি গোবিন্দ মণ্ডলের বড় ভগ্নী।

বাড়ীতে পরেশ, তাহার পিসী এবং একজন রাখাল এই তিনটী মাত্র লোক। ইহাছাড়া একজন কৃষাণ আছে। সে দিনের বেলা কাজকর্ম্ম করিয়া রাত্রে বাড়ী যায়।

পরেশের পিতার অবস্থা বেশ ভাল ছিল। তাঁহার চারিখানি লাঙ্গলের চাষ এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা জমি ছিল। চারিজন কৃষাণ এবং একজন রাখাল ছিল; দশবারটী হালের গরু এবং তিনি চারিটী গাই ছিল। গোবিন্দের বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই দুই একজন বাহিরের লোকের পাতা পড়িত। পিতার মৃত্যুর পর পরেশের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। গোবিন্দের হাতে সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, পরেশের বিবাহে তিনি তাহা সমস্তই ব্যয় করিয়াছিলেন। পিতা এবং বিমাতার শ্রাদ্ধে পরেশকে কিছু ঋণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও পরেশের সংসারের বিশেষ অবনতি হইত না। গোবিন্দ মণ্ডলের মৃত্যুর আট নয় মাস পরে দুই দিনের মধ্যেই পরেশর গরুগুলি সমস্ত মরিয়া যায়। চর্ম্মের লোভে কোন মুচি পরেশের গরুগুলিকে বিষ দিয়াছিল।

হালের গরু গেলেই কৃষকের সর্ব্বনাশ। মুচির এই পৈশাচিক কার্য্য পরেশকে একবারে বসাইয়া দিল। ইহাতে তাহার প্রায় পাঁচ ছয়শত টাকা ক্ষতি হইল।

পরেশ সরলচিত্ত, সুস্থকায়, পরিশ্রমী এবং আত্মনির্ভরশীল কিন্তু অশিক্ষিত, ছেলেবেলায় তাহার শরীর ভাল থাকিত না বলিয়া সে লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই, নচেৎ গোবিন্দ মণ্ডলের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবারই কথা।

পরেশ দেখিল হালের গরু কিনিতেই হইবে এবং তাহাতে টাকার প্রয়োজন। পিসীমার পরামর্শ লইয়া সে তাহার অর্দ্ধেক জমি বেচিয়া ফেলিল এবং ইহাতে যে টাকা পাইল তাহা দিয়া ছয়টী ভাল বলদ গরু কিনিল ও সমস্ত দেনাশোধ করিল। সে দুইখানি মাত্র হাল রাখিল। এবং আপনি ও এক কৃষাণ এই দুইজনে উহা চালাইতে লাগিল। বাপ বাঁচিয়া থাকিতে পরেশ কখনও নিজেরহাতে হাল ধরে নাই, কিন্তু এখন সে অবস্থা বুঝিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিল।

পরেশের অবস্থা খাট হইল বটে, কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিতে যে ফসল হইত, রাজার খাজানা এবং রাখাল ও কৃষাণের মাহিয়ানা দিয়া তাহাতেই তাহার বেশ চলিয়া যাইত। কেবল চলিয়া যাইত তাহা নহে। করুণাময়ী সুগৃহিণী, তাঁহার ব্যবস্থায় স্বজাতি অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক পরেশের বাড়ীতে আসিলেও পূর্ব্বের ন্যায় দুটী অন্ন পাইত।

(২)

পরেশের বিবাহের কথা বলা হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর বয়স এখন বিশ একুশ বৎসর। একটী ছেলে হইয়াছে, তাহার বয়স তিন চারি বৎসর হইবে। এই স্ত্রীপুত্র পরেশের শ্বশুর বাড়ীতেই থাকে। গোবিন্দ মণ্ডলের শ্রাদ্ধের পরে তাহারা আর পরেশের বাড়ীতে আসে নাই। শ্বশুরবাড়ীর লোকের সহিত পরেশের সদ্ভাব নাই।

পরেশের শ্বশুর গোবর্দ্ধন মণ্ডল একজন বড় গৃহস্থ। তাহার বাড়ী পরেশের বাড়ী হইতে তিন ক্রোশ দূরে গোয়ালপাড়া গ্রামে। গোবর্দ্ধনের পিতা গৌর মণ্ডল চাষীলোক ছিলেন। গোবর্দ্ধন সামান্য রূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, জমিদারের গোমস্তাগিরি করিয়া,' নিজের অবস্থা ফিরাইয়াছেন। এখন তিনি গোয়ালপাড়া গ্রামের দরপত্তনীদার। তাহার খামার জমি একশত বিঘারও বেশী। বাড়ীতে আট দশ জন কৃষাণ এবং দুইজন রাখাল।

গোবর্দ্ধনের চারিপুত্র এবং দুই কন্যা। পরেশের স্ত্রী ছোট।

ছেলেরা সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে। জ্যেষ্ঠ জমিদারের তহশীলদার এবং গ্রামের পঞ্চায়েৎ। মধ্যম হাতুড়ে ডাক্তার। তৃতীয় নামে স্কুলের মাষ্টার, কিন্তু কালে কলিকাতার কয়েকটী প্রতারক কোম্পানির মপস্বলের এজেণ্ট বা দালাল। চতুর্থ আদুরে গোপাল এবং গোঁয়ারের একশেষ। সে বাড়ীতেই থাকে। গোবর্দ্ধনের প্রথম জামাতা নিকটবর্ত্তী মহকুমার এক মোক্তারের মহুরি। দ্বিতীয় পরেশই নিরক্ষর কৃষক। গোবিন্দ মণ্ডলের অবস্থা ভাল এবং স্বজাতিসমাজে মানসম্ভ্রম ছিল বলিয়াই গোবর্দ্ধন তাহার একমাত্র পুত্র পরেশের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

গোবিন্দ মণ্ডলের মৃত্যুর পর হইতেই গোবর্দ্ধন ও তাহার স্ত্রীর ইচ্ছা যে পরেশ তাহার পৈত্রিকবাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া গোয়ালপাড়ায় বাসকরে। কিন্তু পরেশ তাহাতে কিছুতেই সম্মত নহে। পরেশের গরুগুলি মরিয়া গেলে গোবর্দ্ধন জিদ্ করিয়া বলিয়াছিলেন "আর কাজ নাই। তুমি তোমার পরাণপুরের বাস তুলে এস। দু'একজন প্রজার জমি ছাড়িয়ে নিয়ে পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমি আমিই তোমাকে দেবো। একটা বাড়ীও করে দেবো। পরাণপুরে যা কিছু আছে তা বেচে ফেল।"

পরেশ শ্বশুরের কোন সাহায্য লইত না গোয়ালপাড়ায় যাইতে একবারেই অস্বীকার করিল। সে একদিন হাসিতে হাসিতে তাহার পিসীর কাছে বলিয়াছিল শ্বশুর মশাই আমাকে আমার বাপের ভিটে ছেড়ে যেতে বলেন।" সে জানিত বৃদ্ধা করুণাময়ীর ইহাত সম্পূর্ণ অমত হইবে। করুণার কথাতে ও অমত প্রকাশ পাইল।

(৩)

পরেশ কিছুতেই গোয়ালপাড়ায় যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এবং শ্যালকেরা সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

পিতার মৃত্যুর পর পরেশ তিন চারিবার মাত্র শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। ইহাতেই সে বুঝিল যে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাহাকে সমুচিত আদর যত্ন করেন না বরং একটু ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ করেন। পরেশ এখন নিজের হাতে হাল চষে ইহা তাহারা সকলেই জানিতেন। তাহার ভায়রাভাই মাখন পরামাণিক মহকুমায় থাকিত এবং শ্বশুরবাড়ী আসিতে হইলে ফর্সা কাপড় চাদর ও ইস্ত্রি করা জামা পরিয়া আসিত। পরেশের কাপড় জামার আড়ম্বর কিছু মাত্র ছিল না। সে দেখিত মাখন এবং

সে একসময়ে শ্বশুর বাড়ীতে আসিলে তাহাদের দুইজনের আদর অভ্যর্থনা দুই প্রকার হইত বসিবার আসন এবং খাইবার বাসনও একরূপ হইত না।

মূর্খ পরেশের চক্ষে ইহা ভাল লাগিত না। সে মনে করিত মাখন এবং তাহার অবস্থার পার্থক্য যতই হউকনা কেন, শশুর বাড়ীতে দুই জামাতার একরূপ আদর হওয়াই উচিত তাহার শ্বশুর শাশুড়ী এবং শিক্ষিত শ্যালকেরা ইহা বুঝিতনা।

ভাবিয়া দেখিলে মাখন এবং পরেশে পার্থক্য অল্প নহে। মাখন সামান্য রূপ লেখা পড়া জানে এবং মূর্খ মক্কেলদিগকে বিলক্ষণ ঠকাইতে পারে। সময়ে সময়ে সে যাহার মহুরি সেই মোক্তারকেও ঠকায়। তাহার নাম করিয়া মক্কেলের নিকট হইতে টাকা লইয়া কতক তাহাকে দেয়, কতক নিজে আত্মসাৎ করে। মিথ্যাকথা বলিতে মাখনের সংকোচ নাই বলিলেই চলে, সে অনেকসময়ে মোকদ্দমাকারী লোকদিগকে মিথ্যাকথা শিখাইয়া দেয়। আর তাহার মোক্তারের কাছে মক্কেল আনিবার জন্য সততই মিথ্যা কথা কহে।

পরেশ লেখা পড়া জানেনা সত্য, কিন্তু সে জীবনে কখনও কাহাকেও ঠকায় নাই। মিথ্যাকথা অথবা কপট ব্যবহার তাহার জানা ছিল না।

পরেশের প্রতি শ্বশুর বাড়ীর এইরূপ ব্যবহারে একটীমাত্র লোক প্রাণে বড় ব্যথা পাইত—সে পরেশের স্ত্রী। কিন্তু পিতা মাতা অথবা বড় ভাইদের বিরুদ্ধে সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। সে দুই একবার শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিলে তাহার বাপ মা উভয়েই তাহাকে ধমক দিতেন।

পরেশ তাহার স্ত্রীকে লইতে চাহিলে তাহার শ্যালকেরা ঠাট্টার হাসি হাসিয়া কহিত "সেখানে গিয়ে আর কাজ নাই—মধ্যে মধ্যে এখানে এসেই দেখে যেও। সেখানে গিয়েত কেবল গরুর জাব কাটাবে ?"

ইহাতে পরেশের মুখ ম্লান হইয়া যাইত। সে কেবল মৃদুস্বরে কহিত "পিসীমা আর কতদিন সংসার চালাবেন ?"

শিক্ষিত শ্যালকেরা ইহার কোন উত্তর দিত না।

পরেশ শেষে শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই ছাড়িয়া দিল।

(৪)

একবৎসর হইল পরেশ শ্বশুরবাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে এমন একটী কাণ্ড হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে পরেশের প্রতি তাহার

শ্বশুর শ্বাশুড়ী এবং শ্যালক দিগের বিদ্বেষ বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুর্গোৎ-সব পূজার সময়ে গোবর্দ্ধন মণ্ডল তাহার এক কৃষাণের হাতে পরেশের জন্য একজোড়া কাপড় ও কিছু মিষ্টি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কাপড় যোড়াটী এমন ছিল যে তাহা জামাইকে না দিয়া চাকরকে দিলেই ঠিক হয়। পরেশ এই তত্ত্ব ফিরাইয়া দিয়াছেন, ইহাতেই আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

কাপড় লইয়া কৃষাণ ফিরিয়া আসিলে পরেশের শ্বশুর এবং শ্যালকগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং পরেশ ও তাহার পিসীর উদ্দেশে যারপরনাই গালিবর্ষণ করিলেন। সিদ্ধান্ত হইল যে, এ সেই বুড়ী মাগীর নষ্টামি।

গোবর্দ্ধন মণ্ডলের অবমাননা হইয়াছে শুনিয়া গোবর্দ্ধনের বাড়ীর লোক এবং গোয়ালপাড়া গ্রামের লোকও যে শুনিল, সেই রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল।

রাগিল না কেবল একজন কিন্তু কাঁদিল,—সে পরেশে স্ত্রী। তত্ত্বের কাপড় সে দেখিয়াছিল। ইহাও সে জানিত যে অন্যান্য বৎসর পিসীকে কাপড় দেওয়া হয়, এবার তাহা হয় নাই। অথচ এই তত্ত্ব যাইবার পূর্ব্বেই পরেশ তাহার স্ত্রী পুত্রের কাপড়ের সহিত শাশুড়ীর একখানি কাপড় দিয়াছে!

(৫)

ইহার কয়েক দিন পরেই একদিন পরেশ ও তাহার রাখাল মাঠে গিয়াছে, বুড়ী করুণাময়ী একা বাড়ীতে আছেন, এমন সময়ে সহসা পরেশের ছোট শালা বাইশ বৎসর বয়স্ক যুবক বিজয় ও গোয়ালপাড়া গ্রামের একজন প্রজা পরেশের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বিজয় বুড়ীকে দেখিয়া কহিল "মাওই ভাল আছ?" বুড়ী উত্তর করিলেন "ভগবান যেমন রেখেছেন। বউমাকে কি পাঠাবে না?"

বি। তাত পাঠাব। বলি, মণ্ডল মশাই কোথায়? (স্বগত) চাষাকেও মশাই বল্‌তে হ'ল! বাবা কি দেখে এমন জামাই করেছিলেন।

ক। সে মাঠে গেছে।

বি। মাঠে ত যাবেনই, বলি, পূজার তত্ত্ব ফিরান হ'ল কেন?

ক। সে সেই জানে।

বি। সে জানে আর তুমি জানদা?

ক। কেমন করে জানব? তোমাদের জামাই, তোমরা তত্ত্ব করেছ, সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বি। তার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সে আমার বাবাকে অপমান করে?

ক। সে কথা তার সঙ্গে বোঝ গিয়ে।

বি। তার সঙ্গে বুঝে কাজ নেই, তোমার সঙ্গেই বুঝ্‌বো। তোমার হুকুমেই ত সে সব কাজ করে।

ক। আমার সঙ্গে বুঝ্‌বে কি? বাড়ী চড়াও হয়ে মার্‌বে না কি?

বি। মার্‌লে কি হয়? আজ তোমাকে ঠ্যাঙ্গাব বলেই এসেছি। তুমি পরামর্শ না দিলে তোমার ভাইপোর এত সাহস হয় যে আমার বাবার তত্ত্ব ফিরিয়ে দেয়?

ইহার পর আর কথা হইল না। বিজয় এবং তাহার সঙ্গী একজন লোক নির্ম্মম ভাবে বুড়ীকে আক্রমণ করিল। দুই চারিঘা মারিতেই বুড়ী মাটিতে পড়িয়া গেল, এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনের রব শুনিয়া পাড়ার লোক দুই চারিজন আসিতে আসিতেই বিজয় এবং তাহার সঙ্গীগণ দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

(৬)

পাড়ার একজন লোক যাইয়া তখনই পরেশকে ডাকিয়া আনিল। পিসীর প্রতি এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে শুনিয়া পরেশ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিল।

পাড়ার লোকের শুশ্রূষায় করুণাময়ী তখন একটু সুস্থ হইয়াছেন। পরেশকে দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "বাবা, বড় সাধ করে বড় ঘরে তোমার বিয়ে দিয়েছিলাম। গোবিন্দ সেরে গেছে, কিন্তু আমিই তার প্রতিফল ভোগ কর্‌লাম।"

কথা গুলি পরেশের বুকে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। সে কহিল এখনই আমি পিসীমাকে নিয়ে মহকুমায় যাব। মহকুমায় না যেয়ে আমি জলগ্রহণ কর্‌বো না।

প্রতিবেশীরা সকলেই পরেশকে ভাল বাসিত এবং করুণাময়ীকে ভক্তি করিত। তাহারা সকলেই পরেশকে সাহায্য করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই একখানি ডুলির বন্দোবস্ত হইল। পরেশ পিসীকে লইয়া একজন প্রতিবেশীর সহিত মহকুমায় গেল।

সেই দিনেই মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাচারিতে বিজয় এবং তাহার সঙ্গী অপরিচিত লোকের নামে নালিশ হইল। করুণাময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে এজাহার দিলেন। পরেশ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয়ের নামে সমনের আদেশ দিলেন এবং করুণাময়ীকে সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তারবাবু ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন এবং কহিলেন আঘাত গুরুতর নহে কিন্তু বাদিনীর বয়স এবং অবস্থা বিবেচনায় ইহাকে নিতান্ত সামান্য বলা যায় না।

(৭)

বিজয় সমনে হাজির হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বা গ্রেপ্তারী পরোয়না বাহির করিলেন।

দ্বিতীয় ধার্য্যদিনের পূর্ব্বেই গোবর্দ্ধন মহকুমায় আসিলেন এবং মাখনকে সঙ্গে লইয়া দুই একজন মোক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিলেন এ মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। অপরাধ প্রমাণ হইলে ইহাতে আসামীর জেল হইবার কথা।

গোবর্দ্ধন চিন্তিত হইলেন এবং পরেশের মোক্তারের নিকট গেলেন। তিনি কহিলেন শালা ভগ্নীপতির মোকদ্দমা মিটিয়ে যাওয়াই ঠিক, কিন্তু পরেশ ইহা মিটাইতে রাজি হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

গোবর্দ্ধন দুই এক জন প্রধান মোক্তারকে অর্থ দিয়া বাধ্য করিয়া তাহাদের দিয়া পরেশের মোক্তারকে অনুরোধ করাইলেন এবং তিনি চিঠি লিখিয়া পরেশকে মহকুমায় আনাইলেন।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কথা শুনিয়াই পরেশ জ্বলিয়া উঠিল এবং মোক্তারকে কহিল "আপনি এই কথা বলেন? আমাকে দশ ঘা জুতো মার্‌লে আমি তা' সহ্য কর্ত্তাম, কিন্তু পিসীমাকে মার্! পিসী মা বাবার বড়—আর এখন আমার মা বাবা সবই তিনি। আমার পিসীর মত পিসী কি হয়?—আমি সর্ব্বনাশ হই সেও স্বীকার তবু এ মোকদ্দমার বিচার হ'ক। আপনি মোকদ্দমা না করেন না কর্‌বেন—হাকিমের কাছে কি বিচার হবে না?

পরেশ কাঁদিয়া ফেলিল।

গোবর্দ্ধন তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন এবং হাত ধরিলেন। শ্বশুরের অনুনয় বিনয়ে এবং মোক্তারদিগের বিশেষ অনুরোধে পরেশ শেষে কহিল, "পিসীমাকে না জিজ্ঞাসা করে আমি কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না।

গোবর্দ্ধন কহিলেন, তাকে যেয়ে বল মোকদ্দমায় তোমার যে খরচ হয়েছে তা আমি দেব আর বিজয় যেয়ে তাঁর পায়ে ধর্‌বে।

(৮)

বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া পরেশ পিসীমাকে সকল কথা কহিল এবং বলিল যে মোকদ্দমা মিটাইবার জন্য মহকুমার অনেক ভদ্রলোক অনুরোধ করিতে-ছেন।

করুণাময়ী কহিলেন, অদৃষ্টে যা' ছিল হয়েছে। তুমি ভদ্রলোকদের কথা রাখ। তাঁদের যেয়ে বল মোকদ্দমা মিটাইতে আমার আপত্তি নাই। খরচ পত্র কিছুই দিতে হবে না; বিজয়েরও এখানে আস্‌বার দরকার নাই। আমি কেবল এই চাই যে, বউমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয়।

পিসীমার আজ্ঞা পরেশের শিরোধার্য্য। সে যাইয়া মোক্তারকে পিসীর মত জানাইল।

গোবর্দ্ধন ইহা জানিলেন। তিনি কহিলেন কন্যাকে একবার না জিজ্ঞাসা করে এ কথার আমি উত্তর দিতে পার্‌বো না। বাড়ীর কাহারও তাহাকে সেখানে পাঠা'বার ইচ্ছা নাই।

গোবর্দ্ধনের মোক্তার তাহাকে বুঝাইলেন পরেশের প্রস্তাব খুবই ভাল। ইহাতে তাহার পিসীর প্রসংশা না করে থাকা যায় না। যদি ছেলেকে জেলে পাঠাইতে না চাও, তবে এখনই ইহাতে রাজী হও। মোকদ্দমা হইলে আসামীর কয়েদ হওয়া অবধারিত। বুড়ীর পিঠের দাগেই মোকদ্দমা প্রমাণ হবে। হাকিম এ মোকদ্দমা নিজের হাতে রেখেছেন। সাজা কঠিন হবে সন্দেহ নাই।

গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইয়া গেল।

(৯)

গোবর্দ্ধন বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর সম্মুখে কন্যাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহে কি না। কন্যা সকলই শুনিয়াছিল। সে কহিল "বাবা, আমি এখনই যাব। আপনারা পাঠা'তে চান না বলেই আমি কিছু বল্‌তে পারি না।

গোঃ। সেখানে যেয়ে ত কেবল রাখালের ভাত রাঁধ্‌বি আর মাঠে ভাত নিয়ে যাবি। তোর কি তোর ছেলের জন্যে হয় ত একটু দুধও জুট্‌বে না।

কন্যা। সেখানে গিয়া আমি শাক ভাত খেয়ে থাক্‌বো ছেলেকেও তাই খাওয়াবো। আপনাদের এই সুখ ঐশ্বর্য্যে আমার কি হবে?

কন্যার শেষের কথায় পিতা একটু চটিলেন। এবং কহিলেন তোর এমন বুদ্ধি তা জান্‌লে ত আগেই পাঠিয়ে দিতাম্।

কন্যা। উত্তর করিল আমি ত একদিনও এখানে থাকৃতে চাইনা। আপনারা আপনাদের জামাইয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা মনে কর্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না। আপনারা গুরুলোক কিন্তু আমার স্বামী গরিব বলে তাঁকে যেরূপ ভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন তা'তে আমি চিরদিন কাঁদবো। মাকে জিজ্ঞাসা করুন এখানে আমি কিরূপভাবে দিন কাটাই। আমি বউদের সঙ্গে মিশি না, দিদির কাছে বসি না, মা কোন ভাল জিনিষ দিলে খাই না। ভাল বিছানায় শুই না, এমন কি এক খানা ভাল কাপড় পরি না। এবারকার তত্ত্বে আমাদের বাড়ীতে যে কাপড় দিয়েছেন তা'ত আপনার কৃষাণরাই পরে। আর সেই কাপড় ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে আমার বুড়ী পিস্‌শাশুড়ীকে বাড়ীর উপর পড়ে মার্! তাঁর মত মানুষ কি হয়? তিনি ত আমার সেখানে যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই চান নাই। দয়া করে আজই আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিন্। আমি আপনাদের দেওয়া কাপড়-চোপড় একখানিও নেব না আমার শ্বশুরের দেওয়া একখানা কাপড় তুলে রেখেছি তাই পরে শ্বশুরবাড়ী চলে যাব।

গোবর্দ্ধন কন্যার এই তীব্র অনুযোগের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার গর্ব্বিতা গৃহিণী কন্যাকে তিরস্কারের ভাষায় কহিলেন এতদিন খাইয়ে পরিয়ে এই তার পুরস্কার?

কন্যার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে মাতার মুখ অপেক্ষা না করিয়া কহিল যখন গর্ভে ধরেছ তখন ত খাওয়াবেই। বাপ মার ঋণ কেউ কখনও শোধ করিতে পারে না। আমি ত কতদিন যেতে চেয়েছি কিন্তু আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর তোমাদের বাড়ীতে থাব না। তোমরা না পাঠাও, আমি হেঁটে চলে যাব।

কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া এবং বিজয়কে জেল হইতে বাঁচাইবার জন্য গোবর্দ্ধন সেই দিনই কন্যাকে পরেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। মোকর্দ্দমা মিটিয়া গেল।

(১০)

আজ আট-দশ দিন পরেশের স্ত্রী শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছে। ফাল্গুনমাস গত রাত্রে বেশ এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠে "যো" পড়িয়াছে, অর্থাৎ এই বৃষ্টিতে জমি চাষের উপযুক্ত হইয়াছে। আজ সকল চাষাই— তাহাদের যত জমিতে পারে লাঙ্গল দিবে।

পরেশ প্রত্যূষেই লাঙ্গল গরু লইয়া কৃষাণের সহিত মাঠে গিয়াছে। পিসীকে বলিয়া গিয়াছে রাখাল আসিবে মাঠে ভাত পাঠাইয়া দিও। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে রাখাল বাড়ী আসিল। পরেশের স্ত্রী আসিয়া অবধি একদিনও পিসীকে রাঁধিতে দেয় নাই। সে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। করুণাময়ী কহিল রাখালের সঙ্গে আমি ভাত নিয়ে যাই। জিদ্ করিল আমি যাব। বুড়ি কহিল যে ক'দিন আমি আছি সে ক'দিন তোমাকে মাঠে যেতে হবে না এর পর যেও। বউ কিছুতেই শুনিল না। রাখালের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে চলিল। চারি বৎসরের শিশু পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল। মাকে ছাড়িয়া সে কিছুতেই বাড়ীতে থাকিতে রাজি হইল না। বৃদ্ধা অনেক করিয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না।

পরেশ যে জমিতে চাষ দিতে ছিল তাহার পাশে একটী বড় আম বাগান, নিকটে একটি পুকুর। বাড়ী হইতে জমিতে যাইতে হইলে এই আম বাগান পার হইয়া যাইতে হয়। পরেশের স্ত্রী-পুত্র ও রাখাল চলিয়া গেলে করুণাময়ী বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। তিনিঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মাঠের দিকে চলিলেন, এবং রাখাল ও বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহারা দেখিতে না পায় এমন ভাবে সেই আম বাগানের ভিতর একটি গাছের আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

পরেশ ও তাহার কৃষাণ ক্ষুধার্ত্ত। তাহারা তাড়াতাড়ি পুকুরের জলে হাত পা ধুইয়া খাইতে বসিল। রাখাল বাড়ী হইতেই খাইয়া গিয়াছিল। পরেশের স্ত্রী স্বামী এবং কৃষাণের পাতায় অন্ন দিয়াছে। সে দেখিল পরেশের বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। পানীয় জল বাড়ী হইতে আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা নষ্ট করা হইবে না। সে পরেশের মাঠের ব্যবহার্য্য একটী মাটীর ভাঁড় লইয়া পুকুর হইতে জল আনিল এবং নিজে অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া আস্তে আস্তে আহারে উপবিষ্ট স্বামীর হাত

ধোয়াইয়া দিল। সে যখন অঞ্চল দিয়া উহা মুছাইতে লাগিল, তখন আম বাগানে দণ্ডায়মানা করুণাময়ীর চক্ষু দিয়া আনন্দ অশ্রুর প্রবাহ ছুটিল।

চারি বৎসরের বালক পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে আর বলিতেছে বাবা, আমি খাব, আমি খাব।

পরেশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "ও খায় নাই?" বধূ ঘাড় বাঁকাইয়া জানাইল, হাঁ খাইয়াছে।

পরেশ বলিল তা হলে আর দেব না।

পিসী আর অন্তরালে থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পরেশের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন "তুই দে দুটো ভাত, আমি ওকে খাওয়াই।"

শ্বাশুড়ীকে দেখিয়া বধূ সরিয়া গেল।

পরেশের পিসী শিশুর মুখে অন্ন দিতে দিতে পুলকে অধীর হইয়া কহিলেন, "বাবা আজ আমার গায়ের মারের দাগ মিটে গেল।"

গোবর্দ্ধন গোয়ালপাড়ার দরপত্তনীদার হইলেও তুমি ত এখনও মাঠে যাও, একবার এই দৃশ্য দেখিবে এস! তোমার চারি পুত্র এবং বড় জামাতা মাঠের ধার ধারে না। পুত্রদের একজন তহশিলদার, এবং পঞ্চায়েতরূপে প্রজার প্রতি পীড়ন করে, দ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া জল বেচে, তৃতীয় নানাপ্রকারে লোক ঠকায়, চতুর্থ নিরপরাধা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলে। বড় জামাতার গুণও তুমি না জান এমন নহে। তোমার ছোট জামাতা পরাণপুরের এই কৃষক পরেশ বর্ণজ্ঞানবিহীন সত্য, কিন্তু সে কি সত্যসত্যই ইহাদের কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট? আর তোমার এই কনিষ্ঠা কন্যা— তোমার গর্ব্বস্ফীত গৃহে প্রতিপালিতা হইলেও সে কি "গোবরে পদ্মফুল" নহে?

উপসংহার।

পরেশের পিসী আর অধিক দিন বাঁচেন নাই। তিনি যেন বধূকে সংসার বুঝাইয়া দিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পিসীর মৃত্যুকালে পরেশ তাঁহাকে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধেও গোবিন্দ মণ্ডলের শ্রাদ্ধের সমান ব্যয় করিয়াছিল। গ্রামস্থ স্বজাতি এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধনের তিন পুত্র এবং মাখম আসিয়া এই শ্রাদ্ধে যোগ দিয়াছিল।

বিজয় তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। করুণাময়ীকে প্রহার করিবার কিছু দিন পরেই তাহার পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই।

অজ্ঞ লোকের কেমন এক এক ধারণা জানি না। গোয়ালপাড়া এবং পরাণপুরের অনেক লোকেরই বিশ্বাস এই যে পরেশের পিসীকে প্রহার করাই বিজয়ের এই পীড়ার কারণ। তাহারা বলে "বুড়ী না বলিলেও বিজয়ের একবার যাইয়া তাঁহার পায়ে ধরা এবং ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত ছিল।"

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন।

বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালীর সম্মান, ন্যায়শাস্ত্রের জন্য। এক নব্যন্যায়ের অবদাত গুণের মাহাত্ম্যে ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিত সমাজ, বাঙ্গালাকে —বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে—ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই ন্যায়শাস্ত্র আজ একমাত্র যাঁহার প্রসাদে উজ্জীবিত রহিয়াছে, যাঁহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আজও আমরা বাঙ্গালার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গৌরব অনুভব করি, সেই পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পবিত্র জীবনের দুই একটী কথা, অদ্য "সাহিত্যের" পাঠক পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিব।

শাস্ত্রানুরাগ

ন্যায়রত্ন মহাশয় একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল অদম্য অধ্যবসায়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। এক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ব্যতীত সম্ভবতঃ দ্বিতীয় আর কেহ এত দীর্ঘকাল পাঠনা-ব্রত অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় এক্ষণে নবতিবর্ষদেশীয় বৃদ্ধ; কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রালোচনা ব্যসনের উৎসাহ দেখিলে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়। শিষ্য শ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। শাস্ত্রমার্গে তিনি যেন—

"রণে পর্য্যচরদ্ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।"

শাস্ত্রের কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে এই বৃদ্ধ শরীর লইয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আর এক বিচিত্র ক্ষমতা এই, তিনি এক গ্রন্থ যতবার

পড়ান, ততবারই তাহা হইতে নূতন মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। "ভাষা-পরিচ্ছেদ" পড়াইবার সময়েও তিনি নূতন ভাবে চিন্তা করেন, এবং তাঁহার সেই মার্জ্জিত নূতন চিন্তার ফলে প্রত্যেক বারই গ্রন্থের নূতন কিছু রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

কেবল মৌখিক অধ্যাপনা নহে, এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া ন্যায় শাস্ত্রের নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়া নির্ভীক ভাবে "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" "মায়াবাদ নিরাস" প্রভৃতি বিচারপূর্ণ পুস্তক লিখিতেছেন, এমন কি, স্বসম্প্রদায়গুরু রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্যের পর্য্যন্ত ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া "ন্যূনতাবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে সকল শাস্ত্রের মীমাংসা করিবার ক্ষমতা ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্যতীত আর দ্বিতীয় কাহারও আছে কি না, জানি না। এ স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। শ্রীহর্ষ প্রণীত "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামক দার্শনিক গ্রন্থ অত্যন্ত দুরূহ এবং বঙ্গদেশে অপ্রচলিত প্রায়। "অবিকল্পবিষয় একঃ স্থাণুঃ পুরুষঃ শ্রুতোঽস্তি যঃ শ্রুতিষু। ঈশ্বরমুময়া ন পরং বন্দেঽমুময়াপি তমধিগতম্॥" "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" এই মঙ্গলাচরণাত্মক প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার আনন্দপূর্ণ, স্বকৃত 'বিদ্যাসাগরী' নামক প্রসিদ্ধ টীকায় ঈশ্বরসদ্ভাবের প্রামাণ্যবোধক একটী অনুমান-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন (১)। অনেকদিন হইতেই কাশীর পণ্ডিতসমাজে এই অনুমান-বাক্যটী অসংলগ্নরূপে চলিয়া আসিতেছিল। কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ নানা অধ্যাপকের মধ্যে একজনও ঐ জটিল অনুমান-বাক্যে সাধ্য, হেতুপক্ষের উদ্ধার বা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে অধ্যাপক সম্প্রদায়ে টীকার ঐ স্থলটী অশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

একদিন সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ শাস্ত্রী, কথাপ্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ঐ অনুমানের কথা বলেন এবং উহা যে অদ্যাপি অধ্যাপক সমাজে অসংলগ্ন পাঠ বলিয়া গণ্য, তাহারও উল্লেখ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত অধ্যাপককে টীকার অনুমাম-বাক্যটী লিখিয়া যাইতে বলিলেন। তা'র পর তিনি একদিন পদ্মনাভ শাস্ত্রীকে ডাকাইয়া

(১) "ইয়ং পৃথিবী সকর্ত্তৃকাকর্ত্তৃক বৃত্তিত্বরহিতানেকাকর্ত্তৃক বৃত্তিত্বরহিতানেক তন্নিষ্ঠাধিকরণং মেয়ত্বাৎ, ঘটবৎ।"

উক্ত অনুমান বাক্যের সুন্দর মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। শাস্ত্রীজী আনন্দে অধীর হইয়া বার বার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরণস্পর্শ করিতে লাগিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন পরিশিষ্ট" গ্রন্থের প্রথমে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের" টীকায় লিখিত উক্ত অনুমান-বাক্য সংলগ্ন করিবার বিশদ্ বিচার-প্রণালী মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন,—"ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অভিনব আবিষ্কার এই বিচার-শৈলী দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহার গৃহে ঐ স্থান সংলগ্ন করিবার কোনও প্রাচীন পুঁথি ছিল।" মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এখন "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" পড়াইবার সময়ে ন্যায়রত্নমহাশয়ের কৃত উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থও ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ অনন্যসামান্য শাস্ত্রীয় প্রতিভার বিকাশ বাল্য-কাল হইতেই লক্ষিত হইয়াছিল। সাতক্ষীরার জমীদার দেবনাথ চৌধুরির বাড়ীতে রামনবমীর উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। একবার সেই পণ্ডিত-সভায় বালক রাখালদাস, ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তৎকালিক সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺রামদাস তর্কবাচস্পতির নিকট পূর্ব্ব-পক্ষ করেন। তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাঠ্যাবস্থা, পিতার নিমন্ত্রণে প্রতিনিধি হইয়া সভায় গিয়াছিলেন। তর্ক বাচস্পতি মহাশয় পূর্ব্বপক্ষের সদুত্তর করিতে না পারিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই বলেন,—"তুমি ত কেবল পূর্ব্বপক্ষ করিতেই শিখিয়াছ, উত্তর করিতে ত আর পার না।" সপ্রতিভ ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আপনারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, আমার কাছে ত আর পূর্ব্বপক্ষ করিবেন না, যদি করেন ত চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।" একজন অধ্যয়নশীল বালকের পক্ষে এরূপ সাহসের কথা বলা সত্যই বিস্ময়াবহ।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথম অবস্থায় নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ৺ গোলোক নাথ ন্যায়রত্নের সহিত অনেক সভাতেই সোৎসাহে বিচার করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বিচারেই বিজয়যশোমাল্যে ভূষিত হইয়াছেন। গোলোক ন্যায়রত্ন, বালক রাখালদাসের অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় নবদ্বীপে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডিত্যের

আত্মচিন্তার উপর নির্ভর করে, গুরুপদেশ অন্যতম সহায় মাত্র; সুতরাং নবদ্বীপে যাইবার প্রয়োজন দেখি না।"

বাঙ্গালায় অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বদেশীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের নিকট ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় সম্মান. এমন অনাবিল সম্মান লাভ, অল্প পণ্ডিতের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কাশীর যাবতীয় প্রধান পণ্ডিত, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন।

দুইবৎসর পূর্ব্বে কাশীনরেশের মাতার সপিণ্ডীকরনোপলক্ষে বারাণসীর প্রধান প্রধান শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহূত হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিগ্রহ না করিলেও মহারাজ বাহাদুর প্রত্যেক কার্য্যেই রাজকীয় শিবিকা প্রেরণ করিয়া সভাক্ষেত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শুভাগমনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে বহুমূল্য মখমলের আসনে ন্যায়রত্ন মহাশয় বসিয়া আছেন; অদূরে বিস্তৃত প্রাঙ্গনে পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছে। রাজার অপর পার্শ্বে আরও দুই তিন খানি আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। এমন সময়ে সেস্থলে মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী সি, আই, ই, আগমন করিলেন। তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক আসনে না বসিয়া ভূপৃষ্ঠেই উপবিষ্ট হইলেন। একজন বরণীয় অধ্যাপককে এই ভাবে মাটিতে বসিতে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারিগণ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী-মহাশয়কে আসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি রাজার সমক্ষে অম্লানবদনে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গুরুর সম্মুখে আসনে বসিব কেমন করিয়া?"

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, সমাগত রাজা মহারাজদিগের নিকট 'গৌতম কনাদের মূর্ত্তি' বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিচয় দিতেন। ইদানীন্তন দণ্ডীসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় অসাধারণ বিদ্বান্ স্বামী মনীষানন্দ, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, তাহা স্বামীজীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ না করিলে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

স্বর্গীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে স্বপরিবার-ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ভালবাসিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় পাঠ সমাপ্তির পর চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয় ভার, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একজন প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর কাল মাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ

সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রবৃন্দের প্রতিপালনে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজেই যখন সমর্থ হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থ সাহায্য লইতে বিরত হইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ অপ্রতারকতা ও অস্বার্থপরতা অনুভব করিয়া পরগুণমুগ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়, আজীবন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের বা পরিজনের পীড়াদি নিবন্ধন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইলে বাড়ীভাড়া, চিকিৎসার ব্যয় প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পন্ন করিতেন।

কেবল অর্থসাহায্য নহে, সময়ে সময়ে সৎপরামর্শ দিয়াও মহাত্মা বিদ্যাসাগর, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঐকান্তিক হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিতেন। নৈয়ায়িকপ্রধান ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের নৈয়ায়িক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"দেখ ন্যায়রত্ন, তোমার ন্যায় একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলে তাহা কলেজের পক্ষে গৌরবজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা আমি ভাল মনে করি না। চাকরী করিলে তুমি তখন তোমার এই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতার স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না।" ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই হিতোপদেশ সাদরে গ্রহণ করিলেন,—তিনি সংস্কৃত কলেজের চাকরী লইতে সম্মত হইলেন না। তখন ৺ প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় চাকরী গ্রহণ করিলে সম্ভবতঃ এমন দেশব্যাপিনী পবিত্র কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেন না।

ছাত্রপ্রীতি।

ন্যায়রত্নমহাশয় ছাত্রবৃন্দকে নিজের কন্যা দৌহিত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। এমন ছাত্রপ্রীতি প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত ছাত্রগণের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। বাড়ীতে কোনও ভাল সামগ্রী প্রস্তুত হইলে, বিদেশ হইতে কোনও ভাল ফলমূলাদি আসিলে আগে ছাত্রদিগকে দিয়া পরে নিজে আহার করিয়া থাকেন। কোটালিপাড়ানিবাসী পণ্ডিতপ্রধান মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের মুখে

শুনিয়াছি, তিনি যখন ভট্টপল্লীতে থাকিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে অধ্যয়ন করেন, সে সময়ে পুঁটিয়ার রাজবাড়ী হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এক নিমন্ত্রণ-পত্র আসে। ন্যায়রত্ন মহাশয় জ্যেষ্ঠতাতকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। যথা-সময়ে তাঁহারা পুঁটিয়ায় পঁহুছিলেন। নিমন্ত্রিত অধ্যাপকদিগকে খাদ্য-সামগ্রী এবং বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘৃত তণ্ডুলাদির সহিত এক বৃহৎ রোহিত মৎস্যও প্রেরিত হইয়াছিল। মৎস্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মাছটী ফিরাইয়া লইয়া যান, আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৎস্যমাংসত্যাগী।" "ন্যায়রত্ন মহাশয় নিকটেই ছিলেন; তিনি বলিলেন, "না, না, মাছ থাকুক, আমার প্রয়োজন আছে।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় জ্যেষ্ঠতাতকে বলিলেন, "দেখ দ্বারিক, যে গৃহস্থের বাড়ীতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা-দিগকে বল যে, খানিকটা ঝোলের মাছ এবং মুড়োটা আমাদিগকে দিয়া বাকি মাছ তাহারা লউক, আর তাহাদের নিকট হইতে মাছ রাঁধিবার একটা কড়া চাহিয়া আন।" ছাত্র গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। "দ্বারিক, তোমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, মাছ ভালবাস, তাই মাছটী ফিরাইয়া দিলাম না। আজ আমি তোমাকে মাছ রাঁধিয়া খাওয়াইব।"—বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই মাছ ও মুড়ো দিয়া ঝোল রাঁধিলেন। তা'র পর স্নান করিয়া আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া উভয়ে পরমানন্দে আহারে বসিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এখনও তিনি অধ্যাপনান্তে বিশ্রামসময়ে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র-সমূহ এবং মন্তব্যপ্রদানার্থ উপহৃত পুস্তকাবলী নিয়মিতভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষার লেখকদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের রচনার প্রতি তিনি সমধিক পক্ষপাতী। দাশরথি রায়ের অনেক সুন্দর সুন্দর ছড়া ও গান তাঁহার মুখস্থ আছে। পাঁচালী শুনিয়া অনেক সভাতেই ন্যায়রত্ন মহাশয় দাশরথি রায়ের সহিত কোলাকুলি করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগ।

দাশরথি রায়ও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। একবার চুঁচুড়ার বারোয়ারীতে পাঁচালীর বায়না লইয়া দাশুরায় গায়িতে আসিয়া-

ছিলেন। যে দিন রাত্রিতে পাঁচালী গায়িবার নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত হইয়াছে, সেইদিন প্রাতঃকালে দাশুরায় দলবল সহ নৌকাযোগে ভট্টপল্লীর নিকটবর্ত্তী মাঠে প্রাতঃকৃত্যের জন্য আসিয়াছিলেন। দাশরথি রায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিলে তিনি বলিলেন, "আজ আর ওপারে যাইতে পারিবে না, আমাদের ভাটপাড়ায় পাঁচালী গায়িতে হইবে।" দাশুরায় বলিলেন,—"বলেন কি ন্যায়রত্ন মহাশয়?—আমি আজ রাত্রে গায়িবার জন্য চুঁচড়ায় বায়না লইয়াছি।" ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন, "আজ ওপারে তোমার পাঁচালী না হইলে কর্ম্মকর্ত্তারা রাগ করিবেন সত্য, কিন্তু সে রাগ 'ক্ষণিক', তুমি কাল গিয়া পাঁচালী আরম্ভ করিলেই আর কাহারও ক্রোধ বা ক্ষোভ প্রকাশ করিবার অবকাশ থাকিবে না।" তখন দাশু রায় দলের লোকদিগকে বলিলেন, "যখন ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন, তখন আজ এইখানেই পাঁচালী গায়িতে হইবে, ওপারে আর যাইব না।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" ও নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে"র প্রশংসা করিয়া থাকেন। "বৃত্রসংহারে"র চতুর্থ সর্গের শচীর—

"ভ্রান্তি যদি হ'ত কভু"

ইত্যাদি উক্তি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজেও প্রথম জীবনে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গান ও ছড়া রচনা করিয়াছেন। সে সমুদয় সংগৃহীত নাই,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্কলিত "কাশীবাস" নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কৃত কয়েকটী বাঙ্গালা গান ও "আগমনী" নামক পাঁচালীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অসাধারণ কবিত্বশক্তির কথা পণ্ডিতসমাজে সুপরিজ্ঞাত। তিনি নানা বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "কবিতাবলী" ও "রসরত্ন" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসার্থ যাত্রা করেন, তখন নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া জন্মভূমির অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

স্বদেশপ্রেম।

"আবাল্যং জননীব জীবয়সি মামারোগ্য হৃৎপঞ্জরং
স্বচ্ছন্দং বশবর্ত্তিনীব মধুরৈর্মূলৈঃ পয়োভিঃ ফলৈঃ।

বিম্বাদিপরিগ্রহেণ চ কদা বাধাপি জাতা ন তে
ক্রোড়ে ক্রীড়নমদ্য বঙ্গবসুধে মুঞ্চামানুজ্ঞায়তাম্ ॥"

"বাল্য হ'তে দাসে তুমি পালিতেছ বঙ্গভূমি
স্নেহময়ী জননীর প্রায়,
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখ, সদা যেন বশে থাক,
তব ঋণ শোধা কি মা যায়।
দিয়াছ মা অনিবার ফল-মূল-পয়োধর
হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর,

মাগো ওই কোলে কত মল-মূত্র অবিরত
ঢালিয়াছি বাধা নাই তোর।
আজি হ'তে তোর ছেলে স্নেহময়ি তোর কোলে
ধূলা-খেলা করে সমাপন,
সন্তানেরে ওমা তুমি আজ্ঞা দাও বঙ্গভূমি
কাশীধামে চ'লেছি এখন।

৺হরকুমার শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।

বর্ত্তমান কালের দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যসমাজে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় ধৈর্য্য অতি অল্প লোকেরই দেখিয়াছি। ১৩১৩ সালের ৫ই বৈশাখ তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺হরকুমার শাস্ত্রীর কাশীলাভ হয়। হরকুমারের ন্যায় নানাগুণ-সম্পন্ন, সুকবি, সুপণ্ডিত পুত্রের বিয়োগেও তিনি হিমালয়ের মত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন। অন্তিমকালে তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুত্রের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরকুমারের শ্রাদ্ধের পরদিন হইতেই তিনি যথানিয়মে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ভীষণ-শোক-জর্জ্জর দেহ লইয়া তিনি গভীর চিন্তাসাপেক্ষ "ন্যূনতাবাদ" প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের জটিল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শোকসময়ের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়। তিনি বলেন, "পারমার্থিক হিসাবে যাহাই হউক, লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলেও শোক প্রকাশ করা একান্ত অনুচিত। শোকে অধীর হইলে একত শত্রু হাসে; দ্বিতীয়তঃ, সুহৃদ্ বন্ধুর হৃদয়ে বেদনা জাগাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বিয়োগব্যথা প্রকাশ করিতে নাই। শোক-রাক্ষসকে জয় করাই যথার্থ বীরত্ব।"

বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে অভিমত।

দেশ হইতে প্রকৃত পাণ্ডিত্য নির্ব্বাসিত হইতে চলিল বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যারপর নাই খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন,—"আজকাল কেবল পল্লবগ্রাহীর দল পুষ্ট হইতেছে, আর সেকালের মত একটীও গভীর পণ্ডিত দেখিতে পাই না। সকলেই পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য লালায়িত, পাণ্ডিত্য-অর্জ্জনের স্পৃহা কাহারও নাই। ন্যায়শাস্ত্রের আজ কি অধোগতিই হইয়াছে! রামদাস তর্কবাচস্পতি, হলধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীরাম শিরোমণি, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত, জয়-নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতিকে দেখিয়াছি, আমাদের সময়েও রামধন তর্ক-

পঞ্চানন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, ভুবন বিদ্যারত্ন, গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি আমরা বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া সভাক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত! ইদানীন্তন নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক প্রাণীরও সূক্ষ্ম পরিদর্শনের সামর্থ্য নাই, 'কালীশঙ্করী' ও 'গোলোকী' পত্রিকা মুখস্থ করাই নৈয়ায়িকত্বের চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে!"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বৎসর রাজত্ব কাল পূর্ণ হইলে 'জুবিলী' উৎসব উপলক্ষে গভর্মেণ্ট ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ দেশের আট জন প্রধান অধ্যাপককে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিভূষণে সর্ব্বপ্রথম ভূষিত করেন। এক্ষণে এক ন্যায়রত্ন ব্যতীত প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাই। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ই প্রথম মহামহোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি প্রয়োজন নাই ব'লিয়া গভর্মেণ্টের নবনির্দ্ধারিত মহামহোপাধ্যায়-উপাধিধারীর প্রাপ্য ১০০৲ শত টাকা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই।

ত্যাগশীলতা।

বঙ্গের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সর্ব্বভৌম প্রমুখ যাঁহার ছাত্র, শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি যাঁহার ছাত্রের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত, বাঙ্গালায় ন্যায়শাস্ত্রের পীঠস্থান নবদ্বীপের সম্প্রদায় হইতেও যাঁহার ছাত্রসম্প্রদায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সাক্ষাৎ গৌতম কণাদের অবতার সেই পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিচয়-প্রদান মাসিক পত্রের কলেবরে সম্ভবপর নহে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এখনও তিনি কিছুদিন জীবিত থাকুন, বাঙ্গলার—ভারতের পাণ্ডিত্যগৌরব কিছুকাল অব্যাহতভাবে বিরাজ করুক।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

সেকালের কথা।

২

সেকালে বেশী বয়সের লোকের মাথায় লম্বা চুল থাকিত না; তাঁহাদিগের কপালের কিয়দংশ কামান হইত। উড়ে ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মত সেকালের

ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মাথায় চুল রাখিতেন। কেহ কেহ শিখামাত্র রাখিয়া সমস্ত মুণ্ডন করিতেন। সেকালে তেল মাখিবার পদ্ধতিটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনেককেই চাকরে তেল মাখাইয়া দিত। মেয়েরা নারিকেলের তেল মাখিত, মাথাঘষা মাখিয়া মাথা ঘষিয়া ফেলিত। তাহারা আগে খৈল বেসন দিয়া গা রগড়াইয়া পরে আবার দুধের সরে জাফ্‌রান বাটিয়া তাহা দ্বারা গা ঘষিয়া গা ধুইয়া ফেলিত। সেকালে সাবানের প্রচলন ছিল না। প্রথমে যখন দেশে সাবানের আমদানী হয়, তখন বৃদ্ধেরা রটাইয়াছিলেন,—"গাধার বিষ্ঠায় সাবান প্রস্তুত হয়।" সেই জন্য প্রথম প্রথম কেহই সাবান স্পর্শও করিত না। বিধবারা রুক্ষ স্নান করিতেন; তাঁহাদিগের মাথা ও গা ঘষিবার রীতি ছিল না; তাঁহাদিগের মাথায় লম্বা চুলও থাকিত না। তাঁহাদের অনেকেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান করিতেন; বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে সকলেরই প্রাতঃস্নান করার নিয়ম ছিল। তাঁহারা সেই তিন মাসে প্রতিদিন বিষ্ণুর বা অন্য দেবতার সহস্র নাম শ্রবণ ও এক একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতেন। অন্য সময়েও তাঁহাদিগের দ্বাদশীতে একটি ভোজ্য উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবার নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বাদশীতে দুই তিন বাড়ীর নিমন্ত্রণ পাইয়া এক বাড়ীতে যাইয়া প্রায়ই অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করিতে হইত। বিধবারাই ছিলেন গৃহকর্ত্রী। প্রত্যেক বাড়ীতে মা, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসীমা, মাসীমা, কাকীমা, জেঠাইমা, ভগিনী, বা শাশুড়ী, কেহ না কেহ থাকিতেন। সেকালে কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, বাড়ীর সেই বিধবার ভয়ে কর্ত্তা ও গৃহিণী সর্ব্বদা জড়-সড় থাকিত। একালের মত সেকালের বিধবারা পাচিকার কার্য্য করিতেন না;তাঁহাদিগেরই হুকুমে সেকালের বধূরা দিনরাত খাটিত। সেকালের বিধবারা গরদ বা তসর পরিয়া গায়ে নামাবলী দিয়া, ঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা,জপ তপস্যায় দিন কাটাইতেন। তাঁহাদিগের মুখে ও শরীরে কেমন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত, দেখিলে পাষণ্ডেরও মনে ভয় ও ভক্তির উদয় হইত।

সেকালে প্রত্যেক বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ ত লাগিয়াই থাকিত; প্রত্যেক গৃহস্থকেই পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহীর শ্রাদ্ধ, মহালয়া বা দীপান্বিতায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও নবান্ন করিতে হইত। তাহার উপর আবার বিধবাদিগের নানাবিধ কাম্য কর্ম্ম ছিল।

আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইয়াও তত ব্রত উপবাসের নাম জানি না। আজ কি

না অশ্বত্থ-প্রতিষ্ঠা, কাল কি না পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা,পরশ্বঃ কি না মঠ-প্রতিষ্ঠা, শিব-স্থাপন, একটা একটা লাগিয়াই আছে। ইহার উপরে বৈশাখ, কার্ত্তিক, মাঘ মাসে পাড়ার কোন এক বাড়ীতে সেই বাড়ীর বিধবার ইচ্ছায় সকালে রামায়ণ, মহাভারত, বা অন্য কোন পুরাণের পারায়ণ, বৈকালে কথকের মুখে তাহার কথা বা পণ্ডিতের মুখে ব্যাখ্যা হইত। পাড়ার সকলে গিয়া তাহা শুনিত। তহা দ্বারা পুরুষ, মেয়ে, এমন কি, বালক বালিকার পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, নীতি শিখিবার সুবিধা হইত। কোন্ তিথিতে কি খাইতে নাই, কোন বারে কি করিতে নাই, কোন তিথিতে কি করিতে আছে, কোন বারে কি করিতে আছে, তখনকার মেয়েরা পর্য্যন্ত জানিতেন। তখনকার মেয়েরা লেখাপড়া না শিখিয়াও অশৌচের ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিতেন। সেকালের মেয়েকে মন্ত্র পড়াইতে যাইয়া পুরোহিত থতমত খাইতেন। সেকালের মেয়েদিগের মুখের শুদ্ধ মন্ত্র ও শুদ্ধ স্তব, কবচ শুনিয়া একালের শিক্ষিতদিগের উচ্চারিত হ্রস্বদীর্ঘশূন্য একটানা উচ্চারণের হাত-পা-ভাঙ্গা সংস্কৃত কবিতা শুনিলে দুঃখিত হইতে হয়। যাহা হউক, আমি দুর্গাপূজা-প্রসঙ্গে সেকালের চিত্র দেখাইব, এই জন্য অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম; বাকী আছে, দুর্গাপূজায় বালকবালিকাদিগের উৎসাহের কথা; তাহা বলিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে কেবল রাঙ্গা কাপড়, রাঙ্গা খড়ম পাইবার জন্যই উৎসাহিত হইত; এবং তাহা পাইয়াই যে কেবল তৃপ্ত হইত—বলিতে পারি না। তাহারা বেলবরণের দিন হইতেই নানা স্থান হইতে তুলিয়া ও কুড়াইয়া রাশি রাশি ফুল আনিত। পূজার সময়ে ও সন্ধ্যাআরতির সময়ে পূজাস্থানের চারিদিকে ঘুরিত, ফিরিত; ধূপচি জ্বালাইয়া দিত; নির্ব্বাণোন্মুখ ধূপচির উপরে ফুঁ দিত, বাতাস করিত; একদীপা, পঞ্চপ্রদীপ বরণডালার বাতি জ্বালিয়া ও উস্কাইয়া দিত; পুরোহিতের ঘণ্টানাদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল ও শাঁখ বাজাইত; অনুপনীত বালকও অঞ্জলি দিবার জন্য জেদ ধরিত। প্রাতে, সন্ধ্যায় আরতির পরে, বলির পরে তাহারা গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিত। চরণামৃতপানের জন্য, ভোগের প্রসাদ খাইবার জন্য তাহাদিগের হুড়োহুড়ি দেখে কে? আবার বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমা বাহির করিবার সময়ে তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইত। হইতে পারে—দেখাদেখি এই সকল কাজে তাহাদিগের উৎসাহ, হইতে পারে—কিন্তু কেবলমাত্র তাহা বলিতে পারি না। বলিতে হইবে, পিতা মাতার সেইরূপ আচার আচরণ দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়েও

একটা অস্ফুট ভক্তির সঞ্চার হইত; একটা অস্ফুট ভক্তির ছায়া পড়িত; সেই ভক্তির বীজ হইতে অজ্ঞাতসারে তাহার অঙ্কুর একটু আধটু করিয়া ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিত। স্কুল কালেজের শিক্ষায় গড়িতে পারে না, ভাঙ্গিতে পারে। মাতা পিতার আচার আচরণ দেখিয়া শিখিয়া মানুষ গঠিত হয়।

ছোট বেলার কথা মনে পড়িতেছে। একদিন একটী বালক মাতার কোলে শুইয়া মাতার মুখে নানা কথা শুনিতেছিল। বালক জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মা, গ্রামের জমীদার বড়লোক, সকলে তাহাকে ভয় করে, মান্য করে; সে কেন আমাদিগকে প্রণাম করে?" মা উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা ব্রাহ্মণ, তিনি শূদ্র, সেই জন্য তিনি তোমাদিগকে প্রণাম করেন; জন্মজন্মান্তরে বহু পুণ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়; অন্যে প্রণাম করায়, সময়ে বা অন্য সময়ে যদি মনে হয়, আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছি, তবে সেই পুণ্য ক্ষয় হয়, আর পর জন্মে ব্রাহ্মণ হইবার আশা থাকে না, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে তাহা শুনিয়াছি। অন্যে প্রণাম করিলে মনে মনে ভাবিবে, এই প্রণাম আমার নয়, আমাকে করা হয় নাই, এ ব্রাহ্মণ দেবের প্রণাম, নারায়ণের প্রণাম। সাবধান, এই কথা ভুলিও না।" বালক মাতার উপদেশে প্রীত হইয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছিল,—"আচ্ছা মা, বেশী পুণ্য ত অল্প লোকে করে, কমপুণ্য বেশী লোক করে, তবে ব্রাহ্মণ বেশী কেন? জমীদার কম কেন?" মাতা হাসিয়া বলিয়াছেন,—"আরে, তাহা নয়; এখনও আমাদিগের দেশে বেশী লোকেই বেশী পুণ্য করে, কম লোকে কম পুণ্য করে। ঈশ্বরের কাছে যা চাইবে, তাই তিনি দিবেন? না চাইলে দিবেন কেন? তুই আমাদিগের নিকট যা পাইবার জন্য জেদ ধরিস্, তাই ত আমরা দিয়া থাকি; যার জন্য তোর জেদ নাই, তা কি আমরা দি? ব্রাহ্মণ হওয়া অপেক্ষা ধনী হওয়া যে কম, তাকি তুই বুঝিস না? ধনীর ধন কাড়িয়া লইলে সে পথের ভিখারী হয়, আর সে ধনী থাকে না; কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য কি কাড়িয়া লওয়া যায়? সেই জন্য এদেশের লোক ধন চায় না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতে চায়। যাহারা অজ্ঞানী, লোভী, তাহারাই ধন চায়; এ দেশে তাহারা বড়ই কম। আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ত লোকে বেশী পুণ্য করিত; তাহারা সকলেই ত মুক্তি পায় নাই। তাহারাই আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে।" অবশ্য তখনকার নিরক্ষর মাতার এই উত্তর ঠিক কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু বালক এই উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। খেলার সময়ে তাহার মুখে এই কথা অনেকবার অনেক বালকই

শুনিয়াছিল। এই জন্য বলিতেছি,—তখনকার মাতা পিতামহী নিরক্ষর হইলেও তাঁহারা যেমন সহজ কথায় বালকের মনে বিশ্বাসের শিকড় বসাইয়া দিতে পারিতেন, এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের কথা ছাড়িয়া দাও, টোলের অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যও সেরূপ পারেন কি না সন্দেহ। খুঁটী নাটী করিয়া সেকালের সমস্ত নিখুঁত চিত্র দেখান অসম্ভব। ছোট খাট বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় বিষয় ধরিয়া দেখাইতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকে শেষ করিতে পারা যাইবে—এরূপ বিশ্বাস হয় না। আজ আর বলিতে চাই না।

সেকালে বিকালে, সন্ধ্যার প্রথম যামে ছেলে মেয়েরা ঠাকুরদাদাকে বা ঠাকুরমাকে ঘিরিয়া বসিত, এবং তাঁহাদিগের মুখে সেকালের কথা বা রূপকথা শুনিত। বালক বালিকারা মাঝে মাঝে 'হুঁ' 'হুঁ' না বলিলে তাঁহারা কথা বলিতেন না। 'হুঁ' 'হুঁ' বলিলে তাঁহারা বুঝিতেন, ইহাদিগের ভাল লাগিয়াছে, বলা আবশ্যক; না বলিলে বুঝিতেন, ভাল লাগে নাই, বলা উচিত নয়। একে একে ঠাকুরমা ঠাকুরদাদারা জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। একালে সেকালের কথা বলেই বা কে? শুনেই বা কে? এ কালের বালক বালিকা যুবক যুবতী সত্যপ্রিয়; কিন্তু মিথ্যা যাহার বনিয়াদ—সেই নাটক নভেল তাহারা ভালবাসে। নিখুঁত সত্য সেকালের কথা ভালবাসিবে কি না, কি করিয়া বলিব? নিজেকে বৃদ্ধ মনে করিয়া আপনা হইতেই সেকালের কথার কতক কতক আওড়াইয়া গেলাম। এখন 'হুঁ'এর অপেক্ষা। যদি কেহ "হুঁ" করে, আবার বলিব, নয় ত এই পর্য্যন্ত। *

বাল্মীকির আশ্রম।

কবিগুরু বাল্মীকির আশ্রম সম্বন্ধে একটি গুরুতর ভ্রম বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, গঙ্গার অনতিদূরে তমসানদীর তীরে তাঁহার আশ্রম। "স মুহূর্ত্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা। জগমে তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্ববিদূরিতঃ॥" দেবর্ষি নারদ দেবলোকে প্রস্থান করিলে মহর্ষি বাল্মীকি মুহূর্ত্তকাল আশ্রমে অবস্থান করিয়া স্নানার্থ জাহ্নবীর অনতিদূরে তমসাতীরে গমন করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে,

* হুঁ।—সম্পাদক।

এই তমসানদী কোথায়? কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার রামায়ণের পদ্যানুবাদ গ্রন্থে (বালকাণ্ড, দ্বিতীয় সর্গ, ৫ম পৃঃ, পাদটীকায়) লিখিয়াছেন,—"সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে তমসা নদী অবস্থিতা। ইংরাজীতে ইহা River Tons বলিয়া খ্যাত (বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত)। এই নদী গঙ্গায় পতিত হইতেছে।" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "সরল কৃত্তিবাস" পুস্তকে "পৌরাণিক ভারত-বর্ষে"র যে মানচিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, এই মতই গৃহীত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ সর্গে দেখিতে পাই, শ্রীরাচন্দ্র বনগমন করিবার সময় প্রথমেই তমসাতটে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। "ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ। সীতামুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ॥" বোধ হয়, রামায়ণের এই উক্তির বলেই সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে তমসানদী এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে, সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যস্থলে যে উপনদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই যদি বাল্মীকির আশ্রমসন্নিহিত তমসা হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, কবিগুরুর আশ্রম সকল সময়ে এক স্থানে ছিল না। কারণ, উত্তরকাণ্ডে আছে, লক্ষ্মণ গঙ্গার পরপারে বাল্মীকির আশ্রমসন্নিকটে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সরযূ ও গোমতীর মধ্যে যে তমসানদী, তাহার তীরে কবিগুরুর আশ্রম হইলে গঙ্গা পার হইয়া তথায় যাইতে হইত না। তবে কি সীতাপরিহারের সময় বাল্মীকির আশ্রম তমসা-তীর হইতে কাণপুরের নিকটবর্ত্তী (যেখানে জনশ্রুতিমূলক সীতাপরিহারক্ষেত্র-স্থিত দেবালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে) গঙ্গাতীরে উঠিয়া গিয়াছিল? কিন্তু সীতা-পরিহার যে তমসাতীরস্থ আশ্রমসন্নিকটে গঙ্গাতীরে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কালিদাস রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গে লিখিয়াছেন,—"অশূন্যতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোপহন্ত্রীং তমসাং বগাহ্য। তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ সম্পৎস্যতে তে মনসঃ প্রসাদঃ॥" মহর্ষি বাল্মীকি সীতাদেবীকে প্রবোধ দিতেছেন,—"মুনিগণের নিবিড়সন্নিবিষ্ট পর্ণশালাসমূহে সমাচ্ছন্ন কলুষনাশিনী তমসানদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তাহার পুলিনদেশে অভীষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া তোমার মন সুপ্রসন্ন হইবে।" রঘুবংশের এই শ্লোক যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত তমসা এবং কবিগুরুর আশ্রমসন্নিহিত তমসা কখনও এক নদী হইতে পারে না। কাণ-পুরের নিকট সীতাপরিহারক্ষেত্র বলিয়া যে জনশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা যদি

কালিদাসের সময়ে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ গুরুতর ভ্রম হইত না। মেঘদূতে মহাকবি যে দেশজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ গুরুতর ভ্রম তাঁহার নিকট আশা করা যায় না। তবে অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ সর্গে ও ষট্‌চত্বারিংশ সর্গে যে যে স্থলে তমসার উল্লেখ আছে, সেখানকার পাঠ প্রকৃত কি না, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আর যদি ঐ পাঠই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দুইটি নদীর নাম তমসা ছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, যে তমসার তীরে কবিগুরুর আশ্রম ছিল, তাহা সরযূ ও গোমতীর মধ্যস্থিত গঙ্গার উপনদী নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে অথবা অন্য কোনও প্রাচীন-ভারতের মানচিত্রে পাঠক দেখিতে পাইবেন, প্রয়াগের একটু নিম্নে একটি ক্ষুদ্র নদী দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদী বিন্ধ্যগিরিমালা হইতে বহির্গত হইয়া ঈশান কোণে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারত-সাম্রাজ্যে"র পুরাতন মানচিত্রে এই নদীর তমসা নাম লিখিত আছে। যেখানে এই নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই নিকটে কবিগুরুর আশ্রম ছিল। গঙ্গাতীরে তমসার সঙ্গমস্থলের নিকট লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে গঙ্গা পার হইয়া যাইতে হইয়াছিল। অদূরে তমসাতীরে বাল্মীকির তপোবন—মুনিবালকগণের মুখে সীতার বিষয় অবগত হইয়া মহর্ষি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং রামপত্নীকে আশ্রমে লইয়া যাইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রয়াগ হইতে তমসার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর অসংখ্য আশ্রম-মণ্ডলে সমাকীর্ণ ছিল।

শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

সেকালের সপ্তগ্রাম।

[তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা।]

সপ্তগ্রাম ভারতের একটী দেশবিশ্রুত প্রাচীন নগর। বাঙ্গালার ভৌগোলিক অধিকারের মধ্যে ইহার উল্লেখ থাকিলেও, ইহার ন্যায় প্রাচীন নগর সমগ্র

ভারতে আজকাল খুব কমই আছে। যে সপ্তগ্রামের কথা আমরা বলিতেছি—এখন আর সে সপ্তগ্রাম নাই। আছে কেবল বনজঙ্গলের মধ্যে অতীতের ভগ্নাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন। এই স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, চোখে জল আসে, কালের শক্তিময় হস্ত যে কি না করিতে পারে, তাহার দুঃখময় দৃশ্য স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে!

কোথায় সপ্তগ্রামের সে ঐশ্বর্য্যময় দিন! যে দিন কূলপ্লাবিনী তরঙ্গমালিনী সরস্বতীর বক্ষে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্যদ্রব্য-সম্ভারপূর্ণ পোতশ্রেণী অনবরত যাতায়াত করিত! কোথায় সেই বড় বড় গঞ্জ, হাট, বাজার ও কেল্লা! কোথায় সে জন-সংঘময়ী কোলাহল-সংক্ষুব্ধ অবস্থা! কোথায় সে কমলার বিলাস-কানন! কোথায় সে বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন! হায়! সুখ গিয়াছে, ঐশ্বর্য্য গিয়াছে—আলো গিয়াছে—আছে কেবল দুঃখের স্মৃতি, আর বর্ত্তমানের অন্ধকার।

সপ্তগ্রাম সেকালের রাঢ়দেশের সীমার মধ্যে। রাঢ়দেশের নিখুঁত ভৌগোলিক সীমা-নির্দ্দেশ সম্ভবপর না হইলেও এটুকু বলিতে পারা যায়, এই রাঢ়দেশের সীমা বর্ত্তমান বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা ও নদীয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টলেমি এই সপ্তগ্রামকে "গাঙ্গেম্‌রিজিয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগল রাজত্বের আকবর শাহের সময়ে—সপ্তগ্রাম একটী বিভিন্ন "সরকার" বা শাসন-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। আর এই সপ্তগ্রামের মধ্যে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীও ছিল।

অনেকে বলেন—পর্টুগীজদিগের আগমনের পর হইতে সপ্তগ্রাম আরও উন্নত হইয়া উঠে। কিন্তু ধরিতে গেলে কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করে। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে সপ্তগ্রাম বিখ্যাত বন্দর। আমাদের পুরাতন বাঙ্গলা কাব্য-গ্রন্থে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যের অবস্থার কথা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই শোনা যায়। পর্টুগীজেরা সপ্তগ্রামের এই বাণিজ্য-ঐশ্বর্য্যময় উন্নত অবস্থা দেখিয়া ইহাকে "পোর্ট পিকুইনো" বা (Little haven) বলিত। কিন্তু হায়! সরস্বতীর বুকে চর পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় সপ্তগ্রাম ক্রমে ক্রমে ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হয়। এই সমস্ত চরের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না, এবং ইহা হইতেই দারুণ বাণিজ্য-সংকট বা Commercial crisis উৎপন্ন হইয়া সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য্য ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে থাকে।

১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে সিজার ফ্রেডরিক নামক এক জন ভ্রমণকারী সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর এক স্থানে লিখিত আছে,—(১) "আমি উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলাদেশে যাত্রা করিলাম। উড়িষ্যা হইতে পোর্ট পিকুইনো (সপ্তগ্রাম) ১৭০ মাইল পথ। সমুদ্রতীর ধরিয়া প্রায় চুয়ান্ন মাইল আসিবার পর আমরা গঙ্গানদীতে প্রবেশ করিলাম। গঙ্গার মোহানা হইতে সপ্তগ্রাম বন্দর একশত মাইল। জোয়ারের মুখে এই পথ অতিক্রম করিতে—১৮ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রতিবৎসর এই সপ্তগ্রাম নগরে ৩০।৩৫ খানি বাণিজ্যপোত নঙ্গর করে। চাউল, কাপড়, চিনি, হরীতকী, লঙ্কা প্রভৃতি নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য এখানকার বন্দর হইতে আমদানী রপ্তানি হয়। সপ্তগ্রাম অতি সুন্দর বাণিজ্যস্থান। ইহা মোগলদের শাসনাধীনে অবস্থিত। পাটনার শাসনকর্ত্তা এই বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা।" *

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ ফিচ্ (Ralph fitch) ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম দেখিতে আসেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণপুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছে —"I went from Agra to Satagan in Bengala in the company o[illegible] hundred and four score boats, laden with salt, opioum, hingee (হিঙ্গু), Lead, carpets and diverse cther commodities down the River Jemena (যমুনা) the cheif merchants are moors and gentiles." ফিচের এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়, তাঁহার আগমনসময়েও সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি অবনতির পথে অগ্রসর হয় নাই।

ইহার পর Di Barros নামক আর এক জন ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি—সপ্তগ্রামের অবস্থা ক্রমশঃ অনেকটা হীন হইয়া আসিতেছিল। সরস্বতী নদীতে চর পড়ায় বড় বড় জাহাজ তাহার মধ্যে পূর্ব্বের মত সহজভাবে যাতায়াত করিতে পারিত না। উক্ত ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন,—"Satgaw is a great and noble city, though less frequented

(১) Cæser Fredericks' Travels. (1563—1681.)

(২) ফ্রেডরিক King of Patena বলিয়াছেন। পাটনা মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে একটী গণিত শাসনকেন্দ্র ছিল। সম্ভবতঃ তিনি সুবেদারকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা লিখিয়াছেন। সেকালের শাসনকর্ত্তা সুবেদারেরা রাজপ্রতিনিধির মত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অবস্থায় থাকিতেন। কাজেই তাঁহাকে King বলিয়া অনুমান করা অসম্ভব নহে।

than Chittagong on account of the Port not being so convenient for the entrance and departure of Ships." ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, চট্টগ্রাম এই সময়ে বন্দর—রূপে সপ্তগ্রামের প্রতিযোগিতা করিতেছিল।

১৬৩২ খৃঃ অব্দে মোগলবাহিনী কর্তৃক হুগলী অধিকৃত হয়। কেন হয়, তাহা ইতিহাস—পাঠকের অপরিজ্ঞাত নহে। হুগলী—বিজয়ের পর হইতেই সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। বাদশাহের আদেশে হুগলীতে সরকারী বন্দর স্থাপিত হয়। সপ্তগ্রামের সরকারী কার্য্যালয়গুলি হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলী বাণিজ্য—ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। তাহা হইলেও উক্ত সময় হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যেও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির একবারে বিদূরিত হয় নাই। ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে Warwick নামক এক জন ডচ্ এড্মিরাল সপ্তগ্রামের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন,—"সপ্তগ্রাম এখনও বাণিজ্যপ্রধান বন্দররূপে প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিতেছে। এখানে পর্টুগীজ বণিকের দলই বেশী।"

বহুকাল পূর্ব্বে স্বরস্বতী উড়িষ্যা ও বঙ্গরাজ্যের মধ্য সীমা—নির্দ্দেশক নদী বলিয়া কথিত হইত। পরের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। তবে আকবর শাহের আমলে সপ্তগ্রাম "বালঘাক্খানা" বা বিদ্রোহের আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইত। বোধ হয়, বিহারের ও উড়িষ্যার পাঠান—বিদ্রোহ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া রাজপক্ষ হইতে সপ্তগ্রামকে এই কলঙ্কিত আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে পাঠানদিগকে বঙ্গ ও উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত হন। পথে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় তিনি বর্দ্ধমানের জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগ) শিবিরসন্নিবেশ করেন। এ সময়েও সপ্তগ্রামের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। মানসিংহের আগমনের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে পাঠানেরা আবার সপ্তগ্রাম বন্দর লুণ্ঠন করে।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, সপ্তগ্রাম আকবর বাদশাহের "বালঘাকখানা" বা বিদ্রোহস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সম্ভবতঃ খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম মুসলমানাধিকারে আসে। ইহার সর্ব্বপ্রথম শাসনকর্ত্তা ইয়াজউদ্দিন। সপ্তগ্রাম তৎকালীন রাজধানী দিল্লী আগরা হইতে বহুদূরে থাকায়, সুবেদার বা শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করিত; কিংবা বিদ্রোহ হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। সপ্তগ্রাম তখন বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর, উন্নত নগর। এখানে লুটের যেরূপ সুযোগ, এমন আর কোথাও নাই। কাজেই পাঠান বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রামের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। সপ্তগ্রামের বন্দর একবার লুটিতে পারিলেই বিদ্রোহীদের পাঁচ বৎসরের খোরাকের সংস্থান হইত।

হায় সপ্তগ্রাম! কোথায় তোমার সে সুখৈশ্বর্য্যময় দিন! জগতে ত চির-দিন কিছুই থাকে না। রাজধানী জঙ্গলে পরিণত হয়, জঙ্গল কাটিয়া রাজ-ধানী করা হয়। যে সময়ে সপ্তগ্রামের অধঃপতন সূচিত হয়, সেই সময়ে কলিকাতার উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকম্পা—দৃষ্টি পড়ে। হাঙ্গর কুম্ভীরের নিবাস-ভূমি, বাদায় পরিপূর্ণ, চোরডাকাতের উপদ্রবময়, জঙ্গলপূর্ণ কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর, এই তিন গণ্ডগ্রাম একত্রিত হইয়া সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে সবলে আয়ত্ত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হুগলীর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়।

কলিকাতার অতি প্রাচীন বৃত্তান্ত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, শেঠ ও বসাকেরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী। বসাক বা "বস্তুক"গণ এখন আপনাদিগকে "বৈশ্য" বলিয়া পরিচয় দেন, এবং এ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। যে বসাকেরা গোবিন্দপুরে তাঁহাদের বাণিজ্য-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া গোবিন্দপুরের অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন, সুতানুটীর হাট বাণিজ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই বসাক বা বস্তুকগণ সপ্তগ্রামের আদিম অধিবাসী। সপ্তগ্রামে ইহারা "বসক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর "বসক" শব্দ "বসাকে" পরিণত হয়। বস্তুকদিগের জাতীয়—ইতিবৃত্তলেখক মহাশয় বলেন,—"আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বস্তুকেরা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবস্থা। বস্তুকদিগের সপ্তগ্রাম—ত্যাগের প্রধান কারণই সরস্বতীর শোচনীয় অবস্থা। কেহ কেহ বলেন, গৃহবিবাদে বস্তুক-দের একদল সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই জানিতে পারা যায়, মোগলেরা হুগলীর সম্মুখবাহিনী ভাগীরথীর শাখা অতিশয় গভীর করিয়া দেন। তাহাতে ভাগীরথীর যে জল পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের ক্রোড়বাহিনী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইত, তাহা রুদ্ধ হইল। এ দিকে আবার বেতাকীর বা বেতড়ের খালে চড়া পড়ায় সরস্বতীর স্রোত ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। ইহাই সপ্তগ্রামের ধ্বংসের কারণ।

"পাদিশাহা" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে ১৬৩২ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংসের কথা উল্লিখিত আছে।

যে সময়ে সপ্তগ্রামের অধঃপতন হয়, তখন পর্টুগীজেরাই বাঙ্গালার প্রধান ব্যবসাদার। ইউরোপখণ্ডে মাল আমদানী রপ্তানীর ব্যাপার তাহাদের একরূপ একচেটিয়া ছিল। বন্দর-পরিবর্ত্তনে হুগলীতে সরকারী কাছারী খাজানাখানা প্রভৃতি সবই উঠিয়া গেল। পর্টুগীজেরাও নিরুপায় হইয়া হুগলীতে গিয়া জুটিলেন। কিন্তু হুগলী নগরের অবস্থা তখন অতিশোচনীয়। ইহার চারি দিকে বন-জঙ্গল ও ব্যাঘ্রভয়। পর্টুগীজেরা নানা স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া কতকটা পরিষ্কৃত করিলেন। বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ১৫৪০ খৃঃ অব্দে হুগলীতে একটী ফ্যাক্‌টরীও স্থাপন করিলেন।

ফ্যাক্‌টরীর গৃহগুলিও তথৈবচ। সবই বাঁশে তৈয়ারী চালাঘর। দুই চারিখানা মেটে বাঙ্গালা, মালগুদাম, এই লইয়াই ফ্যাক্‌টরী। ক্রমাগত চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে তাহারা হুগলীর বাণিজ্য জাঁকাইয়া তুলিল। সরকারী বাণিজ্যের প্রাধান্য কমিল। পর্টুগীজদের বাণিজ্যের এই উন্নত অবস্থা দেখিয়া স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বড়ই চটিয়া গেলেন। তখনই সুবেদার সাহেবের হুকুমজারি হইল—"পর্টুগীজদিগকে হুগলী হইতে তাড়াইয়া দাও।"

পর্টুগীজগণ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অকারণ কোপ-মুখে পড়িয়া প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু বহুদিন এদেশে থাকিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের রীতি প্রবৃত্তি তাঁহারা ভালরূপই জানিতেন। পর্টুগীজ প্রধানগণ উৎকোচাদি লইয়া সুবেদার সাহেবের দরবারে হাজির হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। আবার হুগলীতে [illegible]র্টুগীজ বাণিজ্যের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল। আজকাল যে স্থানকে "ব্যাণ্ডেল" [illegible]লে, তাহাই পর্টুগীজদিগের বন্দর ছিল। "ব্যাণ্ডেল" বন্দর শব্দের অপভ্রংশমাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রাম বিদ্রোহী পাঠানগণ কর্ত্তৃক শেষবার লুণ্ঠিত হয়। ইহার পরেই শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া সপ্তগ্রামের অবশিষ্ট সৌভাগ্য-চিহ্নের বিলোপসাধন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখিতে পাই—চুঁচুড়ার দিনেমার বণিকেরা সপ্তগ্রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। অনেক দিনেমার বণিক এই সময়ে সপ্তগ্রামে পল্লীনিকেতন (Country houses) নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান

করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই চুঁচুড়া হইতে ছয় মাইল পথ দূরবর্ত্তী সপ্তগ্রামে প্রতিদিন পদব্রজে যাতায়াত করিতেন।

অতীতের এই সোনার সপ্তগ্রাম একসময়ে সমগ্র ভারতের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র, লক্ষ্মীর লীলাকানন ছিল। এখন সে সপ্তগ্রাম জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। প্রচণ্ডসলিলস্রোতোময়ী সরস্বতী, পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বুকে লইয়া, মর্ম্মবেদনায় ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিতা। শৃগাল কুকুরেও তাহা পার হইয়া যাইতেছে। যে সরস্বতীর উপর বড় বড় জাহাজ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তাহাতে এখন বড় নৌকাও চরের ভয়ে চলিতে ভয় করে। কালের কঠোর শাসনে মহাসমুদ্র শুখাইয়া যেন গোষ্পদে পরিণত হইয়াছে। হায় সপ্তগ্রাম!

বর্ত্তমান কালে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। কলিকাতার ঐতিহাসিক-সমিতির সদস্যগণ বর্ত্তমান কালের সপ্তগ্রামের ধ্বংসময় অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। সমিতির বিবরণে অতীতকালের অতিবিস্তৃতা, প্রচণ্ডস্রোতঃশালিনী সরস্বতীর বর্ত্তমান অবস্থার সমস্ত কথাই আছে।

[প্রাচীন সপ্তগ্রামের শ্মশানে সে কালের অনেক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পথ অনুসরণ করিয়া এই সপ্তগ্রামের ক্ষেত্রে ভূগর্ভে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কেহ কি এ অঞ্চলে এইরূপ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সূচনা করিবেন না?—সাহিত্য সম্পাদক।]

সরস্বতীর দক্ষিণকূলেই সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ অতীতের কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। হিন্দু, মোগল, পাঠান ও ইংরাজ—চারিটি রাজ্যের কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া পুরাতন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। ধরিতে গেলে সেই প্রাচীন বন্দরের, নগরের কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। দুই একটী ধ্বংসপ্রায় মসজেদ্ ও সমাধিস্তম্ভ এখন মুসলমান রাজত্বকালের ক্ষীণস্মৃতিরূপে বর্ত্তমান। এগুলিও ৩।৪ শত বৎসরের বেশী পুরাতন নহে। বর্ত্তমান গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে এখনও এগুলি বর্ত্তমান। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্বে এবং সরস্বতীর দক্ষিণপূর্ব্বকূলে এখনও একটী পুরাতন কেল্লার আয়তাকার মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ইষ্টকগুলি কালহস্ত-পীড়নে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এ কেল্লা কোন সময়ের, তাহারও কোনও কাহিনী নাই। অনেকে অনুমান করেন, এই কেল্লার পার্শ্ব-বাহিনী সরস্বতীর তীরে ত্রিবেণী হইতে জাহাজাদি আসিয়া মাল নামাইত।

বিধাতার হাত।

ভাস্কর—রোঁদে।

Mohila Press,

ইহার কিছু দূরে কয়েকটী পুষ্করিণী আছে—ইহারা এখনও "জাহাঙ্গীরের দীঘি" বলিয়া পরিচিত। সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, "সাহিত্যে"র পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম। ভবিষ্যতে ত্রিবেণীর কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-বাসবদত্তম্।

"বুদ্ধৌ বুদ্ধিমতাং লোকে নাস্ত্যগম্যং হি কিঞ্চন।"

"সাহিত্যের" বিগত সংখ্যায় "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্" শীর্ষক প্রবন্ধের উপোদ্ঘাতরূপে আমরা মহাকবি ভাস-প্রণীত নাটক-চক্রের নবাবিষ্কারের কথা-প্রসঙ্গে, মহাকবির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছি, এবং তাঁহার রচনার অনন্যসাধারণ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধির উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রণীত "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নাটিকার কথাবস্তুর বিবরণ প্রদান করিয়াছি। বৎসরাজ উদয়ন কর্ত্তৃক অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তার অপহরণ-বৃত্তান্ত ও কৌশাম্বীর মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কর্ত্তৃক উদয়নের কারামুক্তি-কথা অবলম্বন করিয়াই সেই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছিল। বৎসরাজের জীবনের পরবর্ত্তী আর একটি ব্যাপার "স্বপ্ন-বাসবদত্তম্" নাটকের প্রধান কথা। মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণের বুদ্ধি-বলে মগধ-রাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত বাসবদত্তা-প্রণয়-মুগ্ধ উদয়নের পরিণয়সাধন, এবং সেই অভিপ্রেত বিবাহের পর, মহারাজ উদয়নের সঙ্গে মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণ ও প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার পুনর্মিলনই এই নাটকের প্রধান বিষয়। পঞ্চমাঙ্কে বিবৃত, উদয়ন-কর্ত্তৃক স্বপ্নে অধিগত বাসবদত্তার কথা অবলম্বনে রচিত বলিয়া, কবি এই নাটকখানিকে "স্বপ্ন-বাসবদত্তম্" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

আলোচ্য নাটকের কথাবস্তু কোনও মূলগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির "ক্রতুকথাদি-সূত্রান্তাট্ ঠক্" (৪।২।৬০) এই সূত্রের ভাষ্যে "বাসবদত্তিকঃ"

শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন। "বাসবদত্তা" নামক আখ্যায়িকা যিনি পাঠ করেন বা জানেন ["তদধীতে তদ্বেদ" ৪।২।৫৯—সূত্রের সাহায্যে অর্থ করিতে হইবে]—তিনিই "বাসবদত্তিকঃ"। প্রাচ্য প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারে, মহাভাষ্যকারের উদ্ভবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০-১৪০ সংবতের মধ্যেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাস মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে পতঞ্জলি ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তম্" ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্" নাটকদ্বয়ের আখ্যায়িকাকে লক্ষ্য করিয়াই "বাসবদত্তিকঃ" শব্দটীর উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোনও কবির উল্লিখিত আখ্যায়িকার অনুসরণ করিয়া ভাস বাসবদত্তার উপাখ্যান-সংবলিত নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। অথবা পতঞ্জলি ও ভাস উভয়ে একই মূল হইতে বাসবদত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা [১৮৫ পৃষ্ঠায়] বলিয়াছি যে, বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার পিতা, অবন্তিরাজ প্রদ্যোত, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। পালিগ্রন্থ ও পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মগধ-পতি অজাতশত্রুও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি ও তাঁহার পিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগর হইতেই রাজ্যপরিচালন করিতেন। রাজধানী তখন পর্য্যন্তও পাটলিপুত্র [কুসুমপুর] নগরে সংস্থাপিত হয় নাই। পুরাণে বর্ণিত বংশাবলীতে অজাতশত্রুর পুত্রের নাম নানাভাবে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে তাঁহার নাম "দর্শক", এবং তিনি বিম্বিসারের পুত্ররূপে উল্লিখিত। কিন্তু মৎস্যপুরাণের মতে অজাতশত্রুর পুত্রের নাম "বংশক"। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ভাগবতপুরাণের মতে অজাতশত্রুর পুত্রের নামক "দর্ভক"। "বংশক", "দর্ভক" ও "দর্শক" * একই রাজার নাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই দর্শকের পুত্র উদয়ীই সর্ব্বপ্রথম পাটলিপুত্র নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বায়ুপুরাণে [৯৯ অধ্যায়, ৩১৯ শ্লোকে] উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"স বৈ পুর-বরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি॥"

অতএব উদয়ীর পিতা দর্শকের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত রাজগৃহ-নগরেই রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। স্বপ্নবাসবদত্ত-নাটকের বর্ণিত মগধরাজ দর্শকের রাজধানীও যে রাজগৃহ নগরেই অবস্থিত ছিল, তাহার প্রমাণ [প্রথমাঙ্কে] দুই-

---

* পঞ্চবিংশৎ সমা রাজা দর্শকস্তু ভবিষ্যতি॥"—৯৯ অধ্যায়।

বার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং নাটকোক্ত দর্শককেও ঐতিহাসিক রাজা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, এবং তাঁহার অভ্যুদয়কালও গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অল্পকাল পরেই নির্দ্দেশ করিতে হয় ;—কারণ, অজাতশত্রুর রাজত্বের শেষভাগেই বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বা[illegible] লাভ করেন। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর, দর্শকের রাজত্বসময়েও বৎসরাজ উদয়ন বর্ত্তমান ছিলেন। উদয়নের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের উপাখ্যান অবলম্বনে পরবর্ত্তী কালে শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ অনেক নাটকাদির রচনা করিয়াছেন।

আলোচ্য নাটকখানি ছয় অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে শৃঙ্গাররসই প্রধান-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের অঙ্গরূপে অন্যান্য রসেরও গৌণভাবে অবতারণা আছে। নাটকের নায়ক বৎসরাজ উদয়ন, নায়িকা বাসবদত্তা ও উপনায়িকা মগধনাথ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী।

কথাবস্তু।

আদেশিকগণের আদেশ হইয়াছিল যে, মগধনাথ দর্শকের ভগিনী পদ্মা-বতী কৌশাম্বীপতি বৎসরাজ উদয়নের মহিষী হইবেন, এবং এই বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে, উদয়ন শত্রুহৃত আত্মরাজ্য পুনরায় নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হইবেন। বৎসরাজ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের বিশ্বাস ছিল যে,

"ন হি সিদ্ধবাক্যা-
ন্যুৎক্রম্য গচ্ছতি বিধিঃ সুপরীক্ষিতানি।"

"বিধি কখনই সুপরীক্ষিত সিদ্ধবাক্যের উল্লঙ্ঘন করেন না"—এই বিশ্বা-সের বশবর্ত্তী হইয়া, মন্ত্রিবর বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, কি উপায়ে মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত আত্মপ্রভু উদয়নের বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া প্রভুকে নিজরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগি-লেন। যৌগন্ধরায়ণের এই প্রকার চিন্তার অন্য কারণ এই যে, বৎসরাজ উদয়ন পূর্ব্বেই অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে বহুকষ্টে অপহরণ করিয়া আনিয়া বিবাহান্তে তাঁহাকে প্রধানা মহিষীরূপে বরণ করিয়া রাখিয়া-ছেন। মন্ত্রিবর সঙ্কল্প করিলেন যে, যতদিন পদ্মাবতীর সহিত প্রভুর বিবাহকার্য্য সংঘটিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মহাদেবী বাসবদত্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবেন। শীঘ্রই আত্মমনোরথসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন মহারাজ উদয়ন মৃগয়ায় বাহির হইবার পর, যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বান প্রমুখ অন্যান্য অমাত্যগণকে নিজের অনুপস্থিতকালে রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে যথাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান

করিয়া, স্বয়ং পরিব্রাজকের বেশধারণপূর্ব্বক, বাসবদত্তাকে অবন্তিকা সজ্জিত করাইয়া, তাঁহাকে লোকসমীপে নিজ-সহোদরা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে করিতে, আত্মকার্য্যের উদ্ধারের জন্য মগধ দেশের উপকণ্ঠে এক তপোবনপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। পদব্রজে পরিভ্রমণে অনভ্যস্তা বাসবদত্তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার পর আবার মগধরাজের কয়েক জন ভৃত্য তপোবনপথ হইতে সাধারণ লোকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল। দেবীর খেদ দূর করিবার জন্য মন্ত্রী সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বলিতেছিলেন,—

"পূর্ব্বং ত্বয়াপ্যভিমতং গতমেবমাসী চ্ছ্লাঘ্যং গমিষ্যসি পুনর্বিজয়েন ভর্ত্তুঃ।
কাল-ক্রমেণ জগতঃ পরিবর্ত্তমানা চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ॥"

"হে দেবি! পূর্ব্বে আপনিও এইরূপ নিজের অভিমত ভাবে পথ গমন করিতেন, স্বামী বিজয়লাভ করিলে পর, পুনর্ব্বার শ্লাঘ্যভাবে গমন করিতে পারিবেন, কালক্রমে পরিবর্ত্তনশীল জগজ্জনের ভাগ্যপঙ্‌ক্তিও [রথ]-চক্রের অরপঙ্‌ক্তির ন্যায় ঘুরিতে থাকে।" তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী আশ্রমস্থা মহারাজ-মাতাকে দর্শন করিবার জন্য রাজধানী রাজগৃহনগর হইতে কঞ্চুকী ও অন্যান্য পরিজনকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে আসিয়া, সেই দিবস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। তপোবন-তাপসীর সহিত পদ্মাবতীর পরিচারিকার কথোপকথন হইতে প্রচ্ছন্নবেশধারী যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা জানিতে পারিলেন যে, অবন্তিপতি প্রদ্যোত নিজ পুত্রের জন্য পদ্মাবতীর পাণি কামনা করিয়া, মগধরাজ দর্শকের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংবাদে বাসবদত্তা বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। সে যাহা হউক, "ধর্ম্ম-প্রিয়া" পদ্মাবতী আশ্রমবাসী তপস্বিগণকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজপুত্রীর অনুগামী কঞ্চুকীও,

"যদ্যাস্তি সমীপ্সিতং বস্তু তৎ কস্যাদ্য কিং দীয়তাম্।"

"যাঁহার যাহা অভীপ্সিত, তাহা বলুন। বলুন, কাহাকে কি দিতে হইবে"—এই বলিয়া, নৃপসুতার সদভিপ্রায় আশ্রমে ঘোষণা করিয়া দিলেন। কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া যৌগন্ধরায়ণ আপনাকে 'অহমর্থী' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন, এবং বলিলেন যে, তাঁহার এই প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভগিনীকে স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত মহারাজপুত্রী ন্যাসরূপে রক্ষা করিলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। কঞ্চুকী কি প্রকারে এইরূপ প্রার্থনার অনুমোদন কবিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; কারণ,

"সুখমর্থো ভবেদ্ দাতুং সুখং প্রাণাঃ সুখং তপঃ।
সুখমন্যদ্ ভবেৎ সর্ব্বং দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্॥"

"অর্থপ্রদান সুখকর, [পরের জন্য] প্রাণদানও সুখকর, তপস্যা-[ফল]-দানও সুখকর,—অন্য সকলই সুখকর বটে, কিন্তু ন্যাসরক্ষা বড়ই দুঃখকর।" সত্যবাদিনী পদ্মাবতী কঞ্চুকীর নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ঘোষণানুরূপ কার্য্য করিতে আদেশ দিয়া, আবন্তিকাবেশ-ধারিণী ব্রাহ্মণভগিনী বাসবদত্তাকে ন্যাসরূপে রাখিতে স্বীকার করিলেন। যৌগন্ধরায়ণও প্রারব্ধ কার্য্যের অর্দ্ধাংশ পরিসমাপ্ত হইল ভাবিয়া,আপনাকে অনেকাংশে কৃতার্থ মনে করিলেন। ইহার পর, মধ্যাহ্নে, এক পরিশ্রান্ত ব্রহ্মচারী রাজগৃহ হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আত্ম-পরিচয়-প্রদানকালে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি বৎস-ভূমিতে লাবণেক গ্রামে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তথায় এক নিদারুণ বিপত্তি সংঘটিত হওয়ায়,তাঁহাকে সেই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। সম্ভ্রমে সকলেই সেই নিদারুণ বিপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে, ব্রহ্মচারী সেই ঘটনার বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, বৎসরাজ উদয়ন মৃগয়ায় নিস্ক্রান্ত হইলে পর, তাঁহার মহিষী অবন্তি-রাজপুত্রী বাসবদত্তা গ্রামদাহে দগ্ধ হইয়াছেন। দেবীকে উদ্ধার করিতে যাইয়া মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণও সেই অগ্নিতে পতিত হইয়া মৃত্যুর আশ্রয় লইয়াছেন। তৎপরে মহারাজ মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই দুঃসহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রী ও মহিষীর বিয়োগজনিত সন্তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া নিজেও অগ্নিতে প্রাণপরিত্যাগের জন্য উদ্যত হইলেন; কিন্তু রুমণ্বন প্রমুখ অমাত্যগণের প্রযত্নে ও সান্ত্বনাবাক্যে তিনি সেই দুষ্কর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। অমাত্যগণের পরিচর্য্যায় তিনি সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।" ব্রহ্মচারীর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পতিগতপ্রাণা বাসবদত্তা বহুকষ্টে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু, বিদিতবৃত্তান্ত যৌগন্ধরায়ণ,

"তস্মিন্ সর্ব্বমধীনং হি যত্রাধীনো নরাধিপঃ।"

"নরপতি যাঁহার অধীন, তাঁহার নিকট সকলই অধীন" এই ভাবিয়া রুমণ্বান রাজরক্ষার দায়িত্ব কৌশলেই বহন করিতেছেন জানিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন; মনোগত ভাব কাহাকেও, এমন কি, বাসবদত্তাকেও জানিতে দিলেন না। ব্রহ্মচারী বিদায় লইলে, যৌগন্ধরায়ণ স্বভগিনীকে পদ্মাবতীর হস্তে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, পদ্মাবতীও পরিজনসহ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে, একদিন পদ্মাবতী সখী বাসবদত্তা ও অন্যান্য পরিচারিকা-গণকে সঙ্গে করিয়া মাধবীমণ্ডপপার্শ্বে কন্দুকক্রীড়ায় নিরত ছিলেন। উপহাস করিয়া বাসবদত্তা বলিলেন, "রাজপুত্রি! অদ্য তোমার শোভা কিছু অধিকতর বলিয়া মনে হইতেছে। শীঘ্রই তুমি উজ্জয়িনীপতি মহাসেনাপর-নামা প্রদ্যোতের পুত্রবধূ হইবে।" পদ্মাবতীর এক পরিচারিকা উত্তর করিল যে, উজ্জয়িনীরাজ-কুলে তাঁহার সম্বন্ধ হউক, তাহাতে রাজপুত্রীর অভিমত নাই; তিনি বৎসরাজ উদয়নের রূপ গুণের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করিতেছেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে পদ্মাবতীর ধাত্রী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, কোনও প্রয়োজন-বশতঃ বৎসরাজ উদয়ন মগধে আসিয়াছেন; উদয়নের আভিজাত্য, জ্ঞান, বয়স ও রূপ দেখিয়া মহারাজ দর্শক স্বভগিনী পদ্মাবতীকে তাঁহার হস্তেই প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বাসবদত্তা ভাবিলেন,—এ কি সর্ব্বনাশ! তিনি ঠিক করিতেই পারিলেন না, কিরূপে,—

"ণহ ণাম সন্তপ্পিঅ উদাসীণো হোদি।"

"সেই ভাবে সন্তপ্ত হইয়া, এখন রাজা উদাসীন হইলেন"। কিন্তু যখন ধাত্রী-মুখে শুনিলেন যে, উদয়ন নিজে সম্বন্ধ প্রার্থনা করেন নাই, মহারাজ দর্শকই স্বেচ্ছায় পদ্মাবতীকে তাঁহার হস্তে সমপণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই স্বামীকে এই বিষয়ে নিরপরাধ মনে করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই, অপর এক পরিচারিকা ত্বরিত-গতিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীকে অন্তঃপুরে যাইবার জন্য ভর্ত্তৃমাতার আদেশ জানাইল। অদ্যই শুভ নক্ষত্র, অদ্যই বিবাহ-মঙ্গল সম্পাদিত হইবে। এই সংবাদে বাসবদত্তার হৃদয়াকাশ দুঃখান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অন্তঃপুরের চতুঃশালাতে অ-বিধবাগণ নূতন বরকে মণিভূমিতে স্নান করাইতেছেন। পরিচারিকাগণ সকলেই স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ পুষ্প-মালা, কেহ বা বরের পরিধেয় আনিতে ব্যস্ত। কিন্তু আজ বাসবদত্তা সেই স্থানে উপস্থিত নাই। ভর্ত্তৃ-মাতার আদেশ যে, পদ্মাবতীর শুভ-বিবাহের মালা গাঁথিবার ভার তাঁহার প্রিয়বয়স্যা আবন্তিকার [বাসবদত্তার] হস্তেই অর্পণ করিতে হইবে। সেই জন্যই একটি পরিচারিকা পুষ্পহস্তে বাসবদত্তার অন্বেষণ করিতে করিতে, প্রমদবনে যাইয়া দেখিতে পাইল—চিন্তা-শূন্য-হৃদয়া আবন্তিকা প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষ-তলে শিলা-পট্টকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। অদ্য

"অজ্জউত্তো বি ণাম পরকেরও সংবুত্তো।"

"আর্য্যপুত্রও পরের হইয়া গেলেন"—এই দুঃখে চিত্তবিনোদন করিবার জন্যই বাসবদত্তা বিবাহামোদ-সঙ্কুল অন্তঃপুর-চতুঃশালায় পদ্মাবতীকে রাখিয়া, নিজে প্রমদ-বনে চলিয়া আসিয়াছেন।

"এদং বি মএ কত্তব্বং আসী। অহো অকরুণা খু ইস্সরা।"

"ইহাও আমাকেই করিতে হইল,—অহো দেবতাগণ নিশ্চয়ই অকরুণ"—এই বলিয়া, তিনি পদ্মাবতীর বিবাহ-মালা গাঁথিয়া দিলেন।

"অজ্জউত্তং পেক্খামি ত্তি এদিণা মণোরহেণ জীবামি মন্দভাআ।"

"বাঁচিয়া থাকিলে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশাতেই মন্দভাগ্যা হইয়াও বাঁচিয়া থাকিব"—এইরূপ ভাবিয়া, তিনি প্রাণ-পরিত্যাগ করেন নাই। শয্যা আশ্রয় করিয়া নিদ্রা-সাহায্যে দুঃখ-লাঘবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজের অভিপ্রেত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎপরে শরৎকালে একদিন পদ্মাবতী পরিজন সহ প্রমদবনে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন, তাঁহার সখী আবন্তিকা [বাসবদত্তা] কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হলা! পিও দে ভত্তা?" "সখি! তোমার স্বামী তোমার প্রিয় ত?" প্রত্যুত্তরে পদ্মাবতী বলিলেন—

"অয্যে ণ আণামি, অয্যউত্তেণ বিরহিদা উক্কণ্ঠিদা হোমি।"

"আর্য্যে, তা আমি জানি না, কিন্তু আর্য্যপুত্র-বিরহিতা হইলে আমি উৎকণ্ঠিতা হইব।" পদ্মাবতীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,—উদয়ন উপরতা প্রদ্যোত-দুহিতা বাসবদত্তাকেও তাঁহারই মত ভালবাসিতেন কি না? বাসবদত্তার প্রতি রাজার স্নেহের মাত্রা অল্প হইলে, কখনই রাজ-দুহিতা প্রিয়জন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উজ্জয়িনী হইতে উদয়নের সহিত পলাইয়া আসিতেন না।—আবন্তিকা এই বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। পদ্মাবতী মনে করিলেন যে, বাসবদত্তার বীণাবাদন-কৌশলের কথা স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, আর্য্যপুত্র তাঁহার বীণাবাদন-শিক্ষার কথা উত্থাপিত হইলে, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নিরুত্তর হইয়াছিলেন। ইহাতেই পদ্মাবতী বুঝিয়াছিলেন যে, বাসবদত্তাই স্বামীর অধিকতর প্রিয়া ছিলেন। এমন সময়, নর্ম্ম-সচিব বসন্তককে লইয়া, উদয়ন প্রমদবনের শোভা পরিদর্শন করিবার জন্য, সেই দিকেই আসিতেছিলেন। আবন্তিকার পর-পুরুষ-দর্শন পরিহার করিবার জন্যই পদ্মাবতী আর্য্যপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ না

করিয়া পরিজনসহ মাধবীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। শরৎকালের দুঃসহ রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার আশায়, বিদূষক বসন্তক বয়স্যকে লইয়া মাধবীমণ্ডপে অবস্থান করিয়া পদ্মাবতীর প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রমদাগণ প্রমাদ গণিলেন ; কারণ, সেই মণ্ডপে প্রবেশ করিলে, বসন্তক সকলকেই আকুল করিয়া তুলিবেন। পদ্মাবতীর এক পরিচারিকা তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য এক ভ্রমর-লীন লতা ঘুরাইতে লাগিল। মধুকর-সংত্রাসে বিচলিত বিদূষক বয়স্যকে লইয়া সেই মণ্ডপে প্রবেশ না করিয়া, এক শিলাতলে উপবেশন করিয়াই পদ্মাবতীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তথায় বসিয়া বিদূষক বয়স্যকে এক প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিলেন,—"বয়স্য !

"কা ভবদো পিআ, তদাণিং তত্তহোদী বাসবদত্তা ইদাণিং পদুমাবদী বা।"

"কে তোমার [অধিকতর] প্রিয়া, তখনকার বাসবদত্তা ? না, এখনকার পদ্মাবতী ?" বিদূষক কিংবা উদয়ন জানেন না যে, যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন, তাঁহারা উভয়েই মাধবী-মণ্ডপেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন ; কারণ, বিদূষক বাচাল। কিন্তু বিদূষক ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাই অনন্যগতি হইয়া রাজা বলিলেন,—

"কা গতিঃ, শ্রূয়তাম্।
পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপ-শীল-মাধুর্য্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি॥"

"গতি কি ? শ্রবণ কর ! রূপ, চরিত্র ও মধুরতায় পদ্মাবতী আদরণীয়া হইলেও, বাসবদত্তাবদ্ধ আমার চিত্তটি পদ্মাবতী [অদ্যাপিও] হরণ করিতে পারেন নাই।" আর্য্যপুত্রের এই প্রিয়োক্তি শ্রবণ করিয়া আবন্তিকা মনে মনে ভাবিলেন,—

"দিণ্ণং বেদণং ইমস্স পরিখেদস্স। অহো অন্নাদবাসং পি এত্থ বহুগুণং সম্পজ্জই।"

"এত খেদের মূল্য [আজ] প্রাপ্ত হওয়া গেল। অহো ! এই স্থানের অজ্ঞাতবাসও বহুগুণ-যুক্তই হইল"। বাসবদত্তার গুণাবলি অদ্যাপি রাজার স্মরণ হইতে অপগত হয় নাই—এই ভাবিয়া, পদ্মাবতীও উদয়নের এইরূপ মনোভাব জানিয়াও বিষণ্ণ হয়েন নাই। তৎপরে উদয়নও স্ববয়স্যকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক উত্তর করিলেন,—

"কিং মে বিপ্রলপিদেণ, উভও বি তত্তহোদী মে বহুমদাও।"

"বিপ্রলাপের প্রয়োজন কি ? উভয় দেবীই আমার বহুমতা"। রাজাও ছাড়ি-

বার লোক নহেন; বহু পীড়াপীড়ির পর বসন্তক উত্তর দিতে স্বীকার করিয়া বলিলেন,"বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী, উভয়েই সমানগুণ-সম্পন্না হইলেও, পদ্মাবতীর একটি গুণ অধিক আছে। উত্তম ভোজনসামগ্রী থাকিলে, তিনি বসন্তককে তদ্দ্বারা সম্মানিত করিতে ভুলেন না।" মন পরিহাস-বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, রাজা বলিয়া উঠিলেন, "এই সব কথা আমি বাসবদত্তাকে বলিয়া দিব"। বিদূষক বাসবদত্তার অগ্নিদাহে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পর, রাজা বয়স্যকে দুঃখসহকারে অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিতে লাগিলেন, "বয়স্য!—

"দুঃখং ত্যক্তং বদ্ধমূলোঽনুরাগঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা যাতি দুঃখং নবত্বম্।
যাত্রা ত্বেষা যদ্ বিমুচ্যেহ বাষ্পং প্রাপ্তানৃণ্যা যাতি বুদ্ধিঃ প্রসাদম্ ॥"

দুঃখ পরিত্যক্ত হইয়াছে, (কিন্তু) অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। স্মরণে দুঃখ নবীভূত হয়। বাষ্প-বিমোচন করিলে পর, বুদ্ধি শোধন প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হয়—ইহাই সংসারের রীতি।" স্বামীর উৎকণ্ঠা দেখিয়া, বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে স্বামি-সন্নিধানে সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং অন্য পথ দিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী রাজসমীপে উপস্থিত হইলে পর, কাশ-পুষ্প—রেণুপাতই অশ্রুপাতের কারণ, এই বলিয়া রাজা নবোদ্বাহা নারীর মন রক্ষা করিলেন। পদ্মাবতী কিন্তু সমস্ত ব্যাপারই মাধবীমণ্ডপ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অপরাহ্ণে মগধ-রাজ দর্শক নূতন বরকে সুহৃজ্জন-সমীপে পরিচিত করাইয়া দিবেন, এই স্থির ছিল। এই জন্য বসন্তককে লইয়া উদয়নও অন্তঃপুর হইতে চলিয়া গেলেন।

অন্য একদিন, বাসবদত্তার নিকট পরিচারিকা সংবাদ আনিল যে, পদ্মাবতী শীর্ষবেদনায় অস্বস্থা হইয়াছেন; "সমুদ্র-গৃহে" তাঁহার শয্যা আস্তীর্ণ আছে; বাসবদত্তাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে। অপর এক পরিচারিকার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, বসন্তক উদয়নকে পদ্মাবতীর রোগের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। প্রদ্যোতদুহিতার শ্লাঘ্য চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়াই, উদয়ন সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন; আজ আবার পদ্মাবতীর শীর্ষরোগের কথায় বিষণ্ণতর হইয়া সেই রাত্রিতেই বয়স্যকে সঙ্গে "সমুদ্রগৃহে" শীর্ষ-বেদনাপীড়িতা পদ্মাবতীকে দেখিতে আসিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত পদ্মাবতী সেই গৃহে যাইয়া শয়ন করেন নাই। উভয়েই সেখানে পদ্মাবতীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাবেশ হওয়াতে, বিদূষকের গল্প শুনিতে শুনিতেই উদয়ন সেই শয্যাতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নৈশ শৈত্য নিবারণের জন্য

বিদূষকও প্রাবারক আনয়ন করিবার জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে বাসবদত্তাও পদ্মাবতীকে দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানেন না যে, সেই শয্যায় উদয়ন শয়ন করিয়া আছেন। তিনি ভাবিলেন, শয্যার এক পার্শ্বে অসুস্থা পদ্মাবতীই আবৃতশরীরা হইয়া নিদ্রিতা আছেন। সখীর এই পীড়ার সময়ে পার্শ্বে থাকা প্রয়োজন—এই ভাবিয়া বাসবদত্তাও শয্যার এক পার্শ্বেই শুইয়া পড়িলেন। সেই সময়েই উদয়ন স্বপ্নাবস্থায় "হা বাসবদত্তে! হা প্রিয়ে! হা প্রিয়শিষ্যে, আমার কথার প্রত্যুত্তর দাও না কেন?" ইত্যাদি করুণসূচক শব্দাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আর্য্যপুত্রের কণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া আবন্তিকাবেশধারিণী বাসবদত্তা চমকিতা হইয়া, শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সভয়ে ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি আর্য্যপুত্র তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে,

"মহান্তো খু অয্য—জোঅন্ধরাঅণস্‌স পডিণ্ণাহারো মম দংসণেণ নিপ্‌ফলো সংবুত্তো।"

"আমার দর্শনে আর্য্য যৌগন্ধরায়ণের একটি মহান প্রতিজ্ঞা-ভার নিষ্ফল হইয়া যাইবে।" শয্যা-প্রান্ত হইতে স্বামীর অবলম্বিত বাহু-খানিকে শয্যোপরি তুলিয়া দিয়া, বাসবদত্তা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে উদয়নের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে যেন গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, এই ভাবিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য অর্দ্ধনিদ্রাবস্থায় তিনি গৃহের বাহির পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু দ্বার-পক্ষে তাড়িত হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এমন সময়ে বসন্তক প্রাবারক লইয়া আসিয়া দেখেন, রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এবং তিনি বিষণ্ণবদনে শয্যা-প্রান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। বয়স্যকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "বয়স্য,—

"শয্যায়ামবসুপ্তং মাং বোধয়িত্বা সখে গতা।
দগ্ধেতি ব্রুবতা পূর্ব্বং বঞ্চিতোঽস্মি রুমণ্বতা॥"

"এই শয্যায় নিদ্রিত আমাকে জাগাইয়া [বাসবদত্তা এই স্থান হইতে] চলিয়া গিয়াছেন। দাহপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রুমণ্বান্ আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।" বিদূষক বলিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি স্বপ্নে বাসবদত্তাকে দেখিয়া এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু উদয়ন কখনও এইরূপ স্বপ্নদর্শনের আশাও করেন নাই, তাই তিনি ভাবিলেন,

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ্ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্।"

যদি ইহা স্বপ্নই হইয়া থাকে, তবে অপ্রতিবোধই শ্রেয়ঃ ছিল। আর, যদি চিত্তবিভ্রম জন্মিয়া থাকে, তবে যেন এইরূপ বিভ্রমই চিরদিন থাকিয়া যায়।” দুই বন্ধুতে এইরূপ দুঃখের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে মহারাজ দর্শকের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, উদয়নের অন্যতম সচিব রুমণ্বান্ বিপুল সৈন্য সামন্ত লইয়া আরুণির অভিঘাতের জন্য মগধ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। মহারাজ দর্শকের হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি চতুরঙ্গ বল উদয়নের সাহায্যেই সন্নদ্ধ। তিনি আরও বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, উদয়নের গুণ-সমৃদ্ধিতে মুগ্ধ পৌরজনেরা সমাশ্বস্ত হইয়াছে; রিপুকুলের উচ্ছেদের জন্য তিনি সমস্ত কার্য্যের বিধান করিয়াছেন, এখন কেবল—

“তীর্ণা চাপি বলৈর্নদী ত্রিপথগা বৎসাশ্চ হ ধ্রুব।”

“সৈন্যকুল গঙ্গা পার হইতে পারিলেই বৎসরাজ্য তাঁহার হস্তগত হইবে।” উদয়নও শত্রুর উৎসাদাভিপ্রায়ে উদ্যত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন—

“উপেত্য নাগেন্দ্র-তুরঙ্গ-তীর্ণে তমারুণিং দারুণ-কর্ম্ম-দক্ষম্।
বিকীর্ণ-বাণোগ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গে মহার্ণবাভে যুধি নাশয়ামি॥”

হস্তি-হয়-সঙ্কুল, চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ-ভঙ্গসদৃশ প্রচণ্ড-বাণ-সমাকীর্ণ মহাসাগর-তুল্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, একবার সেই ক্রূর-কর্ম্মকুশল আরুণিকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার বিনাশসাধন করিব।”

দর্শকের সহায়তায় উদয়নের বৎস-রাজ্য-লাভ হইল সত্য, কিন্তু বাসব-দত্তার চরিত্রকথা স্মরণ করিয়াই তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে সন্তাপানুভব করিতে-ছেন। প্রদ্যোত ও তাঁহার মহিষী অঙ্গারবতী বাসবদত্তার অগ্নিদাহের কথা ও জামাতা উদয়নের সহিত মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর পরিণয়ের কথা অবগত হইয়াও, বৎসরাজের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ কঞ্চুকীকে ও বাসব-দত্তার ধাত্রী বসুন্ধরাকে বার্ত্তা-সহ মগধে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে বাসবদত্তার ঘোষবতী নামক প্রিয় বীণা-যন্ত্রটি কোনও ব্যক্তি নর্ম্মদাতীরে প্রাপ্ত হইয়া উদয়নকে প্রদান করিয়াছিলেন। বীণা-প্রাপ্তিতে তাঁহার চিরনির্ব্বাপিত শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইল। শিল্পীর সাহায্যে বীণাটিকে নূতন-তন্ত্রীযুক্ত [“নব-যোগা”] করাইয়া রাজা চিত্ত-বিনোদনের উপায় স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে, উজ্জয়িনী হইতে কঞ্চুকী ও ধাত্রীর আগমনসংবাদ উদয়নসমীপে আনীত হইল। উদয়ন পদ্মাবতীকে পার্শ্বে রাখিয়াই উজ্জয়িনী হইতে আগত ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, মনে করিলেন। কারণ,

"কলত্র-দর্শনার্হং জনং কলত্র-দর্শনাৎ পরিহরতীতি বহুদোষমুৎপাদয়ন্তি।"

"কলত্র-দর্শনযোগ্য লোকের নিকট কলত্র-দর্শন পরিহার করিলে, বহু-দোষ জন্মিতে পারে।" নবাগত সংবাদ-বহন-কারিণী ধাত্রী বসুন্ধরা না জানি কি নির্দ্দয় বার্ত্তাই লইয়া উজ্জয়িনী হইতে সেই স্থানে আসিয়া থাকিবেন। ইহাই উদয়নের ভাবনা। প্রদ্যোত-দুহিতাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াও, রক্ষা করিতে পারিলেন না, সেই জন্যই তিনি,

"পুত্রঃ পিতুর্জনিতরোষ ইবাস্মি ভীতঃ।"

"জাতক্রোধ পিতাকে যেমন পুত্র ভয় করেন।" সেইরূপ ভয়ান্বিত থাকিয়া শ্বশুর-শ্বশ্রূ-প্রেরিত সংবাদ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া থাকিলেন। উজ্জয়িনীর কঞ্চুকী বলিলেন,—বৎসরাজের শত্রু-হৃত রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া মহারাজ মহাসেন অতীব প্রীত হইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বাসবদত্তা-বিরহে উদয়নের চিত্ত-সন্তাপ লক্ষ্য করিয়া শ্বশুরকুলের কঞ্চুকী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—

উপরতাপ্যনুপরতা মহাসেন-পুত্রী এবমনুকম্প্যমানার্য্যপুত্রেণ। অথবা,
"কঃ কং শক্তো রক্ষিতুং মৃত্যুকালে রজ্জুচ্ছেদে কে ঘটং ধারয়ন্তি।
এবং লোকস্তুল্যধর্ম্মা বনানাং কালে কালে ছিদ্যতে রুহ্যতে চ।"

"স্বামি-কর্ত্তৃক এইরূপে অনুকম্প্যমানা মহাসেন-পুত্রী [বাসবদত্তা] মরিয়াও অনুপরতা (অমর) হইয়া আছেন। অথবা, মৃত্যুকালে কেহই কাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। রজ্জুচ্ছেদে কে ঘটকে ধরিয়া রাখিতে পারে? লোক সকল বনরাজির সমান-ধর্ম্মা, কেন না, কালে কালে ছিন্ন হইয়া [উভয়েই আবার] অঙ্কুরিত হয়।" তৎপরে ধাত্রী বসুন্ধরা প্রদ্যোত-পত্নী অঙ্গারবতীর বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। অঙ্গারবতী বলিয়া পাঠাইয়াছেন—"আমরা জানি যে, আমাদের কন্যা বাসবদত্তা আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু আমার এবং মহাসেনের নিকট তুমি আমাদের পুত্র গোপালকের ন্যায় সমান স্নেহাস্পদ। সেই জন্যই, আমরা তোমাকে কৌশলে উজ্জয়িনীতে ধরাইয়া আনিয়া, বীণা-বাদন-শিক্ষাচ্ছলেই বাসবদত্তাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কেবলমাত্র অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহমঙ্গল সম্পাদিত হওয়া অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু বিবাহ কার্য্য নিবৃত্ত না হইতেই, তুমি চাপল্যবশতঃ কন্যা অপহরণ করিয়া [illegible] ফিরিয়া গিয়াছিলে। তৎপরে আমরা তোমার ও

বাসবদত্তার চিত্রফলকন্যস্ত প্রতিকৃতিরই বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছিলাম। সেই চিত্রদ্বয় তোমার বর্ত্তমান বিরহাবস্থায় চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়াই, লোক সঙ্গে তাহা প্রেরণ করিলাম। সাপরাধ জামতার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ অদ্যাপি অবিকৃত রহিয়াছে—এই ভাবিয়াই উদয়ন ধন্য বোধ করিলেন। এ দিকে কিন্তু চিত্র-ফলক-ন্যস্ত প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া পদ্মাবতী প্রহৃষ্টা হইয়াও উদ্বিগ্না হইয়া পড়িলেন। রাজা উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর পদ্মাবতী বলিলেন যে, প্রতিকৃতি-সদৃশী এক রমণী তাঁহারই অন্তঃপুরে বাস করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কোনও এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ভগিনীকে তাঁহার হস্তে ন্যাস-রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। রূপ-সাদৃশ্যের কথায় রাজা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই রমণী বোধ হয়, বাসবদত্তাই হইবে ; স্বপ্ন-দর্শনও বুঝি সত্যই হইবে ; রুমণ্বান্ বাসবদত্তার অগ্নিদাহে দগ্ধ হওয়ার কথা বলিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু,

> "যদি বিপ্রস্য ভগিনী ব্যক্তমন্যা ভবিষ্যতি।
> পরস্পর-গতা লোকে দৃশ্যতে রূপ-তুল্যতা॥"

"যদি তিনি কোনও ব্রাহ্মণের ভগিনী হন, তাহা হইলে নিশ্চিতই তিনি অন্য কেহ হইবেন। এই পৃথিবীর লোকমধ্যে পরস্পর-গত রূপ-সাদৃশ্য অনেক আছে।" রাজার রাজ্যলাভ হইয়াছে, সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ এখন রাজার সহিত পুনর্মিলন ইচ্ছা করিয়া, যথাসময়েই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি আত্মভগিনীর প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলেন। আবন্তিকা-বেশধারিণী বাসবদত্তা অন্তঃপুর হইতে আনীতা হইলেন। উজ্জয়িনীর লোকেরাও তথায় উপস্থিত। সকলেই পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। উদয়ন পূর্ব্বমহিষী বাসবদত্তা ও মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণের সহিত মিলিত হইয়া, নবোঢ়া-পত্নী পদ্মাবতীকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। রাজা যৌগন্ধরায়ণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

> "মিথ্যোন্মাদৈশ্চ যুদ্ধৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ মন্ত্রিতৈঃ।
> ভবদ্‌যত্নৈঃ খলু বয়ং মজ্জমানাঃ সমুদ্ধৃতাঃ॥"

"আপনার মিথ্যা উন্মাদ, যুদ্ধ, শাস্ত্রানুমোদিত মন্ত্রণা ও যত্নবলেই [দুঃখ] মজ্জন-শীল আমরা সমুদ্ধৃত হইয়াছি।" মন্ত্রীর বুদ্ধি-কৌশলেই এই বিবাহ সম্পন্ন

হওয়াতে, বৎসরাজ পুনরায় নিজরাজ্য স্বাধিকারে আনিতে সমর্থ হইলেন। উজ্জয়িনীতেও এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

উদ্ভিদে আলোকের প্রভাব।

সূর্য্যদেব জীব ও উদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণ-স্বরূপ। সূর্য্য হইতে জগতের অন্ধকার দূর হয়, জগৎবাসী তজ্জন্য উত্তাপ দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। জীবশরীরে হউক, বা উদ্ভিদের অবয়বে হউক, যেখানে ক্রিয়াশীলতা আছে, সেখানেই আলোক ও উত্তাপের ক্রিয়া আছে; এতদুভয়ের অভাবে কেহ বাঁচিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকা অর্থে সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকা বুঝিতে হইবে। উদ্ভিদ্ যতক্ষণ ভ্রূণরূপে বীজের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার আলোকের বা উত্তাপের কোনও প্রয়োজন হয় না; এ অবস্থায় বীজ নিষ্ক্রিয় থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার ক্ষণ হইতে আলোক ও উত্তাপের প্রয়োজন। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, আলোকে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, এবং সেই ধারণা-বশে মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ রোপিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সে সংশয় এক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা চাষ-আবাদ বা বাগান-বাগিচা যাহা কিছু করি, তাহাতেই প্রকৃতির অনুসরণ করি, প্রকৃতির কার্য্যে সাহায়তা করি। কিন্তু উক্ত সহায়তা কার্য্য এত জটিল ও উদ্বেগময় যে, তাহাকে দ্বন্দ্ব বলিলে ক্ষতি হয় না। প্রকৃতি,—সৃষ্টির মালিক, কিন্তু সেই মালিকই পৃথিবীকে বীজ-দান-বিষয়ে এত মুক্তহস্ত—এত উদার যে, এক একটি গাছেরই বীজের সংখ্যা করিতে পারা যায় না, অঙ্কশাস্ত্রে তত গুরুরাশি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক দিকে যেমন অগণ্য বীজের সৃষ্টি, অন্য দিকে অগণ্য বীজের অপচয়! প্রতি লক্ষ বীজে একটিও গাছ জন্মিয়া জীবিত থাকিলে ২।৫ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী গভীর অরণ্যে পরিণত হইত, শার্দ্দূল সিংহাদি হিংস্রক পশুতে ধরিত্রী পূর্ণ থাকিত, মানবাদি দুর্ব্বল জীব কত দিন পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে, বিলুপ্ত হই, তাহা কে বলিতে পারে? বীজ পাকিবার সময় বা পরে অনেক বৃক্ষের তলায় গেলে রাশি-রাশি বীজ পতিত থাকিতে দেখা যায়। সে

সকল বীজ কতক পশু পক্ষীতে খায়, কতক লোকে আহরণ করে, তথাপি গাছতলায় স্বতঃই কত চারা জন্মে! বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শাল-বনে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—গাছতলায় রাশি রাশি বীজ পড়িয়া আছে,অতঃপর ২।১ পসলা বৃষ্টি হইবার পরই পতিত বীজরাশি হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হয়। অঙ্কুরোদ্গম হইলে মূল মৃত্তিকার অন্বেষণ করে, এবং ভূমি পাইলে তাহাতে মূল প্রবিষ্ট করিয়া স্থায়িভাবে আপনার স্থান করিয়া লয়। যাহারা ভূমিতে মূল সংলগ্ন করিতে পারে না, তাহারাই মরিয়া যায়। এইরূপ অনেক গাছেরই হয়। কারণ, প্রকৃতিদেবী কোন গাছেরই বীজকে মাটীতে পুতিয়া দেন না,—দশ হস্তে দশ দিকে ছড়াইয়া দেন। আমাদিগের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাছে বীজ কোনরূপে নষ্ট হয়, কিংবা বিক্ষিপ্ত হইয়া দেশদেশান্তরে গিয়া পড়ে, বা রৌদ্রজলে হাজিয়া বা শুকাইয়া যায়—এই ভয়ে আমরা বীজ সংগ্রহ করি ও সাবধানে মাটীতে পুতিয়া দিই। মাটীতে পুতিয়া দিই বটে,তথাপি মাটীর মধ্যে যাহাতে আলোক ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় রাখিয়া দিই, এবং সে উপায়,—কর্ষণ-কুদ্দলন দ্বারা মাটীকে আলগা করিয়া দেওয়া।

বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হইলে এক দিকে অঙ্কুর ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে চাহে, আর অপর দিকে উদ্ভিদাংশ বা কাণ্ডাংশ আলোকাভিমুখ হয়। কাণ্ড ও মূলের সংযোগস্থলকে ইংরাজি উদ্ভিদশাস্ত্রানুসারে apex কহে। আমরা ইহাকে মূল-গ্রন্থি বা নাভি নামে অভিহিত করিতে পারি। অঙ্কুরোদ্গমের পর কাণ্ডাংশ কিছুতেই অন্ধকারে বা অবরুদ্ধ স্থানে থাকিতে পারে না, ঊর্দ্ধদিকে সে উঠিবেই। কোনও একটি বীজকে উল্টাভাবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধাংশ নিম্নে ও নিম্নাংশকে উপরিভাগে রাখিয়া বপন করিলেও, লঘু হইলে, বীজ স্বতঃই উল্টাইয়া গিয়া আপনার সহজ ভাব গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ উপরিভাগ উপরিভাগেই আসিবে। তাল,নারিকেল প্রভৃতি গুরুভার ফল বিপরীতভাবে রোপিত হইলে যদিও উল্টাইতে না পারে,তথাপি অঙ্কুরিত হইলে কাণ্ডাংশ উপরে আসিয়া দেখা দিবেই; ইহাতে যদি সেই নবোদ্গত 'কল্'কে কিছু ঘোর-ফের করিতে হয়; তাহা করিয়াও কলটি মৃত্তিকাভেদ করিয়া দেখা দিবে,—ভূগর্ভাভিমুখ হইবে না। উদ্ভিদের কাণ্ডাংশ উপরে আসিবার উদ্দেশ্য,—আলোক-আহরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস-নির্ব্বাহ ইত্যাদি। উত্তাপ বা আলোক কোনও উদ্ভিদেরই খাদ্য নহে, তথাপি খাদ্য অপেক্ষা ইহাদিগের প্রয়োজন অধিক। ভূগর্ভমধ্যে উদ্ভিদের আহার্য্যদ্রব্য নিত্য বিদ্যমান থাকে,সুতরাং খাদ্যের জন্য বায়ুমণ্ডল

বা সূর্য্যের কিরণের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ভূগর্ভ হইতে মূল দ্বারা উদ্ভিদগণ যে সকল আহারীয় পদার্থ আহরণ করে, তৎসমুদয় পত্রে গিয়া পৌঁছে। পত্রগণ আলোক আহরণ করে। এক্ষণে মৃত্তিকা হইতে আহরিত পদার্থসমূহ আলোকের সংস্পর্শে আসিলে এতদুভয়মধ্যে সন্ত্রয়ক বা ভৌতিক ক্রিয়ার উদ্ভব হয়, এবং তাহারই ফলে পত্রমধ্যে প্রথমতঃ পত্রহরিত (chlorophyl), এবং পরে অণুনাল (protoplasm) শর্করা প্রভৃতি দেহগঠনের উপাদানসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, পত্রগণই উদ্ভিদের রন্ধনশালা, আলোক,—অগ্নি, আর স্বয়ং প্রকৃতি,—দেবী রাঁধুনী। উদ্ভিদগণ আলোকের কত পক্ষপাতী, তাহার একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। অনেকের বাড়ীতে নানাবিধ গাছ-পালা টবে বা গামলায় থাকিতে দেখা যায়। এই সকল গাছ প্রায় গৃহস্থের অঙ্গিনা ছাদ বা বারান্দায় থাকে। টবে সংস্থাপিত কোনও একটি গাছকে বহির্দ্দেশ হইতে গৃহমধ্যে আনিয়া ক্ষণকাল,—অধিক কি, একঘণ্টা কাল,—রাখিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই অল্পক্ষণমধ্যে, যে দিকে অধিক আলো, পত্রগুলি সেই দিকে হেলিয়াছে। গৃহের চারি দিকে সমভাবে আলোক থাকিলে উহারা কোন দিকে না হেলিয়া যথাভাবে থাকে, কিন্তু ঠিক দ্বিপ্রহর বা মধ্যাহ্নকাল ভিন্ন কোন সময়েই আবৃত স্থানের চতুর্দ্দিক সমভাবে আলোক পায় না, মোটের উপর স্পষ্টই দেখা যায় যে, যে দিকে আলোক বা অধিক আলোক, সেই দিকেই গাছের পাতাগুলি মুখ ফিরায়, সেই সঙ্গে কোমল ও কচি শাখাগুলিও অনেকাংশে দিকপরিবর্ত্তন করে। দীর্ঘকাল ঈদৃশ অবস্থায় থাকিতে দিলে সমগ্র গাছটি আলোকাভিমুখ হইয়া পড়িবে, এবং তখন মনে হয় যে, অপর দিকটি যেন তাহার পশ্চাদ্ভাগ। এই অবস্থায় ২।৪ দিন থাকিতে দিলে শাখা প্রশাখাগুলি আলোকের দিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা গাছের বৃদ্ধি নহে, আলোকাভিমুখে আসিবার প্রয়াস! এইরূপে এক দিকে যেমন উদ্ভিরটির সদর মফঃস্বলের আবির্ভাব হয়, অন্য দিকে গাছের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইতে থাকে। আরও কয়েক দিবসের পর হইতে উদ্ভিদের পত্র ও হরিত-অংশ-নিচয় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এক্ষণে উদ্ভিদ ব্যাধিগ্রস্থ। এতদবস্থায় আবার কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে এক একটি করিয়া পত্রগুলি খসিয়া পড়িতে থাকে, গাছে নানাবিধ কীট আশ্রয় গ্রহণ করে; ইত্যাদি কত কি হয়। উদ্ভিদের আলোকপ্রিয়তা (actinism) পরীক্ষা করিবার জন্য সমগ্র গাছ না আনিয়া কোনও গাছের একটি ডগা আনিয়া গৃহমধ্যে

বা বারান্দায় একটি জলপূর্ণ ফুলদানী কিংবা ঘটী বাটীতে বোঁটাটী ডুবাইয়া রাখিলেও, তাহার পত্রগুলি, ক্রমে সমগ্র ডগাটি, দিক পরিবর্ত্তন করিয়া আলোকাভিমুখ হইবে। ঈষৎ লক্ষ্য করিলে উদ্ভিদের এই আলোক-প্রিয়তা আমরা প্রতিপদে দেখিতে পাই। কোনও বাগান বাগিচায় গেলে দেখিতে পাই, কত গাছ কত দিকে হেলিয়া গিয়াছে। যে দিকে আওতা, সকল গাছই সে দিক হইতে মুখ ফিরায়। অট্টালিকার বা কোনও বৃহৎ বৃক্ষের নিকটে যে গাছ থাকে, সে গাছ অট্টালিকা বা বৃক্ষের বিপরীত দিকে ঝুঁকে ; আর অপর দিকে শাখা প্রশাখা বা পত্র থাকে না। অনিবার্য্য কারণে যেগুলি সে দিকে বৃদ্ধি পায়, তাহাদিগের সদর সেই অবরুদ্ধ বা আওতার দিকে না হইয়া দিগন্তরে হইয়া থাকে। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কোনও স্থানে কতক গাছের সমষ্টি বা শ্রেণী থাকিলে কিছুদিন পর্য্যন্ত গাছগুলি নিরাপদে বাড়িতে থাকে, কিন্তু যেই পরস্পরে সংলগ্ন হইবার সময় আগত হয়, অমনই তাহাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় ; প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতে থাকে,—কিসে পার্শ্ববর্ত্তিগণকে অতিক্রম করিয়া উপরে বা পার্শ্ব দিকে বাহির হইতে পারে। সমকালে রোপিত বৃক্ষ-পুঞ্জমধ্যে কোনও গাছ ছোট থাকে, কোনও গাছ সমধিক বাড়িয়া যায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আলোকের জন্য সংগ্রাম করিয়া যে যে গাছ জয়লাভ করে, তাহারাই বাড়িয়া উঠে ; অপরগুলি ইহাদিগের ছায়ায় আরও চাপা পড়িয়া যায়। সংসারে যোগ্যতার জয়, ইহা সর্ব্বত্রই দেখিয়া আসিতেছি। এরূপ স্থলে দুর্ব্বল গাছগুলি মারা পড়ে ; বা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ; আর তেজাল গাছগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়।

যে উদ্ভিদের যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ সহিবার শক্তি, কিংবা যে গাছ যেরূপ স্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাহার জন্য ঠিক সেই মত আলোকের ব্যবস্থা আছে। কোনও উদ্ভিদ প্রচণ্ড রৌদ্রে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে। আবার কোনও উদ্ভিদ সুগভীর কূপ বা ইন্দারার ভিতর ঘোর অন্ধ-কারাচ্ছন্ন ক্ষীণ আলোকে সুখে বসবাস করিতেছে। কত জাতীয় শৈবাল জলের মধ্যে চিরজীবন বাস করে, কিন্তু আলোকাভাবে আদৌ ক্লেশ পায় না। আমরা মনে করি, তাহারা আলোক চাহে না, বা আলোকহীন স্থানই তাহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু তাহা নহে ; আলোক বিহনে উদ্ভিদ বাঁচিতেই পারে না। সমুদ্রের জলগর্ভে দেড় শত ফুট নিম্নেও উদ্ভিদ

জন্মে। এই সকল গভীরজলবাসী উদ্ভিদের জাতিগত নাম, অ্যাল্গা (Algæ)। ইহাদিগের মধ্যেও কয়েকটি জাতি আছে, কিন্তু জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে একরূপ গভীরতামধ্যে থাকিতে পারে না। সূর্য্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আছে, তাহারই কোনও কোনও বর্ণরশ্মি ১৫০ ফুট নিম্নে যায়, আবার কোনও বর্ণের রশ্মি কেবল তদুপরিস্থ অনতিগভীর জলে প্রবেশ করিতে পারে।

সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভের দেড় শত ফুট পর্য্যন্ত অ্যাল্‌গা-জাতীয় শৈবাল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোনও কোনও স্থলে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ সলিলে দেড় শত ফুটের নিম্নেও জন্মিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, দেড় শত ফুট জলের ভিতরে আলোকের গতি আছে, স্বচ্ছ সলিলে আরও কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত যায়। সাধারণ হরিত বর্ণের গাছ সকল সূর্য্যরশ্মির আলোকান্তর্গত লাল অংশই গ্রহণ করে, কিন্তু পাটল (Brown) ও লালাভ শৈবালগণ উক্ত রশ্মির সবুজ অংশ গ্রহণ করে; কারণ, তত নিম্নে রশ্মির অপর কোনও বর্ণ প্রবেশ করিতে পারে না। উক্ত রশ্মির বর্ণের বিভিন্নতা হেতু উদ্ভিদগণ তদনুকূল বর্ণের হইয়া থাকে। আলোকের সহিত উদ্ভিদের বর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তাপের যেমন ডিগ্রী বা স্তর আছে, আলোকেরও তাহা আছে; তন্নিবন্ধন যে গাছ যত ডিগ্রী আলোক-সহনে অভ্যস্ত, তাহার বর্ণও তদনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সে বর্ণবিভিন্নতা আমরা তত সহজে বুঝিতে পারি না; কারণ, প্রভেদ এতই কম যে, উপলব্ধি করা সুকঠিন। ছায়াচিত্রে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তাবৎ সৃষ্ট পদার্থে একটি শক্তি আছে; সে শক্তি কোথাও প্রকাশিত, কোথাও প্রচ্ছন্ন। আলোক দ্বারা সেই প্রচ্ছন্নশক্তি উদ্ভাসিত বা উদ্দীপিত হয়, এবং তাহার বলে সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উক্ত শক্তি উদ্ভিদে থাকে, কি আলোকে থাকে, ইহা বলা কঠিন; তবে ইহা দেখিতে পাই, এতদুভয়ের সংস্পর্শে তাহার উদ্ভব হয়। উদ্ভিদের ন্যায় জীবেরও আলোক অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আলোক হইতে উদ্ভিদকে বঞ্চিত করিলে, উদ্ভিদজীবনে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, উদ্ভিদের কত অপকার হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আলোক ব্যতীত উদ্ভিদ-শরীরে পরিশোষণকার্য্য সমাহিত হয় না। উদ্ভিদের বৃদ্ধি যখন

পরিশোধিত পদার্থের উপর নির্ভর করে, তখন আলোকাভাবে বৃদ্ধিও স্থগিত থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত। যে সকল উদ্ভিদে পত্রহরিত নাই, কিংবা গাছের যে সকল অবয়ব পরিশোষণে অশক্ত, তাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন হয় না। ছত্রক-জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে পত্রহরিত থাকে না; এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে, তাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন হয় না। ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে যে, ছত্রকগণ আঁধারেই জন্মে। দুগ্ধ বা ব্যঞ্জনাদি বাসি বা ২।৩ দিনের পুরাতন হইলে তাহার উপর একটি শুভ্র পদার্থে মণ্ডিত আবরণ পড়ে। উক্ত শুভ্র পদার্থমণ্ডল অতিশয় নিম্নজাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-পুঞ্জ ভিন্ন আর কিছু নহে। এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদগণ গভীর অন্ধকারে জন্মে। এ সকল উদ্ভিদে পত্রহরিত থাকে না, সুতরাং তজ্জনিত মালমশলাও তাহাদিগের মধ্যে থাকে না। পত্রহরিত না থাকিলে উদ্ভিদে বর্ণসঞ্চার হয় না। এই জন্য ইহারা বর্ণহীন। শুভ্রতা বর্ণহীনতার নামান্তরমাত্র। বীজ, কন্দ, মূল বা পেঁয়াজ, ইহারা অঙ্কুরিত হইবার জন্য আলোকের অপেক্ষা করে না। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের অন্তস্ত্বক-পরিবৃত্ত কঙ্কাল, মুকুলান্তর্ব্বর্ত্তী কোষ, কিংবা শিকড়ের শেষাগ্রভাগ—এ সকলও আলোক চাহে না; বিনা আলোকেই ইহারা আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আলোকের অভাবে উদ্ভিদের পত্রহরিত-ধারক অংশ সকল—পত্র ও উদ্ভিদের কোমলাংশ পরিশোষণকার্য্য হইতে বিরত থাকে। দীর্ঘকাল আলোকের সংস্পর্শ না পাইলে, পত্রহরিতের শূন্য দানা বা কোষসমূহ শুকাইয়া চুপ্‌সিয়া যায়। ফলতঃ তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া যায়। কোনও একটি বর্দ্ধমান উদ্ভিদের অংশবিশেষকে খণ্ডিত করিয়া ঘনান্ধকারমধ্যে রাখিলে তাহাতে বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর সেই সকল পত্রহরিতের তাবৎ স্থানটি অর্থাৎ পত্র ও কোমলাংশ বিবর্ণতা বা পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই সকল অবয়বও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে পত্রের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র, কিন্তু মূল ও পত্রাদি দ্বারা আহরিত পদার্থের সাহায্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতেই আমরা পত্রসমূহকে বড় দেখিতে পাই। উদ্ভিদের বৃদ্ধি পত্র দ্বারা আহরিত বাষ্পীয় পদার্থের উপর পরোক্ষভাবে সমধিক নির্ভর করে। পত্রাংশে পরিপাকক্রিয়ার কার্য্যশীলতা না থাকিলে মূল দ্বারা আহরিত পদার্থে কোনও ফল হয় না। আলোকের অভাবে নূতন কেঁকড়ি অস্বাভাবিক লম্বা হয়; অর্থাৎ, পত্রগ্রন্থিসমূহের পরস্পর

ব্যবধান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। আওতায় বা ছায়ায় সাধারণ উদ্ভিদগণ—আলোকপ্রিয় উদ্ভিদগণ দীর্ঘ হয়;—কিন্তু উক্ত দীর্ঘতা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আলোকসম্পর্কিত স্থানে ঈদৃশ দ্রুত বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হয়। গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে, কিন্তু সে বৃদ্ধি সারবতী হয়, অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, আবহাওয়াসহ হয়, এবং তাহাতে ফল ও ফুল হয়। ছায়া বা আওতায় উৎপন্ন কোনও উদ্ভিদ দৃঢ় ও রৌদ্র-বাত্যাসহ হয় না। গৃহস্থালীব্যাপারে প্রায় দেখা যায়—ছেঁচ-তলা, অঙ্গিনা, পগার প্রভৃতি কত অজায়গায় শাক সবজী, ডাল কড়াই প্রভৃতির বীজ পতিত হয়, এবং তথায় থাকিয়া অঙ্কুরিত হইয়া চারায় পরিণত হয়। যে চারাগুলি ছায়ায় থাকে, সেগুলি ২।৪ দিনের মধ্যে এত দীর্ঘ হইয়া উঠে যে, খাড়াভাবে দাঁড়াইতে না পারিয়া ভূশায়ী হয়, বর্ণ পাংশু হয়, এবং তাহা-দিগের গ্রন্থি ও পত্র দূরে দূরে উদ্গত হয়। আরও ইহা দেখিতে পাই যে, যে সকল উদ্ভিদে কিংবা উদ্ভিদের যে সকল অংশে হরিতবর্ণোৎপাদক পদার্থ বা পত্রহরিৎ না থাকে, কিংবা যে সকল পুষ্পে বা পুষ্পের অংশে উক্ত পদার্থ স্বভাবতঃ না থাকে, আলোকের অভাবে তাহাদিগের কোনও ক্ষতি হয় না। হরিতবর্ণ-উৎপাদনের জন্য আলোকের যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা উপরে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এ স্থলে আর একটী কথা বলিবার আছে যে, উদ্ভিদশরীরে আলোক দ্বিভাবে কাজ করে, (১) সম্ভূয়কক্রিয়া (chemical action), (২) অনুপ্রাণতা (mechanical effect) দ্বারা। পদার্থে পদার্থে সমাবেশের ফলে যে একটী নূতন পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহা একজাতীয়, এবং পদার্থবিশেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাকে অপর-জাতীয় ক্রিয়ামধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আলোকের সম্ভূয়কতা নিবন্ধন উদ্ভিদে পত্রহরিত উৎপন্ন হয়, এবং কোষগণ পত্রহরিত-পরিশোষণ করিতে সমর্থ হয়। আলোকবিবর্জ্জিত অংশে পত্রহরিত উৎপন্ন হয় না। পত্রহরিতের অস্তিত্ব হেতু উদ্ভিদগণ স্বভাবতঃ হরিত হয়। ঈদৃশ স্থানের পত্রাদিতে পত্রহরিতোদ্দিষ্ট কোষ বা দানা উৎপন্ন হইলেও তাদৃশ স্বাভাবিক আকারের বা গড়নের হয় না; উপরন্তু সেই সকল কোষ বা দানার মধ্যে পত্রহরিতের পরিবর্ত্তে ইটিওলিন (Etiolin) নামক এক পীতাভ পদার্থ উৎপন্ন হয়। এতদবস্থাপ্রাপ্ত উদ্ভিদ আলোক ও উত্তাপ সংস্পর্শিত হইলে, পীতাভ পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া পত্র-

হরিতে পরিণত হয়, এবং উদ্ভিদাবয়ব সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় ; তখন আর সে পাণ্ডুবর্ণ থাকে না ; বরং তাহাতে পুনরায় উদ্ভিদের স্বাভাবিক বর্ণের বিকাশ হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ, বিশেষতঃ গুল্মজাতীয় Ferns আলোক-হীন বা ক্ষীণ আলোকে থাকিলে ঘন সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহা সাধারণনিয়মের বহির্ভূত। ঈদৃশ স্থানে থাকিয়া ইহাদিগের মধ্যে যে পত্রহরিতের দানা জন্মে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

ঋতু, দিন ও সময়বিশেষে আলোকের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। আলোকের ঈদৃশ বিভিন্নতা উদ্ভিদ-শরীরে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটী একজাতীয় উদ্ভিদ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এরূপে রাখিতে হইবে, যেন কোনও গাছে প্রাতে ২।১ ঘণ্টা, কোনও গাছে মধ্যাহ্নে ২।১ ঘণ্টা, কোনও গাছে অপরাহ্নে ২।১ ঘণ্টা রৌদ্র লাগিতে পায়, কিংবা কোনও গাছ সারা দিন রৌদ্র পায়,কোনও গাছ সারাদিন ছায়া পায়। এইরূপ ব্যবস্থাপূর্ব্বক গাছ কয়েকটী কয়েকদিন রাখিলে প্রত্যেক গাছেই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। আলোকের প্রভাবে বা অভাবে কোনও গাছ সবল সুশ্রী, কোনও গাছ শীর্ণ ও বিশ্রী হইয়া যায়, ইত্যাদি অনেক বিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যরশ্মির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ থাকায় স্থানবিশেষে রশ্মির বিশেষ বিশেষ বর্ণ উদ্ভিদকে অনুপ্রাণিত করে, তাহার ফলে ফলও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আলোকের সম্ভূয়ক শক্তি রশ্মির অন্তর্গত লালবর্ণের মধ্যে নিবদ্ধ, কিন্তু অপর শক্তি (mechanical action) আশমানী বা ভায়োলেট বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ; এ জন্য শেষোক্ত বর্ণের দ্বারা উদ্ভিদের কোনও উপকার দর্শে না। গাছের অভ্যন্তরাংশে লালা (Protoplasm) রক্ষিত হইবার যে সকল কোষ থাকে, তাহারা আলোকের দ্বিতীয়শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্ধকারের গাছে আলোকের অভাববশতঃ উক্ত শক্তির সমাবেশ হইতে পারে না বলিয়া তাহারা ক্ষ ; কিন্তু আলোকে পালিত উদ্ভিদ সে সুযোগ পায় বলিয়া দৃঢ় ও সমর্থ হয়। আলোক ও উত্তাপ পরস্পর সখিরূপে প্রায় সর্ব্বদা একত্র থাকে, সুতরাং আলোকের সহিত প্রায় উত্তাপ থাকে। এ প্রবন্ধে উত্তাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল না—কারণ ইহাতে কেবল আলোকের কথা বলিবার বিষয়।

আলোকে উদ্ভিদগণ ক্রিয়াশীল থাকে, এবং সেই অবস্থাতেই উদ্ভিদগণ বর্দ্ধিত হয়। রাত্রিকালে আলোকের অভাব, সুতরাং সে সময় জীবজগতের

ন্যায় উদ্ভিদ-গতেরও বিরাম ও নিদ্রাকাল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যখন জানিলেন যে, আলোকই উদ্ভিদের ক্রিয়াশীলতার মূল, তখনই তাঁহারা জানিলেন যে, রাত্রিকালে উদ্ভিদকে কৃত্রিম উপায়ে আলোক-সান্নিধ্যে রাখিতে পারিলে রাত্রিকালেও উহারা বৃদ্ধি পাইবে। পরীক্ষায়ও তাহা সিদ্ধান্ত হইল। যথা বলা, তথা কাজ। এক্ষণে বিলাতে কোনও কোনও গৃহস্থ কৃষক (farmer) নিজ নিজ ক্ষেত্র মধ্যে রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকের ঘনঘটা লাগাইয়া দিয়া থাকেন; ফলে ফসল আর ঘুমাইতে পায় না— দিবারাত্রি আহার ও পরিশোষণ, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি। এতদুপায়ে ছয় মাসের ফসল তিন মাসে হইতেছে; তন্নিবন্ধন অন্যান্য বাবদে কত ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, কত শীঘ্র টাকা ঘুরিয়া আসিতেছে, ইত্যাদি কত সুবিধা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে পরে বলিব।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আদমস্থুমারীতে বাঙ্গালার অবস্থা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলার আদমস্থমারীর রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটে বাঙ্গলা গবমেণ্ট তাহার উপর মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। দেশীয় নেতৃগণের, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজপতিগণের তাহা আলোচনার যোগ্য। আমরা এ স্থলে তন্মধ্যে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহার ফলে যদি যোগ্য ও সুধী ব্যক্তিরা এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সহর ও পল্লী—ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ পল্লীপ্রধান। ইহার অধিকাংশ লোকই পল্লীতে বাস করে। সেন্সাসে দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার মধ্যে হাজার করা ৯৩৬ জন এখনও পল্লীগ্রামবাসী। সুতরাং পল্লীর উন্নতির উপরেই এ দেশের লোকের জীবন মরণ নির্ভর করে। সেই পল্লীর প্রতি আমরা একেবারেই দৃষ্টিহীন, ইহা সুলক্ষণ নহে। পল্লীসমূহ ক্রমেই পরিত্যক্ত ও লোকশূন্য হইতেছে; অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার

লীলাভূমি হইয়া উঠিতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সেখানে মেলা দুষ্কর, সেখানে ভাল রাস্তাঘাট নাই, জলনিকাশের পথ নাই। যাঁহারা ধনী ও শিক্ষিত, তাঁহাদের কেহ বা বিলাসিতার জন্য, কেহ বা চাকরীর দায়ে, সহরে চিরস্থায়িরূপে বাস করিতেছেন। ইতর শ্রেণী সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকে জীবিকার জন্য সহরে বা তাহার উপকণ্ঠে যাইয়া মজুর প্রভৃতির কাজ করিতেছে। ফলে সহরের লোকসংখ্যা ক্রমেই অত্যধিকপরিমাণে বাড়িতেছে। দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতা, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি বড় বড় সহরে ও তাহার উপকণ্ঠে শতকরা ১৩ জন করিয়া লোক বাড়িয়াছে; আর বঙ্গের মোট লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার গড়ে ৮ জন মাত্র। হাবড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতি বর্গ মাইলে ১৮৫০ জন লোক বাস করে। মোট লোকসংখ্যার গড় প্রতিবর্গ মাইলে ৫৫১ জন মাত্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে কিরূপ ভাবে লোক বাড়িতেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু এই বলিলেই হইবে যে, এক ভাটপাড়াতেই গত ৩০ বৎসরে শতকরা ৫০০ জন অর্থাৎ ৫ গুণ লোক বাড়িয়াছে। ভাটপাড়ার ন্যায় ক্ষুদ্র স্থানের লোকসংখ্যা এখন ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক।

পল্লী এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াই ক্রমে অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, এবং আমাদেরও মৃত্যুর বীজ উপ্ত হইতেছে। চেষ্টা করিয়া পল্লীর উন্নতি করিলে যে পল্লী আবার স্বাস্থ্যকর ও লোকপূর্ণ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই রিপোর্টেই দেখা যাইতেছে। মগরাহাট চব্বিশপরগণার একটি পল্লীগ্রাম; আয়তন ৩০০ তিন শত বর্গ মাইল। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান ম্যালেরিয়ার আকরস্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল—গ্রামবাসী ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কোন প্রকারে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিত। সেখানে ভাল পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণের দ্বারা জলনিকাশের সুব্যবস্থা হওয়াতে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মগরাহাট এখন স্বাস্থ্যকর স্থান; ১৯০১—১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহার লোকসংখ্যা শতকরা ২৯ জন বাড়িয়াছে। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—হইলে আরও সুফল পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। অতঃপর ম্যালেরিয়া-নিবারণে কুইনাইন ও কেরোসিনের অব্যর্থতা সম্বন্ধে রাজপুরুষদের মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপও বোধ হয় মনে করা যাইতে পারে।

লোকসংখ্যা—১৯১১ অব্দে সমস্ত যুক্তবঙ্গের লোকসংখ্যা ৪, ৬৩০৫৬৪২ অর্থাৎ ৪½ কোটীর কিঞ্চিৎ উপরে স্থিরীকৃত হইয়াছে; অর্থাৎ ১৯০১ অব্দের অপেক্ষা ৩৫, ০০০০০ লোক বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির হার মোটের উপর শতকরা ৮ জন। গতপূর্ব্ব সেন্সাস-সমূহের সহিত তুলনা করিলে এইরূপ দেখা যায়ঃ—

সমগ্র বঙ্গের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার।

১৮৭২—৮১	১৮৮১—৯১	১৮৯১—১৯০১	১৯০১—১৯১১
১১. ৫	৭. ৩	৫. ১	৮

সুতরাং গত তিন সেন্সাসে বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল; এইবার একটু বাড়িয়াছে, ইহা আশার কথা বটে। আমি সমগ্র বাঙ্গলার কথাই বলিতেছি। বাঙ্গালী হিন্দুদের সম্বন্ধে এই নিয়ম যে ঠিক খাটে না, তাহা নিম্নেই আমরা দেখিতে পাইব।

লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই অধিকাংশ;—শতকরা ৯৭·৬ জন। সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৫২ জন মুসলমান, আর হিন্দু ৪৫ জন মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা প্রায় ৩২৫০০০০ (৩২½ লক্ষ) বেশী। সুতরাং হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। নিম্নে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সেন্সাসের সহিত তুলনা করিয়া আমরা যে তালিকা দিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবেঃ—

বৎসর	হিন্দুর লোকসংখ্যা	মুসলমানের লোকসংখ্যা	হ্রাস-বৃদ্ধি
১৮৭২ ...	১৭১ লক্ষ ...	১৬৭ লক্ষ ...	মুসলঃ ৪ লক্ষ কম
১৮৮১ ...	১৭২½ লক্ষ ...	১৭৯ লক্ষ ...	মুসলঃ ৬½ লক্ষ বেশী
১৮৯১ ...	১৮০ লক্ষ ...	১৯৬ লক্ষ ...	মুসলঃ ১৬ লক্ষ বেশী
১৯০১ ...	১৯৪ লক্ষ ...	২২০ লক্ষ ...	মুসলঃ ২৬ লক্ষ বেশী

আর এই ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে দেখিতেছি,—

মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা ৩২½ লক্ষ বেশী হইয়া গিয়াছে! আর হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের বৃদ্ধির হার কত শুনিবেন! বেঙ্গল গবর্মেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"The figures of relative growth show that during the last decade (1901—1912) the increase among the

Mohemedans has been nearly thrice as great as among the Hindus. অর্থাৎ, গত দশ বৎসরে (১৯০১—১৯১১) হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ৩ গুণ বেশী হইয়াছে !

সুতরাং বুঝা কঠিন নহে যে, বঙ্গের হিন্দুজাতি ক্রমশই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে—জীবন-যুদ্ধে মুসলমানদিগের দ্বারা তাহারা ক্রমেই পরাস্ত হইয়া পড়িতেছে ! লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৯) এই আশঙ্কার কথাই কঠোর যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১) কিন্তু আমরা মোহমুগ্ধ, মুমূর্ষু, বিকল—বোধ হয়, সে কথা আমাদের কর্ণে ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। উপরন্তু কয়েক জন বুদ্ধিমান্ সদাশয় ব্যক্তি স্বজাতিপ্রেমে অন্ধ হইয়া ইহার প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, নিজের অঙ্গক্ষত লুকাইয়া উপরে ভাল পোষাক পরিয়া লাভ নাই। তীব্র ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ক্ষতের চিকিৎসা না করিলে তাহা মৃত্যুরই কারণ হইয়া উঠে। পৃথিবী হইতে অনেক জাতি লোপ পাইয়াছে—আমরাও হয় ত পাইব। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চল-ভাবে মরার অপেক্ষা কি জীবনের জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত নয় ? একই দেশে বাস করিয়া মুসলমান ও হিন্দুর জীবনীশক্তির এই প্রভেদ কেন হয়, তাহা বাস্তবিকই অনুসন্ধানের বিষয়। সুধী ও মনস্বিগণের এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

শিশুমৃত্যু—আর একটি ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহা হিন্দু ও মুসল-মান উভয়েরই চিন্তার বিষয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে,শিশুমৃত্যু এত বেশী হইয়াছে যে, তাহা নিতান্ত ভীতিজনক। গড়ে বৎসরে প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে ১ জন করিয়া মরে। এই শিশু-মৃত্যু হিন্দুর মধ্যে বেশী, কি মুসলমানের মধ্যে বেশী, তাহা ঠিক হয় নাই। গবর্মেণ্টের মন্তব্যে আছে যে, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, শ্রমজীবিগণের মধ্যে দারিদ্র্য, এইগুলিই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। আমাদের মনে হয়, জনসাধারণের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য-কর বাসস্থান, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও পানীয়ের অভাব, এইগুলিই প্রধান কারণ। অবশ্য এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্বন্ধযুক্ত। ইহা আজকাল সকলেই জানেন যে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃতাদি বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। গবাদি পশুর হ্রাসই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। আর বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবই

(১) "Dying Race"—by U. N. Mukerjee (1909)

যে শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ, তাহা অনেকেই বলিয়াছেন। কলিকাতা-তেই এই শিশুমৃত্যুর সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য। এখানে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের শতকরা ৩০ জনই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কলিকাতার জনাকীর্ণতা, বিশুদ্ধ আলোক ও বায়ুর অভাব, বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব—এ সকলই শিশু-মৃত্যুর সহায়তা করে।

শিক্ষা—শিক্ষা-বিষয়ে বাঙ্গালার একটা সুখবর আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। বাঙ্গলা দেশে সমগ্র শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই যে কেবল বেশী, তাহা নহে; মোট লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত লোকের অনুপাতও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। বাঙ্গলায় শতকরা ৭·৭ জন, মান্দ্রাজে ৭·৫ জন ও বোম্বাই প্রদেশে শত-করা ৬·৯ জন লোক শিক্ষিত। অবশ্য, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই সংখ্যা যে নিতান্ত হাস্যকর, ইহা বলা বাহুল্য। সমগ্র শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশে ৩৫ লক্ষের বেশী হইবে না;—তার মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২½ লক্ষ।

শিক্ষা-বিষয়ে বাঙ্গালায় জেলা-সমূহের মধ্যে কলিকাতা অগ্রবর্ত্তী। এখানে প্রায় প্রতি তিন জনে এক জন শিক্ষিত। অপর দিকে মৈমনসিংহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর ও মালদহ—এই সকল জেলা শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত। এই সকল জেলাবাসীদের ইহা ভাবিবার কথা। মৈমনসিংহে "আনন্দ-মোহন কলেজে" বি. এ. শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম, মৈমনসিংহ এত বেশী শিক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সে বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা অতিরিক্ত লোভের পরিচয়মাত্র!

১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৬৩২, ২২২ অর্থাৎ ৬ লক্ষের কিছু উপর বাড়িয়াছে—তার মধ্যে স্ত্রীলো-কের সংখ্যা ৯০৩৪২। সমগ্র লোকসংখ্যায় শিক্ষিত লোকের বৃদ্ধির অনু-পাত শতকরা ২১০৫ জন;—কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষিতাদের বৃদ্ধির অনুপাত শতকরা ৫৬ জন। বাঙ্গলা গবর্মেণ্ট বলেন যে, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও বেশী দেখা যাইত। কিন্তু ১৯০১ অব্দ অপেক্ষা ১৯১১ অব্দের সেন্সাসে শিক্ষার আদর্শ একটু বেশী উচ্চ ধরা হইয়াছে। ১৯০১

অব্দের সেন্সাসে শুধু কেবল লিখিতে পড়িতে পারাই আদর্শ ছিল। ১৯১১ অব্দে যে সকল লোক অন্ততঃ নিজে পত্র লিখিতে পারে, এবং পত্রের উত্তর পড়িতে পারে, তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই।

শিক্ষাবিষয়ে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা পশ্চাৎপদ, তাহা রিপোর্টে দেখা যাইতেছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় ৩২ লক্ষেরও বেশী। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোকের অনুপাত ২. ৫। —অর্থাৎ, প্রতি ২ জন মুসলমানের তুলনায় ৫ জন হিন্দু শিক্ষিত। কিন্তু গত দশ বৎসরে শিক্ষা বিষয়ে কে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার বেশী দ্রুতবেগে হইয়াছে। ১৯০১ অব্দে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১০.৩ ও মুসলমানদের শতকরা ৩. ৫ জন শিক্ষিত ছিল। এবার হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১১. ৮ ও মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৪. ১ জন শিক্ষিত দেখা যাইতেছে। সুতরাং গত দশ বৎসরে হিন্দুদের মধ্যে ৭ঃ ৮ ও মুসলমানদের মধ্যে ৬ঃ ৭ এই অনুপাতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে শিক্ষা যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে আমরা সুখী। কিন্তু যে শিক্ষা বিষয়ে হিন্দুরা বড়াই করিতেন, তাহাতেও তাঁহারা যে ক্রমে মুসলমানদের অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িতেছেন, ইহা আমরা কোনও মতেই আশার কথা বলিতে পারি না।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে বাঙ্গালাদেশের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। আর এই উন্নতি মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যেই বেশী হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে গত দশ বৎসরে সমগ্র লোকসংখ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ২১. ৪ জন বাড়িয়াছে ;—আর কেবল স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন বাড়িয়াছে। আবার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে তুলনা করিলে এইরূপ দেখা যায় ঃ—

শিক্ষিত লোকসংখ্যার বৃদ্ধি।

	পুরুষ—	স্ত্রী—
মুসলমান	শতকরা ২৯ জন	শতকরা ৩১ জন
হিন্দু	” ১৬ জন	” ৬৪ জন

অর্থাৎ, হিন্দুসমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ৪ গুণ পরিমাণে বাড়িয়াছে! মা লক্ষ্মীদের জয় হউক!

গত দশ বৎসরে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তৃতি বেশী পরিমাণে হইয়াছে। কৈবর্ত্ত, পোদ, নমঃশূদ্র ও রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ পোদেরা শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শিক্ষার উন্নতি আর এক দিক দিয়াও কতকটা বুঝা যাইতে পারে। গত দশ বৎসরে বাঙ্গালাদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০০০ বাড়িয়াছে, এবং ছাত্রসংখ্যা ৪০০০০০ অর্থাৎ ৪ লক্ষ বাড়িয়াছে। আবার বালিকা-বিদ্যালয়েও ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ৩ গুণ পরিমাণ বাড়িয়াছে।

ভাষা—দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৯২ জন লোকের ভাষা বাঙ্গালা। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষীর সংখ্যা শতকরা ৪ জন মাত্র। আর ৪ কোটী ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ লোকই আর্য্যভাষায় কথা কহে।

হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষীদের সংখ্যা হাবড়া ও চব্বিশপরগণাতেই বেশী। কেন না, এই সব স্থানেই প্রধানতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে শ্রমজীবীদের আমদানী হইয়া থাকে। সুতরাং খাস বাঙ্গালায় বাঙ্গালাই প্রায় সমগ্র লোকের ভাষা। শ্রীহট্ট ও পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান বাঙ্গালার সীমা-বহির্ভূত হইয়াছে। তাহা না হইলে বাঙ্গালা-ভাষাভাষীর সংখ্যা আরও বেশী দেখা যাইত। সুতরাং বিস্তৃতিতে পৃথিবীর যে সকল ভাষা শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গালাভাষা তাহাদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবার যোগ্য।

অতঃপর, যে সকল মুসলমান ভ্রাতারা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুকে জোর করিয়া মাতৃভাষা করিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহারা একটু সাবধান হইবেন। স্বাভাবিক ও সার্ব্বজনীন ভাষার বিরুদ্ধে এইরূপ বিপরীত চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যে কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট করিবেন, তাহা নহে; জাতীয় অনিষ্টেরও বীজ বপন করিবেন।

বৃত্তি—শতকরা ৭৫ জন অর্থাৎ বারো আনা লোকের বৃত্তি কৃষি। অন্যান্য সভ্যদেশে শিল্পবাণিজ্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা। আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্য নানা কারণে ধ্বংসপ্রায় হইয়া যাওয়াতে অধিকাংশ লোককেই কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহাই আমাদের দেশের দারিদ্র্য

ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। যাঁহারা আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য আরও বাড়াইবার পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহারা হয় আসল কথাটা চাপা দিতে চান, নয় ভিতরের ব্যাপার তলাইয়া দেখেন না। আমরা যদি আমাদের নষ্ট শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার না করিতে পারি, তবে আর আমাদের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোনও উপায় নাই। (১)

প্রধান প্রধান শিল্প কেবল ৩৫ লক্ষ লোকের অবলম্বন। ইহার মধ্যে প্রায় ¼ লোক তন্তুশিল্পের উপর নির্ভর করে। পাটের ব্যবসায় অত্যন্ত বাড়িয়াছে, দেখা যাইতেছে; গত দশ বৎসরে ইহার বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪০। এই ব্যবসায় প্রায় ৩২৮০০০ লোকের অবলম্বন।

প্রায় ৫ লক্ষ লোক রাজকার্য্য করে। স্বাধীন বৃত্তি ও অন্যান্য উচ্চ-শিল্প প্রায় ১০ লক্ষ লোকের অবলম্বন। গত দশ বৎসরে আইন-ব্যবসায়ে লোকসংখ্যা গড়ে শতকরা ৩০ জন বাড়িয়াছে। এখন বাঙ্গালায় আইন-জীবীদের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ দশ হাজার। আশঙ্কার কথা বটে!

মিল, খনি, চা-বাগান প্রভৃতির সংখ্যা ১৪৬৬। আর এই সকলে ৬ লক্ষের বেশী লোক কাজ করে। ইহাদের প্রায় ⅓ পাটের মিলে ও ⅓ চায়ের বাগানে কাজ করে। কলিকাতা, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা, এই কয়েকটি স্থানই বাঙ্গলার শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসায়ের মধ্যে পিতল ঢালাইয়ের ব্যবসায়, তেলের কল, চাউলের কল, কাঠের কারখানা, ইটের ব্যবসায় প্রভৃতিতে দেশীয়দের আধিপত্য বেশী। অন্য দিকে পাটের কল ইউরোপীয়দের একচেটিয়া। আর চায়ের বাগান, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতিতেও তাঁহাদেরই আধিপত্য বেশী।

একটি চিন্তার কথা এই যে, এই সকল কল কারখানায় অন্যপ্রদেশের শ্রমজীবীদের সংখ্যাই বেশী হইয়া পড়িতেছে। প্রায় সকল কারখানাতেই বাঙ্গালী শ্রমজীবীদের সংখ্যা কম; পাটের ব্যবসায়ে ত নিতান্ত কম। প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ লোক অন্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসে—আর কেবল ৫ লক্ষ বাঙ্গালী বৎসরে বাঙ্গালা হইতে অন্য প্রদেশে যায়। এইরূপে বাঙ্গালার কল কারখানাতে শ্রমজীবীদের মধ্যে খাস বাঙ্গালীর সংখ্যা

(১) এই কথা পূজ্যপাদ শ্রীযুত কিশোরীলাল সরকার এম. এ., বি. এল্. মহাশয় তাঁহার "A Dying Race—How Dying" (১৯১১ অব্দে প্রকাশিত) নামক বহু-তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, ইহা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। ফলে এই সমস্ত জীবিকাহীন বাঙ্গালী শ্রমজীবীরা হয় শেষ আশ্রয় কৃষিকার্য্যাদি অবলম্বন করিবে, অথবা চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা প্রভৃতি করিয়া খাইবে।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৃত্তির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৩৭ জন ও মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন মাত্র কৃষি ব্যতীত অন্য কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ফলতঃ দেশের অধিকাংশ কৃষিকার্য্যই মুসলমানদের হাতে। ইহা হিন্দুদের পক্ষে শুভ কি অশুভ, তাহা মনীষিগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

দেশ ও কাল।

ভূত ডাকিয়া পরে ভূত তাড়ান ওঝার পক্ষে অনেক সময় কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। ভূত বলে, আমার দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া এখন অনাবশ্যক-বোধে আমাকে তাড়াইতে চাও, তাহা হইবে না। ওঝা বিস্তর মন্ত্রৌষধি-প্রয়োগ করিয়াও যখন নিষ্ফল হন, তখন নিরুপায় হইয়া ভূত পুষিয়া রাখেন। পরে সেই ওঝার মৃত্যু হইলে তাঁহার পদে যখন কোনও নূতন ওঝা বসিতে চাহেন, তখন ভূত বলে, অগ্রে আমার পূজা কর, তবে পদে বসিতে পাইবে। নূতন ওঝা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করেন। তাঁহার বিশ্বাস হয়, ঐ ভূতই এই পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বৈজ্ঞানিকের ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। তিনি প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনের সৌকর্য্যার্থ কয়েকটি জিনিস মানিয়া লইয়া তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষে সেই মানিয়া লওয়া জিনিসগুলি ধ্রুবসত্যরূপে আপনাদিগকে জাহির করে। প্রথমে যে বৈজ্ঞানিক একটা মিথ্যাকে পারিভাষিক—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Conventional—সত্যভাবে মানিয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধ করেন, তিনি নিজে হয় ত সতর্ক থাকেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার পোষা ভূতকে দেবতা-ভ্রমে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দুইটী গতিশীল বস্তুর একটীর বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরটীর বেগ একই ভাবে আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য বলা গেল, বস্তু দুইটীর মধ্যে

যাহার বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার উপর কোনও বলের ক্রিয়া আছে। বল শব্দটি ইংরাজি Force শব্দের তর্জ্জমায় ব্যবহার করিয়াছি। আসল ব্যাপার হইল বর্দ্ধনশীল বেগের সহিত গতি, বলের ক্রিয়া একটা মনগড়া কথামাত্র, উল্লেখের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত। যখন মোটেই গতি হইতেছে না, তখনও বলিয়া থাকি, দুইটি সমান বল বিপরীত দিকে ক্রিয়া করিতেছে। এরূপ বলায় কিছু দোষ হয় না, যদি কি বলা হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝা থাকে, কিন্তু অভ্যাস বড় খারাপ জিনিস। তোত্‌লা ব্যক্তিকে ভেঙ্গাইতে ভেঙ্গাইতে অনেক সময় নিজে তোত্‌লা হইয়া পড়িতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপ এই বল জিনিসটাকে প্রশ্রয় দিয়া এমন বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে যে, কোমলমতি বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী বালকগণের উপর উহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। পৃথিবীর অভিমুখে পতনশীল কোনও দ্রব্যের গতির বেগবৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা শুধু মুখে বলে না যে, ঐ দ্রব্যের উপর পৃথিবীর দিকে একটা বলের ক্রিয়া আছে; তাহাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ও ঐ দ্রব্যের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ-রজ্জু আছে, তদ্দ্বারা পৃথিবী উহাকে টানিতেছে, এবং সেই টানের ফলে উহার বেগ-বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদের নিকট বল বেগ-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য একটা মনগড়া কথা নহে; বল সত্য পদার্থ, বেগ-বৃদ্ধি তাহার বহিঃ-প্রকাশমাত্র।

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তবে ভরসার কথা এই যে, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবংবিধ সংস্কারের অপনয়ন ঘটে। কিন্তু সংস্কারের মধ্যেও ছোট বড় আছে। ছোট সংস্কার দূর করা যত সহজ, বড় সংস্কার দূর করা তত সহজ নহে। ইতর ভূতকে সহজে গ্রামছাড়া করা যায়, কিন্তু নাছোড়বান্দা ব্রহ্মদৈত্যকে গাছ হইতে নামানই শক্ত।

এইরূপ দুইটি ব্রহ্মদৈত্য বৈজ্ঞানিককে আশ্রয় করিয়াছে—তাহাদের নাম, দেশ ও কাল। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা যে ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে হইত না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এখন ইহারা ছাড়িতে চাহিতেছে না। সুকোমলমতি বালকের কথা ত দূরে, অনেক সময় ইহারা পণ্ডিতেরও স্কন্ধে চাপিয়া বসে। পণ্ডিত ব্রহ্মদৈত্য ঘাড়ে করিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্য করেন। আরব্য-উপন্যাসে পড়া যায়, সিন্ধবাদ নামক নাবিক দ্বীপবাসী স্কন্ধারোহী বৃদ্ধকে মারিয়া শুধু যে নিজে নিষ্কৃতি পাইয়া-ছিলেন, এমন নহে, ভবিষ্যৎ নাবিকগণের পথও নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। বর্ত্ত-

মান প্রবন্ধে আমি সেরূপ স্পর্দ্ধা রাখি না। ইহা শুধু আমার নিজের স্কন্ধ হইতে দৈত্য নামাইবার প্রয়াসমাত্র।

প্রথমতঃ দেশ কথাটা লইয়া আলোচনা করা যাউক। আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার বশে আমরা বলিয়া থাকি, দেশ সীমাহীন, অক্ষয় ও অচল ভাবে অবস্থিত আছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দেশের এক স্থানে ইহার কিয়দংশ ব্যাপ্ত করিয়া সূর্য্য রহিয়াছে, অন্যত্র চন্দ্র কিয়দংশ অধিকার করিয়া আছে, গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ আপনার আপনার বিস্তারের জন্য অনন্ত দেশের কোন কোন অংশ নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীও আপনার স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভূপৃষ্ঠস্থ যাবদীয় বস্তু আপনার আপনার জন্য স্থান করিয়া লইয়াছে। যাহারা গতিশীল, তাহারা নিয়ত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। যাহাদের বিস্তার পরিবর্ত্তনশীল, তাহারা নিজ নিজ বিস্তারের উপযোগী দেশভাগ অধিকার করিতেছে। দেশ-অধিকারের সময় পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। যে দুর্ব্বল, সে প্রবলের জন্য স্থান করিয়া দিতেছে, নিজে অন্যত্র সরিয়া যাইতেছে; অন্যত্র স্থান না পাইলে নিজের বিস্তার সঙ্কুচিত করিতেছে। দুর্ব্বল যেখানে প্রবলকে বাধা দিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে, সেখানে সে নিজে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। জলে একখণ্ড লৌহ ডুবা-ইয়া দাও, জল অতি ভালমানুষের মত সরিয়া গিয়া তাহার স্থান করিয়া দিবে। আবার একটি কলসীর তলদেশে ছিদ্র করিয়া উল্টাইয়া ডুবাইয়া দাও, তখন দেখিবে, শক্ত কলসীর স্থান হইতে বিলম্ব হইবে না, কিন্তু অভ্যন্তরস্থিত নরম বায়ুকে ছিদ্রপথ দিয়া হঠিতে হইবে। নরমের স্থান শক্ত কোথাও করিয়া দেয় না। এ নিয়ম প্রাকৃতিক জগতে যেমন, মনুষ্য-সমাজেও তেমনই।

কূপমণ্ডূকের গল্পে পড়া গিয়াছে যে, সে কূপের অতিরিক্ত বিস্তারের কল্পনাই করিতে পারে নাই। ইহাতে আমাদের মণ্ডূকের প্রতি অশ্রদ্ধা হইবার কারণ নাই। তাহার জ্ঞান তাহার সংস্কার ছাড়াইয়া যাইলে অস্বাভাবিক হইত। আমরাও যে বস্তুবিশেষে সসীমতা বা অসীমতার আরোপ করি, তাহাও আমা-দের সংস্কারানুগত। ছেলেবেলায় দেশ সম্বন্ধে যে সংস্কার ছিল, জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ছেলেবেলায় মনে হইত, উপরে ওই যে একটা তারকাখচিত আকাশ রহিয়াছে, উহার পরপারে কিছুই নাই। 'কিছুই নাই' জিনিসটা কি, তখন তাহার প্রশ্নই মনে হয় নাই। ক্রমে বুঝিতে

সাহিত্য

যোগী জন্ ব্যাপ্টিষ্ট।

ভাস্কর—রোঁদে।
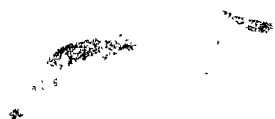
Mohila Press,

শিখিলাম যে, তারকাখচিত মণ্ডপের ধারণাটা মিথ্যা। এক একটি তারকা শূন্যে অবস্থিত। তাহারা অতি বৃহৎ, এবং আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে—কোটী কোটী মাইল দূরে—রহিয়াছে। এমন অনেক তারকা আছে, যাহাদিগকে সাদা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়; তাহারা আরও দূরে আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এখন যেরূপ বড় করিয়া দেখাইবার শক্তি আছে, তাহা অপেক্ষা শক্তি বাড়িলে আরও অধিকসংখ্যক ও অধিক দূরস্থিত তারকা দেখা যাইবে। কোনও তারকায় পৌঁছিতে পারিলে সেখান হইতে আরও অধিকদূরস্থিত তারকা দেখা যাইতে পারে। আবার সেই দূরস্থিত তারকায় পৌঁছিতে পারিলে তাহার অপেক্ষা অধিক-দূরস্থিত তারকা দেখা সম্ভব। ক্রমে এই ভাবে বিচার করিতে থাকিলে দেশে সীমাহীন না বলিয়া পারা যায় না। গোড়ায় দেশের একটা সংস্কার জন্মিয়া গেলে জ্ঞানের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের অসীমত্বের সংস্কার জন্মিতে বিলম্ব হয় না।

এই যে অসীম একটা দেশের অস্তিত্বের সংস্কার, ইহা এত দূর বদ্ধমূল যে, অন্যরূপ কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ সংস্কারের উচ্ছেদসাধন সহজে হইবার নহে। যাহা হউক, উহার মূলে কি আছে, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

দুইটি বর্ত্তুল লওয়া যাউক। তাহারা একই দ্রব্যে প্রস্তুত, এবং তাহাদের ভার, আয়তন, গঠন ও উপরিভাগের মসৃণতা সমান। তাহাদের প্রত্যেককে পর পর একই স্থানে রাখিয়া একই সূর্য্যালোক ফেলিয়া একই ব্যক্তি একই স্থান হইতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হইল। তিনি একটিকে দেখিয়া বলিলেন লাল, অপরটিকে দেখিয়া বলিলেন নীল। যাহাকে পরে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে আগে দেখিলেন, এবং যাহাকে আগে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে পরে দেখিলেন। তথাপি পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া লাল বলিয়াছিলেন, এখনও তাহাকে দেখিয়াই লাল বলিলেন, এবং পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া নীল বলিয়াছিলেন, এখনও তাহাকে দেখিয়াই নীল বলিলেন। তিনি যে লাল-নীল বলিলেন, সেটা হইল তাঁহার উপলব্ধির পার্থক্য। লালের উপলব্ধি একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি, উহা নীলের উপলব্ধি হইতে পৃথক্। দেখা যায় যে, এই বিশেষ উপলব্ধি বস্তুর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ইহা হইতে বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যাহাদিগকে দেখিয়া লাল নীল এই উপলব্ধির পার্থক্য হয়, সেই বস্তুদ্বয়ের মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে;

উহার নাম দেওয়া যাউক বর্ণপার্থক্য। একটির বর্ণ লাল, অপরটির বর্ণ নীল। লালবর্ণের বস্তু দেখিয়া একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি হয়, যাহা নীলবর্ণের বস্তু দেখিয়া হয় না, এবং নীলবর্ণের বস্তু দেখিয়া একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি হয়, যাহা লালবর্ণের বস্তু দেখিয়া হয় না। অথচ তাহাদের মধ্যে হয় ত অপর কোনও পার্থক্য নাই, কাজেই একটা নূতন নাম দিয়া বলিতে হয়, উহাদের মধ্যে বর্ণপার্থক্য আছে।

অপর দুইটি বর্ত্তুল লওয়া যাউক। তাহারা অন্য সকল বিষয়েই সমান, কেবল একটি অপরটি অপেক্ষা আকারে বড়। এক ব্যক্তির চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে এই বর্ত্তুল দুইটি পরীক্ষা করিতে দেওয়া গেল। তিনি হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিলেন, একটি ছোট, অপরটি বড়। তাঁহার ছোট বড় বলাটা হইল তাঁহার উপলব্ধির পার্থক্য. তিনি হাত বুলাইয়া এই পার্থক্য অনুভব করিলেম। চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি দৃষ্টিপাতমাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ঠিকই ত বলিয়াছি, এইটি ছোট,ঐটি বড়।" এখন তিনি দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপর এক ভাবে উপলব্ধি করিলেন; এবং তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হওয়ায় তিনি বলিলেন, একটি ছোট, অপরটি বড়। দর্শনেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, এই উভয়ের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তিনি উভয়বিধ উপলব্ধির দ্বারা একই পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন। লাল নীলের উপলব্ধির ন্যায় এই 'ছোট বড়'র উপলব্ধিও বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন, বস্তুদ্বয়ের মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে, তাহার নাম দেওয়া যাউক বিস্তৃতি বা আয়তনের পার্থক্য। যাহার সম্বন্ধে ছোট বলিয়া উপলব্ধি হইল, তাহার বিস্তৃতি বা আয়তন অপেক্ষা, যাহার সম্বন্ধে বড় বলিয়া উপলব্ধি হইল, তাহার বিস্তৃতি বা আয়তন বেশী, বলা যায়।

এই উপলব্ধির মধ্যে আমরা একটু ইতরবিশেষ করিয়া থাকি। যখন বলি, গুরুমহাশয়ের বেত্র অপেক্ষা চোবে ঠাকুরের লাঠী লম্বা, তখন উহাদের আয়তনের পার্থক্য এক ভাবে উপলব্ধি করি। যখন বলি, রামের বাস্তভিটা অপেক্ষা শ্যামের বাস্তভিটা বেশী, তখন দুই বাস্তভিটার বিস্তৃতির পার্থক্য অন্য এক ভাবে উপলব্ধি করি, বেত্র ও লাঠীর বিস্তৃতির পার্থক্য যে ভাবে করি, সে ভাবে নহে। আবার যখন কোন গোয়ালার দুগ্ধ মাপিবার পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলি, "তোমার এ পোয়া ঘটীটা কিছু ছোট। আমাদের ঘরের পোয়া

ঘটী ইহার অপেক্ষা বড়", তখন ঐ পাত্রদ্বয়ের বিস্তৃতি-পার্থক্য যে ভাবে উপলব্ধি করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবের উপলব্ধি হইতে পৃথক্। পার্থক্য সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে এতটা ঐক্য আছে যে, স্বচ্ছন্দে বলা চলে, বস্তুর একই বিশেষত্বকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিবার প্রণালী হইতে এই পার্থক্যের উৎপত্তি। সেই বিশেষত্ব বস্তুর আয়তন।

এইবার দুইটি বর্ত্তুল লওয়া যাউক। তাহারা সর্ব্বাংশে তুল্য। বর্ত্তুল দুইটিকে পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া এক ব্যক্তিকে চক্ষু বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেল। তিনি হস্তপ্রসারণের দ্বারা উভয়কে স্পর্শ করিলেন। কিন্তু দুইটি বর্ত্তুল স্পর্শ করিতে তাঁহাকে দুই ভাবে হস্তপ্রসারণ করিতে হইল। ইহাতে তাঁহার উভয় বর্ত্তুল সম্বন্ধে উপলব্ধির যে পার্থক্য জন্মিল, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, একটি বর্ত্তুল তাঁহার নিকটে আছে, অপরটি দূরে আছে। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা শুধু তাঁহার উপলব্ধির পার্থক্যমাত্র। হস্তপ্রসারণের পার্থক্যে তাঁহার এই উপলব্ধি-পার্থক্য জন্মিয়াছে। চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহার অন্যবিধ উপলব্ধি-পার্থক্য জন্মিবে। তবে এই উভয়বিধ উপলব্ধির নিত্যসম্বন্ধ দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি একই পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া বলেন,—একটি নিকটে আছে, অপরটি দূরে আছে। এই উপলব্ধি-পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক বলেন, বর্ত্তুল দুইটির মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে; তাহার নাম দেওয়া যাউক—অবস্থান পার্থক্য।

এই অবস্থান-পার্থক্যের উপলব্ধি আমরা কয়েকটি বিভিন্ন ভাবে করিয়া থাকি। সেই বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য আমরা বলি, অমুক জিনিসটা আমার সম্মুখে আছে, অমুকটা পশ্চাতে আছে, অমুকটা দক্ষিণে আছে, অমুকটা বামে আছে; অমুকটা ঊর্দ্ধে আছে, অমুকটা নিম্নে আছে, এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও নিম্নে থাকিয়া অমুক জিনিসটা নিকটে আছে, অমুকটা দূরে আছে। এই যে বিভিন্নতা, ইহার খাতিরে উপলব্ধিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে না ফেলিয়া, বরং এক শ্রেণীর উপলব্ধির প্রকারভেদ বলাই সঙ্গত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বলেন, অবস্থান-পার্থক্যের প্রকারভেদ হইতে উহাদের উৎপত্তি।

এখন বোধ হয় জড়ের বিস্তার, বিস্তৃতি, বা আয়তন বলিলে, পাঠক গোড়া হইতে দেশব্যাপ্তি বুঝিবেন না; অথবা অবস্থান বলিলে, দেশের অংশবিশেষে

স্থিতি বুঝিবেন না। জড়ের অবস্থান ও আয়তন প্রথমে উপলব্ধিভাবে গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ জড়ধর্ম্মভাবে উহাদের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ‘লাল নীল’ এই উপলব্ধির পার্থক্য হইতে যেমন জড়ে বর্ণপার্থক্যের আরোপ করিয়া তাহাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়, ইহাও তদ্রূপ। জড়ের বিস্তৃতি বলিলে বুঝিতে হইবে যে, উহার এমন একটা গুণ আছে, যাহার অভাবে, বিস্তৃতির যে একটা বিশেষ রকমের উপলব্ধি হয়, তাহা হইত না। সেইরূপ, জড়ের অবস্থান বলিলে বুঝিতে হইবে, উহার এমন একটা গুণ আছে, যাহার অভাবে অবস্থান-উপলব্ধি ঘটিত না। উপলব্ধি ব্যাপারটা আত্মসম্বন্ধী—ইংরাজীতে যাহাকে বলে subjective বৈজ্ঞানিক বলেন। উহার পশ্চাতে কিছু থাকিয়া ঐ উপলব্ধি ঘটাইতেছে। সেই জিনিসটা বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধী—ইংরাজীতে যাহাকে বলে objective এইরূপ objective ভাবে অবস্থান ও বিস্তৃতি জড়ের ধর্ম্ম।

শুধু এইটুকুমাত্র বলিয়াই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহেন। এ জন্য তাঁহাকে একটা মনগড়া জিনিস খাড়া করিতে হইল। তাহার নাম দিলেন, দেশ। ধরিয়া লইলেন, একটা সীমারহিত দেশ আছে, তাহা সকল সময়েই স্থির; তাহার কোনও অংশ আপনাকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে না; তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই; তাহার এইমাত্র গুণ যে, তাহা জড়পদার্থের আধারস্বরূপ; জড়পদার্থ তাহাকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে অবস্থিত ও বিস্তৃত করিয়াছে। অতঃপর বলা চলিল, যে বস্তুর আয়তন যত বেশী, তাহা তত বেশী দেশভাগ ব্যাপ্ত করিয়া আছে, এবং দুইটি জড়ের মধ্যে দূরত্ব যত বেশী, তাহাদের মধ্যে দেশের ব্যবধানও তত বেশী। কিন্তু দেশের ব্যবধান দেশব্যাপ্তি এ সমস্ত পারিভাষিক শব্দমাত্র। কল্পিত একটা দেশের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া উহাদের ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জড়ের বিস্তৃতি ও অবস্থান না থাকিলে দেশের কল্পনার প্রয়োজন হইত না। বিস্তৃতি ও অবস্থান আছে বলিয়াই যে দেশের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য, তাহাও নহে। দেশের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিত। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, একটা কল্পিত দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ইহার জন্য মানবের বিজ্ঞানবুদ্ধির ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু কল্পিত জিনিসটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

এইবার কাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। দেশের সংস্কারের ন্যায় কালের সংস্কারও অত্যন্ত বদ্ধমূল। উহার বশে আমি ভাবি, কাল অনাদি ও অনন্ত, এবং জাগতিক ঘটনাবলী তাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে ব্যক্ত করিতেছে। যেন কালসূত্রে তাহারা পুষ্পরূপে গ্রথিত আছে; আমি কালকে স্থিরভাবে দেখিতেছি না, উহাকে প্রবাহরূপে দেখিতেছি; যেন কাল একটা ঘটনাবলীর panorama লইয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে,—আমি স্থির আছি; কালের একটা স্রোত চলিয়াছে; অথবা, কাল স্থির আছে, আমি তাহার উপর দিয়া সাঁতারিয়া চলিয়াছি। আমি আছি গাড়ীর মধ্যে বসিয়া। এখন গাড়ী স্থির থাকিয়া নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত চলিতে থাকুক, অথবা উহারা স্থির থাকিয়া গাড়ী চলিতে থাকুক, আমার পক্ষে দুইই সমান; উভয় ক্ষেত্রেই আমি বুঝিব যে, নদী বৃক্ষ পর্ব্বত আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। আমি কালের সমগ্র মূর্ত্তি একেবারে দেখিতে পাইতেছি না। যে মুহূর্ত্তে উহার যে অংশ দেখিতেছি, তাহা সেই মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান। উহার পশ্চাতে যাহা পড়িয়া আছে, তাহা অতীত, এবং উহার সম্মুখে যাহা আছে, যাহার আবরণ এখনও উন্মুক্ত হয় নাই, তাহা ভবিষ্যৎ। পর মুহূর্ত্তেই আমার এই ভুক্ত বর্ত্তমানকে অতীতের কঙ্কালরাশির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ভবিষ্যতের কিয়দংশ গ্রাস করিয়া সেই মুহূর্ত্তের বর্ত্তমান করিয়া লইতেছি, অতীতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা তখন স্মৃতির বস্তু; কিন্তু ভবিষ্যতের রহস্য তমসাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা কল্পনার সামগ্রী। সময়ে সময়ে বর্ত্তমানের আলোকরশ্মি আপনার তেজঃপ্রভাবে ভবিষ্যতের প্রাচীর ভেদ করে। তখন আমি ভবিষ্যতের ঈষদালোকিত অংশ অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই।

আমি জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কঙ্কালরাশি উদ্ধার করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি। আমার নিজ জীবনের অতীত কতকটা নিজের স্মৃতির সাহায্যে, কতকটা বা পরের মুখে শুনিয়া, দেখিয়া লই। আমার পিতৃপুরুষগণের চরিত যদি রক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা জানিয়া লই। এখন য়ুরোপীয়গণ পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বে অটোমান-রাজত্বের অভ্যুদয় হইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে। তাহারও পূর্ব্বে, এক দিকে হিন্দু ও অপর দিকে রোমান রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। আরও পূর্ব্বে, মানুষ সবেমাত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিতেছে; এক একটা দল

বাঁধিয়া লুণ্ঠনবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারও পূর্ব্বে, মানুষ মানুষকে ধরিয়া খাইতেছে, মনুষ্যে ও পশুতে বড় তফাৎ নাই। ভূতত্ত্ববিদ্ বলেন, তাহারও পূর্ব্বে যাও, দেখিবে—জীবজন্তু নাই, পৃথিবী সবেমাত্র জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। তারও পূর্ব্বে, পৃথিবীর হয় ত অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আর কিছু ছিল। তাহারও পূর্ব্বে, হয় ত কি ছিল, বলিবার উপায় নাই, কিন্তু সেটাও ত কালের প্রারম্ভ নহে? এইরূপে 'তার পূর্ব্বে তার পূর্ব্বে' করিয়া ভাবিয়া যাইলে কালের একটা গোড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে হয়, কাল অনাদি। অতীতের সম্বন্ধে যে ভাবে 'তার পূর্ব্বে তার পূর্ব্বে' করিয়া দেখা গেল, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যদি সেই ভাবে 'তার পরে তার পরে' করিয়া দেখা যায় তবে ভবিষ্যতেরও অন্ত মিলিবে না। কাজেই বলিতে হয়, কাল যেমন অনাদি, তেমনই অনন্ত।

এই যে অনাদি অনন্ত একটা কালের সংস্কার, ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমার ঘটিকাযন্ত্র টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে, অথবা অন্য ভাবে বলা যাউক, ঘটিকাযন্ত্র হইতে টিক্ টিক্ শব্দ হইতেছে, আমি এইরূপ উপলব্ধি করিতেছি। প্রত্যেক 'টিক্' এক একটি পৃথক উপলব্ধি মনে হইতেছে। তাহারা সর্ব্বতোভাবে সমান, অথচ তাহাদিগকে অনায়াসে পৃথক করিতে পারিতেছি; সুতরাং তাহারা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। দুইটি টিকের মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হইতেছে তাহার নাম দেওয়া যায় পৌর্ব্বাপর্য্যের পার্থক্য। বলা যায়, একটি 'টিকে'র উপলব্ধি পূর্ব্বে হইতেছে, অপরটি পরে হইতেছে। এই পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুভূতিটা কি রকম, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু অপরকে উহা ভাষার সাহায্যে বুঝান চলে না। আমি শুধু এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, ঘটিকাযন্ত্রের টিক্ টিক্ শব্দোপলব্ধির মধ্যে আমি এই পার্থক্য অনুভব করি। ইহা হইতে অন্যে পারেন, বুঝিয়া লউন। শুধু পৌর্ব্বাপর্য্য কেন, সকল অনুভূতির সম্বন্ধেই এইরূপ। আমি 'লাল' বলিতে যাহা বুঝি, আমার সাধ্য নাই, তাহা অপরকে বুঝাইতে পারি। তবে, যাহাকে দেখিয়া আমার 'লালে'র অনুভূতি হইতেছে, সেই বস্তুটা অপরের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিতে পারি, ইহাকে দেখিয়া আমার লালের অনুভূতি হয়। তাহা হইতে, তিনি যাহা বুঝিবার, বুঝিয়া লউন। তিনি হয় ত বুঝিবেন, সেই বস্তু দেখিয়া তাঁহার যে অনুভূতি হইতেছে, আমার অনুভূতিটাও ঠিক সেইরূপ। কিন্ত

এরূপ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। তাঁহার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতি মিলাইয়া দেখিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহার অনুভূতি তাঁহার নিজস্ব, এবং আমার অনুভূতি আমার নিজস্ব। কিন্তু ইহাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে কাজ কর্ম্ম আটকাইবে না। কেন না, অনুভূতি যাহাই হউক, উভয়েই একই বস্তুকে দেখিয়া লাল বলিব।

এই পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুভূতি আমার উপলব্ধিগুলি সাজাইবার প্রণালী হইতে, কিংবা অন্য কোনও কারণ হইতে সঞ্জাত, তাহা এ স্থলে জানিবার আবশ্যকতা নাই। আমার কোনও কোনও উপলব্ধির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুভূতি হয়, ইহা সত্য। শুধু পৌর্ব্বাপর্য্য কেন, তাহা ছাড়া অপর একটা অনুভূতি হয়, সেটাকে বলা যাইতে পারে—উহাদের অন্তর। এই অন্তরের পার্থক্যও আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ঘোড়া ছুটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার খুরের ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছে; ঘোড়ার গতি যদি ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আইসে, তবে ঐ ঠক্ ঠক্ শব্দগুলির অন্তরের পার্থক্য হইতে থাকিবে। উপলব্ধির স্থায়িত্ব বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাকে একটা পৃথক অনুভূতি না বলিয়া, উপলব্ধির অংশসমূহের মধ্যে পারম্পর্য্য ও অন্তরের অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপরে পৌর্ব্বাপর্য্য, অন্তর ও স্থায়িত্ব নাম দিয়া যাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছি, পাঠক গোড়া হইতে তাহাদের সহিত সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করিবেন না। আমি তাহাদিগকে শুদ্ধ অনুভূতিভাবে উল্লেখ করিয়াছি। আমার উপলব্ধিসমূহের মধ্যে আমি উহাদিগকে অনুভব করি। বৈজ্ঞানিকের মতে, উপলব্ধির পশ্চাতে একটা বাহ্য ঘটনা আছে, তাহা ঐ উপলব্ধি জন্মাইতেছে; সুতরাং তিনি বলেন, জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্য ও অন্তর আছে। আমি যে 'টিক' 'টিক' উপলব্ধি করিতেছি, উহার পশ্চাতে ঘড়ির 'টিক' 'টিক' আছে; তাহাদের মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্য ও অন্তর আছে; অথবা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে, এমন কিছু আছে, যাহার দরুণ আমার পৌর্ব্বাপর্য্যের ও অন্তরের অনুভূতি জন্মিতেছে।

এই পৌর্ব্বাপর্য্য ও অন্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সৌকর্য্যার্থে একটা অনাদি ও অনন্ত কালের অস্তিত্ব পারিভাষিকভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। এই পারিভাষিক কাল যেন একটি প্রান্তহীন সরল রেখা। উহার একটা দিক্ অতীতের দিক্, এবং তাহার বিপরীত দিক্ ভবিষ্যতের দিক্। জাগ-

তিক ঘটনাবলী উহাকে আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে ব্যক্ত করিতেছে। দুইটি ঘটনার মধ্যে যদি পৌর্ব্বাপর্য্য অনুভূত হয়, তবে বলা যায় যে, পূর্ব্বের ঘটনা পরের ঘটনার সম্পর্কে কালের অতীতের দিকে আছে; এবং পরের ঘটনা পূর্ব্বের ঘটনার সম্পর্কে কালের ভবিষ্যতের দিকে আছে অর্থাৎ, পূর্ব্বের ঘটনার সম্পর্কে পরের, এবং পরের ঘটনার সম্পর্কে পূর্ব্বের ঘটনা, অতীত। দুইটি ঘটনার মধ্যে যে অন্তরের অনুভূতি হয়, তাহার সম্বন্ধে বলা যায়, উহাদের মধ্যে খানিকটা কালের ব্যবধান আছে। এই হিসাবে ঘটনার স্থায়িত্বকে বলা যায়, কালব্যাপ্তি। কিন্তু কালব্যাপ্তি, কালের ব্যবধান প্রভৃতি কথা পারিভাষিকমাত্র। কালের অস্তিত্ব পারিভাষিকভাবে স্বীকার না করিলে, দুইটি ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকে না। যাহা থাকে, তাহা একটা বিশেষ রকমের অনুভূতি মাত্র, তাহার নাম দিয়াছি, অন্তর।

একটা সংস্কারের জন্ম যত সহজে হয়, তাহার উচ্ছেদ তত সহজে হয় না। যুক্তির দ্বারা হয় ত তাহার প্রায় ধ্বংস করা হইয়াছে, তখনও পদে পদে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তর্কের দ্বারা মীমাংসা হইতেছে যে, আমাদের দেশের জ্ঞান একটা অমূলক সংস্কারমাত্র, কিন্তু তথাপি হয় ত কেহ প্রশ্ন করিবেন, দেশই যদি নাই, তবে কি ব্যাপ্ত করিয়া" জড়ের বিস্তার? দুইটি পৃথগবস্থিত জড়ের মধ্যে অবকাশই বা কিসের অবকাশ?" বলা বাহুল্য, প্রশ্নটির মধ্যে সেই গোড়াকার ভ্রান্ত সংস্কার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—একটা কিছু থাকা চাই। যাহাকে অবলম্বন করিয়া জড়ের অবস্থান ও বিস্তার ঘটিতে পারে। 'কিছু আছে' সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। তাহাকে লয় করিয়া, 'কিছু নাই' এই সত্যের উপলব্ধি যে অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই; যুক্তির আগুনে সংস্কারকে নিয়ত দগ্ধ করিতে হইবে, তবে খাঁটী সত্যের মূর্ত্তি প্রকট হইবে। দেশ না থাকিয়া দেশের অস্তিত্বের জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহার প্রমাণ দর্পণের ভিতর দিয়া দেশের জ্ঞান; এখানে দর্পণের পশ্চাতে সেরূপ একটা দেশ নাই, অথচ দর্শনেন্দ্রিয়ের পক্ষে একটা দেশের জ্ঞান ত হয়।

ভাল, আর এক দিক হইতে দেখা যাউক—আমরা জড় জগৎকে যে ভাবে পাইয়াছি, অর্থাৎ, যেরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জড় জগৎ আমাদের উপলব্ধির বিষয়, তাহাতে আমরা বর্ত্তমান পারিভাষিক দেশটাকে

কল্পনা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু যদি জড়ধর্ম্ম অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে? এবম্প্রকার দেশের কল্পনা করিলে চলিত কি? মনে কর, যদি এরূপ হইত যে, বিশ্বজগৎটা সব জমাট বাঁধা, কোথাও বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই; তাহারই মধ্যে পৃথক পৃথক জড় অবাধে আনাগোনা করিতেছে, লেনা দেনা করিতেছে, এবং সমস্ত জড় যুগপৎ বাড়িতেছে ও যুগপৎ কমিতেছে। অথবা যদি এরূপ হইত যে, জড়জগৎ এখনকার মত সাবকাশ ভাবেই অবস্থিত, কিন্তু উহার একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তুমি কোন একটা জড় পদার্থের দিকে যতঅগ্রসর হইবে, তোমার ও সেই পদার্থের মধ্যে দূর ততই বাড়িয়া যাইবে, এবং তুমি যত পিছু হঠিবে, দূর ততই কমিবে, তাহা হইলে কি দেশের বর্ত্তমান পরিভাষায় কাজ চলিত? কিংবা মনে কর যদি এইরূপই হইত যে, দুইটি পৃথগবস্থিত জড় পদার্থের মধ্যে দূরত্ব লাল রঙ্গের গজবাড়ি দিয়া মাপিলে চারি বাড়ি হয়, আবার নীল রঙ্গের গজবাড়ি দিয়া মাপিলে পাঁচ বাড়ি হয়, আবার সবুজ রঙ্গের গজবাড়ি দিয়া মাপিলে তিন বাড়ি হয়, তাহা হইলেও ত পরিভাষা বদলাইতে হইত। তুমি হয় ত বলিবে, এরূপ হওয়াটা অস্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিকতা কথার অর্থ হয় না। প্রকৃতির যদি ঐরূপ মূর্ত্তি ও ধর্ম্ম হইত, তবে তাহাই স্বাভাবিক হইত। 'স্বাভাবিক' 'অস্বাভাবিকে'র পরীক্ষা ত তোমার আমার কাছে নয়, প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতি যাহার উপর ছাপ মারিয়া বলিয়া দিতেন স্বাভাবিক, তোমাকে ও আমাকে তাহাই মানিয়া চলিতে হইত। অতএব দেখা যাইতেছে, দেশাপেক্ষী জড় নহে, জড়াপেক্ষী দেশ। তাহা যদি হইল, তবে জড়কে ছাড়িয়া দেশ থাকিতে পারে না। দেশ একটা স্বয়ং ব্যক্ত সীমাহীন সত্য পদার্থ নহে। উহা জড়ধর্ম্মের ভিত্তির উপর খাড়া করা একটা কল্পিত জিনিস। শুধু একটা পরিভাষামাত্র। যদি কখনও সেই জড়ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তবে পারিভাষিক দেশও তৎসঙ্গে লোপ পাইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, জমী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু জমা লোপ পায় নাই। জমীদারের সেরেস্তায় ভুয়া জমার খাজনা টানিতে হইতেছে। তথাপি এ কথা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিতে চাহিবেন না যে, অগ্রে জমার সৃষ্টি হইয়া পশ্চাৎ জমা অবলম্বন করিয়া জমীর সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের কালের সংস্কারও জাগতিক ঘটনার বর্ত্তমান ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবস্থা যদি অন্যরূপ হইত, তবে কালের পরিভাষাও অন্যরূপ

হইত ; সংস্কারও তদনুযায়ী হইত। এখনকার ব্যবস্থামতে দিন যত বড় হয়, আমরা সকল কর্ম্মই তত বেশী করিতে পারি, এবং দিন যত ছোট হয়, আমরা সকল কর্ম্মই সেই পরিমাণে কম করিতে পারি। সুতরাং আমাদের কালের বর্ত্তমান পরিভাষায় বেশ বলা চলে, দিবাভাগের স্থায়িত্ব-কালটা বাড়িয়া গিয়াছে, বা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে কর, যদি এরূপ হইত যে, দিনটা কয়েকটা কাজের পক্ষে কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর কয়েকটা কাজের পক্ষে বাড়িয়া গিয়াছে, এবং অপর কয়েকটা কাজের পক্ষে সমান আছে, তাহা হইলে কালের বর্ত্তমান পরিভাষায় চলিত কি ? কি বলিতাম ? দিবাভাগের স্থায়িত্বকাল বাড়িয়াছে, না কমিয়াছে ? অথবা, যদি প্রকৃতির বন্দোবস্ত এইরূপই হইত যে, তুমি যত কাজ কর, দিনটা ততই ফাঁপিতে থাকে, দিন ফুরায় না ; আর যেই কাজ বন্ধ কর, অমনই দিন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, এবং শেষে ফুরাইয়া যায় ; তাহা হইলেও ত পরিভাষা বদলাইতে হইত।

অতএব দেখা যাইতেছে, কালও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অপেক্ষা করে। বর্ত্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অনুসারে কালের যে পরিভাষা করায় আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, ব্যবস্থা অন্যরূপ হইলে সে পরিভাষাও চলিত না, সে সংস্কারও জন্মিত না। যাহাদিগের জন্য কালের পারিভাষিক সত্তা, তাহারা যদি কখনও বিলুপ্ত হয়, তবে অনাবশ্যকভাবে সাক্ষ্য দিবার জন্য পারিভাষিক কাল দাঁড়াইয়া থাকিবে না। কেহ যদি বলেন যে, এই বিশ্বজগৎটার যখন সম্যক্ লয় হইবে, তখন যে কিছুই থাকিবে না, সেই কিছু না থাকাটাই দেশ ও কাল। উত্তর এই যে, শুধু দেশ ও কাল কেন, আরও পাঁচটা নাম দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু বুঝা চাই যে, তাহারা কিছুই নহে।

এইখানে কোনও পাঠক হয় ত প্রশ্ন করিবেন, "আচ্ছা, বুঝিলাম যে, দেশ ও কাল, ইহাদের পারিভাষিক অস্তিত্ব ছাড়া অন্য অস্তিত্ব নাই ; তাহা হইলে, জড়ই কি সত্য সনাতন পদার্থ ?" উত্তর এই যে, বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জড়-পদার্থকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। একটা বাহ্যজগৎ অর্থাৎ ঘটনাবলীর সমষ্টি বৈজ্ঞানিক সত্য বটে ; কিন্তু সেই বাহ্য-জগতের ব্যাখ্যাস্বরূপে বৈজ্ঞানিক যখন বলেন,—জড়ের ভিতর দিয়া শক্তির বিকাশ হইতে উহার উৎপত্তি, তখন এই জড় ও শক্তি তাঁহার মনগড়া জিনিস, এবং সে হিসাবে তাহারাও পারিভাষিক। প্রশ্নকর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা

করেন, "সত্যের একটা বৈজ্ঞানিক বিশেষণ ব্যবহার করিলে কেন?" তাহার উত্তর এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। মাঝে মাঝে যে objective হইতে subjective এ আসিতে হইয়াছে, সেটা শুধু বক্ষ্যমাণ বিষয়কে সহজবোধ্য করিবার মানসে। বিজ্ঞান শুধু বাহ্যজগৎ লইয়া নাড়া চাড়া করে, সে অন্তর্জগতের খোঁজ রাখে না। অথচ এই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ। সুতরাং বিজ্ঞানানুমোদিত সত্য ধ্রুব সত্য নহে। উহা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। যতক্ষণ গণ্ডীর ভিতরে থাকে, ততক্ষণ সত্য; গণ্ডীর বাহিরে গেলে উহা সত্য কি মিথ্যা, তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং এরূপ সত্যের একটা সংকীর্ণতাজ্ঞাপক বিশেষণ দেওয়া কর্ত্তব্য। সমীচীন-বোধে 'বৈজ্ঞানিক' এই বিশেষণটির ব্যবহার করিয়াছি। প্রশ্নকর্ত্তা তথাপি সন্তুষ্ট না হইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, "তবে ধ্রুব সত্য কি?" তাঁহার প্রতি আমার নিবেদন যে, তিনি বৈজ্ঞানিকের নিকট এ প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশা করিবেন না। বৈজ্ঞানিক নিজের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে বড় রাজি নহেন। যদি ধ্রুব সত্য কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত।

চীনভাষা, সাহিত্য ও পুস্তক।

চীনদেশের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লিখিত ও কথিত ভাষায় যেমন পার্থক্য আছে, চীনেও তদনুরূপ। এক প্রদেশের কথিতভাষা অন্য প্রদেশের লোক বুঝিতে পারে না। কিন্তু লিখিত ভাষা বিশাল চীন সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই পড়িতে ও বুঝিতে পারে। উচ্চারণ-ভেদে একটি কথায় দুই তিন প্রকার অর্থ বুঝাইয়া থাকে। প্রাচীন চীন ভাষাকে 'ওয়েন-লী' বলে। কথিত ভাষার মধ্যে মান্দারিণ ভাষাই শ্রেষ্ঠ। আদালতে এই ভাষার প্রচলন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়, সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেক লোকেও এই ভাষায় অভিজ্ঞ।

লিখিবার সরঞ্জামগুলিকে চীনেরা অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। কালি, তুলি (কলম), কাগজ ও তক্তি, এইগুলিকে পুস্তকাগারের অতি প্রয়োজ-

নীয় দ্রব্য-চতুষ্টয় বলে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বংশনির্ম্মিত দ্রব্য দ্বারা চীনেরা অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। কাগজও ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাগজ দেখিতে পাতলা, নরম ও হরিদ্রা-বর্ণ। কথিত আছে, চীনেরা নয় শত বৎসর পূর্ব্বে ছাপিবার সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়াছিল। অন্যান্য দেশে সীসার অক্ষর যোজনা করিয়া যেমন পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, চীনেরা সেরূপ করিত না। তাহারা পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠা এক একখানি কাষ্ঠফলকে ক্ষোদিত করিয়া, তদ্দ্বারা পুস্তক ছাপিত। তিব্বতে এইরূপ ছাপিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। তাহাদের কাষ্ঠ-ফলকে খোদাই করিবার প্রণালী এইরূপ ছিল,—প্রথমে একখানি পাতলা কাগজে লিখিত বিষয় লিখিয়া, লেখা দিকটা কাষ্ঠফলকের উপর রাখিয়া, অপর পৃষ্ঠায় জল দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ছাপ তুলিয়া লওয়া হইত; পরে অক্ষরের চিহ্ন রাখিয়া কাঠের অন্য অংশ চাঁচিয়া ফেলা হইত। পরে সেই খোদিত ফলকে কালি লাগাইয়া কাগজ ছাপিত। কাগজ পাতলা বলিয়া এক পিঠ ছাপিত। এক্ষণে অধিকাংশ চীনে অক্ষর আমেরিকায় ঢালা হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা আধুনিক প্রণালীতে পুস্তকাদি ছাপা হয়। 'পিকিন গেজেট' ছাড়া চীনেদের আর একখানি বহুপুরাতন সংবাদপত্র আছে। তাহার নাম 'কিং-বা'; এই পত্রিকাখানি পনর শত বৎসরের। এই সুদীর্ঘ কাল ইহা সমভাবে চলিয়া আসি-তেছিল। কত আপদ বিপদ ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তবুও ইহার প্রচার বন্ধ হয় নাই। অধুনা চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট কোনও কারণে ইহার প্রচার একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ছাপার কাগজ চীনেরা অত্যন্ত মান্য করে। তজ্জন্য তাহারা গৃহভিত্তিতে 'ছাপার কাগজ মান্য করিও' এইরূপে শাসনবাক্য লিখিয়া রাখে। তাহাদের মধ্যে ছাপার কাগজ মান্য করিবার কতিপয় অনুশাসন-বাক্যের প্রচলন আছে; তন্মধ্যে দুই একটি এইরূপ,—"যে ব্যক্তি ছাপার কাগজ মান্য করিতে উপদেশ দিয়া থাকে, অথবা ঐরূপ লিখিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখে, তাহার আয়ু-র্বৃদ্ধি ও অশেষ পুণ্যলাভ হয়। সে চিরকাল নির্দ্দোষ থাকে, এবং তাহার গুণবান্ অনেক পুত্র জন্মে। যে ব্যক্তি কদর্য্য স্থানে অথবা অপরিষ্কৃত জলে ছাপার কাগজ নিক্ষেপ করে, তাহার অত্যন্ত পাপ হয়, সে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে এবং পরিশেষে অন্ধ হইয়া থাকে।"

অনেক সময় ছাপার টুক্‌রা কাগজ রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া কোনও

মন্দিরাভ্যন্তরে পোড়াইয়া ফেলা হয়। সমুদ্র-যাত্রাকালে নাবিকেরা সেই ভস্ম যত্নপূর্ব্বক লইয়া গিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, জাহাজ ঝড় বৃষ্টিতে বিপন্ন হইলে, সেই ভস্ম সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া যায়, জাহাজের কোনও প্রকার বিপদ ঘটে না।

চীনেদের নয়খানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'পরিবর্ত্তন' নামক গ্রন্থই সমধিক আদরণীয়। ইহার অর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, তবুও লোকে খুব আগ্রহ সহকারে ইহা পাঠ করিয়া থাকে। কথিত আছে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনীষী কন্‌ফুসিয়াস এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক চীন পণ্ডিত বলেন, এই গ্রন্থের ভাষা চীন ভাষা নহে, ইহা আসিরীয় দেশের কথিত ভাষা, ইহার নাম অর্কাড়ীয় ভাষা।

ইহার পরেই গীতিকবিতা-পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে কতকগুলি লোকপ্রিয় গীত কবিতায় নিবদ্ধ। তত্তৎসময়ে শাসকগণকে লোকে কি ভাবে দেখিত ইহা পাঠে তাহাই জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহার পর ঐতিহাসিক গ্রন্থ। পূর্ব্বোক্ত গীতিপুস্তক ও ইতিহাসপুস্তক কন্‌ফুসিয়াস্ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। শাসনকার্য্য কিরূপ ভাবে পরিচালিত হওয়া বিধেয়, ভিন্ন ভিন্ন রাজা ও মন্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে ইহাই বর্ণিত আছে। এক মন্ত্রী বলিয়াছেন,'সাধুতাই রাজ্য-সুশাসনের ভিত্তিমূল'। আর এক জন বলিয়াছেন— 'মহারাজ ভুল করিয়া থাকিলে তাহা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইবেন না।'

অপর গ্রন্থ 'শরৎ ও বসন্ত কাল'। কন্‌ফুসিয়াস ইহার প্রণেতা। কতকগুলি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

পঞ্চম গ্রন্থখানির নাম 'কর্ম্মকাণ্ড পুস্তক'। ইহাকে আনুষ্ঠানিক পুস্তকও বলা যাইতে পারে। ইহাতে চীনেদের নানা অনুষ্ঠানের বিষয় লিখিত আছে। এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থ লিখিত যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি দেশের সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় কি না, পরিদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী পিকিনে অবস্থান করেন। চীনেরা উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ও নীতিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ঋষিপ্রবর কনফুসিয়াসের শিষ্যমণ্ডলী পরে আরও চারিখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সেগুলিকেও চীনেরা বিশেষ মান্য ও আদর করিয়া থাকে।

চীনভাষায় শব্দ যেমন, তেমনই থাকে। কোনওরূপে রূপান্তিত হয় না। ঐগুলি আবার একস্বর যুক্ত।

আমাদের শাস্ত্রপুরাণাদি অধিকাংশই যেমন রূপকচ্ছলে বর্ণিত, বাস্তব বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, চীনেদের কোনও গ্রন্থেই প্রায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তাহারা কল্পনা মোটেই ভালবাসে না, তাহারা কাজের লোক। কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী খাঁটী কথা থাকিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। তজ্জন্য তাহাদের সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। চীনেরা কাব্য ও উপাখ্যান বিলক্ষণ ভালবাসে। চীনদেশের সকল স্থানেরই স্থানীয় বিবরণ সংগৃহীত আছে। আমাদের মধ্যে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আজ কাল আমাদের মধ্যে স্থানীয় বিবরণের অনুসন্ধান ও তাহার ফল পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে কেহ কেহ প্রয়াস পাইতেছেন। আশার বিষয় বলিতে হইবে। চীনেদের সাহিত্য চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ; যথা, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন ও প্রাচীন লেখা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চীনেদের 'সাহিত্য-সংগ্রহ' নামক একখানি বিরাটকায় গ্রন্থ আছে, ইহা ৫০২০ খণ্ডে বিভক্ত, এবং ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সারমর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখণ্ড বিলাতের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

একরূপ লিপির প্রচলন আছে বলিয়া এই বিপুল সাম্রাজ্যের এক স্থানের বিবরণ পাঠ করিয়া অন্য প্রদেশের অধিবাসী সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কিন্তু এক স্থানের কথিত ভাষা অপর স্থানের অধিবাসীর অবোধ্য।

শ্রীআশুতোষ রায়

স্বপ্নপথে।

আমি রোগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। পীড়া কঠিন, দারুণ যন্ত্রণায় শরীর ক্লিষ্ট, বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। আমার পত্নী ছল-ছল-নয়নে শিয়রে বসিয়াছিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া ডাক্তার হাত দেখিতেছিলেন। পুত্রকন্যাগণ পায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল ; আমার কাছে কেহ নাই, যাহারা আছে, তাহারা অনেক দূরে, তাহাদের মুখ অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। ডাক্তার মৃদু মৃদু কথা কহিতেছিলেন, আমার মনে হইতেছিল যে, অনেক দুর হইতে কে কথা কহিতেছে। শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদ্রিত হইল, বিকারের প্রকোপে চৈতন্য লুপ্ত হইল।

অকস্মাৎ নিম্নদেশ হইতে সলিলরাশির গম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল।

বিপুল জলপ্রবাহ, তাহার মধ্যে বিশাল ঘূর্ণাবর্ত্ত। আবর্ত্তের মুখে ও চারি পার্শ্বে কটাহস্থিত দুগ্ধের মত ফেন ফুটিতেছে, আবর্ত্তের গহ্বর অতলস্পর্শ, ঘোর অন্ধকার। কুম্ভকারের চক্রের মত জল ঘুরিতেছে। আমি শূন্য হইতে সেই আবর্ত্তে পতিত হইতেছি। সহসা আবর্ত্তের মুখে ফেনরাশির উপর পতিত হইলাম। মনে হইল যেন, যেন উর্দ্ধমুখে শয্যায় শায়িত আছি। সেই অবস্থায় ঘুরিতে লাগিলাম। জলে মগ্ন হইলাম না, শরীর যে আর্দ্র হইয়াছে, তাহাও মনে হইল না। ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, আবর্ত্তের মধ্যে নামিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, কেবল উর্দ্ধে আবর্ত্তমুখে সূর্য্যরশ্মি দেখিতে পাইলাম। প্রাচীর তুল্য কৃষ্ণবর্ণ জল, আমি অতিবেগে তাহাতে ঘূর্ণিত হইতেছি। বহুদূর নীচে নামিতে নামিতে আবার সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলাম, নদীসৈকতে বালুকার উপর শয়ন করিয়া আছি। বালুকা নয়, শুক্তি ও মুক্তাচূর্ণের মত কোন পদার্থ। শরীরে কোন ক্লেশ বা অবসাদ নাই। সূর্য্যকিরণে অধিক উত্তাপ নাই; গোধূলির লোহিত-পাটল বর্ণের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি, অতি স্নিগ্ধ মধুর বায়ু বহিতেছে। উঠিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম। নদীর পুলিনে উপবন, তাহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ গুল্ম রহিয়াছে। সে জাতীয় তরুলতা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। বিচিত্র ফুলে ফলে শোভিত, দিব্য সুগন্ধে সুরভিত কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। বিহঙ্গ সকলও নূতন জাতীয়, মৃদুমধুরস্বরে গান করিতেছে। সব নূতন, সব অপূর্ব্ব, সব শান্তিময়।

ক্রমে কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আর নদীর কোন চিহ্ন নাই, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী। বিশাল তরুরাজির মধ্য দিয়া মুক্ত প্রশস্ত পথ বিসর্পিত হইয়া গিয়াছে। আমি সেই পথে চলিলাম। আর কোনও পথিক নাই, কোনও শব্দ নাই, কেবল বায়ুবিচলিত বৃক্ষপত্র পৎ পৎ শব্দ করিতেছে। কিছু দূর যাইতে বৃক্ষশ্রেণী নিঃশেষ হইয়া গেল। সম্মুখে হরিত তৃণাবৃত প্রশস্ত মাঠ, তাহার পর দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বত, আকাশস্পর্শী শিখরসমূহ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক স্থানে পর্ব্বত দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ-পথ। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, সেই দীর্ঘ পথে মেঘমালা কুণ্ডলিত হইতেছে। কোথাও শুভ্র, কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও গাঢ়, কোথাও তরল, কোথাও

বাষ্পের মত পর্ব্বতলগ্ন রহিয়াছে। ধূমায়িত অভ্রমালা কন্দর হইতে কন্দরে শৈলখণ্ড হইতে শৈলখণ্ডে অলসগতিতে সঞ্চালিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সেই মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ বিলসিত হইতেছে। বিদ্যুতের তেমন তীব্রতা বা নয়নান্ধকারী জ্বালা নাই, মেঘ হইতে মেঘান্তরে, দিক হইতে দিগন্তরে স্বর্ণলতার মত ক্ষণপ্রভার গতি। আমি সেই পথে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম।

সহসা বিদ্যুৎ রহিত হইল। মেঘ নানাবর্ণ ত্যাগ করিয়া ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিল, পর্ব্বতের প্রবেশপথ অন্ধকার হইল। ক্রমশঃ মেঘের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে মেঘ যেমন লোহিত-বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ অরুণ রাগ ধারণ করিল। মেঘ কুণ্ডলিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। আচম্বিতে সেই মেঘস্তরের মধ্য দিয়া একটি হস্ত প্রসারিত হইল। বৃহৎ অথচ অত্যন্ত সুগঠিত হস্ত। চম্পক বর্ণের ন্যায় দীর্ঘ অঙ্গুলি, অঙ্গুলির মধ্য দিয়া লোহিতাভা প্রকাশিত হইতেছে। সুগোল মণিবন্ধ, তাহার উপর আর দেখিতে পাওয়া যায় না, মেঘ জড়াইয়া রহিয়াছে। সেই প্রসারিত হস্ত আন্দোলিত হইল, যেন আমাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে।

আমার মনে হইল, যেন আমার চক্ষে বলপূর্ব্বক কে করতাড়না করিল। অগ্রে পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রহিত হইল, আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। হস্তের সেই নিষেধ বুঝিতে পারিয়া আমি ফিরিলাম। তৎক্ষণাৎ হস্ত মেঘমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমি পথের পার্শে বসিলাম।

মনের মধ্যে প্রশ্ন হইল, "এই কি মৃত্যু ?"

স্পষ্টস্বরে উত্তর আসিল, "না, ইহা মৃত্যু নয়।"

আবার মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় আসিয়াছি ?"

আবার উত্তর আসিল, "এই মৃত্যুর পথ। এখন তোমার সময় হয় নাই। ফিরিয়া যাও।"

বসিয়া বসিয়া পথশ্রান্তিতে তন্দ্রা আসিল। আমি তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, গৃহে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছি। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিতেছেন, "আর ভয় নাই। আশঙ্কা উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

আমাদের সরলতা ও শিষ্টাচার।

সরলতা এবং শিষ্টাচার সর্ব্বত্র পরস্পর-বিরোধী না হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। সরলতার অর্থ,—ঋজুতা, অকপটতা, বা উদারতা। শিষ্টাচারের অর্থ, ভদ্রতা—বা সভ্যজনোচিত ব্যবহার। সরলতা মানুষের স্বভাবজ গুণ, সুতরাং অকৃত্রিম। শিষ্টাচার সমাজশাসিত মনুষ্যের বিধান, সুতরাং কৃত্রিম। শিষ্টাচার শিখিতে হয়, সরলতা শিখিবার বিষয় নহে। পণ্ডিত, মূর্খ, ভদ্র, অভদ্র, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই সরলতা থাকিতে পারে। কিন্তু অশিক্ষিত লোক শিষ্টাচারসম্পন্ন হইতে পারে, ইহা শিক্ষিত লোকেরা স্বীকার করেন না। শিষ্টাচারের সহিত বিনয় এবং নম্রতার সম্পর্ক আছে; কিন্তু সরলতা বিনয়, অবিনয় কাহারও ধার ধারে না। শিষ্টাচার সময়ে সময়ে কপটতারও প্রশ্রয় দেয়; সুতরাং তখন ইহা সরলতার সম্পূর্ণ বিরোধী। অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, সরলতা স্বর্গীয়; শিষ্টাচার পার্থিব। সরলতা চাঁদের কিরণ; শিষ্টাচার বাস্পীয় কিংবা বৈদ্যুতিক আলো। সরলতা খাঁটী দুগ্ধ; শিষ্টাচার ময়রার মিষ্টান্ন।

এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের বাঙ্গালী-সমাজের সরলতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, আর এখন কি হইয়াছি, বা হইতেছি, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অনেকেই আক্ষেপ করেন যে, আধুনিক শিক্ষা এবং সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের সদ্‌গুণের হ্রাস হইতেছে। এ কথা যে সত্য, ইহা আমরা অনেক প্রকারেই বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের শিষ্টাচার বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু সরলতা কমিয়া আসিতেছে। দুই একটী কথা ধরিয়া আমি পূর্ব্বের সরলতার সামান্য আভাস দিব, এবং এখনকার শিষ্টাচারের কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইব।

প্রথম কথা, আমাদের আদর আপ্যায়ন। কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীর আদর আপ্যায়নে সরলতা ছিল, কিন্তু শিষ্টাচারের বাড়াবাড়ি ছিল না।

এখন কেবল শিষ্টাচারেরই ছড়াছড়ি, কিন্তু সরলতা যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ স্থলে দু এক জন বন্ধুর মুখের কথা উদ্ধৃত করিব।

আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি এক্ষণে সবজজ্‌ আছেন) একদিন আমাকে কহিলেন, "ছেলেবেলায় দাদাশ্বশুর (হাইকোর্টের প্রাচীন ও প্রধান উকীল) অন্নদাবাবুর বাসায় গিয়াছি। সকালবেলা—সাড়ে আটটা বাজিতেই দাদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কেদার, এখানে খাবে ত?' আমি হয় ত' বলে'ছি, 'আজ্ঞে না, বাসায় যেয়েই খাব, কলেজে যেতে হবে।' আমার বাসা কলিকাতায়, দাদা মহাশয়ের বাড়ী ভবানীপুরে। বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর পুনরায় কহিয়াছেন, 'এখান থেকে খেয়ে গেলে যদি অসুবিধা না হয়, তা হলে এখানেই খাও। সকাল সকাল ভাত হবে। আর বাসায় যেতে হ'লে বেশী দেরি করো না।' বন্ধু কহিলেন, 'এখন আর এমন সরল কথা শুনিতে পাই না। আজ কাল আমাদের মুখের আদর যথেষ্ট, কিন্তু অন্তরের সরলতা বা উদারতার একান্ত অভাব। এখন আমরা মুখে বল্‌ব, 'সেও কি কথা, এখান থেকে না খেয়ে কি যাওয়া হয়?' কিন্তু মনের ভাব এই, যে চলে যায়, সেই ভাল।"

ইহা অপেক্ষা আর একটু পুরাতন একটী কথা বলি। কথাটী সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর কালনা-নিবাসী স্বর্গীয় বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। বিমলাবাবুর পিতা জজপণ্ডিত ৺তারাকান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় অসাধারণ বৈয়াকরণ স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পিতৃব্য-পুত্র। কালনার এই ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সহিত বঙ্গের গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষরূপ জানাশুনা ছিল। বিমলাবাবু কহিয়াছেন—"ছেলেবেলায় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়াছি। দুইএক কথার পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে কিছু খাইতে বলিলেন, এবং একখানি রেকাব হাতে দিয়া একটি হাঁড়ি দেখাইয়া কহিলেন, 'ওতে রসগোল্লা আছে, চারটে রসগোল্লা নে।' আমি আদেশ প্রতিপালন করিয়া তৎক্ষণাৎ চারিটি রসগোল্লা উদরস্থ কল্লাম্‌। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা কল্লেন্‌, 'আর কটা পার্‌বি, বল্‌?' আমি বল্লাম, 'আর দুটো।' বিদ্যাসাগর বল্লেন, 'ঠিক করে বল।' আমি বল্লাম, 'আর চারটে পার্‌তে পারি।'

"বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁড়ি থেকে পাঁচটী রসগোল্লা নিয়ে রেকাবে তুলে দিলেন। আমি বল্লুম, 'পাঁচটা আমি পার্‌বো না।' বিদ্যাসাগর বল্লেন্‌, চার্‌টে ত

পারবি, তাই খা, আর একটা পাতে থাক্‌। পাঁচটাই যদি পারিস ত' বল্‌, আর একটা দি।' আমি বল্লাম্‌, 'না, এরই একটা পড়ে থাক্‌বে।' বিদ্যাসাগর কহিলেন, 'পড়ে থাকে নষ্ট হবে না, কেউ খাবে। রেকাবটা একবারে খালি থাক্‌লে বাড়ীর ভিতর থেকে এসে (গৃহিণী) এখনই বল্‌বেন, 'ছেলেটাকে খেতে দিয়েছ, তা দেখ নি?' "

পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল, বিমলাবাবু আমাদিগকে এই কথাটী কহিয়া বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সময়ের লোক চ'লে গেলে, দেশে এমন আদরের কথা গল্পের বিষয় হ'য়ে দাঁড়াবে।"

সত্য সত্যই এখন ইহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। এরূপ ব্যবহার এখনকার শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে। আজকাল এরূপ স্থলে গৃহস্বামী বিমলকে দেখিয়াই ফাঁকা চীৎকার করিবেন, "ওরে! বিমল এসেছে, জলখাবার নিয়ে আয়। ঘরে কি ভাল খাবার আছে, দেখ্‌।" বিমল উত্তর করিবেন, "আজ্ঞে, আমি এই খেয়ে আস্‌ছি, খাবার কিছু আন্‌তে হবে না।" গৃহস্বামী তখন আবার চীৎকার করিবেন, "ওরে, কিছু আন্‌তে হবে না, বিমল বল্‌ছে, সে খেয়ে এসেছে।" সঙ্গে সঙ্গে বিমলকে কহিবেন, "তোমাকে আর আদর করবো কি? তুমি ত ঘরের ছেলে। ক্ষিধে পেলে চেয়ে খাবে।" বিমল বলিবেন, "তা ত বটেই।"

পরিচিত লোকের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা, আর অপরিচিত লোক হইলে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করাই ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ; সুতরাং সে ক্ষুধার্ত্ত হইলেও কিছু আসে যায় না।

বস্তুতঃ পূর্ব্বের সরল আদর আপ্যায়ন এখন কেবল নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে অথবা পল্লীগ্রামে দরিদ্র ভদ্রের গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষিত এবং ধনি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিরল হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে শিষ্টাচারেরই আধিক্য লক্ষিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত আমার একদিন এ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে আমার মতের পোষকতা করিয়া কহিলেন, "প্রাণের আদর এবং সরল আতিথ্য এখন সমাজের নিম্নস্তরেই পাওয়া যায়। অল্পদিন পূর্ব্বে আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার জন্য মালদহ জেলার এক পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল।

চাকর, পাচক প্রভৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্নসময়ে আমরা গন্তব্য গ্রামের নিকটে একটী মাঠের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হই, এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া একটী গাছের তলায় শুইয়া পড়ি। সেখানে একটী জলের কূপ ছিল।

"আমাদিগকে দেখিয়া নিকটস্থ কয়েকটী কৃষক তাহাদের কাজ ফেলিয়া আমাদের নিকটে আসিল, এবং কোনরূপ শিষ্টাচারের অপেক্ষা না করিয়াই, আমরা কোথা হইতে আসিতেছি, কি জন্য আসিয়াছি, আমাদের আহারাদি হইয়াছে কি না, এই সকল প্রশ্ন করিল। আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর জানিতে পারিয়াই তাহাদের দুই তিন জন গ্রামের দিকে ছুটিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিল, এবং কয়েকটী জিনিস আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। দেখিলাম, খানিকটা আকের গুড়, খানিক পুরাণো তেঁতুল, একটী মাটীর নূতন কলসী, কয়েকখানি নূতন মালসা, এক ভাঁড় দুধ, আর কতকগুলি পাকা কলা। তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, "কূও থেকে জল তুলে পুরাণো তেঁতুল আর গুড় দিয়ে সরবৎ করে' খান্, শরীর ঠাণ্ডা হবে!"

অক্ষয়বাবু কহিলেন, 'কৃষকের এই সরল আদর এবং ব্যবহার দেখিয়া সত্য সত্যই আমার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। আমার এক জন বন্ধু একটু অনুচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি কৃষকদের আতিথ্যের মূল্য-স্বরূপ তাহাদিগকে একটী টাকা দিতে গিয়াছিলেন। তাহারা সরলভাবে বন্ধুকে কহিল, "আমাদের ঘরে যা ছিল, তাই নিয়ে এসেছি, আমরা ত কোনও জিনিস বেচ্‌তে আসি নাই।"

ইহার উপর অক্ষয়বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত-সমাজের বিশেষ অনুকূল নহে। আমি উহা পত্রস্থ করিব না।

আমাদের ন্যায় নাম করিবার অযোগ্য এক জন সাহিত্যসেবী বলেন, "আমি একদিন কার্য্য উপলক্ষে কোনও পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। সেখান-কার এক জন দরিদ্র ভদ্রলোকের সহিত আমার পূর্ব্বে সামান্য পরিচয় ছিল।

"আমি সেখানে গিয়াছি শুনিয়াই তিনি আমার কাছে আসিলেন, এবং আমার যদিও তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না, তথাপি অন্যত্র যাইতে হইলে আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া, তিনি এমন ভাবে আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমি কিছুতেই তাঁহার কথা

এড়াইতে পারিলাম না। তাঁহার বাড়ীতে গেলে তিনি এবং তাঁহার পুত্র আমার আহার-সামগ্রী-সংগ্রহের জন্য যে ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, তাহা হয় ত শিষ্টাচারের অনুমোদিত নহে,* কিন্তু প্রাণের আগ্রহের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। বলিতে কষ্ট হয় যে, চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের মনের মত দ্রব্যাদি (সরু চা'ল, ভাল মাছ এবং মিষ্টি ইত্যাদি) পাইলেন না, কিন্তু যাহা দিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সরল আদর মাখানো।

জলযোগে ছিল, "ফলের মধ্যে ফুটি, মিষ্টির মধ্যে বাতাসা, একটু দুধের সর, একটু নারিকেল কোরা। আহারে মাঝারি চা'লের ভাত, একটু গাওয়া ঘি, দু তিনটী ব্যঞ্জন, এক বাটী খাঁটি দুধ, সঙ্গে মিষ্টি সেই বাতাসা।" সাহিত্যিক বলেন, "পল্লীবাসি-প্রদত্ত এই বাতাসায় যে মিষ্টত্ব পাইয়াছিলাম, সহরের বউবাজারের সন্দেশ, বাগ্‌বাজারের রসগোল্লা, বৰ্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, বা কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়াতেও অনেক স্থলে সে মিষ্টত্ব পাই নাই।"

দরিদ্র গৃহস্থ অতিথিকে পাইয়া পুত্রের সহিত যে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয়, তাঁহার প্রদত্ত সামান্য সামগ্রী এত মিষ্ট লাগিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বাড়ীতে কোনও ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইলে, বা কোনও কারণে দশ বিশ জন লোকের নিমন্ত্রণ থাকিলে, গৃহস্বামী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেন। একবার বাহিরে, একবার রন্ধনশালায় যাইতেন। এখন শুনিতে পাই, সমাজের শীর্ষস্থান সহরে অনেক স্থলে এই অশিষ্ট ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। যতগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল, এবং তাহাদিগকে যে যে জিনিস খাইতে দিতে হইবে, তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই চলে; কর্ম্মকর্ত্তাকে কিছুমাত্র হাঙ্গাম পোহাইতে হয় না। অল্পদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি।

আমাদের আদর আপ্যায়নে শিষ্টাচার আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই হয় ত আমরা দেখিতে পাইব যে, সামাজিক ব্যাপারে লোক নিমন্ত্রণ

---

* যে হেতু অচাপল্যই শিষ্টের লক্ষণ যথা, :—

"ন পাণি-পাদচপলো ন নেত্র-চপলো মুনিঃ।
ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণম্।

করিয়া বাড়ীতে কোনরূপ আয়োজনই করিতে হইবে না। যে ঠিকাদার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবেন, ভাড়া লইয়া তিনিই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের বসিবার ও খাইবার স্থানও দিবেন। এক সময়ে তাঁহার প্রতি একাধিক কার্য্যের ভার থাকিলে পৃথক পৃথক ঘরের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকিবে "অমুকের পুত্রের উপনয়ন", বা "অমুকের কন্যার বিবাহ।" আহূত ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রণপত্র দেখাইয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিবেন।

এইবার আমার দ্বিতীয় কথাটা ধরি। দ্বিতীয় কথা,—বিনয়। বিনয় শিষ্টাচারের এক প্রধান অঙ্গ, এবং ইহা সদ্‌গুণ,সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি যে, সরলতা বিনয়ের ধার ধারে না। এ কথা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বে আমাদের সমাজে সরল এবং স্পষ্টবাদী লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। স্পষ্টবাদী হইতে হইলেই সময়ে সময়ে অবিনয়ী এবং কর্কশভাষী হইতে হয়, সুতরাং কিছুকাল পূর্ব্বেও সমাজের অনেক লোক কখনও কখনও কর্কশ বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতেন। দুই এক সময়ে তাঁহাদের মুখ দিয়া অশ্লীল ভাষাও বাহির হইত।

অধুনা আমরা এ দোষ পরিহার করিয়াছি সত্য, এখন সমাজে বিনীত লোকের অভাব নাই, অবিনীত লোকের সংখ্যাই অতি অল্প, কিন্তু আমাদের বিনয় যেন বিপরীত দিকে যাইতেছে। আমরা বিনয়ের পূজা করিতে যাইয়া সরলতাকে একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।

বিনয়ের সহিত যখন সত্যের সংস্রব থাকে, তখন উহা মধুর, সন্দেহ নাই, কিন্তু বিনয় যখন সত্যের ত্রিসীমা দিয়াও যায় না, তখন উহা কেমন কদর্য্য বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এক স্থলে বিনয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছি। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ লেখক চার্লস্ ডিকেন্স্ একদিন স্বর্গীয়া মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অনুমতি অনুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ডিকেন্স্ তাঁহার লিখিত সমস্ত পুস্তকের এক এক খণ্ড মহারাণীকে উপহার দেন। ভিক্টোরিয়া তাঁহার স্বরচিত জর্‌নাল্ (Journal) নামক এক খণ্ড পুস্তক ডিকেন্স্‌কে উপহার দিয়া তদুপরে লিখিয়া দেন :—To the greatest of English authors from the humblest," অর্থাৎ, "ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকারকে অতি সামান্য গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক এই উপহার প্রদত্ত হইল।" এ বিনয়ে মধুরতা আছে; কেন না, লেখক হিসাবে চার্লস্ ডিকেন্স্ রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া অপেক্ষা অনেক বড়।

দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল বাঙ্গালীর শিষ্টাচারে যে বিনয় দেখিতে পাই, তাহা এ শ্রেণীর নহে। একটী উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্গের এক জন খ্যাতিমান্ লোকের বাড়ীতে গিয়াছি। বয়স, বিদ্যা, বৈভব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। বিদায়-গ্রহণকালে তিনি শিষ্টাচারের ভাষায় অনায়াসে কহিলেন, "আমি আপনাদেরই আশ্রিত।" আশ্রিত শব্দের অর্থ তাঁহার জানা নাই, এ কথা বলিতে পারি না, কাজেই এরূপ বিনয়কে কপটতা ভিন্ন আর কি বলিব?

এমন উদাহরণ এত জানা আছে যে, তাহা লিখিতে গেলেই একটী প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ বিনয়ের আতিশয্যে কত স্থানে কাণ ঝালা-পালা হইয়াছে, বলিতে পারি না।

ফলতঃ এখনকার বিনয়ে কেবল কপটতারই একশেষ, কিন্তু সরলতার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং সত্যের মর্য্যাদা কিছুমাত্র রক্ষিত হয় না।

আমাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়াই আধুনিকসমাজের অবস্থাভিজ্ঞ, দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, আমার এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে একাধিক-বার কহিয়াছেন যে, "শিষ্টাচার-জড়িত কৃত্রিম বিনয় এবং কাষ্ঠহাসি অপেক্ষা সরলপ্রাণের কুৎসিত ভাষা অথবা গালাগালিও মিষ্ট লাগে।" বন্ধু আরও বলেন,—আমাদের মৌখিক ভদ্রতা যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, অন্তঃকরণও তেমনই ফাঁপা হইয়া উঠিতেছে। দেশে সরলতার আদর এতই কমিয়াছে যে, এখন আমরা শিক্ষিত অথচ সরল লোক দেখিলেই বলি, 'লোকটা লেখা-পড়া শিখেও ভারী সাদাসিদে অথবা নেহাৎ সেকেলে'।"

বিনয় সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। এইবার তৃতীয় একটী কথা ধরিয়া আমি আমাদের সামাজিক আচরণে শিষ্টাচার দেখাইব। সে কথাটী বিবাহ। বিবাহ বাঙ্গালীর এক প্রধান সংস্কার, আর বর্ত্তমান সময়ে ইহা সমাজের এক প্রধান সমস্যার বিষয়ও হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে কষ্ট এবং লজ্জা হয় যে, এই বিবাহ-ব্যাপারে আমরা এখন যেরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করি, তাহা কপটতার চরম সীমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আচরণের কথা ভাবিলে সত্য সত্যই মনে হয় যে, সরলতা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সমাজের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের মুখে শুনিবেন যে, বিবাহে অর্থগ্রহণ অতি গর্হিত কাজ; কিন্তু কাজের বেলায় পুত্রের বিবাহে কিছু গ্রহণ করেন না, এরূপ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাই। অথচ শিষ্টাচার ষোল আনা।

যেখানে কিছু না বলিলেও বিলক্ষণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেখানে কিছুই বলা হয় না; অথবা কন্যাপক্ষ পীড়াপীড়ি করিলে বলা হয়, "তা দু'গাছি রুলি দেবেন।" কিন্তু যেখানে প্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দেহ থাকে, অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে, যেখানেই শিষ্টাচার অন্যবিধ। এরূপ স্থলে বরের বাপ কন্যার পিতাকে প্রায়ই এইরূপ ভাবের কথা বলেন যথাঃ—"আপনার ঘর থেকে মেয়ে আন্‌ব, এত আমার সৌভাগ্যের কথা। পাওনা থোওনা সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বক্তব্য নাই, আর এ বিষয়ে বেশী কথা হয়, এও আমি ভালবাসি না। তবে ছেলের গর্ভধারিণী বলেন যে, আমাদের পাড়ার অমুকের ছেলে এত পেয়েছে, আমার ছেলের বেলায় ত তার কম হ'তেই পারে না" ইত্যাদি। অথবা "পাওনা থোওনার কথা বল্‌তেই লজ্জা হয়, তবে এখন এটা একটা প্রথা হয়েছে বলেই বল্‌তে হয়—এক একটী ছেলে মানুষ করা—বুঝ্‌তেই পাচ্ছেন্। তা এই বিবাহের খরচটা আমার ঘর থেকে না দিতে হয়, আর আপনার কন্যার কিছু থাকে—মেয়ে যাতে দশ জনের সাম্‌নে বেরুতে পারে—জামাইকে দেবার কথা আর বেশী কি বল্‌ব?—"ইত্যাদি। ইহার পরেই পাটীগণিতের যোগ প্রকরণ!

অর্থাৎ, ভদ্রতার কিছুমাত্র ত্রুটী নাই, তবে নিজের বেলায় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা, আর পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা হয়, ইহাই কিন্তু সকলেরই অভিপ্রেত। আর সে বিষয়ে জ্ঞানও বেশ টন্‌টনে। ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কোন, সরলচিত্ত বরকর্ত্তা পুত্রের বিবাহে উপযুক্ত মূল্য আদায় করিতে না পারেন, বা না করেন, তাহা হইলে তিনি প্রশংসিত না হইয়া বরং নির্ব্বোধ বলিয়া উপহসিত হন। হায় রে সামাজিক শিষ্টাচার!

এইবার বিবাহ সম্বন্ধে একটী ছোট কথায় আধুনিক সমাজের আচরণ দেখাইব। আজ কাল বিবাহের নিমন্ত্রণের পত্রের শেষে প্রায়ই লিখিত হয়, "লৌকিকতা-গ্রহণে অসমর্থ বিধায় ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।" ইহা কিরূপ শিষ্টাচারের ভাষা, জানি না। লৌকিকতা-গ্রহণে কেহই অসমর্থ হইতে পারেন না। অসমর্থ শব্দের অর্থ অশক্ত, বা শক্তিহীন। সুতরাং "গ্রহণে অসমর্থ" বাক্যের অপপ্রয়োগ, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে পত্রে লিখিত হইত, "পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।" এখানে নিকটে যাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল না বলিয়া ত্রুটী স্বীকার করা হইত।

কিন্তু লৌকিকতা গ্রহণ না করায় উদারতাই প্রকাশ পায়, ইহাতে ক্রটী কোথায়? ফলকথা এই যে, ইহা কপটতার ভাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে যাঁহারা এইরূপ লৌকিকতা-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারাও উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বলেন, "ইনি দিয়াছেন, তিনি দিয়াছেন, উহা কি ফিরাইয়া দেওয়া যায়?" কাজেই বলিতে হয়, পত্রের এ উক্তি মনকে চোখঠারা মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে লৌকিকতা-প্রদানেই অনেকে অসমর্থ, কেন না, দেশের অর্দ্ধেক ভদ্রলোক এখন অর্দ্ধাহারে দিন কাটান। অগ্রহায়ণ মাসের শেষেও যখন একটী বড় বেগুণের দাম দু' পয়সা, তখন "লৌকিকতাগ্রহণে অসমর্থ বিধায় ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন"—এরূপ উপহাসের ভাষা ভাল লাগে কি?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা নিমন্ত্রণের পত্রে প্রথমতঃ শিষ্টাচারের এইরূপ ভণিতা দেখিয়াছিলাম, তখন আমাদের ছেলেবেলার একটী গল্প মনে পড়িয়াছিল। আমাদের গ্রামে রামচাঁদ নামে একটী নীচজাতীয় লোক বাস করিত। তাহার এতই বাক্‌চাতুর্য্য ছিল যে, লেখাপড়া শিখিলে সে প্রহসন লিখিতে পারিত। রামচাঁদ একদিন হাটে গিয়াছে। কৈলাস ছুতার নামে অন্য গ্রামের একটী পরিচিত লোক তাহার নিকট একটী টাকা ধার চাহিল, এবং কাকুতি-মিনতি করিয়া কহিল, "রামচাঁদ দা, একটী টাকার বড়ই দরকার, থাকে ত দাও, আমি পরের হাটেই দেব।" রামচাঁদ একটী টাকা দিল, কিন্তু পরের হাট কেন, আট দশ হাট চলিয়া গেল, রামচাঁদ কৈলাসের দেখা পাইল না। কৈলাস হাটে না আসে, এমন নহে; কিন্তু রামচাঁদের যে দিকে থাকিবার কথা, সে দিকই মাড়ায় না। সপ্তাহে দুইবার হাট, কাজেই এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। সহসা রামচাঁদ একদিন কৈলাসের সাক্ষাৎ পাইল, সেদিন আর কৈলাস পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে নাই। কৈলাস রামচাঁদকে দেখিয়াই কোমরের কাপড় হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া কহিল, "রামচাঁদ দা, সেই থেকে ফি হাটেই তোমাকে খুঁজি, কিন্তু একদিনও দেখ্‌তে পাই না, তাতেই টাকাটা দিতে দেরি হয়ে গেছে, কিছু মনে করো না।" রামচাঁদ কহিল, "মনে আর কি করবো ভাই, তোমাকে টাকাটী দিয়ে অবধি আমিও হাটে আসি, কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়,—আর তুমি টাকাটা দিয়ে ফেল।"

রামচাঁদের স্নেবের ভাষার অনুকরণে বলিতে হয় যে, আমাদের সমাজে এখন লৌকিকতা-প্রদানে সকলেই ব্যগ্র, কিন্তু উহা গ্রহণে কেহই সমর্থ নহেন, তাই পত্রে লিখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় ;—পাছে কেহ কিছু দিয়া ফেলেন।

বস্তুতঃ যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, কেবল ইহাই দেখিতে পাই যে, আজকাল বাক্যে এবং ব্যবহারে বাহিরে খুব ভদ্রতা দেখাইতে শিখিয়াছি, বা শিখিতেছি, কিন্তু আমাদের ভিতরের সরলতা বা সহৃদয়তা ক্রমশই চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যাহাকে তুমি বলিলে চলে, তাহাকে এখন আমরা আপনি বলি, কিন্তু আসল কাজের বেলায় অক্ষম ভাইকেও দুটী ভাত দিতে নারাজ, ইহাই এখন সামাজিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথা ঘুরাইয়া বলিতে না পারিলে এ কালের সমাজে বাস করা চলে না, ইহাও এখন অনেকেরই ধারণা। আর বাড়াইব না। যাহা বলিয়াছি, তাহাই বোধ হয় কিঞ্চিৎ তিক্ত হইয়াছে। একটী মিষ্ট কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

অল্পদিন হইতে আমাদের এই শিষ্টাচার-প্লাবিত সমাজে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই যে, দুই এক জন বিবাহিত যুবক পিতার শিষ্টাচারে সর্ব্বস্বান্ত শ্বশুরের সাহায্য করিতেছেন। আর গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে বাঙ্গালার বালকদিগের ব্যবহারে যে সরলতাময় সৌজন্যের সূত্রপাত দেখিয়াছিলাম, এবার দামোদরের বন্যায় তাহার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছি। বালকেরা সেবার আপনাদের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া মহিলাদের স্নানের নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। এবার তাহারা শিষ্টাচার-বর্জ্জিত হইয়া অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় জল সাঁতরাইয়া যাইয়া বিপন্নের সেবা করিয়াছে। ইহাতেই আশা হয় যে, আবার আমাদের সমাজে মানব-হৃদয়ের অমূল্যনিধি সরলতা ফিরিয়া আসিবে। যে সমাজে সরলতার অবতার পরমহংস দেবের ন্যায় গুরু ও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শিষ্য, এবং দয়ার অবতার বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়, সে সমাজ হইতে সরলতা একবারে ভাসিয়া যাইবে, ইহা মনে হয় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

গ্রাম্য দলাদলি।

[নক্‌সা।]

গোবিন্দপুরে দলাদলির বিষম ঘটা। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ইহার পথ-প্রদর্শক। এই দলাদলির একটু ইতিহাস আছে। সেখানে রাঢ়ী, ব্যারেন্দ্র ও বৈদিক, তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস। তবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরাই মাতব্বর; তাঁহাদের মধ্যে জমীদার আছেন, উকীল মোক্তার আছেন, ডাক্তার আছেন, সরকারী চাকুরেও দুই চারি জন আছেন। বারেন্দ্র ও বৈদিকগণ রাঢ়ী মহাশয়দের অনেকটা আশ্রিত; কিন্তু সংপ্রতি তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্দ্ধিত হইতেছে।

স্থানীয় জমীদার ভজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কন্যাদায়' গোবিন্দ-পুরের ব্রাহ্মণসমাজে দলাদলি-সৃষ্টির প্রধান কারণ। ভজকৃষ্ণবাবু জানিয়া শুনিয়া যে কুলে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, সেই বংশের 'পিরালী' অপবাদ আছে; অর্থাৎ, অরাতিদমন মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ নবাব-সরকারে চাকরী করিবার সময় নবাব বাহাদুরের বাবুর্চ্চিখানার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে নিষিদ্ধ কুক্কুটমাংসের ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন; পলাণ্ডু-খচিত, পরম মুখ-রোচক কুক্কুটমাংসে তাঁহার অভিরুচি না থাকিলে, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের অপরাধে তিনি সমাজে পতিত হন। তাঁহার বংশধরেরা আট পুরুষের মধ্যে আর পবিত্র হইতে পারিলেন না। এমন বংশে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে জাতি যায়, ইহাই ত হিন্দু সমাজের বিধান।

সুতরাং ভজকৃষ্ণবাবু জমীদার হইলেও তাঁহার জাতি গেল। সমাজে তিনি 'একঘরে' হইয়া থাকিলেন। শব্দগত অর্থ ধরিয়া 'একঘরে' বলিলে ঠিক বলা হয় না; কারণ, একঘরে হইয়াও তিনি দলে পুষ্ট রহিলেন; তাঁহার অধি-কাংশ আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। গোবিন্দপুরের বাঁড়ুয্যে-বংশ যেন, রাবণের বংশ! 'একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতি' না হইলেও বংশে বাতি দিবার লোক শতাধিক।

আত্মীয় স্বজনেরা ভজকৃষ্ণকে ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট জ্ঞাতি ও প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার নিতাইকৃষ্ণ অন্যদলের অর্থাৎ 'অপিরালী' দলের দলপতি হইলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড বৈঠকখানার পাশার আড্ডায় মহা-সমারোহে ঘন ঘন সামাজিক বৈঠক বসিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখা-পেক্ষী অনেক ব্রাহ্মণ-নন্দনই তাঁহার দলে যোগদান করিলেন। মিউনিসি-

পালিটীর নির্ব্বাচনের সময় আজ কাল করদাতাদিগকে 'মিষ্টমুখ' করাইতে না পারিলে কমিশনের দুর্লভ পদ লাভ করিতে পারা যায় না। স্থানীয় মিউ-নিসিপালীটির ৬ নং ওয়ার্ডের কমিশনর ও অনাহারী (যদিও তিনি 'আহার'-গ্রহণে অকুণ্ঠিত) ম্যাজিষ্ট্রেট নিতাইকৃষ্ণ তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহার আড্ডাধারিগণকে নিষিদ্ধ পক্ষি-মাংসে এবং হরিশ সাহার অমৃত-কুণ্ডস্থিত খাঁটী স্বদেশী গৌড়-রসে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পদিনেই তাঁহার দল পরিপুষ্ট হইল। তখন তিনি সদলবলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, ভজকৃষ্ণদের জাতি মারিবেন।

ভজকৃষ্ণ বিপদ বুঝিয়া নিজের দলের দলপতির শরণ লইলেন। দল-পতি মহাশয় শিক্ষিত ব্যক্তি—প্রবীণ, বিচক্ষণ এবং বিলাত-প্রবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি প্রাণের টানে অকপট ভাবে 'অপি-রিলী'গণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার প্রবল প্রতিপত্তিতে বারেন্দ্র ও বৈদিকব্রাহ্মণেরাও তাঁহার দলে যোগদান করিলেন, ক্রমে তাঁহার দলই প্রবল হইয়া উঠিল।

ইহার ফলে দলাদলি বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এক বাড়ীর মধ্যেই দুই দলের লোক। কাকা ভজকৃষ্ণের দলে, ভাইপো নিতাইকৃষ্ণের দলে। বড় ভাই এক দলে, ছোট ভাই অন্য দলে; সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদের প্রকাণ্ড সুবিধা হইয়া গেল, এবং কলহের বাস্তুদেবতা ঋষিবর নারদ শূন্যমার্গে তাঁহার প্রিয়বাহন ঢেঁকির উপর আরোহণ করিয়া সবেগে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তেজস্বীর পক্ষে সকল দ্বার উন্মুক্ত; পরম তেজস্বী রুদ্র-নারায়ণবাবু কলিকাতায় এটর্ণীগিরি করিয়া নানা উপায়ে কয়েক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি পূজার সময় গোবিন্দপুরে মাতুলালয়ে আসিয়া পিরালী-দলভুক্ত মাতুলের অন্নগ্রহণ করিলেও তাঁহার দূরসম্পর্কীয় শ্বশুর 'অপিরালী'-দলভুক্ত মদনমোহন বাবুর গৃহে ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়াছিলেন। এ ব্যাপার লইয়া কোনও পক্ষই সামাজিক গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন নাই।

ইহাতে একটা অসুবিধা হইল। উভয় দলেরই ক্রিয়া কর্ম্ম কমিয়া আসিল। যাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে স্বজাতি কুটুম্ব খাওয়াইয়া দশ টাকা অপব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, অথচ এই অপব্যয়ে বিরত হইলেও

কৃষক-বালিকা।

চিত্রকর– ভি, সি প্রিন্সেপ।

Mohila Press. Cal.

নিন্দার ভয় করেন, তাঁহারা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে কুটুম্ব-গণকে অম্লানবদনে রম্ভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহার ভাই বা ভাইপো অন্য দলে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে অন্য কুটুম্বকে উৎসবে আহ্বান করিবেন? কোনও কার্য্যেই দুই দলের লোক একত্র হইবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। গোবিন্দপুরে ক্রিয়া-কর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, যাঁহাদের পেশা কেবল 'ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ' তাঁহারা প্রলয় গণিলেন।

বৈদিক সম্প্রদায়ের দলপতি শ্যামাচরণ বাবু? দেখিলেন, এই সুযোগে সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এমন 'সুবর্ণ-সুযোগ' আর উপস্থিত হইবে কি না সন্দেহ। সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপনের তাঁহার যথেষ্ট আবশ্যকতা ছিল। তাঁহার পিতা যদুপতি ভট্টাচার্য্যের নাম গোবিন্দপুরের অধিক লোক জানিত না; তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কোথায় ছিল, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত। কথিত আছে, তিনি গোবিন্দপুরের পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ বামনদাস ভট্টাচার্য্যের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; একদা তাঁহার পৈত্রিক বাসভবন বৈশ্বানরের কুক্ষিগত হইলে তিনি পত্নীপুত্র সহ গোবিন্দপুরে আসিয়া শ্যালকের ভদ্রাসনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 'হবির্বিনা হরির্যাতি'—এ প্রবচন তাঁহার পক্ষে খাটিল না; এমন কি, ধনঞ্জয়ও যখন তাঁহার সহিষ্ণুতার নিকট হারি মানিল, তখন বামনদাস অগত্যা তাঁহার স্কন্ধে পৌরোহিত্যের ভার কতক কতক নিক্ষেপ করিলেন। যদুপতিও মা-মনসার স্তবে লক্ষ্মী-পূজার রাত্রে কমলাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কলা, মূলা, আতপ চাউল প্রভৃতি যাহা কিছু যজমান-বাড়ী হইতে গামছায় করিয়া বাঁধিয়া আনিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উপরি-আয়ও ছিল; কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলে আর রক্ষা ছিল না তিনি এক ঘটী ও গামছা লইয়া পুত্র সহ দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী পল্লীতে পদব্রজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। যেখানে লুচি সন্দেশ ক্ষীর দধি প্রভৃতি যত পারিতেন, আকণ্ঠ আহার করিয়া, গামছায় লুচি, ঘটীতে মিষ্টান্ন পক্কান্ন প্রভৃতি, এবং মাটীর গেলাসে ক্ষীর বোঝাই করিয়া, বাড়ী ফিরিতেন। সেই লুচি সন্দেশের দৌলতে তিন দিন তাঁহার গৃহে উনান জ্বলিত না। সে সময় যজমান-বাড়ীতে নৈবেদ্যের যে আতপ চাউল পাইতেন, তাহা রৌদ্রে শুষ্ক

করিয়া গণ্ডকালয়ে বিক্রয় করিতেন। গণ্ডক-রমণীরা তাহা জাঁতায় পিশিয়া 'সবেদা' প্রস্তুত করিয়া ময়রার দোকানে বিক্রয় করিত। তাহা জিলিপি বা পক্কান্নরূপে ব্রাহ্মণ-ভোজনে লাগিত!

যদুপতি কষ্টে-স্বষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুভা-দৃষ্টক্রমে কৃতী বামনদাস ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইলে শ্যালকের সমস্ত যজমানের পৌরোহিত্য-ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণেতর কয়েক ঘর যজমান পাইয়া যদুপতির আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইল। তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণকে 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'খানা (তখন 'পুরোহিত-দর্পণ' প্রভৃতি প্রকাশের ফন্দী শাস্ত্রগ্রন্থ-ব্যবসায়িগণের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হয় নাই) মুখস্থ করাইয়া পৌরোহিত্যের 'এপ্রেণ্টিসি' করাইবেন। কিন্তু গোবিন্দপুরের স্বনাম-ধন্য উকীলও কায়স্থ-জমীদার রামচরণ মিত্র তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন, "বুঝেছ খুড়ো, তুমি ত যজমানের চাল কলাতেই সংসার চালিয়ে গেলে, কিন্তু ক্রমে ক্রিয়াকর্ম্মে লোকের যে রকম আস্থা বাড়ছে, তাতে দশ বছর পরে আর চাল কলায় পেট ভরবে না। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান, ওকে ইংরাজী শিখাও।"

যদুপতি উভয় চক্ষু কপালে তুলিয়া শিখা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "ইংরাজী পড়াতে যে বল হে, শেষটা ম্যাও ধরবে কে?—ওর কেতাব কেনবার খরচ, ইস্কুলের মাইনে, এ সকল কে দেবে? ইংরাজী পড়ান কি মুখের কথা?"

উকীল জমীদার রামচরণবাবু সহাস্যে বলিলেন, "তার জন্যে আর ভাবনা কি? ওর লেখা পড়ার জন্যে যা কিছু খরচ হবে—তা না হয় আমিই দেব। ব্রাহ্মণের ছেলের জন্যে বছরে দশ বিশ টাকা খরচ করলে, সে টাকা আমার জলে পড়বে না।"

রামচরণবাবু ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে ভক্তিমান ক্রিয়শালী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বিশেষতঃ নবকুমারের মত যে প্রতিবেশীদের জন্য কাঠ কাটিতে যাইবে, দুর্জ্জন প্রতিবেশীরা তাহাকেই বনবাস দিয়া আসিবে, এই নীতি-কথার উপরেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না।

তখনও পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হালের আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পল্লীবিদ্যালয়ের মাষ্টার পণ্ডিতদের অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। যদিও একালের মত সেকালেও স্কুলের শিক্ষকগণকে মধ্যে মধ্যে স্কুলের সম্পাদকের মো-সাহেবী করিতে হইত, এবং সম্পাদক মহাশয়ের সুরে

সুর মিলাইয়া জল উঁচু না বলিলে চাকুরী বজায় রাখা দুষ্কর হইত, তথাপি একালের মত শিক্ষাবিভাগে বড় কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার পর্য্যন্ত ছয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার মনিব তাঁহাদের অদৃষ্ট লইয়া খেলা করিত না, এবং স্কুলে ছেলেদের কোন-মুখো করিয়া বসাইতে হইবে, —তৎসম্বন্ধে আদেশলাভের জন্য ঊর্দ্ধমুখ চাতকের মত তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইত না। আর দশ বৎসরের ছেলেকেও অসংখ্য পুস্তকের চাপে কুব্জ হইতে হইত না। দশ বৎসরের ছেলের জন্য আজ কাল ছয় টাকার পুস্তক লাগিতেছে। কোনও কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশু-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া জমীদারী কিনিতেছেন। তখন কিন্তু সেরূপ ছিলনা; তখন একখানা রয়াল রীডার, লোহারামের ব্যাকরণ, বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী, আর তারিণীচরণের ভূগোলেই ছেলেরা কালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা প্রফুল্লচন্দ্র রায় হইতে পারিয়াছেন।

রামচরণবাবুর সাহায্যে শ্যামাচরণের লেখাপড়া চলিতে লাগিল। শ্যামাচরণ শৈশবাবধি বড় লাজুক, যাহা নিতান্ত না হইলে নয়—তাহাই সে তাঁহার নিকট গ্রহণ করিত। একখানি পাটীগণিত হইলে অঙ্ক কসিবার সুবিধা হয়,—কিন্তু সে দত্তদের নবীনের পাটীগণিত দেখিয়া অঙ্ক কসিত। খাতা বাঁধিয়া অন্যের অভিধান দেখিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী কথার অর্থ লিখিত, দেশী মোটা কাগজে 'রাইটিং' লিখিত। চাদরের নীচে যাহার জামা জুটিত, এরূপ ভাগ্যবান ছাত্র তখন স্কুলে অতি অল্পই ছিল। ছেলেদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পূজার সময় একজোড়া মোজা পাইত, উৎসবকাল ভিন্ন তাহা তাহারা ব্যবহার করিত না, যদি ছিঁড়িয়া বা বিবর্ণ হইয়া যায়! ফরাসী ছিটের 'দোলাই'য়ের পরিবর্ত্তে যে পশমী 'র‍্যাপার' গায়ে দিতে পাইত, অন্যান্য ছেলেরা তাহার দিকে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিত।—শ্যামাচরণ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটি ভাঙ্গা লণ্ঠন হাতে লইয়া আধক্রোশ দূরবর্ত্তী রসিকমাষ্টারের বাড়ী গিয়া পড়া 'বলিয়া' লইয়া আসিত। আর একালে শ্যামাচরণের দুই ছেলের দু জন মাষ্টার, এক জন বাঙ্গালা, এক জন ইংরেজী শিখান, দুই ভায়ের দুইখানি পাটীগণিত, আর উভয়ের গায়ে চৎমকার শাল! এক ঘণ্টা কাল মোজা ছাড়িলে তাহাদের সর্দ্দি লাগে! লুচি মোহনভোগ ভিন্ন তাহাদের 'টিফিন' হয় না, এবং শীতের রাত্রে দৈবাৎ দোতালার শয়নকক্ষে খড়খড়ী বন্ধ করিয়া শার্শি

বন্ধ করিতে ভুল হইলে ঠাণ্ডায় তাহাদের মাথা ধরে! শ্যামাচরণ কিন্তু বাল্যকালে খড়ের ঘরের বারান্দায় ময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়া মাঘমাসের রাত্রি কাটাইয়াছে, তাহাতে তাহার কখনও 'নিউমোনিয়া' দূরের কথা, সর্দ্দি কাশিও হয় নাই।

শ্যামাচরণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই গ্রামের এণ্ট্রেন্স-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। তাহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে অতঃপর বিদ্যাভ্যাস করা একান্ত অসম্ভব, কিন্তু উকীল রামচরণবাবুর অনুগ্রহে তাহার পাঠ বন্ধ হইল না। রামচরণবাবু কাশিমবাজার রাজসংসারের উকীল ছিলেন, তিনি সুপারিশপত্র দিয়া শ্যামাচরণকে বহরমপুরে পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং তাহার পাঠ্যপুস্তকগুলি কিনিয়া দিলেন। শ্যামাচরণ প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর কৃপায় বিনাবেতনে বহরমপুর কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। বোর্ডিংএও তাহাকে কিছু দিতে হইত না। শ্যামাচরণ ক্রমে এল্-এ, বি-এ, এবং বি-এল্, পর্য্যন্ত পাশ করিয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন, রামচরণবাবু তখন পর্য্যন্ত তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় বিরত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে নিজের 'জুনিয়ার' করিয়া লইয়া ওকালতী শিখাইলেন। তাঁহার চেষ্টায় অল্পদিনেই শ্যামাচরণের পশার জমিয়া গেল। শ্যামাচরণ ওকালতী করিতে করিতে একটি চাকরীও জুটাইয়া লইলেন। স্থানীয় বিধবা জমীদার নৃত্যকালী চৌধুরাণীর ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু উকীলেরা গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে চাকরী করিতে পারেন না, সেই জন্য বাহিরে প্রকাশ থাকিল, তিনি নৃত্যকালী চৌধুরাণীর ষ্টেটের 'লিগাল এড্ভাইসার', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই ম্যানেজার, রীতিমত বেতনভোগী ম্যানেজার।

স্ত্রীলোকের সংসারে ম্যানেজারী করিয়া কিছুদিনের মধ্যে শ্যামাচরণের 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ' হইল। শ্যামাচরণ দেওয়ানী আদালতের বন্ধের মধ্যে জমীদারী-পরিদর্শনে যাইতেন। একবার জমীদারী ঘুরিয়া আসিয়াই তিনি দুই শত টাকা মূল্যের এক জোড়া কাশ্মীরী শাল কিনিয়া ফেলিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের কমিটীর মেম্বর ও মিউনিসিপালিটীর 'কমিশনার' হইলেন। অল্পদিনেই শ্যামাচরণ মাতুলের খড়ের ঘর ভাঙ্গিয়া সেখানে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা ফাঁদিয়া বসিলেন। একদিন রামচরণবাবুর এক জন কর্ম্মচারী জমীদার নৃত্যকালী চৌধুরাণীর সেরেস্তায় কয়েক বিঘা জমী 'মৌরুসী' করিয়া

লইবার জন্য শ্যামাচরণকে ধরিয়া বসিল। শ্যামাচরণ যে রামচরণের অন্নে প্রতিপালিত, তাহার এক জন কর্ম্মচারীর কিঞ্চিৎ উপকার তিনি নিঃস্বার্থ-ভাবেই করিবেন, সকলে এইরূপ আশা করিয়াছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে পূর্ব্ব-কথা ভুলিয়া যায়। রামচরণবাবুর কর্ম্মচারী জমীদারের নজর ৫০৲ টাকা এবং ম্যানেজারের নজর ২৫৲ টাকা দিতে বাধ্য হইল। বিধবার জমীদারীতে ম্যানেজারের উপার্জ্জন এইরূপ।

এই সময় গোবিন্দপুরে সামাজিক দলাদলির 'মরসুম' পড়িয়া গেল। শ্যামাচরণ এক দলের দলপতি হইবার জন্য চেষ্টাযত্নের ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইতিমধ্যে শ্যামাচরণের অন্নদাতা ও পৃষ্ঠপোষক রামচরণবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হইল। শ্যামাচরণ কর্ত্তব্যানুরোধে রামচরণবাবুর পুত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তাঁহার গৃহে আসিলেন। রামচরণবাবুর ভ্রাতা হরিচরণবাবু বলিলেন, "শ্যামাচরণ! দাদার অনুগ্রহেই তুমি আজ মানুষ। গ্রামে আজ কাল সামাজিক দলাদলি বড়ই প্রবল; শ্রাদ্ধটা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, আমার বাড়ীতে যাহাতে দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া ফলার করে—তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।"

শ্যামাচরণ অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে বলিলেন, "তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমার যাহা সাধ্য, তা' অবশ্যই করিব। তুমি এক কাজ কর। ব্রাহ্মণের সামাজিক দলাদলির মধ্যে তোমার মাথা দিবার দরকার নাই; তুমি 'পিরালী' 'অপিরালী'—সকলকে একধার হইতে নিমন্ত্রণ কর, যাহাদের ইচ্ছা হয়, আসিবে; যাহাদের আপত্তি থাকে, আসিবে না; তুমি এক দলকে বাদ দিয়া অন্য দলকে বলিয়া কেন দোষের ভাগী হইবে?"

উপদেশটি প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত সরল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে বৈদিকী চা'ল ছিল, কূটবুদ্ধি জমীদার হরিচরণবাবুর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, "তুমি ত বেশ পরামর্শ দিলে! কিন্তু আমি জানি, দুই দলে একত্র বসিয়া কোথাও খায় না; এ অবস্থায় আমি দুই দলকে একত্র আহারের জন্য কিরূপে অনুরোধ করিব? আর তাহারা সে অনুরোধ রক্ষা করিবে, এ আশাই বা কিরূপে করি? শেষে কি সমস্ত কাজ পণ্ড করিব?"

শ্যামাচরণ সোৎসাহে বলিলেন, "সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি সব ঠিক করিয়া লইব, কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা চাই। যে কয় ঘর

বৈদিক আছেন, আমি তাঁহাদের ভার লইলাম। অন্যান্য দলের দলপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।"

হরিচরণবাবু এ কথাতেও তেমন ভরসা পাইলেন না। কিন্তু মহাসমারোহে শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। হরিচরণবাবু তাঁহার দাদার শ্রাদ্ধে প্রজাবর্গকে ভোজন করাইবেন বলিয়া নিকটবর্ত্তী তালুকসমূহের 'মাতব্বর' প্রজাদের নিকট নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। ঘরেই মিষ্টান্নের 'ভিয়ান' আরম্ভ হইল। বিভিন্ন গ্রামের গোয়ালাদের উপর প্রচুরপরিমাণ দধি, ক্ষীর প্রভৃতির 'বায়না' পড়িল। কলিকাতা হইতে অনেক কেনেস্ত্রা ঘি ও অনেক বস্তা ময়দা আসিল। নিকটে যাহাদের পুষ্করিণী ছিল, তাহাদের নিকট প্রচুরপরিমাণ মৎস্যের বরাত গেল। আয়োজন দেখিয়া সকলেই বুঝিল, গ্রামের কোনও লোক অভুক্ত থাকিবে না। শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পূর্ব্বেই পনের বিশখানি গ্রামের কাঙ্গালীরা সংবাদ পাইল, রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে মহাসমারোহে কাঙ্গালীবিদায় হইবে। তাহারা ঔৎসুক্যভরে শ্রাদ্ধের দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

গোবিন্দপুর অঞ্চলে পূর্ব্বাপর নিয়ম আছে, শ্রাদ্ধের দিনই শ্রাদ্ধের বাড়ীতে ব্রাহ্মণভোজন হয়। তদনুসারে হরিচরণবাবু স্থির করিলেন, শ্রাদ্ধের দিন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও 'শূদ্রভদ্র' সকলকে ভোজন করাইয়া সন্ধ্যার পর কাঙ্গালী বিদায় করিবেন, দ্বিতীয় দিন প্রজাদের খাওয়াইবেন, তৃতীয় দিন নিরামিষ-ভঙ্গ, জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণকে ভোজ দিবেন। এই সঙ্কল্পানুসারে তিনি ক্ষীর, দধি ও মৎস্যাদির বায়না দিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন শ্যামাচরণের সুপ্রশস্ত বৈঠকখানার ফরাসের উপর এক 'বৈঠক' বসিল। শ্যামাচরণ এই বৈঠকের সভাপতি হইলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, "আমাদের এ অঞ্চলে একটা বড় কুপ্রথা আছে। শ্রাদ্ধের দিন শূদ্র-বাড়ীতে ব্রাহ্মণেরা ফলার করে! এই কুপ্রথা রহিত করিবার এই উত্তম সুযোগ। অতএব কাল যদি রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে তোমাদের ফলারের নিমন্ত্রণ হয়, তাহা হইলে তোমরা এক প্রাণীও ফলার করিতে যাইবে না। তোমাদিগকে আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে।"

বৃদ্ধ নীলকমল ভট্টাচার্য্য অনেক কালের মানুষ, তাহার উপর তিনি কিছু স্পষ্টভাষী। তিনি বলিলেন,"সে কি হে শ্যাম! এইত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বিনোদনগরে কার্ত্তিক বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ হয়, তখন তোমার বাবা ঘটী হাতে

লইয়া দুপুর রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া শ্রাদ্ধের দিন ফলার মারিয়া আসিয়াছিলেন, আর এক ঝুড়ি লুচি ঘাড়ে করিয়া বাড়ী আনিয়াছিলেন; আজ তুমি উকীল হইয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ। কিন্তু তিনি শাস্ত্র-নিপুণ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি যাহাতে আপত্তি করেন নাই, তুমি তাহাতে আপত্তি করিতেছ কেন? বিশেষতঃ রামচরণবাবু তোমার পরম হিতৈষী ছিলেন,—তাঁহার অনুগ্রহেই তোমার এতটা উন্নতি; আজ এ ভাবে তাঁহার শ্রাদ্ধ পণ্ড করা কি তোমার উচিত?"

উচিত জবাব শুনিলে অনেকেই চটে। মুখের মত জবাব শুনিয়া শ্যামাচরণও চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কর্ত্তারা কি করিয়াছেন না করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেখিবার দরকার নাই; সে এক কাল ছিল, এখন আর এক রকম সময় পড়িয়াছে। এ কালে সকলেই স্ব স্ব সমাজের উন্নতি করিতেছে। আমরাও সমাজের সংস্কার করিব, উন্নতি করিব। আপনি কি জানেন না—সেকালে কোথাও ফলারের নিমন্ত্রণ হইলে কুণ্ডীকে অপদস্থ করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাড়ী ছাড়িয়া বাগানে গিয়া গাছের উপর বসিয়া থাকিতেন; সহজে গাছ হইতে নামিতে চাহিতেন না?"

নীলকমল বলিলেন, "হাঁ, সে কথা সত্য। তুমিও কি হরিচরণবাবুর দাদার শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার জন্য গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিবে? কিন্তু হরিচরণ বড় শক্ত ছেলে, সে যদি বর্ত্তমান রস্তা দেখাইয়া তোমাকে গাছ হইতে নামাইবার চেষ্টা না করে, তখন কি করিবে? আমি বলি কি, এ সব 'পাটোয়ারী বুদ্ধি' এখন রাখিয়া দাও। সমাজসংস্কার করিতে হয়, কুপ্রথা রহিত করিতে হয়, সময়ান্তরে করিও; রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে তোমার এ রকম ঘোঁট করিয়া শ্রাদ্ধ-পণ্ড করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, এমন নিমকহারামী করিও না।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "রামচরণবাবু কোন দিন যদি আমার কোনও উপকার করিয়াই থাকেন, তাহাতে আমার সমাজের কি?—সে জন্য ত আমাদের সামাজিক কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতে পারি না। না, এ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না। কাল যদি আমরা রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে ফলার না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর কেহ আমাদিগকে শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিবে না। এই উপলক্ষে একটা প্রকাণ্ড কুপ্রথা রহিত হইবে।"

নীলকমল বলিলেন, "শুনিয়াছি, শ্রাদ্ধবাড়ীতে মোটা রকম দক্ষিণার ব্যবস্থা আছে। তোমার পিতা জীবিত থাকিলে তিনি এ সুযোগ ত্যাগ করি-

তেন না, কিন্তু তুমি জমীদারের ম্যানেজার হইয়া সমাজের মুকুটমণি হইয়াছ, পিতৃতুল্য চিরহিতৈষী মুরুব্বীর শ্রাদ্ধে সামাজিক কুপ্রথা তুলিয়া দিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ। সাধু, বেঁচে থাকো বাবা! তোমা হইতে এই হইল যে, ভবিষ্যতে আর কেহ কাহারও উপকার করিবে না। কোনও নিরাশ্রয় দরিদ্রের ছেলেকে স্কুলের বেতন দিয়া, কেতাব কিনিয়া দিয়া সাহায্য করিবে না। মনে করিবে, দুধ কলা দিয়া কালসাপ পুষিয়া ফল কি? বিষদাঁত গজাইলেই 'ছোঁ' মারিবে।—তা তোমারছোবলে বাবু! রামচরণের শ্রাদ্ধ বন্ধ থাকিবে না, মধ্য হইতে কেবল নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবে!"

শ্যামাচরণ ক্ষাপা হইয়া বলিলেন, "কি! আপনি আমার বাড়ীতে বসিয়া আমার অপমান করিয়া যান! আপনি বুঝি টাকাটা সিকেটে ঘুসের লোভে রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে ফলার করিবেন, ঠিক করিয়াছেন? যদি তাহা করেন, তবে আমার বাড়ীতে আগামী পূজায় দুর্গোৎসবে আপনার নিমন্ত্রণ বন্ধ!"

নীলকমল বলিলেন, "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস! প্রজাদের গালে চড় মেরে, আর নিরীহ মক্কেল ভুলিয়ে দশ টাকা উপায় কর; বৎসরান্তে একবার মহামায়াকে ভিটেয় তুলে মনে কর, সমাজের কর্ত্তা হয়েছ! যা খুসী করবে! তা তোমার নিমন্ত্রণে খুব বাহাদুরী আছে, তুমি এক বাড়ীর মধ্যে দাদাকে বাদ্ রেখে ভাইকে পূজায় নিমন্ত্রণ কর! দাও ত খেতে খিচুড়ী প্রসাদ! সে মহাপ্রসাদের নিন্দা করতে চাইনে, থাকুন তিনি মাথায়, কিন্তু আমাকে তাতে বঞ্চিত ক'রে যদি জাতের কর্ত্তা হ'তে পার, ত দেখ চেষ্টা, মন্দ কি? রামচরণের বাড়ী নিমন্ত্রণের কথা কি বল্‌চো! আমি তাঁর অন্নে মানুষ, তোমার মত কৃতঘ্ন হইনি যে, তাঁর উপকার ভুলে যাব। ভোজনদক্ষিণার লোভে যারা যায়, তারা যাবে। আর দক্ষিণা লওয়াটা এমন দোষেরই বা কি? শূদ্রবাড়ী ফলার ক'রে চিরকাল আমার বাপ্ দাদারা ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে এসেছেন! তুমিই না হয় দক্ষিণার নাম বদ্‌লে আজ 'ফি' বোল্‌চো। বেটা সভা মুচী যেদিন মাণিকচাঁদের গরুকে বিষ খাইয়ে ফৌজদারীতে পড়ে, সে দিন তুমি তার কাছে পাঁচ টাকা 'ফি' নিয়ে তাকে খালাস করে আননি? মুচী বেটা জলজ্যান্ত তিন সের দুধের গরুটাকে বিষ খাইয়ে মারলে, আর তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে প্রমাণ ক'রে এলে—সে গো-হত্যা করেনি! এরকম 'ফি'র চেয়ে আমাদের ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা লক্ষগুণে মানের জিনিস।"

নীলকমল সক্রোধে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ-দলপতিগণের নিষেধবাক্য-প্রচারে অনেকেই হতাশ হইলেন। দলপতিরা ভরসা দিলেন, তাঁহাদের একতার ফলে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদের আদেশ শুনিতে বাধ্য হইবেন, শ্রাদ্ধের পরদিন ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে।

কিন্তু রামচরণবাবুর ভ্রাতা হরিচরণ দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "শ্রাদ্ধের দিন চিরকাল ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়াছে, এবারও তাহাই হইবে। যে রীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে, আজ ব্যক্তিবিশেষের 'খেয়ালে' তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া কাহাকেও খাওয়ান যায় না। যাঁহারা না খাইবেন, তাঁহাদের পায়ে মাথা কুটিয়া লাভ কি? কিন্তু এই ব্যাপারে কে বন্ধু, কে শত্রু, চিনিতে পারিলাম। কপট বন্ধুদের চিনিয়া লাভ আছে।"

দলপতিরা আসিয়া হরিচরণকে বলিলেন, "কত চেষ্টা চরিত্র করিলাম, কোনও ফল হইল না। শ্রাদ্ধের পরদিন ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন কর।"

হরিচরণ বলিলেন, "আমি ত বন্ধু বান্ধবকে প্রীতিভোজন দিতে বসি নাই। শ্রাদ্ধের যেরূপ দস্তর, সেই ভাবেই কাজ হইবে। আমি বলিলাম, 'আপনি কাল আমার বাড়ী খাইবেন' আপনি বলিলেন, 'দশদিন পরে খাইব,' আমার সুবিধা অসুবিধা দেখিবেন না। এ সেই গল্পের ইংরাজ উপর ওয়ালার অপেক্ষাও যথেচ্ছাচার। কেরাণী বলিল, 'হুজুর কাল বাপের শ্রাদ্ধ, ছুটী চাই'। হুজুর অম্লানবদনে বলিলেন, 'শ্রাদ্ধ মুলতুবী রাখ, রবিবারে শ্রাদ্ধ করিও'। আপনাদের হুকুমও অনেকটা সেই রকম।"

এক জন দলপতি চটিয়া বলিলেন, "তবে কর শ্রাদ্ধ। এক জন ব্রাহ্মণও কাল তোমার বাড়ী খাইবে না। রামচরণ দাদা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, আর তোমরা সে দিনের ছেলে, আমাদের খাতির রাখিতে চাও না।"

হরিচরণ বলিলেন, "আপনারা নিজে খাতির হারাইলে, আমরা আর কি করি? আপনারা চাহেন সমাজের চূড়ায় বসিয়া থাকিতে, অথচ সমাজ-শাসনের শক্তি আপনাদের নাই। সমাজ যে পথে লইয়া যাইবে, পাছে চূড়া হইতে নামিয়া পড়িতে হয়, সেই ভয়ে আপনারা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। সমাজের দশ জন বুঝিয়াছে—আপনাদের মতের স্বাধীনতা নাই।"

দলপতি বলিলেন, "যাহাতে দশ জন খুসী হয়, তাহাই কর। শ্রাদ্ধের পরদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন কর। ইহাতে অপমান নাই।"

হরিচরণ বলিলেন, "অপমান নাই বটে, কিন্তু অসুবিধা বিস্তর। ক্ষীর টক্ হইয়া যাইবে, সন্দেশ দুর্গন্ধ হইবে, দই কেহ মুখে করিতে পারিবে না, ভোজ্যের মাছ পচিয়া যাইবে। আমার এ সমস্ত অসুবিধার কথা যখন আপনারা বিবেচনা করিলেন না; তখন আর কি করিব? দরিদ্র-নারায়ণ কাঙ্গালীদের সন্তুষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইব। যিনি গিয়াছেন, তিনি স্বর্গ হইতে দেখিবেন, তাঁহার কার্য্যে আমাদের ত্রুটী কতটুকু।"

এ কথার পর, আর তর্ক চলে না। তথাপি দলপতিরা বিশ্বাস করিলেন, ফলারটা 'ফাঁকি' যাইবে না। ব্রাহ্মণ-ভোজন না করাইয়া কি ক্রিয়া শেষ করিতে পারিবে?

'ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ' যাঁহাদের পেশা, তাঁহারা দলপতিদের বলিলেন, "আপনাদের চক্রান্তে পড়িয়া যদি ফলার 'মাঠে মারা' যায়—তাহা হইলে আপনাদিগকে ঘর হইতে ফলার দিতে হইবে!"

দলপতিরা বলিলেন "হাঁ হাঁ, আমাদেরই পিতৃশ্রাদ্ধ আর কি?"

এক জন স্পষ্টবাদী বলিলেন, "ফলার দিতে পারেন না, দলের কর্ত্তা হ'তে সখ! 'সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, প্রাণ যায় মচ্ছব দিতে!' মচ্ছব দিতে যার প্রাণ যায়, তার বোষ্টম হ'তে নেই।"

সকল দলেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "খাইতে যাইব", কেহ বলিল, "পরদিন যাইব, শ্রাদ্ধের দিন খাইব না।"—নানা মুনির নানা মত!

শ্রাদ্ধের দিন কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ 'ফলারে' রাজি. গুপ্তচরের মুখে হরিচরণ সে সংবাদ পাইলেন। তিনি শ্রাদ্ধের দিন প্রভাতে তাঁহাদিগকে যথারীতি অধিষ্ঠান ও জলপানের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ইহাও জানাইলেন, তাঁহার স্বর্গীয় অগ্রজের সম্ভ্রমের উপযুক্ত ভোজন-দক্ষিণারও ব্যবস্থা আছে।

শ্রাদ্ধের দিন শতাধিক ব্রাহ্মণ রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে ভোজন করিলেন। সন্ধ্যার পর কাঙ্গালীবিদায় আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় এক জন দলপতি সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হরিচরণ, তুমি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা কর, কাল প্রত্যুষেই গ্রামস্থ ব্রাহ্মণরে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাও।"

হরিচরণ বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-ভোজন ত হইয়া গিয়াছে।"

দলপতি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "হইয়া গিয়াছে!—

কি কথা বলিতেছ? আমি যে ব্রাহ্মণদের আশা দিয়া রাখিয়াছি, কাল এখানে তাহাদের পাতা পড়িবে।"

হরিচরণ বলিলেন, "আমার দুর্ভাগ্য! সকলের পাতা পড়িল না, কিন্তু আমাদের এই দায়ে যাঁহারা দয়া করিয়া আজ পাতা পাড়িয়াছেন, তাঁহাদের ত অপমান করিতে পারি না।—কাল তাঁহাদের বাদ দিতে পারিব না, আবার এতই লোককে দুই দিন খাওয়াই, ভোজন-দক্ষিণা দিই, এরূপ সাধ্যই বা আমার কোথায়?"

দলপতি বিব্রত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিলে!"

হরিচরণ বলিলেন, "সঙ্কটটা ত আপনাদেরই সৃষ্টি! আপনারা কয়েক জন মুরুব্বী চেষ্টা করিলে আজ সকলেই এখানে খাইতেন, কিন্তু আপনারা কি আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন?—আমি যাহাতে বিব্রত হই, আপনাদের চেষ্টার ফলে তাহাই কাজে দাঁড়াইতেছিল।—আর ব্রাহ্মণ-ফলার হইবে না।"

দলপতিরা ক্ষুণ্ণমনে পরামর্শ করিতে বসিলেন।

দলস্থ লোকেরা বলিল, "পরামর্শই করুন, আর যাহাই করুন, আমাদিগকে একদিন লুচির ফলার দিতেই হইতেছে, নতুবা আপনাদিগকে দলপতিত্ব হইতে খারিজ করিব।"

দলপতিরা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শেষে ভগবান অকূলে কূল দিলেন।

শ্যামাচরণ যে জমীদারের ম্যানেজার, সেই জমীদারের সদর-আমীনের কন্যার বিবাহ উপস্থিত।

আমিনী করিয়া রামকান্ত চৌধুরী কোনও রকমে সংসার প্রতিপালন করে। তাহার অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহটী দিয়া, কোনও রকমে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। আজ কাল ভাল ঘরে কন্যার বিবাহ দেওয়াই কষ্টকর, বহুব্যয়সাধ্য; তাহার উপর দুই চারি শত লোককে লুচির ফলার দিয়া পরিতুষ্ট করা, রামকান্ত কেন, অনেকেরই অসাধ্য।

কিন্তু ম্যানেজার শ্যামাচরণ অন্যান্য দলপতির পরামর্শে পরোয়ানা জারি করিলেন,—"যেহেতু গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদের বড়ই আগ্রহ হইয়াছে—তোমার বাড়ীতে তাঁহাদের পাতা পড়ে, অতএব তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে, তুমি তোমার কন্যার বিবাহে গ্রামস্থ সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

ইহাতে যে ব্যয় হইবে, তাহার কিয়দংশ জমীদারীর প্রজার নিকট ভিক্ষা আদায় করিয়া দেওয়া যাইবে।"

রামকান্ত অতিবিস্তীর্ণ ফলারের আয়োজন করিল। গ্রামস্থ সকল ব্রাহ্মণ ফলারে নিমন্ত্রণলাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন ও দলপতিদের মুন্সীয়ানার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "কেমন? ফলার পাইলে ত?"

যাহারা রামচরণবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয় নাই, তাহারা বলিল, "আমরা একদিন ফলার পাইলাম, আর উহারা দুই দিন খাইবে?—তাহা হইবে না। নিমন্ত্রণে উহাদের বাদ দাও।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তোমরা যদি না খাও তবে এ ফলারও হাতছাড়া হইবে, তখন আমি আর ফলারের জন্য দায়ী হইব না।"

দলের লোকেরা বলিল, "যাহারা শ্রাদ্ধে ফলার করিয়াছে—তাহারা আসিয়া দোষ স্বীকার করুক! তবে তাহাদের লইয়া খাইব।"

যাঁহারা শ্রাদ্ধে খাইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কোনও দোষ করি নাই, দোষ স্বীকার কেন করিব? নিমন্ত্রণ হইয়াছে—খাইতে যাইব। যাঁহারা না খান, তাঁহারা উঠিয়া যাইবেন।"

দলপতি শ্যামাচরণ বলিলেন, "রটাইয়া দাও, উহারা নাকে খত দিয়াছে। লোকে জানিলেই হইল।"

'নাকে খতে'র কথা মধ্যাহ্নমধ্যে সমস্ত পল্লীতে রাষ্ট হইল।

প্যারীলাল সতীশ চক্রবর্ত্তীকে বলিল, "শ্রাদ্ধের বাড়ী খেয়ে নাক খত দিয়ে আজ বিয়ের বাড়ী খেতে যাচ্ছ! পেটটা কিছুতেই ভরে না?"

সতীশ বলিল, "নাকে খত কেন দেব? যখন আমার মা মরেন, তখন কেহ দেখে নাই; আমিও আমার স্ত্রী তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়াছিলাম; আমার স্ত্রী মরিলে, আমি ও আমার ছোট ভাই, এই দুই জন মাত্র মিলিয়া তাঁহার সৎকার করি। বিপদের সময় যাহারা দেখে না, ফলারের সময় তাহারা জাতি মারিতে আসে? লজ্জা করে না?"

সুতরাং বলা বাহুল্য, সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রামকান্তের কন্যার বিবাহে ফলার করিতে চলিলেন। দলপতিগণের আর উৎসাহের সীমা নাই। বিবাহের মজলিসে গিয়া কেহ কেহ ঘন ঘন তামাক টানিতেছেন, কেহ সোৎসাহে

বলিতেছেন, "ধন্য রামকান্ত, মেটো আমীনী ক'রে আজ জমীদার রামচরণ বাবুর শ্রাদ্ধের উপর 'টেক্কা' দিলে!"

রামকান্তের শ্যালক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "এটা রামকান্তের মেয়ের বিবাহ, কি রামকান্তের নিজের শ্রাদ্ধ, তা ঠিক বুঝতে পারচি নে! 'মোর বুদ্ধি, তোর কড়ি, ফলার করি আয়!' ঠিক তাই হয়েছে,—আপনাদের বুদ্ধিতে ফলার জুগিয়ে বেচারা সর্ব্বস্বান্ত না হয়!"

ফলারের পাতা পড়িয়াছে। কড়ার উপর ঘি কল্-কল্ করিতেছে; শুভ্র লুচিগুলি স্ফীতবক্ষে তাহার উপর ভাসিতেছে। যেমন ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিবেন, অমনই তাহা 'খোলা' হইতে তুলিয়া তুলিয়া তাঁহাদের পরিবেশন করা হইবে। কিন্তু 'গরম লুচি' ভগবান তাঁহাদের ভাগ্যে লেখেন নাই। একজন বৈদিকশ্রেষ্ঠ প্রস্তাব করিলেন, "শ্রাদ্ধে যাহারা খাইয়াছে, তাহারা লুকাইয়া শ্যামাচরণবাবুর কাছে ঘাট স্বীকার করিলে চলিবে না; আজ এই দলের সম্মুখে তাহাদিগকে 'নাকে খত' দিতে হইবে।"

অন্য দল চটিয়া বলিল, 'নাকে খত'! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা মুখে আনো? নীলকমল! ধর ত উহার কাণ।"

বিবাহের বাড়ী দুই দলে হাতাহাতি হইবার উপক্রম! পুলিস-ইনস্পেক্টার শান্তিরামবাবু তিন জন কনেষ্টবলকে থানা হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু কনেষ্টবল আসিবার পূর্ব্বেই বিবাদ থামিয়া গেল। লুচি জল হইয়া যাইতেছে শুনিয়া উভয় পক্ষ শান্তভাবাপন্ন হইলেন, এবং বিভিন্ন দল স্বতন্ত্র কক্ষে ভোজন করিতে বসিলেন। তখন রাত্রি প্রভাত-প্রায়।

আহারান্তে আচমনপূর্ব্বক উদরে করতল ঘর্ষণ করিতে করিতে ভোক্তৃবৃন্দ সমস্বরে বলিলেন, "জয়, লুচির জয়!"—সেদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত দলপতিদের সুনিদ্রা হইয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র।

কিছুকাল হইল, আমরা বিগত যুগের শিক্ষিত বঙ্গসমাজের অন্যতম নেতা, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক, 'ইণ্ডিয়ান্ ফীল্ডের' সম্পাদক স্বর্গীয় কিশোরী-

চাঁদ মিত্রের জীবনচরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছি। সম্প্রতি এই মহাত্মার কয়েক বৎসরের 'ডায়েরী' আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই রোজনামচা হইতে তৎকালীন সমাজের একটী অবিকল ছায়াচিত্র পাওয়া যায়, এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ দেশনায়কগণের জীবনের অনেক কথা অবগত হইতে পারা যায়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে পরমশ্রদ্ধাস্পদ 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয় আমাকে এই রোজনামচা অবলম্বন করিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিশোরীচাঁদের অন্যতম অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিশোরী চাঁদের রোজনামচায় হরিশচন্দ্রের কথা বহু স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। হরিশ্চন্দ্রের শেষ পীড়ার কথা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে দিবসের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহার অসাধারণ চরিত্রগুণ সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন। এই মন্তব্যগুলি পরে বিশদাকারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন দিবসের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড্' পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে প্রকাশিত করেন। নিম্নে সেই প্রবন্ধটীর অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক সময়েই মাসিক-পত্রে প্রকাশ করা শোভন নহে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলির পর্য্যালোচনা করিলে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম, বোধ হয়, অসঙ্গত বোধ হইবে না :—

(১) অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক পূর্ব্বের দেশীয় সংবাদপত্রাদি এতদ্দেশের শ্রেষ্ঠতম পুস্তকালয়েও দুষ্প্রাপ্য। আমাদিগের দেশে রোজনামচা রক্ষা করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না।

(২) যে অসাধারণ বাঙ্গালী ছয় বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন ভাবের ও নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার উল্লেখযোগ্য জীবনচরিতের অভাব এখনও বাঙ্গালীর কলঙ্ক-স্বরূপ। যদি ভবিষ্যতে কেহ এই কলঙ্কমোচনে অগ্রসর হয়েন, এবং তিনি যদি এই প্রবন্ধ হইতে কোনও প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে, এই প্রবন্ধের অনুবাদ-প্রকাশ বিফল হইবে না।

---

* যদি 'সাহিত্যের' কোনও পাঠক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবগত থাকেন, তাহা হইলে ৯০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে অনুবাদককে জানাইলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন।

(৩) এই প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চরিতের নূতন উপকরণাদি না থাকিলেও, তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম দেশ-নায়ক ও সহচরের মানসপটে তাঁহার জীবন ও চরিত্র কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক পাঠকের পক্ষে কৌতূহলপ্রদ হওয়া সম্ভব।—অনুবাদক।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু,—যে শোকাবহ ঘটনা বিগত শুক্রবার ১৪ই জুন দিবসে সংঘটিত হইয়াছে,—তাঁহার দেশবাসিগণ কর্তৃক যথার্থই একটি জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনে তাঁহার নাম দেশপ্রাণতার সহিত বিজড়িত, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিরই মনে জন-সাধারণের, এবং তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নেতা জমীদারগণের, উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট।

হরিশ্চন্দ্রের নামে, আমাদিগের মনে কোনও ভারতীয় ঋষির কথা উদিত হয় না। যিনি রামমোহন রায়ের ন্যায় দেশে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রযত্ন করিয়াছিলেন; মনে হয়, সেই সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের পরম শত্রুর বিষয়, নীলকরগণের নির্ম্মম অত্যাচার, অনধিকারচর্চ্চার অসংযত উপদ্রব, এবং রাজকর্ম্মচারিগণের অন্যায় ও অবৈধ কার্য্যপ্রণালী যাঁহার তীব্রসমালোচনার লক্ষ্য ছিল; ক্ষমতার অপব্যবহার ও শক্তির অপচারে বিধিসঙ্গত বাধা প্রদানের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার বিয়োগে কাতর, এবং তাঁহার যশোগানে মুখরিত, সেই সময়ে বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে, যথাযথভাবে তাঁহার চরিত্রবিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন-কথার বর্ণন সময়োপযোগী হইবে না। সুতরাং কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, অতি অল্প কথায় তাঁহার কঠোর অথচ কোমল চরিত্রের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমান লেখক এই রচনার বিষয়ীভূত মহাত্মার সহিত সাধারণ এবং ব্যক্তিগতভাবে, সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে মিলিত ছিলেন। তাঁহার বহু পরিচিত বন্ধুবর্গ অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতরভাবে ও সম্যভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার

মনের সর্ব্বাপেক্ষা অনমনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যে অবস্থা তাঁহার স্বাভাবিক হইলেও বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নহে। যদ্দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের সুন্দর অন্তর্দৃষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লেখক তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সেই সকল অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন। লেখক এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন না, কেবল মাত্র এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ প্রদর্শন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কোনও প্রতিভাবান্ বা শিক্ষিত হিন্দুর জীবনের ঘটনা অসাধারণ বা বৈচিত্র্যময় হওয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনীতিক ও সামরিক উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকায়, তাঁহাকে সচরাচর কলিকাতায় কোনও অফিসে কেরাণী রূপে অথবা অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলে, কোনও পরগণার বা সবডিভিসনের তালুকদার বা সবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, কোনও ক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। দেশের সকল প্রকার উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহারা কেরাণীর ডেস্কে ও ক্ষুদ্র কাছারিতে উৎসর্গীকৃত শক্তিকে কোনও বিস্তৃত প্রদেশ শাসনের ক্ষমতায় বিকশিত করিতে পারেন না। যে প্রতিভা মহাত্মা আকবরের সৈন্যগণকে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদান করিয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল; অবিশ্রান্ত লেখনী চালাইয়া, খাজনা আদায় করিয়া, অথবা চোর ধরিয়া, সে প্রতিভার স্ফুরণ হওয়া অসম্ভব। সার্দ্ধ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র হয় ত টোডর মল্ল অথবা আবুল ফজল্ হইতে পারিতেন। কিন্তু যে শাসনপদ্ধতিতে সমস্ত শক্তি অপচিত হয় এবং সমস্ত প্রতিভা বিনষ্ট হয়, তাহারই ফলে, তিনি সামান্য কেরাণীর ন্যায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সহকারী মিলিটারী-অডিটর-রূপে জীবনের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতামাতা হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। হরিশ্চন্দ্রের সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহারা তাঁহাকে বহুবিষয়ে পারদর্শী ও ধর্ম্মশীলতার জন্য বিখ্যাত স্বর্গীয় রেভারেণ্ড মিঃ পিকার্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইউনিয়ন স্কুল নামক

মিশনরী (অথবা স্বাধীনভাবে পরিচালিত) বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এইখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি আট বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক মিঃ পিফার্ডের সস্নেহ ব্যবহারে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিষ্টার পিফার্ডের সেই সতত স্নেহশীল ও সদয় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর কৃতজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলীন হয় নাই। একদিন আমাদিগের বাটীতে কলিকাতা বারের মিষ্টার সি, পিফার্ডের সহিত হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কোনও প্রশ্নের উত্তরে মিঃ পিফার্ড বলেন, তিনি রেভারেণ্ড্ মিষ্টার পিফার্ডের পুত্র। ইহা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুবারি উথলিয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এমন লোকও আছেন, যাঁহারা দেশবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নামক কোনও বৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

বাল্যে হরিশ্চন্দ্রের যে প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল,যৌবনে তাহা আশাতীতরূপে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি পাঠে দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং শীঘ্রই মফঃস্বলস্থ প্রাথমিক শিক্ষালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যসমূহে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর হিন্দু কলেজের উচ্চবৃত্তির জন্য (Senior Scholarship) পরীক্ষা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বিনাবেতনে শিক্ষালাভ ব্যতীত অন্য কোনও রূপে কলেজের উচ্চশিক্ষালাভের অন্তরায় হওয়াতে, তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে তিনি তৎকালীন নীলামদার টলা এণ্ড কোম্পানীর আফিসে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের আফিসে একটী কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায়, উহার জন্য তিনি আবেদন করেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা মাত্র, কিন্তু প্রার্থী অনেক ছিলেন। তাঁহাদিগের পরীক্ষাগ্রহণ করা হইল; কারণ, তখন এই পরীক্ষাগ্রহণের বাতুলতা (Mania) আরম্ভ হইয়াছে। মিষ্টার জর্জ্জ কেলনার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল একটী প্রবন্ধরচনা এবং পাটীগণিত ।.. সমস্ত

কাগজ দেখিয়া মিষ্টার কেল্‌নার হরিশ্চন্দ্রের উত্তরপত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তিনি কেরাণীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই কেরাণীজীবনের প্রভাব, যাহা সচরাচর প্রতিভা নির্ব্বাপিত-প্রায় করে, হরিশ্চন্দ্রের মানসিক গঠনের উপর তাদৃশ অনুৎসাহজনক অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। উহা তাঁহার সুন্দর বলিষ্ঠ প্রতিভা নির্ব্বাপিত করে নাই, করিতে পারে নাই। কিন্তু কিছু খর্ব্ব করিয়াছিল। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মনিপুণতা স্বীকার করিলেন, এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রকে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত উচ্চজ্ঞান অর্জ্জন্ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বহুবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। এইরূপ এক জন কর্ম্মচারী আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই নিজের সংগ্রহ হইতে ও কলিকাতা পব্‌লিক্‌ লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনাইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতেন। অধিকাংশ হিন্দু যুবক, যাঁহারা বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত পুস্তকাদির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা তিনি কত বিপরীত-ভাবাপন্ন ও কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন! যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, শৈশবে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুতে শেষ হয়, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন; এবং এতদ্দেশবাসীর পরমমিত্রগণের নিকট হইতে 'এতদ্দেশে প্রতিভাশালী বালক আছে, কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য নাই'— এই যে অভিযোগ প্রায়ই শ্রবণ করা যায়, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও হরিশ্চন্দ্রের এই অসাধারণ শিক্ষানুরাগ সেই অভিযোগের প্রকৃত প্রতিবাদ। তাঁহার পাণ্ডিত্য তত গভীর ছিল না, কিন্তু তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের চিন্তাশীল ভাব, অসাধারণ তর্কশক্তি, অপূর্ব্ব মেধা, যাহা পড়িতেন,— তাহা নিজস্ব করিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে অনুরাগের ফলে তিনি অল্পবয়সেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি লেখনী ধারণ করিলেন, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরিচালিত একটী সাময়িকপত্রে তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশিত হইল। "বেঙ্গল রেকর্ডারে" * তাহার প্রথম রচনাশক্তি বিকাশ

* "বেঙ্গলী" পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "হিন্দুপেট্রিয়ট" প্রতিষ্ঠার * পূর্ব্বে সাহিত্যজগতে তিনি যশঃ অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার সম্পাদকত্বে "হিন্দুপেট্রিয়ট" শীঘ্রই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। ইহা দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ হইল, এবং সাধারণ বিষয়ে লোক-মত অবগত হইবার জন্য উৎসুক গবর্মেণ্টের নিকট রাজভক্তি-জ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ হইল।

কিন্তু হিন্দুপেট্রিয়ট দেশবাসিকর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র নহে। সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র Reformer (সংস্কারক) প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, এবং তিনিই উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাহার পর রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Enpuirer (জিজ্ঞাসু) প্রকাশিত করেন। কিন্তু তাঁহার সংশয় দূর হইবামাত্র ঐ কাগজ বন্ধ হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানালোকবিস্তারকল্পে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য অধুনালুপ্ত পত্রিকার মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণই' শ্রেষ্ঠ। ইহা সাপ্তাহিক এবং দ্বিভাষী পত্রিকা ছিল, এবং স্বর্গীয় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। 'জ্ঞানান্বেষণের' পরে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক আর একটী দ্বিভাষী সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহা বাবু রাম-গোপাল ঘোষ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত, এবং ইহার জীবনকালে নিপুণতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত সমাজসংস্করণের জন্য যুঝিয়াছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার'ও দেশের অনেক উপকারসাধন করিয়াছিল। দ্বৈভাষিকতা 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গলস্পেক্টেটরের' স্বল্পায়ুর কারণ। হরিশ্চন্দ্র এই ভ্রান্ত পথ পরিহার করিয়াছিলেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছে, এবং অত্যাচারীর বিপক্ষে অত্যাচারিতের পক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহার সাধারণ ও রাজনীতিক বিষয়সমূহের আলোচনায় অসাধারণ দক্ষতা ও বিচারশক্তি প্রকটিত হইত। মার্কুইস্ অব্ ড্যালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী নীতি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রকে সম্পা-দকশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পর সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের নৃশংস অত্যাচারে ইংরাজগণের

কর্ত্তৃক 'বেঙ্গল রেকর্ডার' ও 'হিন্দুপেট্রিয়ট' উভয় সংবাদপত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। মৎপ্রকাশিত Life of Griah Chunder Ghose. নামক পুস্তকে এই পত্রিকাদ্বয়ের ইতিহাস আছে। ৯০ নং শাঁখারীপাড়া ষ্ট্রীট প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।—অনুবাদক।

ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে উত্তেজিত, এবং তাঁহাদিগের বিচারশক্তি খর্ব্ব করিল। তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিলম্বে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে 'পেট্রিয়ট' এই সকল উন্মত্ত ব্যক্তি-গণের ও ভীত জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অমূল্য উপকারসাধন করিয়াছিল। যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সঙ্কটকাল উপস্থিত, এবং বে-সরকারী ইউরোপীয়গণ লর্ড ক্যানিংয়ের পদচ্যুতির প্রার্থনা এবং দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছিলেন, তখন পেট্রিয়ট এই উন্মত্ত ও অজ্ঞান আন্দোলন-কারিগণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। দেশবাসিগণকে গবর্মেণ্টের পক্ষে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নীলকর আন্দোলনে এই স্বদেশহিতৈষী (Patriot) যে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতার অন্যতম কারণ। আমাদিগের সহযোগী দুর্ব্বল প্রজাগণের একজন ধর্ম্মনিপুণ, উপযুক্ত ও নির্ভীক পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অশেষবিধ দৃষ্টান্তসংবলিত আক্রমণের প্রতিবাদ নীলকরগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

হিন্দুপেট্রিয়টে নীলকরগণের অত্যাচারের মর্ম্মস্পর্শী ও অবিশ্রান্ত প্রতিবাদ করিয়া যে উচ্চস্বর উত্থিত হইত, তাহাতেই এই অসাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রের প্রধানতম বৃত্তিগুলির স্বরূপ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্বর আন্ত-রিক দেশপ্রেমিকের কণ্ঠস্বর! আমরা গভীর চিন্তার পর হরিশ্চন্দ্রকে অসা-ধারণ বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল না। হয় ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিম্নতম শ্রেণীর চতুর ছাত্রগণের ন্যায় সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বা মিল্টন আবৃত্তি করিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি প্রভূত, অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিরূপ হীন অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে প্রতিভা ছিল, তাহা অকৃ-ত্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্য ইহাকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। কখন শক্তিপ্রয়োগের উপযুক্ত কাল, তাহা তিনি জানিতেন, এবং দেশে রাজনীতিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ছিল, যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর ছিল, সমস্তই তিনি একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত নিয়োজিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই সংকল্পসিদ্ধির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেই সংকল্পসিদ্ধিই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সেই সংকল্পসিদ্ধির পক্ষে বাধাপ্রদান করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শত্রু ছিলেন। যদিও তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার বিষয়ে একবারে উদাসীন ছিলেন না, তথাপি (আমাদিগের বোধ হয়, তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। রাজনীতিক অবস্থার উন্নতির অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার দেশবাসিগণের রাজনীতিক নবজীবনসঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রকাশ্যভাবে এই ভাব প্রকাশ করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, একদা আমাদিগের ভবনে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফের সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারা আমাদিগের দেশে নবজীবন-সঞ্চাররূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে, ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক অধিকারলাভ দেশকে সঞ্জীবিত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় (যথা, - যে সকল রাজনীতিক ক্ষমতার অভাবে দেশ শক্তিহীন, সেই সকল অভাব মোচন কর, দেশবাসিগণকে রাজনীতিক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান কর; মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের সাধু সংকল্প পূর্ণ কর)। কিন্তু রাজনীতিক উন্নতির সহিত সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ না হইলে যথার্থ ভারতপ্রেমিকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না।

আমরা এই পত্রিকার স্তম্ভে 'হিন্দুপেট্রিয়টে'র স্বর্গীয় সম্পাদককে প্রায়ই ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষী বলিয়া অভিহিত করা কর্ত্তব্যবোধ করিয়াছি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা তাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতার অকৃত্রিমতা বা আগ্রহে সন্দিহান হই নাই।

আমাদের আরও বিশ্বাস যে, তিনি আশা-পূর্ণ স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন, এবং আমাদিগের ন্যায় এবং আমাদিগের অধিকাংশ বন্ধুবর্গের ন্যায় অন্ধকারময় বর্ত্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখিয়া ব্যথিত হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রত্যেক অবস্থার আশা-পূর্ণ অংশটী দেখিতেন,

এবং যে সমাজে তিনি বাস করিতেন, গতায়াত করিতেন, এবং যে সমাজে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার ভীষণ ক্ষতপূর্ণ অঙ্গটা দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার দেশবাসিগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহার যে চরম মত ছিল, তাহার কারণ তাঁহার এই মনের ভাব। আমরা অবশ্য অতি দুঃখের সহিতই এই সকল কথা বলিতেছি, ক্রোধবশতঃ নহে; কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে, যথার্থ চিকিৎসকের ন্যায় ক্ষত আরোগ্যের পূর্ব্বে ক্ষতের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শলাকা প্রবেশিত করা যথার্থ সংস্কারকের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সংস্কারক-রূপে হরিশচন্দ্রের কোনও দোষ বা ত্রুটী লক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রগুণে, তাঁহার সারল্যে, তাঁহার আন্তরিকতায়, তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ হৃদয়ে তাহা যথেষ্টরূপে সংশোধিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ উচ্চমনা ছিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যথার্থ অতিথিসেবাপরায়ণ ছিলেন। যে সকল বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার আতিথেয়তার প্রতিদান দিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদেরই সেবা করিতেন, এমন নহে; পরন্তু যাঁহারা প্রতিদান দিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগেরই অধিকতর সেবা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি ঈশার উপদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবন পরামর্শ ও সাহায্যপ্রার্থিগণের সমাগমস্থল ছিল, এবং তিনি স্বকীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে অকাতরে পরামর্শ ও সাহায্য উভয়ই প্রদান করিতেন। ইহাই তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর দুঃখমোচন ও সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক। আত্মত্যাগে স্পৃহা না থাকিলে স্বদেশপ্রেমিকতা থাকিতে পারে না। যে অসাধারণ হিন্দু সম্প্রতি পরলোকে গমন করিলেন, তাঁহার জীবনই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, সেই বহুশিক্ষাপ্রদ জীবনের শিক্ষা আমাদিগের দেশবাসীর হৃদয়ে বিফল হইবে না। আমাদিগের আরও আশা এই যে, বহুসংখ্যক শিক্ষিত দেশবাসী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, এবং তাঁহারা দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহের অধিকারী হইয়া দেশে নবজীবনসঞ্চার করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

একচক্ষু।

১

সন্তোষ অভাবের মুখাপেক্ষী নহে। তাই দীনতার নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও নানা অভাবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও একচক্ষু মাণিক হৃষ্ট, তৃপ্ত ও স্বল্পে সন্তুষ্ট। কোনও 'হাই'-স্কুলে না পড়িলেও সে প্রকৃতির স্কুলে কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল। তজ্জন্য সে চিরদিন সত্য, সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের পিপাসু। তাহার অবয়বে বা আয়ে লক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষ লক্ষিত না হইলেও, মস্তিষ্কে বিদ্যালয়ের বাগ্দেবীর কৃপা প্রকটিত না হইলেও, ভগবান্ তাহার মনটা ভাল করিয়াই গড়িয়াছিলেন; জগতের ভাল মন্দ দুই দিক দেখিবার জন্য দুই চক্ষু না দিলেও, তাহার ভাল দিকের চক্ষুটা কাণা করেন নাই।

বয়োবৃদ্ধি নিজের হাতে নয়। তবু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উপার্জ্জনক্ষম না হইলে গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। মাণিকের পক্ষে এ বিধানের ব্যতিক্রম হইবার কারণ ছিল না। অনেক লাঞ্ছনার পর সে চাকরীর চেষ্টায় বিরত হইয়া ব্যবসায়ে মন দিল। কিছুদিন রেড়ীর চাষে অদৃষ্টপরীক্ষার পর সে স্থির করিল, শূকরের ব্যবসায়ে ১০০৲ টাকা মূলধন লইয়া বসিলে পাঁচ বৎসরে ৭১১২।৶৭ পাই লাভ সুনিশ্চিত! কিন্তু কেবল জল্পনার ঊর্ণা বয়ন করিয়া কে কবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছে? অতএব মাণিকের এবারও হার হইল।

ভগবান্ কাহাকেও একেবারে কাঙ্গাল করেন না। মাণিকের সকল সম্পদ তাহার কণ্ঠে। ঐ যন্ত্রটির সাহায্যে সে প্রায়ই কোন না কোন 'পার্টি'তে বা 'পিক্‌নিকে' আমন্ত্রিত হইত। ক্রমে মদনগঞ্জের সঙ্গীত-রসিক জমীদার রায় বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরীর সহিত তাহার পরিচয় হইল। সেই হইতে তাহাকে দগ্ধোদর-পূরণের জন্য বিচলিত হইতে হইত না। এখন সে নিশ্চিন্তমনে 'দ্বিগুণ খায়, দেড়গুণ ঘুমায়।' চরকের মতে অতিনিদ্রায় মেদবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তদুপরি নিত্য চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি ভোজন ও অলসভাবে জীবনযাপন! অগৌণে মাণিকের উদর-দেশ তাহার তানপুরার আকার ধারণ করিল।

২

রায় বাহাদুর রমণীরঞ্জন দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন হইল মদনগঞ্জের সব-

ডিভিসন্তাল অফিসার হুল সাহেবের বিষনয়নে পড়িয়াছেন। কুলোকের চক্রান্তেই হউক, অথবা যথারীতি মন যোগাইবার ত্রুটীতেই হউক, শ্রীযুতকে অনেক ঘুরপাক খাইতে হইতেছিল। কেহ কেহ বলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল বাক্যের ফুলঝুরিতে কল্পনার অগ্নিময়ী লীলা দেখাইয়া 'বয়কট্' ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া আইনের সীমা কিছু অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেই হইতেই সকল অনর্থের সৃষ্টি। তজ্জন্য উক্ত 'স্বদেশী' পুত্রকে বর্জ্জন করিবার অঙ্গীকার করিয়াও রায় বাহাদুর নানারূপ লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। হুল সাহেব মদনগঞ্জে থাকিতে দেশে না থাকাই বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবগণের পরামর্শসিদ্ধ হওয়ায়, তিনি অবিলম্বে সস্ত্রীক ও সগভর্ণেস দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। জমীদারীর ভার নবনিযুক্ত ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের হাঁতে রহিল। ইহাও কম সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় নহে। পাছে জমীদারী লইয়া বিব্রত হইতে হয়, তজ্জন্য বিপদের কাণ্ডারী 'উপযুক্ত' ম্যানেজার বাহাল করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বিলাতী গভর্ণেস ? —সে তো বড়লোকের পোষাকী সখ। যেমন খেতাব চাই, 'মোটর' চাই, 'অনারেবল' হওয়া চাই, তেমনি একটি গন্ধবতী গভর্ণেসও চাই।

৩

মে মাস। দার্জ্জিলিঙ্গের প্রভাত-শোভা বড় সুন্দর, বড় রমণীয়। হিমাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে ও সানুদেশে শ্যামসৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত। পশ্চাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুঙ্গ শৃঙ্গে তুষারপুঞ্জ মরীচিমালীর কনককিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত। হীরকস্তূপে হেমচ্ছটা বিকীর্ণ। নবযৌবনপুষ্পিত প্রকৃতির হাস্যময় উচ্ছ্বাসে হিমানীজড়তা দূরীভূত হইয়াছে সেই সঙ্গে মানুষের মনও আনন্দময়, সঙ্গীতময় হইয়াছে। জগৎ নবোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

অনঙ্গ কাহার প্রতি কখন ফুলশর নিক্ষেপ করেন, কে জানে ? মাণিক একে 'নেটিভ', তায় একচক্ষু, কৃষ্ণকায়, নির্ধন। দুই-চক্ষুষ্মতী 'গভর্ণেসে'র কৃপাই বল, আর অনুগ্রহই বল, উহা লাভ করিবার কোনও গুণই তাহার ছিল না, সে আশাও ছিল না। তবু গ্রহের ফেরে মাণিকের চিত্ত নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে প্রভুর যুবতী গভর্ণেসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এক দৃষ্টে সন্দর্শন, অদর্শনে তদ্‌গতচিত্তে ধ্যান। এ ভালবাসা 'ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে'। যাহা হউক, ক্রমে মাণিকের নিদ্রা গেল, ক্ষুধা গেল ; অতএব মেদেরও হ্রাস হইল। গরীবের রোগ ভগবান্ সারান।

গভর্ণেস মিস্ মেরীকে গৌরাঙ্গী বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে তিনি পাণ্ডুবর্ণা বলিয়া প্রতিভাত হইবার জন্য প্রত্যহ 'টয়লেটে' যে প্রাণান্ত শ্রম করিতেন না, এ কথাও বলা যায় না। মিস্ মেরী খাঁটী 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্' কি না, সে মীমাংসার ভার পাঠক-পাঠিকাগণের উপরই রহিল। রায় বাহাদুরের বিলাসবাগানে অনেক কুসুম ছিল। তাহাদের প্রায় সকলগুলিই পলাশ, কচিৎ দুই একটি যুথী বা শেফালিকা। মিস্ মেরী কাঠমল্লিকা। অঙ্গসৌষ্ঠবে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অপূর্ব্ব 'মডেল'।

ভালবাসি, অথচ যাহাকে ভালবাসি, সে তাহা জানিতে পাইবে না, ইহা কাব্য-জগতে সম্ভবপর হইলেও, বাস্তব-জগতে অসম্ভব। মাণিক যে তাহার ১৫৲ টাকা মাসহারা হইতে মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল ফুলের তোড়া কিনিয়া আনিয়া চুপে চুপে মেম-সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত, মিস্ মেরী ইহা লক্ষ্য না করিয়াছিলেন, এমন নয়। ইহা ছাড়া মাণিকের একচক্ষু যে সঙ্গোপনে তাহারই মুখমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া প্রায়শঃই স্থির হইয়া থাকিত, ইহাও তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন, মাণিক হতবুদ্ধি, অথবা প্রকৃতই চন্দ্রাহত। মিস্ মেরী এক দিন খুসী হইয়া বেচারীকে একটা দু-আনী বক্‌সিস্ স্বরূপ মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। অভাগা তাহার উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া দুআনীটা টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

মাণিক প্রেমের রাস টানিয়া ধরিতে চেষ্টা না করিত, এমন নয়। তবে সভাস্থলে 'বিবাহে পণ লইব না' বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়া যেরূপ, 'ভালবাসিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাও সেইরূপ। দুইয়ের কোনটাই কার্য্যকরী হয় না। অতএব মাণিকের মনে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি সনাতন প্রথানুসারে মাথায় সামলা আঁটিয়া অনেকক্ষণ বৃথা তর্কবিতর্ক—সওয়াল জবাব করিল। এ প্রেমে কেবল নৈরাশ্য, অবমাননার বৃতি ও বিপদের ব্যূহ। তবু অভাগার একচক্ষু সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শুধু ঐ রমণীমূর্ত্তিটিই খুঁজিয়া বেড়াইত।

অপরাহ্ণকাল। স্বাস্থ্যকামিগণ যুগলে যুগলে বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। প্রকৃতির শোভা ও রমণীয় সৌন্দর্য্য পর্য্যটকের নয়নে বিচিত্র গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মাণিক ইহার কিছুই লক্ষ্য না করিয়া মিস্ মেরীর অনুসরণ করিতেছিল। কখনও একটি সচকিত দৃষ্টি বা অর্দ্ধস্ফুট দীর্ঘশ্বাস

তাহার অনির্ব্বাপিত প্রণয়-বহ্নি ব্যক্ত করিতেছিল। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, হৃদয়-দুর্গ-অধিকারের কামনা নাই ; মাণিক শুধু ভালবাসিয়াই সুখী।

কয়েক দিন হইল, সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী মধ্যে মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করেন। মিলনক্ষেত্র ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সন্নিহিত। মিশিবার রকম দেখিয়া ইঁহাদিগকে ভ্রাতা ভগ্নী বা নিকট আত্মীয় বলিয়া বোধ হয় না ; প্রেমিক প্রেমিকাও মনে হয় না। হয় ত ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার হিসাবে আদৌ দূষণীয় নয়। তবু মাণিকের ইহা ভাল লাগিত না।

আজ মিস্ মেরী একাকিনী বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা পীড়িতা। তাই গভর্ণেস তাহার সঙ্গে নাই। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উচ্ছ্বসিত বারিরাশি নিম্নদেশবর্ত্তী শিলাখণ্ডসমূহে গর্জ্জিয়া 'মুরছিয়া' পড়িতেছে, এবং মুষ্টি মুষ্টি মুক্তারেণু বর্ষণ করিতেছে। মিস্ মেরী একাকিনী। আজ শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর সহিত মিলনের সুযোগ না ঘটায় তিনি ক্ষুব্ধহৃদয়ে ফিরিতেছেন। এই ভাবে বিমর্ষহৃদয়ে তিনি যখন ধীরে ধীরে কাকঝোরার পোলের কাছে আসিয়াছেন, তখন একখানা 'রিক্শ' তাঁহার গা ঘেঁসিয়া সবেগে চলিয়া গেল। মেম সাহেব পড়িয়া গিয়াছেন দেখিয়া 'রিক্শ'ওয়ালা প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পালাইল। মিস্ মেরী জ্ঞানশূন্যা, তাঁহার পার্শ্বে মাণিক !

বেচারী প্রাণপণে রমণীর চৈতন্যসম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। আপনার বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া উহা কাকঝোরায় সিক্ত করিয়া মেরীর চোখে মুখে ও মাথায় জল ছিটাইতে লাগিল। মিস্ মেরী একবার চাহিলেন, আবার চক্ষু মুদিলেন। মাণিক প্রমাদ গণিল। অবশেষে মিস্ সংজ্ঞালাভ করিলেন ; কিন্তু সম্মুখে মাণিককে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তুমি এখানে কেন আছে ?"

মাণিক। আপনার সেবার জন্য আছি।

মিস্। যাও, চলিয়া যাও ; ধন্যবাদ।

মাণিক ভাবিল, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে হয় ত যথেষ্ট। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরও কিছু নিদর্শন মাণিকের ভাগ্যে অবশিষ্ট ছিল। মিস্ মেরী 'রিক্শ'র ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া গেলে মাণিক পোলের নীচে তাঁহার 'পার্স' ও একখানি চিঠি কুড়াইয়া পায়। শেষটিতে কি আছে, জানিবার জন্য তাহার

কৌতূহল হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া চিঠি ও খাম উভয়ই ফিরাইয়া দিবে ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় ক্ষীণকণ্ঠে গভর্ণেস ডাকিলেন, "বাবু! বাবু!" তখনও মিসের দুর্ব্বলতা আছে, এবং মাথা ঘুরিতেছে ভাবিয়া, মাণিক তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমার হাতের উপর ভর দিয়া চলুন।" ঘৃণায় মিস্ মেরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "রিক্শ বোলাও।" তাহার করস্পর্শে মেম সাহেবের পাউডার-ধূসর চর্ম্ম মলিন হইতে পারে, ইহা জানা ছিল না বলিয়া, সে মনে মনে আপনাকে বারংবার ধিকার দিতে দিতে দূর হইতে একখানি 'রিক্শ' ডাকিয়া আনিল। মিস্ মেরী গৃহে ফিরিলেন।

৫

কৌতূহলাবিষ্ট মাণিক অবসরসময়ে মিসের চিঠি পড়িতে চেষ্টা করিল। একে তাহার ইংরেজী ভাল জানা ছিল না, তাহার উপর সাহেবী ধাঁচের লেখা। ভাল বুঝিতে না পারিয়া সে উহা রায় বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ত্রিলোচন বাবুর কাছে লইয়া গেল। ত্রিলোচন বাবু পত্র পড়িয়া অবাক্! তার পর মাণিকের কাণে কাণে কি বলিয়া তিনি রায় বাহাদুরের নিকট গেলেন।

এ দিকে মাণিক মেমসাহেবকে 'পার্স' ফিরাইয়া দিতেই তাঁহার মুখ একেবারে কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি?" মাণিক কহিল, "চিঠি তো আমার কাছে নাই।"

মিস্। ড্যাম ইউ!

কৃতজ্ঞতার অন্যতম উপঢৌকন লাভ করিয়া বিস্মিত হইয়া মাণিক বলিল, "মেমসাহেব, আমি আপনার চিঠি সন্ধান করিয়া দিব।"

মিস্। ডেভিল্!

মাণিক চলিয়া গেল। এতদিন তাহার নিকট যাহা শুধু স্বপ্নময়, সৌরভ-ময়, সঙ্গীতময়, শারদজ্যোৎস্নামণ্ডিত সুষমা মনে হইতেছিল, আজ তাহা রবিকরস্পর্শে শিশিরবিন্দুবৎ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; অনাবৃত বাষ্পের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। হায় অদৃষ্ট!

যাহা হউক, তার পর রায় বাহাদুর তাঁহার ফ্লানেলজড়িত পা দুখানি কষ্টে ঠেলিয়া লইয়া, ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া মিস্ মেরীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "তে— তে—তেমন চোট লাগিনি তো?

আজ আবার রিউম্যাটিজম বাড়িয়াছে। তবু আপনার অবস্থা জানিতে আসিলাম।"

মিস্ ভাবিলেন, তবে এ দীর্ঘকর্ণ কিছু জানিতে পারে নাই! প্রভুকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য মিস্ কহিলেন, "নো,—থ্যাঙ্কস্। বিশেষ কোনও আঘাত লাগেনি। আপনি বোধ হয় আমাকে এখন একটু একলা বিশ্রাম করিতে দিবেন।"

আজ আর রায় বাহাদুর আহত সারমেয়ের ন্যায় সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি রুষ্টস্বরে কহিলেন, "বিশ্রাম?—চিরবিশ্রাম তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। যাক্,—মিস্ মেরী, তুমি এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হও! তোমার নিজের জিনিসপত্র কিছুই নাই। একটা ট্রঙ্ক সঙ্গে এনেছিলে; তা পোর্টার ষ্টেশনে দিয়া আসিবে। উঃ! কি ভয়ানক! তুমি এমন ঘৃণিত 'স্পাই'!"

ক্রোধে রায় বাহাদুরের কথাগুলি আরও জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মিস্ মেরী কোনও উত্তর না দিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অপমানে তাঁহার কাণ দুটি যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শ্রীমতীর ঈষৎকৃষ্ণ ত্বকের ভিতর হইতেও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

রমণীরঞ্জন আপনার কক্ষে ফিরিয়া গিয়া বহুদিনের উপেক্ষিত ভগবান্‌কে স্মরণ করিলেন। ইহার পর মাণিক আসিল। তাহাকে দেখিয়াই রায় বাহাদুর বলিলেন, "আপনি আমায় বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আজ হইতে আপনাকে মাসিক ৩৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া আপনি ২০০৲ দুই শত টাকা পারিতোষিক পাইবেন। (প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রতি) দেখিলেন, আপনি ত্রিলোচন ও আমি দ্বিলোচন হইয়াও যাহা দেখিতে না পাইয়াছি, একচক্ষু মাণিক বাবু তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন!"

ত্রি। মাণিক বাবু বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইনি আমাদের চক্ষুদান করিয়াছেন।

মাণিক সবিনয়ে জানাইল, "চক্ষুদানের কর্ত্তা ভগবান্। আমরা নিমিত্ত-মাত্র। আমি বেতনবৃদ্ধি বা পারিতোষিক, কিছুই লইব না। আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না।"

এমন সময় এক জন দরোয়ান খবর দিল, মেমসাহেব চলিয়া গিয়াছেন।

পরদিন হইতে মাণিককে কেহ রায় বাহাদুরের বাড়ীতে দেখিতে পাইল

না। দুই এক জন কহিল, তাহারা অভাগাকে মৃতের কবরের পার্শ্বচারী প্রেতের মত কাকখোরার পোলের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। ত্রিলোচন বাবু কহিলেন, "মাণিক বাবুর প্রকৃতিটা যেন কেমন একরকম! তাঁহার জীবনটাও হেঁয়ালির মত! তিনি ছায়ার মত আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।"

শ্রীসত্যরঞ্জন রায়।

সামাজিক সমস্যা।

বর্ত্তমান যুগে নানা দেশে নানা ভাবে সামাজিক সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এই সমস্যা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিতেছে। মানব ব্যষ্টিভাবে যেমন প্রতিবেশপ্রভাবে প্রভাবিত, তেমনও সমষ্টিভাবে তাহা অপেক্ষা অধিকমাত্রায় পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ, ভূমার উপরই প্রকৃতি দেবী অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এখানে বলা আবশ্যক, সঙ্ঘ ও সমাজ এক নহে। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে এক অলক্ষিত সম্বন্ধ আছে, জনসঙ্ঘের মধ্যে সে গূঢ় সম্বন্ধের অস্তিত্ব সকল সময়ে থাকে না। রেলগাড়ীতে বা ষ্টীমারে যাত্রাকালে বহু লোক এক স্থানে সমবেত হয়, সেই জনসমূহকে জনতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা মানবসমাজ নহে। সেই সমবেত বহুলোকের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না। বহুদূর একত্র যাইতে হইলে লোক পরস্পর পরস্পরের সহিত কিয়ৎপরিমাণে ঘনিষ্ঠতা করে সত্য, কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা বাহ্যভাবে সামাজিক সম্বন্ধের অনুরূপ হইলেও, বস্তুতঃ উহা সামাজিক সম্বন্ধ নহে। উহাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না; ব্যষ্টি ব্যষ্টিই থাকিয়া যায়; ব্যষ্টিকে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি দিতে হয় না। দেহস্থিত কোষ (cell) ও সমাজস্থিত ব্যক্তির (individual) একই অবস্থাপন্ন। দেহস্থিত একটি কোষ বা গ্রন্থিকে কাটিয়া লইলে উহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না, স্বাতন্ত্র্য হিসাবে কেহ উহার গুরুত্ব বা লঘুত্বের বিচার করে না। দেহে থাকিয়া দেহের অন্যান্য উপাদানের ও উপকরণের সহিত সমতানতা রক্ষা করিয়া ইহা কি প্রকারে আপনার কার্য্য করে, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ লোক তাহারই বিচার করিয়া থাকে। সমষ্টি হিসাবে উহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কি ভাবে ও কি

পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার জন্যই দেহস্থ কোষের ও গ্রন্থির ব্যষ্টিভাবে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা জন্মে। ঐক্যতান বাদনে একটি লোহার কাঠি কিরূপ বাজিতেছে, এবং একটি ক্লারিয়নেট কিরূপ বাজিতেছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করে না, কিন্তু সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সম্মিলিত হইয়া যে ধ্বনি উৎপন্ন করে, তাহা শুনিয়াই লোক ঐক্যতান বাদনের বিচার করিয়া থাকে। ঐ ঈপ্সিত বাদিত্র-ধ্বনি উৎপন্ন করিবার জন্যই বিবিধ বাদিত্রের প্রয়োজন কিন্তু কোনও বাদ্যকর যদি আপনার ইচ্ছামত সুর বাঁধিয়া আপনার ইচ্ছামত তালে ও পর্দ্দায় বাজনা বাজাইতে থাকে, তাহা হইলে, সে ধ্বনি সঙ্গীতের সৃষ্টি না করিয়া কর্ণপটহবিদারী এক বিকট আরাবের সৃষ্টি করে। ঐক্যতান বাদন করিতে হইলে প্রত্যেক যন্ত্রীকে তাহার যন্ত্রের সুর পর্দ্দা প্রভৃতি সেই অভীপ্সিত ধ্বনিরই অনুরূপ করিয়া লইতে হয়। জীবদেহস্থ এক একটি কোষ বা গ্রন্থি ও ঐক্যতান বাদনের এক একটি যন্ত্রের ধ্বনি যেরূপ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সমষ্টিরই পোষণ করিয়া থাকে, সমাজস্থ ব্যক্তিগণকেও সেইরূপ আপনাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া সমাজের অঙ্গেই অঙ্গ মিশাইয়া থাকিতে হয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে মানবের যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রকাশের অবকাশ নাই, এ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। যে সকল ক্ষেত্রে উহা আবশ্যক, সে সকল ক্ষেত্রের বিষয় বর্ত্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য নহে। সমাজের সহিত সামাজিকের যে প্রগাঢ় সম্বন্ধ, তাহারই কথা আমি স্থূলতঃ বলিতেছি।

কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইলেই সমাজ গঠিত হয় না। সমাজ ও দল এক নহে। মীন জলমধ্যে দলে দলে বিচরণ করে, কিন্তু তাই বলিয়া মীনকে সামাজিক জীব বলা যায় না। প্রাচীন ঋষিগণ মীনকে "সঙ্ঘচারী" বলিয়াছেন, মানবকে বলেন নাই। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিব না। এ বিষয়ে মনস্বীদিগের মধ্যেই বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে সম্বন্ধ অলক্ষ্য হইলেও অচ্ছেদ্য। শ্রমবিভাগ প্রভৃতি তাহার বাহ্য বিকাশ। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, পরস্পর সাহায্য ও সহায়তার উপরই সেই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। সমাজের ভিতর দিয়া সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। হটেণ্টট, বা সামায়েডস্ সমাজে অকস্মাৎ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বা লর্ড কেল্‌ভিনের উদ্ভব সম্ভব নহে,—কসাক সমাজে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়

না। যে সমাজ যেরূপ—সে সমাজে সেইরূপ ব্যক্তিই জন্মিয়া থাকে। দৈত্য-কুলে প্রহলাদ জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রহলাদ যে সমাজে জন্মিয়াছিলেন, তাহা দৈত্যসমাজ নহে। প্রহলাদ যে সমাজে জন্মিয়াছিলেন, সে সমাজে হরিভক্ত ছিল। সমাজে হরিভক্ত না থাকিলে হিরণ্যকশিপু হরিদ্বেষী হইতে পারিতেন না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপর দ্বেষ সম্ভবে না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, এক একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রভাবে সমাজে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, সমাজের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইঁহারা নূতন ভাবের ভাবুক, নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজের সংস্কারক বলিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া অনেকে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যে সমাজের অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া ব্যক্তিগত ভাবকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকিতে হইবে, এ কথা সত্য নহে। যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারাও যদি গড্ডলিকার ন্যায় আপনাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়া জনপ্রবাহের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া চলেন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়, সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেকে সামাজিক সম্বন্ধ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্বখ্যাপনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আমার মনে হয়, আপাতদৃষ্টিতে এই মতাবলম্বিগণের যুক্তি যেরূপ প্রবল বলিয়া অনুমিত হয়, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ যুক্তি সেরূপ প্রবল বলিয়া প্রতিভাত হয় না। মানবসমাজ মাত্রই বিবর্ত্তধর্ম্মী। স্থূলতা হইতে সূক্ষ্মতার দিকে, সরলতা হইতে জটিলতারদিকে লঘুত্ব হইতে গুরুত্বের দিকে ইহার গতি। কালের প্রভাবে প্রতিবেশ ও [illegible] তাড়নায়, সামাজিকদিগের প্রকৃতি বশে ইহার গতি নিয়ন্ত্রিত ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। মানবেরও যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতা, স্থূলতঃ এই ছয়টি দশা আছে, মানবসমাজের ও স্থূলতঃ এইরূপ ছয়টি দশা আছে। মানবই মানবসমাজের উপাদান, সেই জন্য মানবসমাজ—মানবধর্ম্মী। জৈব উপাদান (protoplasm) দিয়াই যেমন মানবদেহ গঠিত, ব্যষ্টি মানব লইয়াই সেইরূপ মানবসমাজ গঠিত। সমাজ শরীরী। সেই জন্য বিখ্যাত চিন্তাশীল দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে organism বলিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ সমাজকে বিরাট পুরুষ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ এই বিরাট পুরুষের মস্তক, ক্ষত্রিয় ইহার বাহু

ও হৃদয়, বৈশ্য ইহার উদর, আর শূদ্র ইহার চরণযুগল। শ্রমবিভাগ (Division of labour) ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ বিকাশ লাভ করে। জীবদেহে অনেকগুলি যন্ত্র থাকে। এক একটি যন্ত্র দ্বারা এক এক প্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয়। মস্তিষ্ক চিন্তার কার্য্য, শ্বাসযন্ত্র নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শোণিতশুদ্ধির কার্য্য, উদর পরিপাককার্য্য, চরণ গমনকার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া থাকে। একই জৈব উপাদান ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। সমাজেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। শ্রেণীভেদে মানবের কার্য্যভেদ হইয়া থাকে। সকল মানবসমাজেই চাতুর্ব্বর্ণ্য বিরাজমান। তবে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজে বর্ণবিভাগ যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় ও পুরুষ-পরম্পরা-স্থায়ী, অন্য কোনও সমাজেই সেরূপ নহে। উভয়বিধ বর্ণবিভাগের উৎকর্ষাপকর্ষ বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

যেমন দেহমাত্রেই যন্ত্র আছে,—তেমনই সমাজমাত্রেই সামাজিকের শ্রেণী আছে। অ্যামিবা প্রভৃতি এককোষ জীবের দেহ একটিমাত্র যন্ত্র-সম্বল,—তেমনই প্রথমোন্মেষিত সমাজেও একটিমাত্র শ্রেণী। উহা পরিবার নামে অভিহিত। অ্যামিবার দেহে যেমন একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে সর্ব্বনিম্নতম পর্য্যায়ের সমাজে তেমনই এক জন কর্ত্তা আছে। তাহাকে ধরিলে সে সমাজেও দুইটি শ্রেণী হয়। এক শ্রেণীতে কর্ত্তা স্বয়ং, অন্য শ্রেণীতে পরিবার বর্গ। কিন্তু মানবসমাজ এইরূপ কখনই কেবল পারিবারিক অবস্থায় স্থায়ী থাকে না। বহু পরিবার মিলিত হইয়া প্রকৃত সমাজের পত্তন করে। এইরূপ সমাজে ক্রমশঃ শ্রেণীবিভাগ অভিব্যক্ত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, আদিম সমাজে মানুষ ক্ষত্রিয়বৃত্ত থাকে। তাহারা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহ ও আততায়ীর সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করে। তাহার পর যখন তাহারা যাযাবর ভাব ত্যাগ করিয়া এক স্থানে বসতি করিতে থাকে,—যখন কৃষিকৌশল উদ্ভাবিত হয়, তখন সমাজে বৈশ্যবৃত্ত লোক আবির্ভূত হয়। এক শ্রেণী আততায়ীর হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করে,—সমাজের শান্তিরক্ষাকল্পে বিধিবিধান সৃষ্ট এবং অন্য সম্প্রদায় কৃষি কার্য্য দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে এই অবস্থায় মানবজাতির চরিত্রে স্বার্থ-পরতা প্রবল থাকে। স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই তাহারা কার্য্য করে। ক্রমে চাষীরা সন্নিহিত, সাধারণের কোনও সুগম স্থানে কৃষিলব্ধ পণ্য বিক্রয় করিতে

যায়। এই প্রকারে হাট, বাজার ও সহরের পত্তন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় লোক পণ্যের সহিত পণ্যেরই বিনিময় করে। ক্রমে ধাতুর বিনিময়ে পণ্য-প্রদান-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে সঞ্চয়ের সুবিধা হয় বলিয়া লোকের মনে সঞ্চয়ের জন্য আগ্রহাতিশয্য জন্মে। চাষীদিগের পক্ষে কার্য্যের ক্ষতি করিয়া হাটে আসিয়া পণ্য বিক্রয় করা সুবিধাজনক নহে। সুতরাং সেই সময়ে এক শ্রেণীর লোক চাষীদিগের নিকট হইতে পণ্য কিনিয়া হাটে তাহা বিক্রয় করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অধিক লাভ পায়। এই শ্রেণীই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সভ্যতা বিকাশের প্রথম অবস্থাতেই মানবের মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়। প্রথমতঃ মানুষ নিজের ধর্ম্ম কার্য্য নিজেই করে। পরে যখন তাহারা লাভজনক ব্যবসায়ে পূর্ণমাত্রায় আত্ম-নিয়োগ করে, তখন আর তাহারা নিজের ধর্ম্ম কার্য্য নিজে করিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং তখন তাহারা সম্প্রদায়বিশেষের উপর ধর্ম্মকার্য্য নিষ্পন্ন করিবার ভার দেয়। ইহাই পুরোহিত জাতির আবির্ভাবের নিদান কথা।

পাশ্চাত্য মতে বিবিধ শ্রেণী বিভাগের কথা এ স্থলে অত্যন্ত স্থূলভাবেই উক্ত হইল। এ দেশের প্রাচীন মতে, মানব প্রথম হইতেই সামাজিক জীব। সৃষ্টি-কর্ত্তা একেবারেই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়া মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। ঋগ্-বেদের পুরুষসূক্তে উক্ত আছে,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

—ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯ম সূক্ত, ১২ ঋক।

"বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় উরু এবং বৈশ্য। পদদ্বয় হইতে শূদ্র আবির্ভূত। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতায় ও অথর্ব্ব বেদে এই মন্ত্র আছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, বৈদিক সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। হিন্দুরা এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে তাহাদের সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি বলিয়া মনে করি-তেন। সেই জন্য যে দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, সে দেশ ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়াই বিজ্ঞাত ভগবান বিষ্ণু লিখিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥

—বিষ্ণুসংহিতা, ৮৪। ৪।

ম্লেচ্ছসমাজে হিন্দুসমাজের ন্যায় বর্ণাশ্রমব্যবস্থা না থাকিলেও শ্রেণী-বিভাগ যে ছিল এবং আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, শ্রেণীবিভাগকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ বিকাশলাভ করিয়া থাকে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তির্য্যক জীবের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সকল জীব সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করে, যাহারা মীনের ন্যায় কেবল সঙ্ঘচারী নহে,—তাহাদের মধ্যেও অল্পাধিক শ্রেণীবিভাগ বর্ত্তমান। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি তাহার উদাহরণ।

সমাজ থাকিলেই কোনও না কোনও ভাবে শ্রেণীবিভাগ থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। যে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতানতা অক্ষুণ্ণ না থাকে, সে সমাজের পরিণাম শুভাবহ নহে। যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ঠিক একই সূত্রে আবদ্ধ থাকে,—সে সমাজ অচল অটল,—তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের স্বার্থবাদ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়া সামাজিক বলকে অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতেছে। অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতা-প্রিয়তা লইয়াই শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদ বাধিয়া থাকে। য়ুরোপে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য তথায় ধনীর সহিত শ্রমজীবীর বিবাদ, আভিজাত্যের সহিত অন্ত্যজের বিবাদ, স্ত্রীজাতির সহিত পুংজাতির বিবাদ সামাজিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আশঙ্কা জন্মাইয়া দিতেছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ অতি সুন্দরভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সমাজে যতই বর্ণসঙ্কর জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সামাজিক বিকাশের সহিত যত বিভিন্ন জাতি আবির্ভূত হইতে লাগিল,—ততই তাহাদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহাতে কাহারও বৃত্তি বন্ধ না হয়,—যাহাতে একের বৃত্তিতে অন্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিধিব্যবস্থাও প্রণীত হইল। নাপিত, মালাকার প্রভৃতির বৃত্তি কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির বৃত্তি অপেক্ষা সহজে বন্ধ হইতে পারে। সেই জন্য ব্যবস্থা হইল অশৌচে শুভাশুভ শুভকর্ম্মে, দশবিধ সংস্কারে নাপিত, মালাকার প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন। অনেক কার্য্যে 'ডোমের সাজ'ও আবশ্যক। যাহাতে কোনও শ্রেণীর মধ্যে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা অনুভূত না হয়, যাহাতে সমাজের কোনও অঙ্গই বিক্ষুব্ধ না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেই জন্য

শত সহস্র বিপ্লবের ব্যাত্যাতাড়নে ইহা এতকাল অবিচলিত রহিয়াছে। সেই জন্য চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদ, শাক্যসিংহের সাম্যবাদ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমী জাতির সনাতন ভিত্তিকে টলাইতে পারে নাই। যাঁহারা সমাজের শীর্ষ-স্থানীয়, সেই ব্রাহ্মণ জাতির ত্যাগই ধর্ম্ম, দারিদ্র্যই সম্মান ও গৌরব-লাভের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ—ইহা বর্ণাশ্রমী হিন্দুরই কথা। আমার মনে হয়,—পাছে সমাজে জীবন-সংগ্রাম তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই ভয়েই আর্য্য-ঋষিগণ স্বল্পশ্রমে বহুপণ্য-উৎপাদক কল কারখানার (Labour-Saving machines) সৃষ্টি করেন নাই। যাহাতে সমাজে সকল স্তরে অর্থ সুচারুরূপে বণ্টিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ দেশে উটজ-শিল্পেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার ফলও যে সুন্দর হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যত দিন সমাজে এই ব্যবস্থা ছিল, ততদিন ভারতে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা অনুভূত হয় নাই,—সোসালিজমও আত্মপ্রকাশ করে নাই।

পক্ষান্তরে য়ুরোপের সামাজিক অবস্থার কথা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। দেখিবেন একদিকে দারুণ দারিদ্র্য—অন্যদিকে বিপুল বিলাস। একদিকে নরকের পৈশাচিক দৃশ্য,—অন্যদিকে অমরাবতীর শোভা! তথায় ধনীর স্বার্থ চক্রে দরিদ্রগণ যেরূপ নিপীড়িত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা শুনিলে শরীর সিহরিয়া উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ কাল পর্য্যন্ত খনির ও কলের মজুরদিগের সহিত স্বার্থসর্ব্বস্ব ধনী সম্প্রদায় যে ব্যবহার করিত, তাহা বর্ণনারও অতীত। ভারতবাসী তাহার কল্পনাও করিতে পারে না। এখন শ্রমজীবিগণ দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের স্বার্থ বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে,—কিন্তু তথাপি তাহাদের স্বার্থ যে ধনী দিগের পদতলে মথিত হইতেছে না একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য বটে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় ও বিলাস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং জমায় কম খরচ বেশী হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য বিক্ষোভ ও ধর্ম্মঘট, সেই জন্য সোসালিজমের উৎকট সাম্যবাদের আবির্ভাব। আবার সাফে গেট হাঙ্গামে যে অস্বাভাবিকতা সূচিত, তাহা যে স্বাভাবিক কারণ-সম্ভূত, তাহা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। এদেশের জনসাধারণের ধারণা অন্যরূপ। তাহারা মনে করেন, ঐ দেশের ললনাগণ কোমলভাব পরিহার করিয়া পুরুষপ্রকৃতি

হইয়া পড়িতেছেন,—সেই জন্য তাঁহারা পুরুষের সহিত সকল বিষয়ে তুল্যাধিকারের দাবী করিতেছেন। তথাকার নারীগণ যে অবস্থাবশে কতকটা পুরুষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহারা স্বেচ্ছায় আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমল ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। অবস্থার তাড়নে তাহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, য়ুরোপে বিশেষতঃ প্রতীচ্য য়ুরোপে রমণীর সংখ্যাই অধিক। তথায় সকল পুরুষ বিবাহ করিলেও অনেক রমণীকে অবিবাহিতা থাকিতে হয়। তাহার উপর অনেক পুরুষ জীবনসংগ্রামের তীব্রতাবশতঃ বিবাহ করেন না। সুতরাং তথায় লক্ষ লক্ষ রমণীকে আমরণ কুমারী থাকিতে হয়। য়ুরোপে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। অবিবাহিতা রমণীগণ বয়ঃস্থা হইলে তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। জীবিকার জন্য অধিকাংশ রমণীই উৎকট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করিলেও পুরুষের ন্যায় পারিশ্রমিক পান না। মেয়ে কুলী, মেয়ে শিক্ষক, মেয়ে কেরাণী প্রভৃতি তাঁহাদের তুল্য কর্ম্মী পুরুষ অপেক্ষা অনেক অল্প বেতন পাইয়া থাকেন। পুরুষ যেখানে এক টাকা পান মেয়ে সেখানে দশ আনার অধিক পান না। কিন্তু মেয়েদের আয় অল্প হইলেও ব্যয় অল্প নহে। ঘর ভাড়া, কয়লা, খাদ্য, পোষাক প্রভৃতি বাবদ মেয়ে পুরুষের খরচ সমান। মেয়েরা স্বতঃই মনে করেন যে, পুরুষরা বিধিপ্রণেতা বলিয়া এই পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। সেই জন্য রমণীরা সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার পাইবার জন্য ব্যস্ত ও সচেষ্ট। ফলে য়ুরোপে জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রকটিত হইয়া সমাজের একতানতা নষ্ট করিয়া দিতেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সংহত হইতেছে। য়ুরোপে এই সামাজিক বিক্ষোভের পরিণাম কোথায়, তাহার অনুমান করা কঠিন।

আমাদের সমাজে এখনও ঠিক এইরূপ সামাজিক বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু য়ুরোপীয় আলোকসম্পাতে ও য়ুরোপীয় অবস্থার সংযোগফলে আমাদের দেশেও জীবন-সংগ্রাম দিন দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে সমাজে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা উচ্ছিন্ন হইতেছে, পাণ্ডিত্যের ও মনীষার আদর হ্রাস পাইয়া ধনের আদর

বাড়িতেছে, সকল সম্প্রদায়ই আভিজাত্যের দাবী উপস্থিত করিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আরূঢ় হইতে চেষ্টা পাইতেছে। ফলে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একতানতা যুগযুগান্তর ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। প্রতীচ্য সাম্যবাদ যে একটু বিকৃত হইয়া ইহার উত্তেজক কারণ-রূপে কার্য্য করিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা ভিন্ন ইহার অন্য কারণ যে নাই, তাহা নহে। আমাদের সনাতন সামাজিক ব্যবস্থা বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা, তাঁহারা শিক্ষা-বল ও চরিত্রবল হারাইয়া সমাজের নিম্নতর স্তরের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতেছেন,—সম্প্রদায়বিশেষের বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সামাজিকগণ ব্যষ্টিভাবে তাহা রক্ষা করিবার জন্য কোনও চেষ্টাই করিতেছেন না। সেই জন্যই যত গোল ঘটিতেছে। এই গোলের শেষ ফল কি, তাহা কে বলিতে পারে?

অনেকে মনে করেন যে, যখন একটা সমস্যা উঠিয়াছে, তখন তাহার সমাধান হইবেই। সকল ক্ষেত্রে এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। যদি লোক স্বাধীনভাবে এইরূপ সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হইত, তাহা হইলে সে আশা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় সমাজের আদর্শ আমাদের কর্ম্মীদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। দূর হইতে পাশ্চাত্য সমাজের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া তাঁহারা সেই সমাজকেই তাঁহাদের আদর্শ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে হিন্দুসমাজ-গঠন কখনই সম্ভবপর হইবে না। কারণ, উভয় সমাজের উপাদান এক নহে,—ভিন্ন। পাশ্চাত্য জাতির মনোবৃত্তি, ভাব, সংস্কার, জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-পদ্ধতি,—হিন্দুর চরিত্র, মনোবৃত্তি, ভাব প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। বহু যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রতিবেশ-অবস্থার নিয়ন্ত্রণফলে এই স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ও পুষ্টি হইয়াছে; তাহা সহজে লুপ্ত হইবার নহে। বিশেষতঃ সকল প্রতিবেশ-অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন মানব-সামর্থ্যের আয়ত্ত নহে। সুতরাং উভয় সমাজের ঔপাদানিক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। যেখানে ব্যষ্টি স্বতন্ত্র, সেখানে সমষ্টির একতা-ভাব-সাধন অসম্ভব। বিভিন্ন উপাদান লইয়া তুল্যপদার্থ সৃষ্ট করা যায় না। ইহা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কর্তৃক স্বীকৃত। আমি আপাততঃ সেই জটিল তর্কে না নামিয়া একটি উদাহরণ দ্বারা এই কথাটি পরিস্ফুট করিতে চাহি। সকলেই দেখিয়াছেন যে, পগমিলের খুব সুন্দর, অখণ্ড, ইষ্টক দ্বারা চূণ সুরকী ব্যতিরেকেও উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত করা যায়। উহা সাজাইলে প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় না হউক,—অনেকটা

দৃঢ় হইতে পারে। কিন্তু আমাপোড়া ভগ্নকোণ অসম ইষ্টক সাজাইতে হইলে, তত উচ্চ করা চলে না—তাহা বেধ-বহুল ও স্বল্পোশ্চ করিয়া সাজাইতে হইলে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। উহা প্রাচীরের আকারেই সাজান যায় না। উহা সাজাইতে হইলে পিরামিডের আকারে সাজাইতে হয়। আবার দেখুন, শর্করা মিছরীর যেরূপ দানা বাঁধে, মধুর সেরূপ দানা বাঁধে না। ইক্ষু-চিনির যেরূপ দানা,—বিট-চিনির দানা সেরূপ নহে। সোহাগার দানায় আর লবণের দানায় পার্থক্য বর্ত্তমান। সুতরাং উপাদান-ভেদে উহার সমবায়-প্রণালী ভিন্ন হইতেই হইবে। ব্যষ্টি অনুযায়ী সমষ্টি হইবে। অসম্পূর্ণ ইষ্টক লইয়া পগমিলের সুপোড় সুন্দর ইষ্টকের ন্যায় সাজাইতে চেষ্টা করিলে উহা ভাঙ্গিয়া রাবিশে ও স্তূপে পরিণত হইবে। গোলায় প্রাচীর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইলে পণ্ডশ্রম হইবে। সেইরূপ, য়ুরোপীয় আদর্শে দেশীয় সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। দেশীয় সমাজের বিক্ষোভনিবারণ করিতে হইলে দেশীয় পদ্ধতির অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। নতুবা সামাজিক বিক্ষোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ফেরেস্তা-বর্ণিত হিন্দুজাতির ইতিহাস।

মহাভারত হিন্দুজাতির বিখ্যাত ইতিহাস। আকবর বাদশাহের আদেশে শেখ মোবারকের পুত্র শেখ আবুল ফজল মূল সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক আছে। ঋষি ও দার্শনিকেরা আপনাদের বিশ্বাসানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। এক মহাভারতেই ত্রয়োদশ প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুরা সময়কে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে বিভক্ত করেন। এই চারি যুগ অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কলি যুগের অবসানে আবার সত্য যুগ আসিবে। পৃথিবী চিরস্থায়িনী; ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ বলেন, পৃথিবীর নাশ হইবে, এবং বিচারের দিন আসিবে।

সত্য-যুগ ১৭,২৮০০০ বৎসর স্থায়ী হয়। তখন ধর্ম্ম ও সত্য প্রাধান্য লাভ করে, মনুষ্যের পরমায়ু লক্ষ বর্ষ হয়।

ত্রেতা যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। মনুষ্য জাতির বার আনা লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। মানুষ দশ হাজার বৎসর বাঁচে।

দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর। এই যুগের অর্দ্ধলোক দুর্বৃত্ত হয়, তখন মানুষের আয়ু হাজার বৎসর হয়।

কলি যুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের বার আনা লোক পাপী। চারি আনা লোক কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। মনুষ্যের আয়ু শত বৎসরমাত্র হয়। হিন্দুদের গণনানুসারে ১০১৫ হিজিরায় কলিযুগের ৪৬৮৪ বৎসর অতীত হইয়াছে।

ঈশ্বর প্রথমে চারি ভূতের সৃষ্টি করেন। ইহা ছাড়া ইথারও (ব্যোম) একটী পদার্থ। ইহার পর ঈশ্বর ব্রহ্মা নামক মনুষ্যের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যাবতীয় চেতন পদার্থের সৃষ্টির ক্ষমতা দেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, ইথার (ব্যোম) জড় পদার্থ নহে। বায়ু পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগুলি দেবতা হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্যাকারে আবির্ভূত হয়, এবং পৃথিবীতে শুভকার্য্য করিলে স্বর্গে গিয়া পুরস্কার লাভ করে। ব্রহ্মা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতিতে বিভক্ত মনুষ্যসংঙ্ঘের সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণের প্রতি দেবার্চ্চনার ও মনুষ্য জাতির শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি মনুষ্য জাতির শাসনের এবং বৈশ্য জাতির প্রতি ভূমিকর্ষণ ও যাবতীয় শিল্প কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়। শূদ্রগণ উপরি-উক্ত জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। মনুষ্যগণের জন্য ব্রহ্মা ইহার পর বেদের সৃষ্টি করেন। বেদ পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ, উহা লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ। প্রত্যেক শ্লোকের চারি চরণ; প্রত্যেক চরণ ছাব্বিশের অনধিক ও একুশের অনল্প অক্ষরে নিবদ্ধ। ব্রহ্মা সত্যযুগে এক শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সত্যযুগের প্রত্যেক বৎসর ৩৬০ দিনে হইত। সত্যযুগের দিন এই যুগের চারি হাজার দিনের সমান ছিল। রাত্রির পরিমাণও তদ্রূপ ছিল। ব্রাহ্মণেরা সকলেই স্বীকার করেন, একই ব্রহ্মা ১০০১ বার আবির্ভূত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

দ্বাপর যুগের শেষে হস্তিনাপুরে ভরত নামক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। ভরতের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পরে কুরু নামক রাজার নামানুসারে থানেশ্বরের ময়দান কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। কুরুবংশীয়েরা কুরু-নামে অভিহিত হয়। কুরুর ছয় পুরুষ পরে, বিচিত্রবীর্য্য-তেজ রাজা আবি

ভূ ত হন্। বিচিত্র-বীর্য্যের দুই পুত্র জন্মে,—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজা হইতে পারেন নাই; পাণ্ডু রাজা হইলেন। পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরাজও বলিত। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন কুন্তী নাম্নী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নকুল ও সহদেবের মাতার নাম মাদ্রী। ধৃতরাষ্ট্রের ১০১ পুত্র জন্মে। উহার মধ্যে ১০০টী গান্ধার-রাজকন্যার গর্ভজাত। এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দুর্য্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদিগকে কুরু ও পাণ্ডুর সন্তানদিগকে পাণ্ডু বলা হইত। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য গ্রহণ করিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন রাজপ্রতিনিধি হইলেন। দুর্য্যোধন, পাণ্ডু-(পাণ্ডব)-দিগকে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে তাহারা বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ইহা জানিতেন। তিনি পারিবারিক অসদ্ভাবের দূরীকরণমানসে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নগরের বহির্ভাগে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে বলিলেন। দুর্য্যোধন শিল্পীদিগের দ্বারা শণ, আলকাতরা প্রভৃতি দিয়া একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। অভিপ্রায় ছিল—রাত্রিকালে আগুন লাগাইয়া পাণ্ডুদিগকে পোড়াইবেন। পাণ্ডুগণ পূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই গৃহে অগ্নি দিয়া মাতার সহিত হস্তিনাপুর ত্যাগ করিলেন। এই অগ্নিদাহে ভীল নামক স্ত্রীলোক ও তাহার পাঁচ পুত্র নষ্ট হয়। ইহারা গৃহে অগ্নি দিবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল। পরদিন ইহাদের অস্থি দেখিয়া কুরুগণ মনে করিল, পাণ্ডুরা মাতার সহিত পুড়িয়া মরিয়াছে। পাণ্ডুগণ হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই সময়ে তাঁহারা কাম্পীল্যনগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কাম্পীল্যের রাজার কন্যা দ্রৌপদীকে পর্য্যায়ক্রমে বিবাহ করিলেন। এই নিয়ম হইল, তাঁহারা এক এক জন দুই দিন দ্রৌপদীর সঙ্গে বাস করিবেন। কোনও কোনও হিন্দু উক্ত ঘটনা অস্বীকার করে; তাহাদের কথা সত্য হইতেও পারে। পাণ্ডুরা জীবিত আছেন শুনিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি ইন্দ্রপ্রস্থ ও রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুদের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। পাণ্ডুদের উন্নতি দেখিয়া কুরুগণের হিংসা হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেবগণের

দুষ্টু মেয়ে।

চিত্রকর ল্যাণ্ডসায়ার।

Mohila Press, Cal.

শ্রীত্যর্থ একটী উৎসব করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই উৎসবে পৃথিবীর সমুদায় রাজাকে উপস্থিত হইয়া কর প্রদান করিতে হয়। রাজগণের জয়ের জন্য যুধিষ্ঠিরের চারি ভ্রাতা পৃথিবীর চারি দিকে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থান জয় করিলেন। রূম্, হাবাশ, আজাম, আরব ও তুর্কি-স্থানের রাজগণ কর দিতে উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুদের উন্নতি দেখিয়া হিংসায় দুর্য্যোধনের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাদের সমূলে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। সেকালে দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। পাণ্ডুগণ দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। পাণ্ডুরা দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

দুর্য্যোধন আরও একবার খেলিতে ইচ্ছা করিলেন। সে বারে এই পণ নির্দ্ধারিত হইল, পাণ্ডুরা যদি জয়লাভ করেন, তাহা হইলে সমুদায় রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন, হারিলে তাঁহাদিগকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বার বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে।—বার বৎসর পরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। যদি তখন তাঁহাদিগের স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আবার বার বৎসর বনবাস করিতে হইবে। সে বারেও পাণ্ডুদের পরাজয় হইল। পাণ্ডুগণ বার বৎসর বনে বাস করিয়া এক বৎসর ওয়ি নামক স্থানে অজ্ঞাত-বাস করিলেন। দুর্য্যোধন সমুদায় পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়াও পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইলেন না। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাসুদেব-পুত্র কৃষ্ণকে দূত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য দিতে অসম্মত হইলেন। কতিপয় রাজা পাণ্ডুদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পাণ্ডুরা কলিযুগের প্রথমে থানেশ্বরের নিকট কুরুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। দুর্য্যোধন পরাজিত ও নিহত হইলেন। কুরুদিগের এগার খুন্ (অক্ষৌহিণী) ও পাণ্ডুদের সাত খুন্ সৈন্য ছিল। প্রত্যেক খুনে ২১,৮৭০ গজ, ২১৮৭০ রথ, ৬৫,৬১০ অশ্বারোহী ও ১০৯৩৫০ পদাতিক ছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই যুদ্ধে কেবল বার জন মাত্র জীবিত ছিল। এই বার জনের মধ্যে কুরুপক্ষে চারি জন—১ম কৃপাচার্য্য, এই ব্রাহ্মণ সাহস ও শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন; ইনি অস্ত্রাচার্য্য ছিলেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি অশ্বত্থামা, ইনি দার্শ-নিক দ্রোণের পুত্র ছিলেন। দ্রোণ যুদ্ধে মারা যান তৃতীয় ব্যক্তি যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা। চতুর্থ ব্যক্তি সঞ্জয়—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদবাহকতা ও যুদ্ধকালে সারথ্য করিতেন। পাণ্ডুদের পক্ষে আট জন জীবিত ছিলেন, পাঁচ পাণ্ডুভ্রাতা,

সাতিক (সাত্যকি) যদু, যুযুচ (যুযুৎসু), ইনি দুর্য্যোধনের বৈমাত্রের ভ্রাতা ছিলেন। আমরা মহাভারত হইতে কৃষ্ণের বর্ণনা করিতেছি।

মথুরা নগর কৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিন্দুজাতির সকলে কৃষ্ণকে সমান সম্মান দেয় না; কেহ কেহ কৃষ্ণকে ধর্ম্মোপদেশক, কেহ বা তাঁহাকে দেবতা মনে করেন। থানেশ্বরের যুদ্ধের পূর্ব্বে মথুরার রাজা কংস দৈবজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিবে। কংস কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের বাটীতে এগার বৎসর লুকাইয়া থাকিলেন। সুবিধাক্রমে কৃষ্ণ কংসের বিনাশসাধন করিয়া, কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক নিজেই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ আপনার প্রতি দেবতার সম্মান অর্পণ করিতে প্রজাগণকে আদেশ করেন, এবং নিজের মতাবলম্বী বহু লোক প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ মথুরায় বত্রিশ বৎসর আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। নিকটবর্ত্তী রাজগণ কৃষ্ণের ক্ষমতায় ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। এই সকল রাজার মধ্যে বেহারের রাজা জরাসন্ধ বিপুল সৈন্য লইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পশ্চিম দিকে ম্লেচ্ছরাজ কালযবন কৃষ্ণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিলেন। কালযবন হিন্দু ছিলেন না। বোধ হয়, কালযবন আরবজাতীয় লোক ছিলেন। কৃষ্ণ রাজগণের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারিয়া দ্বারকায় যাইতে বাধ্য হইলেন। দ্বারকা বর্ত্তমান সহর আহমদাবাদ হইতে এক শত ক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সেখানে আটাত্তর বৎসর রাজগণের সেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ থাকেন। ইহার মধ্যে নগর হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় ১২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণ এখনও লুকাইয়া আছেন। এখন মূল প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর পঞ্চ পাণ্ডব, ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে পাণ্ডু-বংশের অন্ত হইল।

রাজা কুরু হইতে পাণ্ডুর মৃত্যু পর্য্যন্ত	৭৬ বৎসর।
দুর্য্যোধন কুরুর রাজ্যকাল	১৩ „
যুধিষ্ঠির, যিনি সচরাচর ধর্ম্মরাজ বলিয়া অভিহিত	৩৬ „
মোট	১২৫ বৎসর।

এই বংশে রাজত্ব করেন। পাণ্ডুদের রাজ্যত্যাগের কতিপয় বৎসর পরে অর্জ্জুন পাণ্ডুর পৌত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ব্যাস নামক ব্যক্তি সেই ভার গ্রহণ করিলেন। ব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন। মহাভারতের অর্থ—মহাযুদ্ধ। কিন্তু মহাভারত শব্দের অর্থ, ভরত রাজার বংশের ইতিহাস। ভরত হইতে পাণ্ডু ও কুরুগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্যাস চারি বেদের টীকা করেন। সেই চারি বেদের নাম—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের মধ্যে ২৪০০০ শ্লোকে পাণ্ডুদের যুদ্ধবর্ণনা আছে। তাতার ও চৈনিকদের ন্যায় হিন্দুরা নোয়ার সময়ে জলপ্লাবনের কাহিনী অস্বীকার করে।

কতিপয় হিন্দুর মত এই যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে আছে। কিন্তু রাজপুতেরা কলিযুগের প্রারম্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য জাতির সম্বন্ধেও ঐরূপ বর্ণিত হয়। বিক্রমাদিত্যের পর হইতে রাজপুতদের প্রাদুর্ভাব হয়। বিক্রমাদিত্য হইতে হিন্দুদের অব্দ গণিত হইয়া থাকে। দাসীগর্ভে রাজাদের যে সকল সন্তান জন্মিত, তাহাদিগকে রাজপুত বলিত। রাজা সূর্য্যের পুত্রগণের প্রথমে রাজপুত নাম হয়। জলপ্লাবনের পর নোয়া হইতে ভারতবাসীদের উৎপত্তি হয়। নোয়ার তিন পুত্র। সেম, হাম ও জাফেৎ প্রথমে স্বীয় সন্তানগণের জন্য ভূমিকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রথম রাজার নাম কৃষ্ণ। ইনি মথুরার বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ নন। বেহারের প্রজাগণের সম্মতি-অনুসারে কৃষ্ণ রাজা হন। এই রাজা অযোধ্যানগর নির্ম্মাণ করেন। বাহমুন কৃষ্ণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। কৃষ্ণের আকার এত বৃহৎ ছিল যে, কোনও অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতে পারিত না; তজ্জন্য তিনি একটী হস্তীকে পোষ মানাইতে আজ্ঞা দেন। মন্ত্রী লাঙ্গলের উদ্ভাবন করেন। বর্ণমালাও বাহমুনের উদ্ভাবিত। কৃষ্ণ চারি শত বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কৃষ্ণ পারস্য-রাজ তাহমর্সাপের সমসাময়িক। কৃষ্ণের সাঁইত্রিশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মাহারাজ সিংহাসনে আরোহন করেন। মহারাজ শিল্প ও সাহিত্যে উৎসাহ দান করেন। মহারাজের রাজত্বকালে দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও দেশবাসিগণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ ভারতের লোককে নানা জাতিতে বিভক্ত করেন। ব্রাহ্মণদের উপর শাস্ত্রানুশীলন ও রাজকার্য্যের ভার, কোনও জাতির উপর শিল্প, কোনও জাতির উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। প্রধান ব্যক্তির নামানুসারে রাঠোর, চোহান,

পাউঁয়ার ও বৈস্ প্রভৃতি জাতির নাম হইয়াছে। মহারাজ পারস্তপতির সহ সর্ব্বদা সদ্ভাব রক্ষা করিতেন। মহারাজের পৌত্র ডুঙ্গর সেন পারস্ত-পতি ফরিদুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফরিদুন নিজ পুত্র কুরশপকে এক দল সেনা সহ পঞ্জাবে প্রেরণ করেন। কুরুশপকে বলিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে মহারাজ আপনার পৌত্রকে পঞ্জাবের কোনও অংশ প্রদান করেন, তাহার জন্ম যত্ন করিবে। এই সেনাদলের সহ মহারাজের দশ বৎসর যুদ্ধ হয়, অবশেষে মহারাজ ডুঙ্গর সেনকে পঞ্জাবের কিয়দংশ প্রদাম করেন। ইঁহার রাজত্বের শেষভাগে, সিয়োলা ও কর্ণাটিকের জমীদারেরা ইঁহার সেনাপতি শিবরায়কে দক্ষিণাপথ হইতে তাড়াইয়া দেন। মহারাজ আপনার পুত্রের সহিত এক দল প্রবল সেনা বিদ্রোহীদের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। রাজপুত্র পরাজিত ও নিহত হইলেন। শিবরায় মহারাজের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহারাজ পুত্রনাশের অপেক্ষা পরাজয়ে অধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। আচীন, মালাক্কা, পেগু ও মালাবারের রাজগণ ইহার পূর্ব্বে বিদ্রোহী হইতে সাহসী হন নাই। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয়। মহারাজ মালববাসী মল্লচাঁদকে সেনাপতি করিয়া পঞ্জাব-রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। মল্লচাঁদ পারসীকদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিলেন, এবং কতিপয় হস্তী প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন যে, কুরুশপের বংশীয় রুস্তম পর্য্যন্ত পারসীক রাজগণ পঞ্জাবের সহিত কাবুল, তিব্বত, সিন্ধু ও নেমরুজ ভোগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর মালচাঁদ [ইহার নামানুসারে মালবের নাম হইয়াছে,] সসৈন্য দক্ষিণাপথে গিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মালচাঁদ এই সময়ে গোয়ালিয়রের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মালচাঁদ হিন্দুস্থানে সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তৈলঙ্গ-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই বিজ্ঞান সঙ্গে করিয়া আনেন। মালচাঁদ অনেক দিন গোয়ালিয়রে বাস করেন। এই সময় হইতে তুলুঙ্গী-সঙ্গীত উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হয়। মহারাজ সাত শত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কেশুরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কেশুরায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে দিগ্‌বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। নিজে সসৈন্ত কাশ্মী দিয়া গণ্ডোয়ানা ভেদ করিয়া সিউরাজ দ্বীপে

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। গমনপথে যে যে রাজ্য পড়িয়াছিল, তৎসমুদায়ের রাজগণ কর প্রদান করিল। ফিরিবার সময় সেই সকল রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কেশুরায় সাহায্যপ্রার্থনায় পারস্য-পতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মনুচেহর সুরীমনের পুত্র সামকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কেশুরায় স্বীয় সেনার সহ জলন্ধরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। দক্ষিণের রাজগণ পারসীক সেনার আগমনে ভীত হইয়া কেশুরায়ের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কেশুরায় পারসীক সেনাপতির সহ পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কেশুরায় অযোধ্যায় আসিয়া দুই শত কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুনির রায় রাজা হইলেন। মুনির রায় প্রজাগণের সুখবৃদ্ধির জন্য অনেক যত্ন করেন। মুনির রায় পারস্যরাজের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেন। মনুচেহরের মৃত্যুর পর তুরাণরাজ আফিয়াসার-তুর্ক যে সময়ে পারস্য আক্রমণ করেন, মুনিরায় সেই সময়ে পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা জালকে দূরীভূত করেন। জাল সামের পুত্র। জালের নামানুসারে জালন্ধরের নাম হইয়াছে। মুনির রায় উপঢৌকনসহ আফ্রিসায়ারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তদবধি কৈকোবাদের সময় পর্য্যন্ত পঞ্জাব ভারতীয় রাজগণের অধীন ছিল। কৈকোবাদ জালের পুত্র রুস্তমকে মুনির রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মুনির রায় পারসীক সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ঝাড়খণ্ড ও গোণ্ডয়ানার পাহাড় অঞ্চলে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন।

রুস্তম হিন্দুস্থান জয় করিয়া সুরযকে রাজা করিয়া ইরাণে গমন করিলেন। বঙ্গসাগর হইতে দাক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ সুরযের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। এইরূপ বর্ণিত আছে, এক ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তনায় সুরয প্রথমে দেব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি হিন্দুরা পৌত্তলিক হইয়াছে; তাহার পূর্ব্বে পারসীকদের ন্যায় তাহারা সূর্য্য ও নক্ষত্রের পূজা করিত। সুরয পারস্যরাজ কৈকোবাদের করদ ছিলেন।

সুরযের পঁয়ত্রিশ পুত্রের মধ্যে বাহ্‌রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহ্‌রাজের নামানুসারে ভেরাইচের নাম হইয়াছে। বাহরাজ সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বাহরাজের পিতা বারাণসীর মূল পত্তন করেন, তাঁহার সময় নগর নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, বাহরাজই

আপনার ভ্রাতৃগণের রাজপুত নামকরণ করেন। বাহরাজ-মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী রহিত করেন। শিবালিক-নিবাসী কেদার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। বাহ্‌রাজ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

কেদার রাজা অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বাহ্‌রাজ-শাসিত অবনতিপ্রাপ্ত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তিনি পারস্য-রাজ কৈকায়ুস ও কৈখসুরুর সমসাময়িক। কেদার তাঁহাদের করদ ছিলেন। কেদার কলিঞ্জর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কুচ-রাজা শঙ্কুল বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ ও বিহার অধিকারপূর্ব্বক কেদারকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। কেদার উনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

শঙ্কুল রাজা হইয়া লখ্‌নৌতি নগরের পত্তন করেন। লখ্‌নৌতি গুড় বা গৌড় নামে প্রসিদ্ধ। লখ্‌নৌতি দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। মোগল-রাজত্বকালে এই নগর নষ্ট হইলে, তাড়া (টাণ্ডা) বঙ্গের রাজধানী হইয়াছে।

শঙ্কুল রাজার চারি হাজার হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব ও চারি লক্ষ পদাতিক সেনা ছিল। তিনি আফ্রিসায়ারের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। আফ্রিসায়ার পিয়ারা নৈশার সৈনাপত্যে পঞ্চাশ হাজার তুর্ক অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। শঙ্কুল রাজা কুচ পর্ব্বতের নিকট তাঁহার অগ্রগমনে বাধা দিলেন। দুই দিন এক রাত্রি ঘোর যুদ্ধ হইল। তের হাজার তুর্ক ও পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নিহত হইল। তৃতীয় দিবসে তুর্কগণ পাহাড় অঞ্চলে গিয়া শিবির স্থাপন করিল। সেনাপতি আফ্রিসায়ারের নিকট যুদ্ধের অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে আফ্রিসায়ার খাত্তা ও খুটানের মধ্যবর্ত্তী কুমুকৃদিজ্‌ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ স্থান খানবালিখ্‌ হইতে এক মাসের পথ দূরবর্ত্তী ছিল। সেনাপতির পত্র পাইয়া তিনি লক্ষ অশ্বারোহী সেনা সহ তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সেনাপতি অসংখ্য সেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আফ্রিসায়ার অবিলম্বে হিন্দুসেনা আক্রমণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া সেনাপতির উদ্ধার সাধন করিলেন। আফ্রিসায়ার লখ্‌নৌতি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শঙ্কুল রাজাকে আক্রমণ করিলেন। শঙ্কুল ত্রিহুতের পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। সেখান হইতে

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আফ্রিসায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আফ্রিসায়ার তাঁহাকে গলায় অস্ত্র বাঁধিয়া স্ব-সমীপে উপস্থিত হইতে বলিলেন। শঙ্কুল বিজেতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আফ্রিসায়ার শঙ্কুলের পুত্রকে লখ্‌নৌ-তীর রাজা করিয়া শঙ্কুলকে সঙ্গে লইয়া তুরাণে গেলেন। শঙ্কুল তুরাণে অনেক দিন ছিলেন। পরে রুস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। শঙ্কুল চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন।

আফ্রিসায়ার তুরাণে প্রত্যাগমনকালে শঙ্কুলের পুত্র রোহৎকে ভারতের রাজা করিয়া যান। শঙ্কুলের রাজ্য গাহি হইতে মালব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোহৎ রাজ্যের আয় চারি ভাগ করিয়া এক ভাগ দান করিতেন, এক ভাগ তুরাণে পিতার নিকট পাঠাইতেন, এক ভাগ আফ্রিসায়ারের নিকট পাঠাইতেন, চতুর্থ ভাগ দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিতেন। এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা তাঁহার হস্ত হইতে গোয়ালিয়র দুর্গ কাড়িয়া লন। রোহৎ রোহৎস্‌-গড় নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গটী একটী সুন্দর মন্দির দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। রোহৎ গোয়ালিয়র দুর্গ পুনরধিকারে ব্যর্থযত্ন হন। কনোজে রোহতের রাজধানী ছিল। রোহৎ আশী বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।

রোহতের কোন পুত্র না থাকায়, মাড়বারের কস্থবহ জাতীয় মহারাজ নামক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ নেহারওয়ালা নগর আক্রমণ করেন, এবং তৎপ্রদেশের গোপ জাতীয় জমীদারদিগকে বশীভূত করেন। মহারাজ সমুদ্রতীরে একটী নগরের পত্তন করেন, এবং নানা আকারের অনেক জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ ২য় পারস্যরাজ গুর্শা-স্পের সমসাময়িক। তিনি পারস্যরাজকে কর দান করিতেন।

মহারাজের মৃত্যুর পর কেদার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে রুস্তম হত হওয়ায়, কেদার তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হস্ত হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লন। কেদার বেহার নগরে কিয়ৎকাল বাস করিয়া জামুর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখানে তিনি বুলবাস্‌-জাতীয় দুর্গা নামক ব্যক্তিকে স্থাপন করেন। দুর্গা ঠাকুর ও পঞ্জাবের পূর্ব্বতন জমীদার চৌবিয়াদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ীয়াদিগকে সঙ্গে লইয়া কেদার রাজকে আক্রমণ করেন। কেদার রাজ পঞ্জাব হইতে পলায়ন করেন। আমি অনুমান করি, এই সকল পার্ব্বত্য জাতিকে আমরা আফগান বলিয়া থাকি। কেদার রায় ৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

কেদার রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি জয়চাঁদ রাজা হন। জয়চাঁদের রাজত্বকালে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে বহুলোকের প্রাণ যায়। জয়চাঁদ প্রজাদের উদ্ধারের কোনও উপায় না করিয়া বায়ানা নগরে আনন্দে কালক্ষেপ করেন। জয়চাঁদ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। জয়চাঁদ বাহমন ও দারাবের সমসাময়িক। জয়চাঁদ শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে তৎপত্নী পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু শিশুর পিতৃব্য দেহলু অমাত্যগণের সাহায্যে নিজে রাজা হন। দেহলু সাহস ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দিল্লী নগরী নির্ম্মাণ করেন। চারি বৎসর রাজত্বের পর, কুমায়ুনের রাজা ফুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া রোটাস্ দুর্গে প্রেরিত হন। ফুর বঙ্গদেশ দিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তিনি পারস্যপতিকে কর দিতে স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য জাতীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সসৈন্য গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে ফুর প্রাণত্যাগ করেন। ফুর ৭৩ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে কুলকা-স্থাপনকর্ত্তা কুলচাঁদ, মিরচ-স্থাপনকর্ত্তা মেরুচাঁদ ও বিজয়নগর-স্থাপনকর্ত্তা বিজয়চাঁদ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

এরূপ বর্ণিত আছে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে বিদরনগরের স্থাপন-কর্ত্তা বিদর আপনার পুত্রকে বিবিধ উপঢৌকন সহ আলেকজাণ্ডারের নিকট প্রেরণ করেন। সংসারচন্দ্রের নিকট হইতে ফুরের পৌত্র জুনা রাজ্য গ্রহণ করেন। এই সংসারচন্দ্র ফুরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পারস্য-রাজ গুদর্জ্জের নিকট কর প্রেরণ করেন। জুনা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন এবং গঙ্গা ও যমুনার তীরে অনেক নগর স্থাপন করেন। জুনা আর্দ্দশীর বেবীগানের সমসাময়িক। আর্দ্দশীর ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। জুনা তাঁহাকে হস্তী ও স্বর্ণ দ্বারা তুষ্ট করিলে, তিনি পারস্যে প্রতিগমন করেন। জুনা নব্বই বৎসর রাজত্ব করেন।

জুনার ২২ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কল্যাণচাঁদ রাজা হন। তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিলেন। বিনা কারণে অনেক প্রজার প্রাণ বধ করেন। প্রজাগণ কনোজ ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে, কনোজ নির্ম্মনুষ্য হইয়া যায়। কল্যাণ-চাঁদের পর রামদের ব্যতীত অন্য কোন গণনীয় রাজা কনোজে রাজত্ব করেন নাই। এখন আমরা মালবদেশ ও বিক্রমাদিত্য রাজার বিষয় বর্ণনা করিব।

তৎসময়ে বিক্রমজিতের ন্যায় প্রসিদ্ধ রাজা কোন দেশে ছিল না। বিক্রমজিতের উপাখ্যান দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। বিক্রমজিৎ বাল্যকালে সন্ন্যাসীর ন্যায় কালযাপন করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিয়া গুজরাট মালব প্রভৃতি অধিকার করেন। হিন্দুরা বলেন যে, তিনি দেবাবিষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারিতেন। তিনি জাঁকজমক পরিত্যাগ করেন, সাধারণ লোকের ন্যায় কালযাপন করিতেন, মৃৎপাত্রে জল পান করিতেন এবং সামান্য মাদুরে শয়ন করিতেন। উজ্জিন এই সময়ে লোকপূর্ণ হয়, মহাকালী নামক দেবমূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমজিৎ ধার নগরের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমজিৎ হইতে যে অব্দ গণিত হয়, তাহার ১৬৬৩ তে ১০১৫ হিজিরা হয়। বিক্রমজিৎ আর্দ্দশীরের সমসাময়িক। কেহ কেহ বলেন, তিনি সাহপুরের সমসাময়িক। বিক্রমজিৎ দক্ষিণাপথের রাজা শালিবাহন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বিক্রমজিতের মৃত্যুর পর মালব অনেকদিন অরাজক ছিল। পরিশেষে ধার নগরের রাজা ভোজ-প্রমর প্রবল হইয়া উঠেন। ভোজ, কুর্গা, বিজয়-গড় ও হান্দিয়া প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরে দুইবার তিনি চল্লিশ দিন ব্যাপী উৎসব করিতেন। তাহাতে উত্তর-ভারতের সমুদায় স্থান হইতে গায়কগণ ও নর্ত্তক-গণ সমবেত হইত। তিনি তাহাদিগকে খাট, বস্ত্র ও অর্থ দান করিতেন। এই সময়ে বসুদেব নামক ব্যক্তি কনোজ অধিকার করেন। ইঁহার রাজত্ব-কালে পারস্যরাজ বেরামগোর ছদ্মবেশে কনোজ-রাজসভায় আগমন করেন। এই সময়ে একটী বন্যহস্তী কনোজে অত্যন্ত উৎপাত করিত, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই; এমন কি, রাজা বাসুদেবও কয়েকবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। বৈরামগোর যখন কনোজে উপনীত হন, তখন একদিন সেই হস্তী কনোজ নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া নাগরিকদের ভয় উৎপাদন করে। বৈরামগোর ধাবিত হইয়া একেবারেই হস্তীর প্রাণ-বধ করেন। সেই সময়ে বসুদেবের যে দূত পারস্যে কর লইয়া গিয়াছিল, সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। সে পারস্যপতিকে চিনিতে পারিয়া বসুদেবের নিকট হস্তিনিহন্তার পরিচয় প্রদান করিল। বসুদেব বৈরামগোরকে কন্যা প্রদান করিলেন এবং উপযুক্ত সঙ্গী দিয়া পারস্যে প্রেরণ করিলেন। সত্তর বৎসর রাজত্বের পর বসুদেবের মৃত্যু হয়। বসুদেবের সময় কাল্পীর দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বসুদেবের ৩২ পুত্রেরা রাজ্যের জন্য দুই বৎসর বিবাদ করে।

অবশেষে সেনাপতি রামদেব রাঠোর রাজা হন। রামদেব বিদ্রোহী রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া সসৈন্যে সাডোবারের দিকে যাত্রা করেন, এবং তথা হইতে কচবাহদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাঠোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মারবার হইতে কনোজে আসিয়া বঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহার রাজধানী অধিকার করিয়া প্রচুর ধন প্রাপ্ত হন। রামদেব তিন বৎসর পরে কনোজে প্রতিগমন করেন।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে রামদেব মালব অধিকার করিয়া তথায় অনেক নগর স্থাপন করেন। এই সকল নগরের মধ্যে নরবর একটী। রামদেব বিজয়নগরের রাজা শিবদেবের নিকট তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। শিবদেব রামদেবের প্রভাবে ভীত হইয়া দূতের সহ স্বীয় কন্যাকে প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর পরে রামদেব শিবালিকের রাজাকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে কুমায়ুনের রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কুমায়ুনের রাজবংশ অতি প্রাচীন। এই রাজবংশ প্রায় দুই হাজার বৎসর রাজত্ব করিতেছিল। রামদেবের সহ কুমায়ুনরাজের উদয়াস্তব্যাপী ভয়ানক যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুসেনা হতাহত হইল। কুমায়ুন-রাজ পরাজিত হইয়া সমুদয় হস্তী ও অর্থ ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। কুমায়ুন-রাজ রামদেবকে নিজের কন্যা দান করিলেন। রামদেব কুমায়ুন রাজকে তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর রামদেব নগরকোটে উপস্থিত হইয়া সেই নগর লুণ্ঠন করিলেন। শিবকোট পিণ্ডীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য দুর্গাদেবীর সম্মানার্থ তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। দুর্গাদেবীর মন্দির নগরকোটের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামদেব সেখানকার রাজাকে নিজের সমীপে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন। কুমায়ুন-রাজ দুর্গাদেবীর মন্দিরে রামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। রাজা মন্দিরে রামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামদেবের পুত্রকে নিজের কন্যাদান করিলেন। অতঃপর রামদেব জামুর রাজাকে পরাজিত করিলেন। রাজা করদানে স্বীকৃত হইয়া রামদেবের অন্য পুত্রকে কন্যাদান করিলেন। রামদেবে বেহারে নদী, তীরে উপনীত হইলেন। এই নদী কাশ্মীরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া পঞ্জাব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রামদেব বঙ্গদেশ দিয়া শিবালিক পর্ব্বতের শেষভাগে উপস্থিত হইলেন।

রামদেব পাঁচ মাসের মধ্যে পাঁচ শতের অধিক রাজাকে বশীভূত করিয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তিনি সমুদায় সেনাকে পুরস্কৃত করিলেন, এবং একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

রামদেব প্রায় চুয়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা রাজ্যলাভার্থ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। রামদেবের সেনাপতি শিশোদীয়-জাতীয় প্রতাপচাঁদ সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক রামদেবের পুত্রগণের বিনাশসাধন করিলেন। রামদেব পারস্য-রাজকে কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। নৌসেরাওর দূত রিক্তহস্তে পারস্যে গমন করিল। পারস্য সেনা মুলতান ও পাঞ্জাব আক্রমণ করিল। প্রতাপচাঁদ পারস্যপতিকে করদানে স্বীকৃত হইলেন। প্রতাপ চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ সাম্রাজ্যের এক এক প্রদেশ অধিকার করিল। প্রতাপচাঁদের বংশধরগণ কনোজ হইতে পালাইয়া কম্বলমিয়রের পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই প্রদেশ চিতোর ও মাঙ্গলুরের নিকটবর্ত্তী। প্রতাপের বংশীয়গণ এখন তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের উপাধি রাণা।

প্রতাপের অন্যান্য সেনাপতিদের মধ্যে আনন্দদেব রাজপুত প্রসিদ্ধ। তিনি বৈশ্য জাতীয় ছিলেন। আনন্দ পাল মালয়ে বিস্তর সেনা সংগ্রহ করিয়া নেহারওয়ালা ও মাইাট্টা জয় করিলেন। তিনি বিরারে রামগিরি ও মাহুর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মাহুর দুর্গও তাঁহার নির্ম্মিত। আনন্দ রায়, পারস্যরাজ খুস্রু পার্ব্বিজের সমসাময়িক। আনন্দ রায় ১৬ বৎসর রাজত্বের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে মালদেব নামক হিন্দু দোয়ারে সেনা সংগ্রহ করিয়া দিল্লী ও কনোজ অধিকার করিলেন। মালদেব কনোজে বাস করিতেন। তখন কনোজের পূর্ণ উন্নতি হইয়াছিল। তথায় তাম্বুল বিক্রয়ের ত্রিশ হাজার দোকান ছিল। তথায় ষাট হাজার নর্ত্তক ও গায়ক বাস করিত। মালবদেব ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। মালব দেবের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। মুসলমানদের আক্রমণকালে ভারতবর্ষে এক জন সার্ব্বভৌম রাজা ছিল না। সুলতান মহম্মদ গজনভির সময়ে হিন্দুস্থানে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

১ কনোজ, ২ মিরাট, ৩ মহাবন, ৪ লাহোর, ৫ কুয়ার রাজ, ৬ হরদত্ত-

রাজ, ৫ কুলচন্দ্র রায়, ৮ জৈপাল ইট পালের পুত্র, ৯ মালব, ১০ গুজরাট, ১১ আজমীর, ১২ গোয়ালিয়র প্রভৃতি।

মন্তব্য—কোথা হইতে ফেরেস্তা আপনার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। হিন্দুশাস্ত্রগুলি তিনি ভাল পণ্ডিতের নিকট শুনেন নাই। ভারতবর্ষ চিরকাল পারস্য-রাজের অধীন ছিল, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল। পূর্ব্বকার ভারতবর্ষ ও পারস্যের সীমা পরস্পর সন্নিহিত ছিল। ইহা সম্ভব হইতে পারে; পারসীকেরা মধ্যে মধ্যে ভারতের সুদূর পশ্চিম সীমায় লুটপাট করিত। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দু নামগুলি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফেরেস্তা-বর্ণিত হিন্দুজাতির ইতিহাস কত দূর প্রামাণিক, তাহা পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন। ফেরেস্তার প্রকৃত নাম মহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ। ফেরেস্তা শব্দের অর্থ দেব দূত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

জৈনশাস্ত্র।

সমস্ত জৈন শাস্ত্র বিষয় হিসাবে চারি ভাগে বিভক্ত। এই ভাগের শাস্ত্রীয় নাম অনুযোগ (কথন)। জৈনেরা বলেন, এই সব অনুযোগই তীর্থঙ্করগণের উপদেশবাণী। জৈনগণ এই অনুযোগসমূহকে বিশেষ ভাবে মানিয়া থাকেন, অনুযোগচতুষ্টয়—(১) দ্রব্যানুযোগ; (২) গণিতানুযোগ; (৩) চরণকরণানুযোগ; (৪) ধর্ম্মকথানুযোগ।

(১) দ্রব্যানুযোগ—দ্রব্যের ব্যাখ্যা। দ্রব্যের ছয় ভেদ। জৈন শাস্ত্র ইহাকে 'ষড় দ্রব্য' নাম দিয়াছে। ষড় দ্রব্য—জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, এবং কাল।

জীবাস্তিকায়ের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্ত চ।
সংসর্ত্তা পরিনির্ব্বাতা সহ্যাত্মা নান্যলক্ষণঃ॥

কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্মের ফলভোগকারী, কর্ম্ম অনুসারে শুভাশুভগতিবেত্তা, এবং সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মের নাশে সক্ষম যে আত্মা, তাহাই জীব। এই জীবকেই জীবাস্তিকায় বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মাস্তিকায়—ইহা অরূপ পদার্থ। জীব এবং পুদ্গল এতদুভয়কে গতির সাহায্য করে। জীব ও পুদ্গলের চলিবার সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মা-স্তিকায়ের সহায়তা ব্যতীত তাহাদের গতি ফলীভূত হয় না,—যে প্রকার মৎস্যের চলিবার শক্তি আছে, কিন্তু জল ব্যতীত উহা কার্য্যকরী হয় না। মৎস্যের গতির পক্ষে জলের যেরূপ সহায়তার দরকার, জীব এবং পুদ্গলের গতির জন্য ধর্ম্মাস্তিকায়েরও ঠিক্ তেমনি সহায়তার দরকার। ধর্ম্মাস্তি-কায়ের তিন ভেদ—স্কন্দ, দেশ এবং প্রদেশ।

স্কন্দ এক প্রকার সমূহাত্মক পদার্থ। দেশ স্কন্দের ভাগের নাম। দেশ ভাগের আবার বিভাগকে প্রদেশ বলে।

অধর্ম্মাস্তিকায়—ইহা অরূপ পদার্থ। ইহার কার্য্য জীব এবং পুদ্গলকে স্থির হইবার সহায়তা করা। স্থল যেমন মৎস্যকে স্থির হইবার সহায়তা করে, বৃক্ষ যেমন পথিককে ছায়া দানে বিশ্রামের সহায়তা করে, অধর্ম্মাস্তিকায়ও তেমনি জীব এবং পুদ্গলকে স্থির হইবার সহায়তা করে। যদি এই পদার্থ না থাকিত, তবে জীব এবং পুদ্গল মুহূর্ত্তের জন্যও স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইত না। ধর্ম্মাস্তিকায় এবং অধর্ম্মাস্তিকায় পদার্থদ্বয় দ্বারা জৈনশাস্ত্র লোক এবং অলোকসম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত যুক্তির অবতারণা করে। যে সময় হইতে ধর্ম্মাস্তিকায় ও অধর্ম্মাস্তিকায়, সেই সময় হইতেই লোকের অস্তিত্ব, তৎপূর্ব্বে কেবল অলোকের বিদ্যমানতা। অলোকে আকাশ ব্যতীত কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই; এই জন্য লোকের অন্ত আছে। (১) কেননা পূর্ব্বোক্ত উভয় পদার্থের কোন পদার্থই লোকের পূর্ব্বে ছিলনা। এই না থাকার গতিকে অলোকেরও কোন গতি ছিলনা। সুতরাং লোকের অন্তে জীব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। জৈনশাস্ত্র বলে যদি এইরূপ না হইত, তবে কর্ম্মমুক্ত জীব ঊর্দ্ধগতি হইয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিত না এবং বরাবর ঊর্দ্ধেই চলিতে থাকিত। এই কারণে লোকের স্থান (সিদ্ধশিলা) বলিয়া কোন স্থানের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতে পারেনা।

অধর্ম্মাস্তিকায়েরও তিন ভেদ—স্কন্দ, দেশ ও প্রদেশ।

আকাশাস্তিকায়ও অরূপ পদার্থ, ইহা জীব এবং পুদ্গলকে স্থান দান

(১) যাবন্মাত্রং নরক্ষেত্রং তাবন্মাত্রং শিবাস্পদম্
লোকাগ্র ত্রিয়তে তত্রৈবোর্দ্ধং গত্বা স সিদ্ধতি॥ ইত্যাদি

লোক প্রকাশ, ৫৭ পৃঃ।

করে। ইহা লোক এবং অলোক উভয় স্থানেই বর্ত্তমান। আকাশাস্তিকায়ের তিন ভেদ—স্কন্দ, দেশ এবং প্রদেশ।

পুদ্গলাস্তিকায়—সংসারের সমস্ত রূপবান্ জড় পদার্থ। স্কন্দ, দেশ, প্রদেশ এবং পরমাণু ইহার চারি ভেদ। পরমাণু তাহাই, যাহার ভাগের ভাগ নাই। পরমাণুসমূহ একত্র হইয়া যে স্থান অধিকার করে, তাহা প্রদেশ।

কাল এক প্রকার কালস্তি পদার্থ। কাল দুই প্রকার—উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই চারি পদার্থের ক্রমশঃ বৃদ্ধি যাহা দ্বারা হয়, তাহা উৎসর্পিণী এবং যাহার গতিকে উহারা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই অবসর্পিণী।

উপসর্পিণী এবং অবসর্পিণীর প্রত্যেকের ছয় ছয় ভেদ। এই ভেদের নাম অরা। এই দুই কালে ছাব্বিশ জন এবং চব্বিশ জন তীর্থংকর আবির্ভূত হন। মুক্ত জীব পুনরায় ফিরিয়া আসেনা। উপসর্পিণী এবং অবসর্পিণী এই উভয়কালেই নূতন নূতন জীব এবং তীর্থংকরের উৎপত্তি হয়। এই কাল অনাদি।

যে প্রকার সূর্য্য তারকাদি নিশ্চল এবং উহাদের কোন ব্যবহার নাই, সেই প্রকার কালেরও কোন ব্যবহার নাই। এইজন্য কালকে কালস্তি বলা হইয়াছে। (২) ইহারও স্কন্দাদি চারি ভেদ। (৩)

চরণকরণানুযোগে চারিত্রধর্ম্মের বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহাকে বিষয় করিয়া নিম্নলিখিত গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—আচারাঙ্গ সূত্র এবং সূত্রকৃতাঙ্গ।

গণিতানুযোগে গণিতসম্বন্ধীয় ব্যাখা ও বিবরণ আছে। লোকে অসংখ্য দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে। এই দ্বীপ এবং সমুদ্রসমূহের সংখ্যা পরিমাণ, রীতি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই বিষয়ের উপর নিম্নলিখিত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, লোকপ্রকাশ, ক্ষেত্রসমাস, ত্রৈলক্যদীপিকা।

ধর্ম্মকথানুযোগ—এই ভাগে নানাবিধ রকমারি উপদেশপূর্ণ কথা

(২) জৈন মতে সূর্য্যতারকাদি নিশ্চল।

(৩) এই ছয় অস্তিকায়ের বিস্তৃত বিবরণ 'সম্মতি তর্ক', 'রত্নাকরাবতারিকা', 'প্রমাণ মীমাংসা', অনেকান্ত 'জয়পতাকা' ও 'ভগবৎসূত্র' প্রভৃতি জৈন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

আছে। ইহারা উপদেশ ছলে সংসারী ভক্তবৃন্দের নিকট জৈন মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যেমনি 'জাতক' জৈন শাস্ত্রেও তেমনি 'কথা'। কথার অনেক গ্রন্থ আছে. প্রাকৃতেই বেশী, সংস্কৃতে অপেক্ষাকৃত কম। এই বিষয়ে চারিত্রজ্ঞাতা, ধর্ম্মকথা, বসুদেবহিন্তী, ত্রিষষ্টিশালা কাপুরুষ চরিত্র, আরাধনা কথাকোষ, ধর্ম্মপরীক্ষা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রোৎপত্তির সম্বন্ধে শ্বেতাম্বরীয় এবং দিগম্বরীয়দের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্বেতাম্বরীয়েরা বলেন এই শাস্ত্র সমূহ জৈন সাধু এবং তীর্থংকরগণ কর্ত্তৃক রচিত। দিগম্বরীয়েরা বলেন কেবল মাত্র চতুর্বিংশতি তীর্থংকর মহাবীর স্বামীই এই শাস্ত্রসমূহের প্রণেতা।

অতি অল্প জৈন গ্রন্থই ছাপা হইয়াছে। রাশি রাশি হস্তলিখিত গ্রন্থ এখনও রহিয়াছে। আরাতে একটি জৈন লাইব্রেরী আছে, সেখানে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। অধিকাংশই কীটদষ্ট এবং অস্পষ্ট। জৈনপ্রধান অনেক স্থানে এইরূপ পুঁথি আছে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্নেহলতা।

স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে,
দেবতার আলিঙ্গন করি' অঙ্গীকার।
তব স্পর্শে উচ্ছ্বসিত জীবন্ত শিখার
আভায় তুলিছে আজ দেশ আলো করে'
অপূর্ব্ব হোমাগ্নি জ্বালি' বিবাহ-বাসরে,
দিয়াছ আহুতি তাহে দেহ মল্লিকার।
"অনন্ত মরণ মাঝে জীবন-বিকার"—
এ সত্য কোথায় পেলে তব খেলা ঘরে?
এ জগতে প্রাণ চায় স্বচ্ছন্দ বিকাশ;
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ।
দাস মোরা চিরবন্দী শাস্ত্র-কারাগারে,
উন্মুক্ত আকাশ হেরি' শুধু ভয় পাই।
জেলেছ যে সত্য-বহ্নি মিথ্যার মাঝারে,
এ মৃত সমাজ তাহে পুড়ে হো'ক ছাই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

জনপ্রিয় শরৎকুমার।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-বণিক্ ও প্রকাশক শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। শরৎবাবু কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের অপরাহ্ণে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে মহাকাল তাঁহাকে হরণ করিলেন। তিনি পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। পিতার অনেক সদ্গুণ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। বিশ্রাম ও আলস্য কাহাকে বলে, শরৎবাবু তাহা জানিতেন না। কর্ম্মক্ষেত্রেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিয়াছি।—ভগবান তাঁহাকে শান্তি ও শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা দান করুন। শরৎবাবুর বদান্যতার ফলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। শরৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, কালে তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া, শরৎবাবুর স্মৃতি বাঙ্গালীর মানস পটে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

চিত্রাঙ্কনে।

চিত্রকর — এইচ্ রণ্ডেল।

Engraved & Printed by the Mohila Press, Calcutta.

সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

চিত্র শিল্পে বিজ্ঞান।

শিল্প জাগতিক উন্নতি ও সুখ সৌকর্য্যের প্রধান সাধন; সাহিত্য তাহার প্রাণ; পক্ষান্তরে, সাহিত্যে শিল্পের অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। সুতরাং শিল্প লইয়াই জগতের সাহিত্য, সাহিত্য লইয়াই বিশ্বের শিল্প, উভয়েই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মানব যখন সেই সুদূর অতীত যুগে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান-কল্পে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছিলেন, অহরহঃ অভাবের ভীষণ তাড়নায় বিচলিত হইয়া বিধিপ্রদত্ত চিন্তাশক্তিসহ কালের অনির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছিলেন, তখনই তাহাদের অনাবিল হৃদয়ে প্রথমেই সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত দৈবশক্তির যে অভিনব প্রথমস্ফূরণ উদ্ভূত হইয়াছিল, আর্য্য ভাষায় তাহারই নাম 'উদ্ভাবনা'। তাহার পর সেই উদ্ভাবনা শক্তির সহায়তায় মানব ক্রমে যখন তাঁহাদের নিত্য নব নব অভাব সমূহ মোচন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সাধনা পথে যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার নাম রাখিলেন, "বিজ্ঞান"। অনন্তর সেই বিজ্ঞান-পরিচালিত কর্ম্মের নামান্তর 'শিল্প' বলিয়া তাঁহারা জগতে প্রচার করিলেন।

বাস্তবিক, বিজ্ঞানই সমগ্র শিল্পের প্রধান সাধন, জীবাত্মা-পরমাত্মার ন্যায় একত্র জড়িত—প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় যেন নিত্য অবিভাজ্য। ফলতঃ একের অভাবে অন্যের স্বার্থকতা কোন রূপেই উপলব্ধ হয় না। সেই কারণ মানবের প্রত্যেক ইচ্ছা ও ক্রিয়া, যথাক্রমে বিজ্ঞান ও শিল্প নামেই অভিহিত! আর্য্য পিতামহগণ এই বিস্তৃত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, পরে সূক্ষ্ম চতুঃষষ্টি বিভাগে তাঁহাদের সমুদায় শিল্প ও বিজ্ঞানবিধির প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চিত্রশিল্প সেই সকলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুকুমার কলা। এক কথায় বিশ্বের সকল ভাবই চিত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা যেমন সুস্পষ্ট ভাবে চিত্রে প্রতিভাত হয়, যাহা কিছু জগতের অপ্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাও সেইরূপ ভাবে চিত্রে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

ইহাকেই চিত্রের সমুন্নত ভাব বলে। যিনি চিত্রের সেই অভিনবভাবে অভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট চিত্রশিল্প যে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিতান্তই যাহা সাধারণের সহজ বোধ্যরূপে চিত্রে অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায় না, তাহা সেই চিত্রেরই বিভিন্নরূপ, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভাষার 'অক্ষর চিত্রে' তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'অক্ষর' ভাষার সাঙ্কেতিক চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং চিত্র শিল্পের সহায়তায় যে বিশ্বের সকল ভাবই সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ভাব ও ভাষার মধ্যে যাহার প্রতিহত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার মূল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও যে নিতান্ত সামান্য নহে, একথা বলাই বাহুল্য। [পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কোনও শিল্পের উপায় বা তাহার 'পন্থার' নির্দ্দেশকেই তাহার 'বিজ্ঞান' বলে। চিত্র শিল্পের অভ্যাস ও তাহার ভাব-পরিস্ফূরণ-কল্পে যে সকল উপায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই ইহার বিজ্ঞান। তাহা যেমন উন্নত, তেমনিই বিবিধ বিভাগে প্রসারিত। বোধ হয় জগতে এমন কোনও বিষয় নাই, যাহা উন্নত চিত্র-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত নহে। আমাদের রসায়ন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, গণিত, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, আনন বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি, স্থূল কথায় বিজ্ঞানমূলক সকল শাস্ত্রই ইহাতে বিশেষভাবে আবশ্যক। চিত্রশিল্পের সামান্য আলিম্পন বা রেখাঙ্কন হইতে সমুদয়-চিত্রকলা বর্ণচিত্রণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

রেখাচিত্রণকালে রেখাগণিত বা জ্যামিতি যেমন প্রথম হইতেই প্রয়োজনীয়, উহার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতির ও উচ্চতর বিষয় 'পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান' বা (perspective) পার্সপেকটিভেরও তেমনই প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে কোনও ভাষার শিক্ষাকল্পে যেমন সেই ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক, ব্যাকরণ ব্যতীত সেই ভাষায় বিশুদ্ধভাবে লিখিতে বা বাক্য রচনা করিতে পারা যায় না, তেমনই চিত্রশিল্পের বা চিত্ররূপ ভাষার ব্যাকরণ স্বরূপ এই পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, উহার একটি রেখাপাতও বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। 'চিত্র' বিদ্যা এক হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট শিল্প, সাধারণভাবে তেমনই সার্ব্বজনীন ভাষাও বটে। পণ্ডিত-সমাজ বলিয়া থাকেন, সকল ভাষাই ভাষান্তরিত করিয়া বা অনুবাদ করিয়া ভিন্ন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হয়; কিন্তু চিত্রশিল্পরূপ ভাষার আদৌ অনুবাদের প্রয়োজন হয়

না। 'অশ্ব' বলিলে আমরা সকলেই যে চতুষ্পদবিশিষ্ট জীবকে বুঝিয়া থাকি, একজন ইংরাজ সেই অশ্ব শব্দ শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারিবেন না; তাঁহাকে বুঝাইতে হইলে, তাঁহাদের ভাষায় (Horse) শব্দে তাহা অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু কয়েকটি রেখাপাতে একটি অশ্বের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলে, আমরা যেমন তাহা অশ্ব বলিয়া বুঝিব, ইংরেজ ও তাঁহার ভাষায় 'হর্স' বুঝিবেন; আবার একজন কাফরী বা আদিম আমেরিকা-বাসীও তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষায় অশ্বকে যাহা বলে, তাহাই বুঝিবে। য়ুরোপের জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—"Drawing is a simple kind of short hand which requires no translation." সুতরাং চিত্রশিল্পকে কেবল ভাষা নহে, বিশ্বের ভাষা বা সাধারণের ভাষাই বলিতে হয়। কোনও সংকীর্ণ প্রাদেশিক ভাষায় ইহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। এ ভাষারও ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিধি—সমস্তই আছে ; তাহা শিক্ষার্থীর ও অনুরাগীর রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন হয়। অতএব ইহা নিতান্ত নিরক্ষরের বিদ্যা নহে! আমাদের দেশের কবির গান, তরজার গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, কবিওয়ালাদের বা তরজাওয়ালাদের ছন্দঃ ব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদি ভাষা বিজ্ঞানে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও কেবল অভ্যাসবশে, তাহারা যেরূপ পদযোজনা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা বস্তুতই অত্যন্ত বিস্ময়প্রদ! কোনও কোনও স্থলে তাঁহারা উচ্চ কবিত্বেরও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলেই বা সকলেই উচ্চ অঙ্গের কবিজনসুলভ ভাব ভাষা ও বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সাধারণ শ্রোতা অবশ্যই তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট তাহা অবিদিত থাকে না। তাহার প্রধান কারণ, উচ্চ শ্রেণীর রচয়িতাদিগের অনেকেই ভাষা বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ! চিত্রশিল্পেও সেইরূপ অনেকে চিত্র রচনা করিয়া সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধির অভিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই জন্য এদেশীয় চিত্রকর জাতি বা পটুয়াগণের চিত্রের কোনও কালেই বিশেষ আদর নাই। কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষিত চিত্রকর মাত্রই যে পটুয়াদিগের অপেক্ষা উন্নত বা চিত্র বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, একথাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় না। বরং অনেককে সভ্য শ্রেণীর পটুয়া বলাই অধিকতর সঙ্গত। এক পক্ষে পটুয়াগণ বংশপরম্পরায় অনুশীলনের ফলে যে শিক্ষা ও জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে অর্জ্জন করিয়া থাকে, শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

বাঙ্গলা দেশের বহু গৃহে প্রতিমা পূজা হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র পটুয়া গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রতিমা চিত্রিত করিতেছে, রাত্রিকালেও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে তৈল প্রদীপটি ধরিয়া আছে, তাহারই নিম্নে কনিষ্ঠায় অথবা মণিবন্ধে মৃণ্ময় বর্ণপাত্র বা ভাণ্ডটি সূত্র সহযোগে আবদ্ধ, একপদ কাষ্ঠের চৌকিতে অন্যপদ প্রতিমার উপরেই সন্তর্পণে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিকা ধারণ করিয়া প্রতিমায় বর্ণ বিলেপন করিতেছে; যাহা একবার লেপন করিতেছে, তাহা আর সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতেছে না; তাহার না আছে কম্পাস, না আছে রবার; তাহার নিপুণ হস্তে একবারে যাহা বাহির হইতেছে, তাহাই রহিয়া যাইতেছে; অথচ তাহার কর্ম্মান্তে সে চিত্রণ নিতান্ত মন্দও দেখায় না। ইহা বংশানুক্রম ও তাহাদের আজন্ম অভ্যাসের ফল। ইহা প্রাচ্য চিত্রশিল্প-প্রণালীর অতি ক্ষীণ ও হীন শেষ আদর্শ! বর্ত্তমান সময়ে শিল্পবিদ্যালয়ের কোনও শিল্পীই এমন সহজভাবে চিত্রণ কার্য্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহা-দের মধ্যে যাঁহারা চিত্রের উন্নত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়া চিত্রকলা শিক্ষা করিয়া-ছেন, তাঁহারা চিত্রে যে সকল বিষয় প্রতিভাত করিতে পারিবেন, পটুয়াগণ প্রাণান্ত-পরিশ্রমেও তাহা কখনই সম্পন্ন করিতে পারিবে না। সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহাদের যে আদৌ নাই; সে শিক্ষা তাহারা যে আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, অথবা বংশানুক্রমে তাহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

বলিতেছিলাম, পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান বা চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণের জ্ঞান ব্যতীত চিত্রের একটি রেখাপাতও পরিশুদ্ধ হইতে পারে না, এবং শিল্পীর দৃষ্টিশক্তি আশানুরূপ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। চিত্র-বিদ্যান্তর্গত পরি-প্রেক্ষিত নামক এই পারিভাষিক শব্দটি আমাদের বাঙ্গলায় বা ভারতে নূতন নহে; বহু প্রাচীনকাল হইতে 'মানসার' প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পগ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। ইহার ব্যুৎপত্ত্যর্থ ধরিলে জানিতে পারা যায়,—(পরি+প্র+দৃক্ষ =দর্শন করা+ক্ত), বস্তুসকল বাস্তবিক সত্তাকালে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তদনুরূপ ভাববোধক চিত্র বিন্যাসের নিয়ামক বিজ্ঞান, বা বিদ্যা। ইহার দ্বারা সকল দ্রব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে। একই দ্রব্য সম্মুখে, পার্শ্বে, নিকটে বা দূরে থাকিলে কিরূপ দেখায়, শিল্পী না হইলেও, সামান্য মনোযোগ দিয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর দাঁড়াইয়া রেলপথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে

দেখিতে পাওয়া যায়, রেল লাইন যতই দূরবর্ত্তী হইতেছে, ততই যেন সূক্ষ্ম মুখ হইয়া মিলিয়া যাইতেছে; রেলগাড়িটি যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হয়, তখন তাহা কত বড় দেখায়, কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িয়া যতই দূরে যাইতে থাকে, ক্রমে ততই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বলিয়া মনে হয়। দর্শকের নিকটে, দূরে মধ্য পথে কিংবা বহুদূরে থাকিলে কোন্ বস্তু কত বৃহৎ বা কত ক্ষুদ্র পরিলক্ষিত হয়, চিত্রে তাহাই যথাবিধি প্রতিভাত করিবার প্রয়োজন হয়, এবং একমাত্র পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানই সে কার্য্যে শিল্পীর সহায়তা করে। যে শিল্পী চিত্রের প্রথম রেখা অঙ্কনে পরিপ্রেক্ষিত বিধানে তাহার নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও বিবিধ বর্ণ সম্পাতে সেই প্রকৃতানুরূপ ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না, কারণ, তাহার পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান-লব্ধ সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব, সে ভাব উক্ত বিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত আয়ত্ত হইবার উপায় নাই। তাহা শিক্ষা করিতে হইলে রেখাগণিত বা জ্যামিতি ও দৃষ্টি-বিজ্ঞান (Optics) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সাধারণ চিত্রকর বা পটুয়া জাতিরা নিত্য অভ্যাসের কালে রেখাপাতের দৃঢ়তা বা বর্ণবিন্যাসে যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করিতে পারে; কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে সকল বস্তুর সত্বাকালীন অবস্থাবোধক ভাব চিত্রে প্রকাশ করিতে পারে না। উন্নত প্রতীচ্য-খণ্ডে তাহার যথেষ্ট আলোচনা আছে, সে দেশের শিল্পীরা প্রায় সকলেই তাহাতে অভিজ্ঞ। তাঁহাদের কোনও চিত্র দেখিলে বোধ হয়, তাহা যেন ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ চিত্র। আমাদের কেহ কেহ অতি বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, অমন প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে প্রতীচ্যভাবের সেই বিসদৃশ ছায়া মিলাইবার প্রয়োজন কি? সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শিল্পানভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণের অনেকেও হয় ত তাহার সমর্থন করিয়াও থাকেন; কিন্তু তাঁহারা জানেন না, পূর্ব্বে আমাদের কি ছিল, আর এখনই বা কি আছে। ভারতের এমন দিন গিয়াছে, যখন জগতের সকল সভ্য জাতিই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে গর্ব্ব অনুভব করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিত। সে কালে ভারতের চিত্রশিল্প বিজ্ঞান-বিহীন ছিল না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়েই সকল কার্য্যের মধ্যেই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক, উন্নত, অন্য, সাধারণ। এক স্বেচ্ছায় চিত্ত-বিনোদনে, অন্য কেবল উদরান্ন-সংগ্রহের অভিলাষে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা কেবল অর্থলালসায় চিত্রাদি যে কোনও শিল্পের অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করে, তাহারাই সাধারণ শ্রেণীর লোক;

তাহারা কোনরূপে ক্রেতার মনস্তুষ্টি করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হয়। আর যাঁহারা ভাবের বশে আত্মতৃপ্তির অভিলাষে প্রাণপণে শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই উন্নত শ্রেণীর শিল্পী; তাঁহারা যে কোনও শিল্পে তাঁহাদের অসাধারণ চিন্তাশক্তির যে বিকাশ করিয়া যান, তাহা প্রকৃতই অনির্ব্বচনীয়। প্রাচীন-কালে ভারতের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় চিত্রকলাতেও এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, তাহা অবশ্যই সুধীমণ্ডলীর অবিদিত নাই। সামান্য গৃহস্থ হইতে রাজন্য-বর্গ পর্য্যন্ত সকলের গৃহেই সে কালে চিত্রকলার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ভারতের ঋষি ও কবিকুল আলোকচিত্রের ন্যায় তাঁহাদের কাব্য-মকুরে সে সকল সুস্পষ্ট-ভাবে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস, তাঁহার শকুন্তলার রাজা দুষ্মন্তের মুখে বলিয়াছেন:—

"কার্য্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতোবহামালিনী।
পদাস্তামভিতো নিষণ্ণচমরা গৌরী গুরোঃ পাবনাঃ॥
শাখালম্বিত বল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতু মিচ্ছাম্যধঃ।
শৃঙ্গে কৃষ্ণ মৃগস্য বাম নয়নাং কণ্ডুয়মানাং মৃগীম্॥"

অর্থাৎ স্রোতস্বতীমালিনী গৌরী গুরু হিমালয়ের গিরি-অঙ্কে ধীরে ধীরে প্রবাহিত, তাহারই বালুকাময় সৈকত-প্রদেশে ক্রীড়াপরায়ণ হংসমিথুন সকল লীন হইয়া রহিয়াছে, বৃক্ষ শাখায় বল্কল বিলম্বিত তাহারই নিম্নে একটি কৃষ্ণসার দাঁড়াইয়া, একটি মৃগী নিজ বাম নয়ন সেই কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে কণ্ডুয়ণ করিতেছে। এইরূপ দৃশ্য চিত্রের পশ্চাৎ দিকে বা তল পৃষ্ঠে (Back ground) অঙ্কিত করিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, চিত্রের সম্মুখ অংশে শকুন্তলাদির প্রতিমূর্ত্তি, তাহার পশ্চাতে অতি সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, তাহা আবার বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরত্ব হেতু মালিনীর সেই সৈকত পর্য্যন্ত সকল বস্তুই ক্রমে যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইতেছে, সেই কারণ হংস মিথুনাদি অস্পষ্ট ভাবে সেই সৈকতসহ লীন হইয়া যাইতেছে। এই লীন বা ভ্যানিশিং (Vanishing) ভাব, পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞান-জ্ঞানেরই পরিচায়ক। সাধারণ শিল্পী এ সকল উচ্চ-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সে কালে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ না থাকিলেও, উচ্চশ্রেণীর সৌখীন শিল্পীরা তাহা ভাল রূপেই জানিতেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক ও অন্যান্য কাব্যাদির মধ্যে স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর উপ-

জীবী চিত্রকরেরা সর্ব্বকালেই তাহাদের সাধারণ চিত্রের মধ্যেও সেই সকল উচ্চ অঙ্গের চিত্রাদির অনুকরণ পূর্ব্বক পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের কতক কতক ভাব বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এইরূপে যে কোনও শিল্পী বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষিত না হইলেও, আজীবন অভ্যাস ও বহুদর্শিতার ফলে চিত্রের মধ্যে পরিপ্রেক্ষেতিক নীতি কিছু না কিছু নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনি মুখে বলেন, আমি পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান মানি না, তাঁহারও চিত্রে উক্ত বিজ্ঞানের অলঙ্ঘ্য প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চিত্ররূপে যে কোনও বস্তুর সত্বাকালীন ভাবের বিকাশ কল্প একটি মাত্র রেখার অঙ্কনও পরিপ্রেক্ষিত নীতির সহায়তা ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

অনন্তর চিত্রের ছায়ালোক সমাবেশের কথা। ইহাও আলোক ও ছায়া-তত্বের উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত নীতি। এই ছায়ালোকের সাহায্যেই চিত্রের সমতল আধারের উপর সকল বস্তুর উন্নত অনুন্নত ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সুধীগণ বলেন—"Light & shade is the form of painting." চিত্রকরণের উপযোগী কাগজ বা বস্ত্র খণ্ড স্বভাবতঃই সমতল, তাহার মধ্যে কোনও অংশ উন্নত বা অনুন্নত নাই, কেবল ছায়াপাতের সাহায্যেই উহাতে উচু নীচু ভাব ফুটিয়া উঠে। যে কোনও একখানি সুন্দর চিত্র দূর হইতে দেখিলে তাহাতে চিত্রিত সকল বস্তুই স্পষ্ট বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে উচু নীচু, নিকট দূর, সকল ভাবই দেখা যাইবে, কিন্তু চিত্রের নিকটে যাইয়া তাহার উপর হস্ততালু বিলেপন করিলে চিত্রাধারের ক্ষেত্র সমতল ব্যতীত অসমান বোধ হইবে না। সে চিত্র-ক্ষেত্র চিত্র অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বেও যেমন সমতল ছিল, এখনও তেমনই সমতল আছে, কিন্তু আবার দূর হইতে দেখিলে সেই উচ্চ অনুচ্চভাব বোধগম্য হইবে। ছায়ালোকই তাহার কারণ। যে শিল্পী আলোক ও ছায়ার বৈজ্ঞানিক তত্বে অভিজ্ঞ তাঁহারই চিত্র অধিকতর স্বাভাবিক হয়। পরিপ্রেক্ষিতের সহিত ছায়া-বিজ্ঞানও জড়িত, যিনি তাহাতে অনভিজ্ঞ, তিনি ছায়াতত্বও ভাল বুঝিতে পারিবেন না। যাহা হউক, এই আলোক ও ছায়াই চিত্রের উচ্চ অনুচ্চভাবের বোধক। কেবল চিত্র বলিয়া নহে, সমগ্র বিশ্বই আলোক ও ছায়ার সম্পাতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, যাহা কিছু ভালমন্দ বলিয়া অনুভব করিতেছি, সে সমস্তই আমাদের চিরবরেণ্য সবিতা দেবতার

কৃপায় তাঁহারই শুভ্রজ্যোতিঃ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ আলোক স্বয়ং প্রকাশমান নহেন, ছায়া তাঁহার অংশ সম্ভূতা; ছায়াই আলোকের শক্তি, ছায়া ব্যতীত আলোক সম্পাতের অস্তিত্ব বোধ কখনও সম্ভবপর হইত কিনা কে জানে! দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে আলোক, সেইখানেই তাহার ছায়া; আলোক না থাকিলে যেমন তাহার ছায়া থাকে না, তেমনি ছায়া না থাকিলে, বোধ হয় আলোকের অস্তিত্ব থাকিত না। জীব ভূমিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের যে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র আলোক জ্যোতিঃ নয়নেন্দ্রিয়ে প্রথমে ধারণা করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে, যাহার সাহায্যে জীবের অন্যান্য অঙ্গও পরিপুষ্ট হয় তাহাই আলোক, কিন্তু ছায়া, তাহার পার্শ্বে পার্শ্বেই চিরদিন সমভাবে বিদ্যমান। তবে, যখন যেমন আলোক, তাহার ছায়াও তদনুরূপ। উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে গভীর ছায়া, অল্প আলোকের পার্শ্বে ক্ষীণ অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আলোকের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং সাক্ষাৎ শক্তি-স্বরূপিণী ছায়াই আলোকের সহিত দম্পতীযুগলের ন্যায় নিত্য অবিভাজ্যভাবে অবস্থিতা হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সামগ্রীরই অস্তিত্ব সপ্রকাশ করিয়া থাকে। চিত্রের মধ্যেও সেই আলোক ও ছায়ার যথাযথ বিন্যাসেই চিত্রক্ষেত্রস্থিত সকল বস্তুর প্রকৃত অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! অবস্থা, স্থান ও কাল ভেদে ছায়ালোকের বহু তারতম্য হইয়া থাকে, তাহার অনুকরণ করিয়াই শিল্পী চিত্রের নানাভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন্।

চিত্রবিদ্যান্তর্গত সর্ব্বরূপ প্রকাশক এই ছায়াতত্ত্ব শিবানুকল্পিত সঙ্গীত বিজ্ঞানেও প্রযুক্ত হইতে পারে; সংগীতের সপ্তস্বর ও তিন গ্রামে যেমন ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বিকাশ হইয়া থাকে, চিত্রের মধ্যেও আলোক-ছায়ার সপ্ত বিভাগে ঠিক সেইরূপ সকল ভাবই প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতের ন্যায় চিত্র-কলার মধ্যে তাহার রাগ আছে, রাগিণী আছে, তাল লয় মান সকলই আছে। আর্য্যঋষিগণ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; আমাদের দুরদৃষ্ট, আমরা সেই পৈতৃক সম্পদে বঞ্চিত হইয়া ভিখারীর ন্যায় অন্য প্রদত্ত মুষ্টি ভিক্ষার প্রতি চাহিয়া আছি। সে যাহা হউক, সঙ্গীতের অতি সূক্ষ্ম রাগ রাগিণীর নির্দ্দেশও আর্য্য প্রতিভাসম্ভূত। এই বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ জগতের অন্য কোনও সঙ্গীতে নাই, অথবা অন্য সকল সঙ্গীতই তাহার অতি হীন অনুকরণমাত্র! বোধ হয়, সকলেই জানেন, ভারতীয় সঙ্গীত কলাবিদ, যখন তখন যে কোন রাগ রাগিণীর আলাপ করেন না, অপিচ নব শিক্ষার্থীকে তাহার অকাল আলাপে পুনঃ পুনঃ নিষেধ

করিয়া থাকেন। প্রাতে ভৈরবাদি রাগ ও তদনুগত রাগিণীগুলির আলাপের সময়, সন্ধ্যায় তাহার আলাপন নিষিদ্ধ; আবার শ্রী পুরবী আদি কোন ক্রমেই উষার আলাপ্য রাগ বা রাগিণী নহে। কেন এই কঠোর নিষেধ, তাহা অধুনা অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বোধ হয় অবগত নহেন। সুধীমণ্ডলীর অবগতির জন্য আমি আমার জীবনের একটি দিনের ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে অনেক দিনের কথা। আমি এক সময় হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মহাত্মার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন সাধু তাঁহার শিষ্যকে সঙ্গীতের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন্, শিষ্য বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াও গুরুর কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বরের ঠিক অনুকরণ করিতে পারিতেছে না। গুরু তখন শিষ্যের গ্রীবা ও পশ্চাতের নিম্ন কপালাস্থির উপর কোনও কোনও শিরা টিপিয়া ধরিলেন, এবং শিষ্যকে স্বর উচ্চারণ করিতে উপদেশ দিলেন। তখন স্বাভাবিকভাবে তাহার অভিলষিত স্বরের বিকাশ হইতে লাগিল। আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শন করিলাম। দেখিলাম, যেমন হারমোনিয়াম যন্ত্রে চাবি টিপিলে পর পর সকল সুর বাহির হয়, গুরুজী সেইরূপ শিষ্যের গ্রীবার উপরিস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্থান টিপিয়া ধরিলেন এবং শিষ্য গলায় আওয়াজ দিবামাত্র অভিলষিত স্বর বাহির হইতেছে। এমন অদ্ভুত ক্রিয়া আমি আর কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। অদৃষ্টক্রমে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাতে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। বুঝিলাম যে, সময়ে বা অসময়ে সকল স্বরই এই ভাবে বাহির করা যাইতে পারে। আমি যতক্ষণ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাহার মধ্যে সুর সম্বন্ধে আলোচনায় আরও অবগত হইলাম, আমাদের কণ্ঠে সময়ানুসারে কতকগুলি সুর স্বাভাবিকভাবে বাহির হয়, তাহারই যথাযথ সমাবেশ করিয়া ঋষিগণ এক একটি রাগ বা তদনুগত রাগিণীর আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই রাগ বা রাগিণী কালবোধক।

চিত্রের মধ্যেও সেইরূপ কালবোধক উন্নত প্রাকৃতিক ভাব আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট নিসর্গ চিত্রের রাগ বা রাগিণী প্রভৃতি শব্দের ক্রমমীল (the Harmony of the sounds) দ্বারা শব্দতরঙ্গ উত্থিত হইলে যে কালবোধক রাগিণীর বিকাশ করিয়া দেয়, ছায়ালোকের ক্রমমীল (the Harmony of the light & shade) দ্বারা সেইরূপ আলোকের রশ্মিতরঙ্গের মধ্যেও তাহার কাল অথবা রাগাদির ভাব নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যে শিল্পী সেই

আলোক ও ছায়াতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া তাঁহার কল্পিত চিত্রের মধ্যে তাহার বিকাশ করিতে পারেন তিনি উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকর বা শিল্পীরূপে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

আমরা নিত্য ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকি অথচ "এখন বেলা কত?" এই রূপ প্রশ্ন হইলে ঠিক তাহার উত্তর দিতে পারি না, তখনই ঘড়ি দেখিতে হয়। যদি নিকটে ঘড়ি না থাকে, তবে বাহিরের আকাশ ও আলোক রশ্মি দেখি, অনেক সময় কতকটা আনুমানিক সময় বলিতেও সমর্থ হই, কিন্তু প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। অথচ সাধারণ কৃষক, ঘরামি বা রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রায় ঠিক সময় বলিয়া দিতে পারে। যখন তাহাদের কর্ম্মের পর ছুটী হয়, তখন কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, এখন কত বেলা। তাহারা "ভারা" বা গৃহের "মটকা" হইতে অমনি নামিল, আপনি ঘড়ি খুলিয়া দেখুন, প্রায় ঠিক সময়, হয়ত দুই চার মিনিটের এদিক ওদিক হইবে মাত্র। আমাদের ন্যায় তাহাদের ঘরে বাহিরে ঘড়ি নাই তথাপি সময় নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে তাহাদের যথেষ্ট উপায় আছে। তাহারা আমাদের অপেক্ষা প্রকৃতির অধিক অনুগত, সেই কারণ প্রকৃতি দেখিয়াই বা প্রকৃতির নয়নস্বরূপ আলোকের দীপ্তি দেখিয়াই তাহারা যখন তখন সময় নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাহারা প্রকৃতি-গাত্রে কি কেবল আলোক দেখে না তাহার ছায়া দেখে, অথবা আলোক ছায়া উভয়ই দেখে? সুবিজ্ঞ শিল্পিগণ বলেন, তাহারা আলোক ও ছায়া দুইই দেখে। আলোকের তেজ, গতি ও বর্ণ, ছায়ার রূপ, গঠন ও গাম্ভীর্য্য সমস্তই তাহারা দেখে কিন্তু সঙ্গীত-স্বরে স্বাভাবিক মুগ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাহারা ঠিক বলিতে পারে না যে, তাহারা কি দেখে? যাহা হউক সঙ্গীতের সকল রাগ-রাগিণীর মূলীভূত সপ্তস্বর ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষদের ন্যায় চিত্রেরও সপ্তবিধ ছায়ালোক বিধান আছে। উজ্জ্বলালোক (High light), আলোক (light), মধ্যমালোক (middle tint), শুদ্ধ মধ্যমালোক (2nd middle tint), ছায়া-লোক (Shade tint), ঘনচ্ছায়ালোক (deepshade tint), ও প্রতিবিম্বিতা-লোক (Reflect tint), আলোক ও ছায়ার এই সপ্তবিভাগেই চিত্রের সকল ভাব সকল কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আলোকাত্মক সপ্তবর্ণও ছায়ালোকের সম্পূর্ণ সহায়তা করে ইহার সাহায্যেই প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন ও নিশা, ইহার সাহায্যেই শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ সমস্তই

প্রতীতি হয়। সাধারণ শিল্পী বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষার অভাবে আলোক ও ছায়াতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইলেও সুনিপুণ বিজ্ঞানবিদ শিল্পীরা তাঁহাদের নিপুণ হস্তে সে সকল ভাব চিত্রের মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সে চিত্র দেখিলে চিত্রের কাল অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃতির কোন সময় অনুকৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দর্শক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সেই কালেরই অনুকরণ করিতে থাকে। ছায়ালোকের সূক্ষ্মতর এই সকল গভীর তত্ত্ব এত সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাতেই চিত্রান্তর্গত বিজ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই ছায়া-তত্ত্ব প্রতীচ্যের জ্ঞান ও গবেষণার ফল নহে। গত শতাব্দির বিখ্যাত শিল্প সমালোচক মিঃ এন্, ফিও পাশ্চাত্য চিত্র শিল্পের সমালোচনা ব্যপদেশে একস্থলে বলিয়াছেন।

"Leonardo davinci was the first artist who treated the subject "chirosceoro Scientificaly".

অর্থাৎ লিওনার্ডো ডা ভিন্সিই এই ছায়ালোক তত্ত্ব প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাবে আরব্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর বহু শিল্পী ক্রমে অবিরত পরিশ্রম, অভ্যাস ও পরীক্ষা করিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। সুতরাং সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও য়ুরোপে ছায়াতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল না. কিন্তু ভারতে চিরদিনই তাহা প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীন শিল্প গ্রন্থ মানসারাদির মধ্যে যেমন তাহার বহু পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মহাকবি কালিদাস আদির প্রণীত কাব্য সমূহ মধ্যে অনেক স্থলে তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত কেমন আবেগভরে তদ্গত প্রাণে বলিতেছেন :—

অস্তাস্তাঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিস্থিতাং
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চবলয়ো ভিত্তৌ সমায়া মপি।
অঙ্গেচ প্রতিভাতি মার্দ্দব মিদং স্নিগ্ধ প্রভাবচ্চিরং।
প্রেম্নামমুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরাচ বক্তীবমাম্।

অর্থাৎ এই চিত্রফলক বা ইহার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ সমতল হইলেও ইহাতে অঙ্কিত স্তনযুগল যেন উন্নতের ন্যায় বোধ হইতেছে, নাভিগহ্বর নিম্ন বা গভীর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, হস্তের বলয়গুলিও যেন স্বাভাবিক, হাত হইতে যেন স্পষ্ট

পৃথক হইয়া রহিয়াছে তৈলাক্ত বর্ণ বিশেষের চিত্রণ দ্বারা দেহের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যও যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আহা প্রণয়াবেশে প্রিয়া যেন আমার মুখের দিকে বঙ্কিম বা আড়নয়নে চাহিয়া আমায় যেন কি বলিবার নিমিত্তই ইহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সে ভাব মুখে আসিয়াছে কেবল কথায় পটিতেছে না। তাই বুঝি প্রিয়ার মুখমণ্ডল মৃদু হাস্য বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

চিত্রগতা শকুন্তলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই যে উন্নত অনুন্নত ভাব যাহা সমতল চিত্র ক্ষেত্রের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা সেই ছায়া তত্ত্বেরই বৈজ্ঞানিক সমাবেশ মাত্র। যদি চিত্রশিল্পের এই বিজ্ঞানতত্ত্ব সেকালে পরিজ্ঞাত না থাকিত তাহা হইলে শকুন্তলায় এমন স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম না, বা তখন তাহা সম্ভবপরও হইত না; চিত্রবিজ্ঞানের এ প্রত্যক্ষভাব কবির হৃদয় কল্পন স্পর্শ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

চিত্রশিল্পের কার্য্য করিবার জন্য অথবা চিত্র দেখিবার জন্য উত্তরের আলোক (North light) প্রশস্ত। পাশ্চাত্য প্রদেশের সকলেই একথা জানেন, কারণ ইহা তাহাদের দেশে একটি উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত বিধি। বিশেষ তৈলচিত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশের শিল্পিগুরুগণ যে এ তত্ত্ব জানিতেন না বা বুঝিতেন না তাহা নহে, ববং তৈল চিত্র প্রণালীর ন্যায় এই উত্তর আলোক তত্ত্বও তাঁহাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা চিত্রশিল্পে বিজ্ঞানের নামে শিহরিয়া উঠেন, তর্কপরদিগের সন্দেহ নিবারণার্থ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য দেবের সেই অতি প্রাচীন নীতি শাস্ত্রের একটি কথা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সেই সুন্দর অতীত যুগে তাঁহার নীতি-শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ববিধ গৃহাদির নির্ম্মাণ বিষয়ে যে স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, সেই স্থলে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের ২২৮ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন, "শিল্পশালাং-কুর্য্যাদুদগগৃহাৎ।" টীকাকার বলিয়াছেন "শিল্পশালাং শিল্প গৃহং উদক্ উত্তর-স্যান্দিশি কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ শিল্পগৃহ উত্তরাস্যভাবে নির্ম্মাণ করিবে। অধুনা পাশ্চাত্য শিল্পী মাত্রেই এই উত্তরাস্য গৃহ বা ষ্টুডিও নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কার্য্য করেন ও চিত্রাদি সজ্জিত করেন। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী ও দ্বারমধ্য হইতে কি পরিমাণ আলো গ্রহণ করিতে হইবে তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিত্র-শিল্পীর বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তাহার পর শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রের ন্যায় দেহের লাবণ্য, মুখের আনন্দ-

বিজড়িত অব্যক্তভাব সমূহ, শারীর স্থান বিজ্ঞান (Anatomy)আনন বিজ্ঞান (Physiognomy), ও অঙ্গের পরিমাণ বিজ্ঞান (Science of Human proportions) প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বের অন্তর্ভূত। যে সকল তত্ত্ব সম্যক্‌ অবগত না হইলে চিত্রগতা মূর্ত্তির পরিমাণ সৌষ্ঠব, আস্যরেখায় তাহার মনোগত অব্যক্তভাব ফুটাইবার উপায় নাই। মদীয় অন্যতম শিক্ষক মিঃ আর্চার (Mr. Archor R. S. A) সাহেব বলেন "There are four things to make it perfect. চতুর্ব্বিধ উপায়ে ইহাকে সুসম্পন্ন করিতে পারা যায়। (Air) আস্য রেখা,—(Attitude of posture) ভঙ্গিমা,—(dress) পরিচ্ছদ ও (colours) বর্ণাবলী। এই চতুর্ব্বিধ উপায়ই বিজ্ঞানমূলক। পূর্ব্বে যে শারীর স্থানাদির বিষয় বলিয়াছি তাহাও এই বিধিচতুষ্টয়ের অন্তর্গত।

মানবের আস্য বা মুখমণ্ডলের মধ্যে নাসিকা ও চক্ষুর পার্শ্বে গণ্ডে ও ললাটের মধ্যে যে সকল রেখা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পরস্পর আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা ভয়, দুঃখ, হাসি ও আনন্দ আদি আন্তরিক ভাব নিচয় প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম আস্যরেখা (airs); শিল্পীকে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণের মধ্যে মানবের সমুদায় অন্তরের ভাব এই আস্যরেখার সাহায্যে প্রকাশ করিতে হয়। যিনি চিত্র মধ্যে এই সকল ভাব যত অধিক ফুটাইতে পারেন তিনি ততই উচ্চশ্রেণীর চিত্রশিল্পী। পূর্ব্বোদ্ধৃত শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তিতে সেই সকলভাব প্রকটিত হইয়াছিল; কবি, তাহা বলিয়াছেন। সেই সকল ভাবকেই 'এক্সপ্রেসন' (Expression) বলে। চিত্রকলার অন্তর্গত এই ভাব বিকাশক বিধি অভ্যাস করিতে হইলে, শিল্পীকে, আনন বিজ্ঞান (physiognomy) আভাস করিতে হয়। তাহা প্রকাশ কল্পে কেবল উদ্ভাবন বা পরিকল্পনার বোঝা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কেবল সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তাহার যথাযথ বিকাশ কার্য্যে সহায়তা করিবে না; শারীর স্থান বিদ্যার (Anatomy) অন্তর্গত অস্থি ও পেশী সমূহের সঞ্চালন জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে, তাহারই সাহায্যে উদ্ভাবনাগত ভাবরাশি চিত্রে প্রকৃতির অনুরূপ প্রকাশিত হইবে। অন্তরের যে ভাবটি মনে প্রকাশ পায়, তখন মুখের একস্থানে যে ফুটিয়া উঠে তাহা নহে, অর্থাৎ মুখমণ্ডলের সর্ব্বাবয়বে অল্পবিস্তর তাহার আভাস পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়। মানব হাসিলে কেবল যে তাহার দন্তই বাহির হইয়া পড়ে সূক্ষ্মদর্শীরা সে কথা বলেন না; তাঁহারা অধর, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকা, গণ্ড এমন কি কর্ণ ও কেশমূল পর্য্যন্ত সে হাসির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং অদূরদর্শী

শিল্পী প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ কালে ওষ্ঠের পার্শে হয়ত একটু হাসির ভাব দেখাইয়াছেন, কিন্তু নয়ন-প্রান্তে এক ম্লান ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথবা নয়ন প্রফুল্লতাব্যঞ্জক কিন্তু কপোল কালিমাময় ও বিশুষ্ক, চিত্রে এই অস্বাভাবিক ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্রকর আর্য্য রেখা দর্শনে প্রকৃত অন্ধ, আনন বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অর্থাৎ মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের কোন্ কোন্ গুলির কোন্দিকে কিরূপ সঞ্চালনে কি ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অপারদর্শী। সুশিল্পী হইতে হইলে এ সকল বিষয়েও রীতিমত শিক্ষা ও সর্ব্বদা তাহার আলোচনা রাখিতে হইবে।

মানবের মুখমণ্ডলে ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রমে নিম্নে নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠদ্বয় ও চিবুক পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যস্থ পেশীগুলিই মনোভাব প্রকাশে সুপারগ। ইহাদের মধ্যে আবার নয়নের অন্তর্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশী কয়েকটির মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও অনন্ত, এমন কি মুখের ভাষাও ইহার নিকট যেন সঙ্কুচিত; প্রকৃত পক্ষে মানব যখন ভাষা বলিতে অসমর্থ যখন বাক্ শক্তির আদৌ বিকাশ হয় না, সেই শৈশব সময়ে অথবা যৌবনের চাঞ্চল্য-বিজড়িত প্রগাঢ় দাম্পত্য প্রেমের প্রথম প্রেম-বিনিময়ে যখন অফুরন্ত ভাষার তরঙ্গ মন্দীভূত হইয়া অন্তরেই লয় হইবার উপক্রম হয়, চিত্তের সেই অদম্য আবেগ যখন ভাষায় ফুটাইতে শত চেষ্টা করিলেও একটি অক্ষরেও সে ভাবের অভিব্যক্তি হয় না, কিম্বা যখন মুমূর্ষু বৃদ্ধ জীবনের শেষ শয্যায় শায়িত হইয়া, বাকশক্তিবিরহিত অবস্থায় পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনের শত শত প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে অক্ষম, হস্তপদাদি পর্য্যন্ত পরিচালনে যখন অপারগ সমস্তই অসাড় ও নিস্পন্দপ্রায়, তখন মানবের সেই ক্ষুদ্র ক্ষীণ, নয়ন-প্রান্তে নীরব ভাষায় কত কথাই যে প্রকাশ পায়, কত অজস্র ভাবের তরঙ্গ যে তাহাতে উঠিতে থাকে, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। সে ভাব ভাষায় বুঝান কঠিন! শিল্পীকে নয়নের সেই নীরব ভাষায় অতিযত্ন সহকারে শিক্ষা করিতে হয়, পূর্ব্বোক্ত পেশীগুলির আকুঞ্চন বিকুঞ্চনে বা তাহার কিরূপে পরিবর্ত্তন হইলে কি ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তাহারই সাহায্যে প্রস্ফুটিত আস্য রেখা (airs) মুখমণ্ডলের বিশেষ নয়ন-প্রান্তস্থিত রেখাক্ষরে শিল্পীকে পরিচিত হইতে হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্র শিল্পে শারীরাদি বিজ্ঞানের প্রয়োজন নিতান্ত সামান্য নহে!

প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণে পরিমাণ বিজ্ঞানের বিষয় যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কতকটা শারীর বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিতে হইবে। সে সকলেরও বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে, তবে অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত আর্য্য অনার্য্য সকল শ্রেণীর মূর্ত্তি শিল্পীরা অথবা দেবমূর্ত্তির পরিমাণ কল্পনায় যথেষ্ট আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। জগতের সকল সভ্যতার আদিগুরু, পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের চিন্তা ও গবেষণা হইতেই পবিত্র গঙ্গোত্তরীর পূত বারিধারার ন্যায় এই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রথম উদ্ভূত ও প্রবাহিত হইলেও অধুনা প্রতীচ্যবাসীরা তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন্; অপিচ প্রাচ্য কলাসম্ভূত কতিপয় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভাস্কর্য্যাদি যাহা পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয়কালে অধিকাংশ হীন শিল্পীর দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমাদের শারীরস্থান বিদ্যাও তদানুষঙ্গীকে পরিমাণাদি বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার পূর্ব্বাপর বিচার-পরিশূন্য কত শিল্পীর দল অভ্রান্তভাবে সেই সকল আদর্শের হীন অনুকরণ করিয়া তাহাদের উক্তির সমর্থন কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এই সকল শিল্পী যদি সামান্য মাত্রও শিক্ষা ও পরিশ্রম সহকারে পূর্ব্বাচার্য্যগণের লিখিত শিল্প গ্রন্থাদির সামান্য মাত্রও আলোচনা রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ দুর্ণাম আমাদের আজ শ্রবণ করিতে হইত না, পরন্তু সমুন্নত গ্রীসীয় পরিমাণেও যে দোষ আছে প্রত্যুত্তরে তাহা দর্শাইতে পারিতাম! বাস্তবিক তাঁহারা যে নীতিতে মানব মূর্ত্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্য পরিমাণ হইতেই তাঁহাদের এই পরিমান জ্ঞান সংগৃহীত হইলেও স্থূলভাবে আলোচনা করিবার ফলে এক স্থান বিশেষে সামান্য লক্ষ্য হীনতা দোষে তাঁহাদের প্রচলিত পরিমাণ নীতির মধ্যে এক বিষম দোষ করিয়া বসিয়াছেন। সেই কারণ তাঁহাদের প্রসিদ্ধ হারকিউলিস্‌প্রতিম বীর পুরুষের দেহযষ্টি পরিমাণ-বদ্ধ করিতে যাইয়া একটি সুপুষ্ট শরীরের উপর একটি বিসদৃশ ক্ষুদ্র শির বা মস্তক নির্ম্মিত করিয়া গিয়াছেন, সামান্য মনোযোগ দিয়া দেখিলে তাহা আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না। কিন্তু কেন এমন হইল? এত দিনে বোধ হয় তাহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। আর্য্যের একখানি প্রধান শিল্প গ্রন্থ, যাহার উল্লেখ আমি ইতিপূর্ব্বে আরও দুই এক স্থলে করিতে বাধ্য হইয়াছি, সেই বিরাট গ্রন্থ "মানসার" যাহার কিয়দংশ

প্রতীচ্যে "মেনসুরেশন" (Mensuration) বা ক্ষেত্রতত্ত্ব নামে পরিচয় দিতেছে, তাহাতে "উষ্ণীষাৎপাদ পর্য্যন্ত তালত্রয় শতাংশকং" ইত্যাদি দেহ পরিমাণের যে বিস্তৃত বিধি লিপিবদ্ধ আছে তাহা দেখিলে সকলের সকল গোলই মিটিয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে "শিল্প ও সাহিত্য" "মানবমূর্ত্তি অঙ্কন" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি অনেকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কনে দেহের পরিমাণ বিজ্ঞানেরও যে বিশেষ আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধটি সংক্ষেপে লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্রমে দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, এ নীরস প্রবন্ধে সাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, অতএব আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই ইহা শেষ করিব।

চিত্রশিল্পে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান সমূহের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আবশ্যক হয়, যাহার সহায়তা ব্যতীত রঞ্জন শিল্পের অস্তিত্বও সম্ভবপর হইত না। সেই রঞ্জন বা বর্ণের বিজ্ঞান অথবা বর্ণাদির রসায়ন জ্ঞান সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। চিত্রশিল্পীর তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। বিবিধ বর্ণ প্রস্তুত করণ, তাহার মিশ্রণ ও বিলেপনাদি সমস্তই উক্ত বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। এক সময় ভারতের প্রস্তুত বর্ণ লইয়াই সকল দেশের শিল্পীরা চিত্র রচনা করিতেন, কালে তাহার লোপ হইয়াছে, এখন বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল বর্ণ আমদানি হয় তাহাতেই এ দেশীয় শিল্পীকেও তাঁহাদের চিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল উপাদান হইতে বর্ণ প্রস্তুত হইত, যে সকল উপাদান, এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার প্রস্তুত প্রণালী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা নানা কারণে আমাদের ভুলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। আবার কতদিন যে তাহা আমাদের পুনরায়ত্ত হইবে কে জানে? যাহা হউক সেই বর্ণগুলি নানা উপাদান মূলক। কতকগুলি উদ্ভিজ্জ,—তাহা বৃক্ষ লতাদির পত্র, পুষ্প ও কাষ্ঠাদি হইতে জাত; কতকগুলি আকরিক—তাহা মৃত্তিকা, প্রস্তর ও গন্ধকাদি হইতে উৎপন্ন হয়; কতকগুলি ধাতব, অর্থাৎ তাম্র দস্তা ইত্যাদি ধাতু হইতে তাহার প্রস্তুত হইয়া থাকে; আর কতকগুলি জৈব,—সে গুলি কোন কোন প্রাণীর অস্থি কঙ্কাল ও দন্তাদি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই সকল বর্ণের মিশ্রণ ব্যপদেশে কোন বর্ণ কাহার সহিত মিশ্রণ-দোষে চিত্র অনতিকাল মধ্যে বিবর্ণ ও ম্লান হইয়া যাইবে, চিত্রশিল্পীর তাহা অবশ্য শিক্ষা করা আবশ্যক, নতুবা এই বিজ্ঞান

জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ চিত্রই দুই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া যায়।

'চিত্রশিল্পে বিজ্ঞান' এই বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইলে বহু বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার প্রয়োজন হয়, তাহা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। তবে এই প্রসঙ্গে 'প্রাচ্য চিত্রকলা' স্থানে স্থানে শব্দের উল্লেখ করিয়াছি ; সেই সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া ইহা শেষ করিব।

'প্রাচ্য চিত্রকলা' এই বিকৃত শব্দের পরিবর্ত্তে আমাদের 'আর্য্য বা ভরতীয় চিত্রকলা' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কারণ, প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সকলের আদিতে এই ভারতে চিত্রকলার আবিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাই সমুন্নত বিজ্ঞান সিদ্ধ শিল্প বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। ভারতের এ শোচনীয় দুর্দ্দিনে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। পুনরায় তাহার উদ্ধার করিতে হইলে, রীতিমত সেই সকল বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে। ভারতের ইতিহাস, কাব্য ও পুরাতত্ত্বাদির অনুসন্ধান সহ প্রকৃত ভারতীয়-চিত্রকলা-শিক্ষা ও তাহার সংস্কার করিতে হইবে। ভারতের বিমল ও উন্নত পদ্ধতির মধ্যে প্রাচ্যের সকল চিত্র-প্রণালীর সঙ্করত্ব বা সাধারণ ভাষায় তাহার "ঘণ্ট" রূপে 'পারসীক', চৈনিক, মোগলিক আদি প্রাচ্যেরই বিভিন্ন অনুন্নত চিত্রপদ্ধতির সম্মিলন কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে ; কারণ, তাহাতে সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক বিধির সমাবেশ নাই, তাহা তত্তৎপ্রদেশের চিত্রজীবী সাধারণ ব্যক্তিরই কর রচিত। ভারতের ঋষি ও রাজন্যবর্গের ন্যায় সে সকল প্রদেশের কোনও উন্নত সমাজের মধ্যে চিত্রকলা-শিক্ষার প্রচলন বা আদর বিধিবদ্ধ ছিল না। যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলার উন্নতির পক্ষপাতী, তাঁহাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন, যত দিন না শিক্ষিত ও মেধাবী ব্যক্তিগণ এই বিজ্ঞানমূলক চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, ততদিন প্রকৃত ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধার হইবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিজ্ঞানই শিল্পের প্রাণবায়ু, যে কোনও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার মূলীভূত বিজ্ঞানের উন্নতি করা প্রথম প্রয়োজন। তাহার বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে তাহারই উপর শিল্পের কলা-চাতুর্য্য ও পরিকল্পনা-সিদ্ধ উন্নত ভাবাবলী প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্যথা কেবল প্রাণপণ পরিশ্রম করিলে চিত্রের সেই অব্যক্তভাবসমূহ কখনই ফুটিয়া উঠিবে না। সুতরাং যথার্থ ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতি কখনই সম্ভবপর হইবে না। এই স্থলে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, চিত্রকলা-পদ্ধতি ভাব ও রুচিভেদে প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের মধ্যে বহু পার্থক্য সম্ভবপর বা সঙ্গত, কিন্তু তাহার বিজ্ঞানের মধ্যে সেরূপ কোনও বিভেদ নাই, অথবা তাহা কখনও সম্ভবপরও নহে। ইহা প্রত্যেক শিল্পানুরাগীর আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (১)

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

উদ্ভিদ-শিশুর পরিপুষ্টি।

—:*:—

প্রাণিজগতে দেখা যায়, সন্তান যতদিন মাতৃজঠরমধ্যে অবস্থান করে, ততদিন সে মাতার দেহ হইতে শরীরপোষণোপযোগী তাবৎ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জগতেও সে নিয়ম বিশেষভাবে বর্ত্তমান। ভ্রূণরূপে যতদিন ভাবী উদ্ভিদ বীজমধ্যে অবস্থান করে, ততদিন সে বীজের শাঁস দ্বারা পরিপোষিত হইয়া থাকে, এবং অঙ্কুরিত হইবার পরেও অল্পাধিককাল তাহাতেই জীবনধারণ করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে প্রাণীদিগের শিশুগণ জননীর স্তন্যপান করিয়া জীবনধারণ করে, এবং বয়োবৃদ্ধিসহকারে বাহিরের দ্রব্য পানাহার করিতে এবং খাদ্যাদি আহরণ করিতে শিখে। বীজভেদ করিয়া উদ্গত হইবার পর শিশুচারা সেইরূপ বীজের দল বা শাঁসের সাহায্যে জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। এক দিকে, চারার কলেবরবৃদ্ধির সহিত বীজের দল যত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অন্য দিকে শিশু চারার নূতন শিকড় ও পত্র উদ্গত হইয়া বহির্দ্দেশ—ভূমি ও বায়ুমণ্ডল হইতে তত আহারীয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এ স্থলে বলিয়া রাখি, বীজ বা দানামাত্রই সদল নহে। অনেক দানা বীজের আকার ধারণ করে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এরূপ অনেক দানা থাকা সম্ভব, যাহাদিগের মধ্যে দল নাই, কিংবা দল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঈদৃশ বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না, গ্রাম্য ভাষায় ইহাদিগকে 'ফোক্‌লা' বীজ কহে। তবেই হইল যে, যে দানার মধ্যে দল আছে তাহাই বীজ,—অনেকে তাহাকে তাজা বীজ কহিয়া থাকেন। যাহা হউক, দলের মধ্যে উদ্ভিদের দেহধারণের পযোগী যে সকল পদার্থ ঘনীভূত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, শিশু চারার মধ্যে তাহা

(১) গত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

কি উপায়ে প্রবিষ্ট হয়, বা কি প্রণালীতে তাহার পরিবৃদ্ধির সহায়তা করে, এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা যে প্রতিদিন চাউল গোধূম দ্বিদল (ডাল) ভোজন করি, তৎসমুদায়ই দল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোনটী পূর্ণদল বা একদল, যথা চাউল বা গোধূম; কোনটী দ্বিভক্ত দল, যথা মুগ, অড়হর, বুট প্রভৃতির ডাল; কিন্তু সকলগুলিই দল। উক্ত দল একটী আবরণ-মধ্যে থাকে; তাহাকে আমরা খোসা বলিয়া থাকি। ধান্য হইতে খোসা স্বতন্ত্রীকৃত হইলে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, তখন আর তাহাকে তণ্ডুল বা চাউল না বলিলে ভুল হয়। সেইরূপ দাল কলাই ভাঙ্গিয় যুক্তদলকে আমরা ভগ্নদলে পরিণত করি; অতঃপর তাহাদিগকে আমরা ডাল বলি; অনেকে কিন্তু 'দাইল' বলেন। যাহা হউক, ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণ ও কতকগুলি দ্বিভক্ত; কেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়, সুতরাং এ স্থলে তাহার আলোচনা করিব না।

বীজের যে একটী আবরণ বা খোসা আছে, তাহার মধ্যে দলের স্থান। উক্ত দলের কোনটীকে চূর্ণ করিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার আবির্ভাব হয়; চাউলের গুঁড়া, দালের গুঁড়া, ব্যাসম, ছাতু, আটা, ময়দা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এতদ্দ্বারা আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, অসংখ্য কণিকার সমন্বয়ে দলের উৎপত্তি। প্রত্যেক কণিকা এক একটি কোষ। আবার প্রত্যেক কোষই উদ্ভিদের সংক্ষিপ্তসারস্বরূপ; কারণ, সেই কোষ উদ্ভিদশরীর-সুলভ—শ্বেতসার (Starch), শর্করা (Sugar), অণ্ডনাল (albumen), উদ্ভিজ্জ-বসা (vegetable fat) প্রভৃতিতে পূর্ণ। উক্ত পদার্থনিচয় বীজ বা দলমধ্যে অবস্থানকালে সঙ্কুচিত বা ঘন অবস্থায় থাকে। বারিসংস্পৃষ্ট হইলে বীজের মধ্যে যতই জল প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তদন্তঃস্থিত কোষনিচয় তত বিগলিত হইয়া জলের সহিত একীভূত হয়। এক্ষণে কোষান্তর্গত ঘনীভূত পদার্থগুলি সম-সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নবজাত শিশু-উদ্ভিদকে পালন করিতে থাকে।

বীজমধ্যে জল প্রবিষ্ট হইবার জন্য বীজগাত্রে দুইটী ফটক বা গেট আছে। কোনও একটী বীজ লইয়া পরীক্ষা করিলে সহজেই দেখা যায়, তাহার কোনও এক স্থানে একটী অল্পাধিক বন্ধুর দাগ আছে। উক্ত দাগটী অঙ্কুরণের স্থান। ইহার উভয় পার্শ্বে অতি সূক্ষ্ম এক একটী ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রদ্বয়কে এ স্থলে ফটক বা প্রণালী নামে অভিহিত করিলাম। সেই বিশেষ স্থানটীকে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলে সহজে আর বীজের মধ্যে রস প্রবেশ করিতে

পারে না। তথাপি যে প্রবেশ করে, তাহার অন্য কারণ আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া রাখা ভাল। মাটীর কলসীর মুখটীকে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত রাখিলে তাহার মধ্যে অবশ্যই জল প্রবেশ করিবে; কারণ, কলসীর গাত্র সচ্ছিদ্র বা Porous, বীজের গাত্রও সেইরূপ সচ্ছিদ্র; সুতরাং তাহার গাত্রস্থ কূপ (Pores) দ্বারা ভিতরে জল প্রবেশ করে। ইহাকে জলের চৌর্য্য-প্রবেশ (Percolation) কিংবা বীজের চৌর্য্য-আহরণ (absorption) বলিলে ক্ষতি হয় না। এতদুপায়ে বীজের মধ্যে রস-প্রবেশের বিলক্ষণ বিলম্ব হয়।

উক্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহিরের রস বীজের মধ্যে প্রবেশ করে; ফলতঃ বীজ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠে। বীজের নিজস্ব গুরুত্বের একচতুর্থাংশ হইতে এক-একচতুর্থাংশ অর্থাৎ সওয়া অংশ বা পঞ্চচতুর্থাংশ রস বীজমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দলস্থিত শর্করা, আঠা (gum) প্রভৃতি সঞ্চিত পদার্থ বিগলিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু বীজান্তর্গত তৈলসঙ্কুল পদার্থ সহজে বিগলিত হয় না; সুতরাং তাহা ভৌতিকতা-নিবন্ধন রূপান্তরপ্রাপ্ত না হইলে উদ্ভিদের কোনও উপকারে আইসে না। অঙ্কুরোদ্গমকালে বীজান্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থনিচয় লঘুত্ব বা প্রাথমিক দশা লাভ করিয়া ভ্রূণের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

বীজের মধ্যে অপরাপর পদার্থের ন্যায় তৈলসঙ্কুল পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। তিষি, সর্ষপ, রাই, মাঠকড়াই, সূর্য্যমুখী-বীজ, মুলা-বীজ প্রভৃতি বহু শস্যই তৈলপ্রধান; সাংসারিক কার্য্যে ইহাদিগের তৈল নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বহু ফল পাকুড়—নারিকেল, বাদাম, তরিতরকারীর বীজ,—কুমড়া, শশা, নানাবিধ কপি-বীজ—প্রভৃতির মধ্যেও তৈল আছে। অঙ্কুরোদ্গমকালে উক্ত তৈল সাক্ষাদ্ভাবে শিশু-উদ্ভিদের বা কোনও উদ্ভিদের কোনও কাজে আইসে না, এবং সহজে বিগলিত হয় না; তবে সে তৈল যে উদ্ভিদের কোনও ব্যবহারে আইসে না, তাহাও নহে। বীজ, রসের সংস্পৃষ্ট হইলে অপরাপর পদার্থের পরিবর্ত্তনের সহিত তৈলেরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ভৌতিকতা-নিবন্ধন তৈলের রূপান্তর ঘটিলে, তবেই তাহা উদ্ভিদের আহার্য্য হয়। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যাক্স্ (Sachs) সাহেবের পরীক্ষা ফলে জানা যায় যে, তাঁহার পরীক্ষাকালে সুপরিপক্ব স্কোয়াস (Squash) নামক সব্জীর বীজে ৫০ ভাগ তৈল ও ৪০ ভাগ বসাজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল; শ্বেতসার, শর্করা, বা আটাজাতীয় কোনও পদার্থই ছিল না। কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমকালে উক্ত স্কোয়াস-বীজের অন্তর্গত সেই তৈল ও বসাজাতীয় পদার্থ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি

লক্ষ্মী মেয়ে।

চিত্রকর—সার জস্থয়া রেনল্ড।

Mohila Press, Cal.

সহজ উদ্ভিজ্জ পদার্থে পরিণত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বীজান্তর্গত তৈল ও বসাকে উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত হইতে হইলে, প্রথমতঃ শ্বেতসার প্রভৃতির ন্যায় অপেক্ষাকৃত সহজ পদার্থে পরিণত হইতে হইবে; অতঃপর সেই পরিবর্ত্তিত-অবস্থাপ্রাপ্ত শ্বেতসারাদি প্রাথমিক পদার্থে পরিণত হইলে, উদ্ভিদের ব্যবহার্য্য হইবে। বীজের অবয়বে যে কিছু পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা তদন্তর্ব্বর্ত্তী ভ্রূণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং পরে অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের কাল হইতে শিশু-উদ্ভিদ যাবৎ না সক্ষম ও স্বাধীন হয়, তাবৎকাল উহার দেহগঠনের ও আহার্য্য-সংস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপতঃ উদ্ভিদ বা ফলের মধ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহা পরবর্ত্তী উদ্ভিদের জন্য। অঙ্কুরের উদ্গম হইলেই যে উদ্ভিদ আপন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা নহে। বীজের তাবৎ পদার্থকে ব্যবহারে আনিয়া, শিশু-উদ্ভিদ আপনার অবয়ব গড়িয়া লয়। এইরূপে মূল, কাণ্ড ও পত্রসমন্বিত হইবার পরে উদ্ভিদ ভূগর্ভ হইতে রস ও বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিতে সক্ষম হয়। উদ্ভিদে বা তাহার ফল ফুল বা বীজে যে তৈলজাতীয় পদার্থ উদ্ভূত হয়, তাহা অপরাপর পদার্থ হইতে ভৌতিক ক্রিয়াবশে উৎপন্ন হইয়া থাকে,—মৃত্তিকা বা বাতাস হইতে হয় না। তাহা ব্যতীত তৈল উদ্ভিদের খাদ্য নহে। প্রায় সকল বীজেই তৈলের একটা ভাগ থাকে,—অল্প বা অধিক ইহাই প্রভেদ। সর্ষপ, তিসি, তিল, মূলাবীজ প্রভৃতি তৈলপ্রধান শস্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক তৈল থাকিতে দেখা যায়। আলু, আরোরুট, শঠী প্রভৃতি কন্দে শ্বেতসারের প্রাধান্য। ইক্ষু, খর্জ্জুর, বীট প্রভৃতি শর্করা-প্রধান উদ্ভিদ। উদ্ভিদ বা তাহার ফলফুলের মধ্যে যে কোনও পদার্থ থাকিতে দেখা যায়, তৎসমুদায়ই উদ্ভিদের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের উপকরণ—মাটী, জল, বায়ু ও রৌদ্র। মানুষে কোনও একটী জিনিস প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিলে কতদিন হইতে কত উপায়ে, কত অর্থব্যয়ে উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু বিশ্বমাতা উদ্ভিদদিগকে দুইটী জিনিস দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; সেই দুইটী জিনিস, পূর্ব্বেও বলিয়াছি—ভূমি ও আকাশ। সেই ভূমি ও আকাশ, সেই জল বায়ু, সেই সূর্য্যালোক লইয়া কোনও উদ্ভিদ শর্করা, কোনও উদ্ভিদ তৈল, কোনও উদ্ভিদ বর্ণ, আবার কোনও উদ্ভিদ সুখাদ্য, কোনও উদ্ভিদ বিষ প্রদান করিয়া জগতের মহা-কল্যাণসাধনে দিবারাত্রি কত না পরিশ্রম করিতেছে! একই মাটীতে জন্মিয়া ও একই আকাশের নিম্নে থাকিয়া কোনও উদ্ভিদ লাল, কোনটী হরিদ্রা, কোনটী

শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছে! এ স্থলে সংক্ষেপে আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বীজের অবয়বে যে সকল পদার্থ সন্নিবিষ্ট থাকে, তৎসমুদায়ের রূপান্তরের মূল কি? দ্রবনীয় পদার্থের পচনকালে ভৌতিক সত্ত্বাপ্রাপ্ত বীজের অভ্যন্তরস্থিত ভ্রূণের নাভি বা গ্রন্থির মধ্যে একটী পদার্থের উদ্ভব হয়, ইংরাজীতে উহা ডায়েষ্টেস্ (Daistase) নামে অভিহিত। আমরা তাহাকে পাচক-চূর্ণ বলিব। কোনও অঙ্কুরিত বীজকে 'কল্' হইতে স্বতন্ত্র করিবার পর সুরাসার (alchohol) সহযোগে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শোধন করিলে একপ্রকার সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ চূর্ণ পাওয়া যায়। উক্ত চূর্ণই Diatase বা পাচকচূর্ণ। উহার মধ্যে শতকরা প্রায় ১০০৪ ভাগ যবক্ষারজান থাকে। বীজের মধ্যে যথাসময়ে উহা প্রাদুর্ভূত হইয়া বীজের অন্তরতম স্থানে সুষুপ্ত ভ্রূণ বা অঙ্কুর-মূলে বা মূল গ্রন্থিতে থাকিয়া বীজস্থিত পদার্থনিচয়কে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। অতঃপর সেই রূপান্তরিত সূক্ষ্ম পদার্থ শিশু-উদ্ভিদের শরীরে অগ্রসর হইতে পারে। ইহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এক দিকে উক্ত সূক্ষ্ম কণিকাগণ দ্বাররক্ষিরূপে অঙ্কুরমূলে বা নাভিস্থলে থাকিয়া বীজের দলগত কিংবা আহরিত কোনও পদার্থকে উর্দ্ধাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেয় না; অন্য দিকে পাচকরূপে বীজের কাঁচা (raw) জিনিসকে পাক করিয়া অঙ্কুরকে প্রদান করে। এক দিকে প্রত্যাখ্যান, অন্য দিকে আহ্বান—মধুর ব্যাপার! আবার সেই পাচকগণের শক্তির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। সেই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কণিকাগণ নিজ নিজ গুরুত্ব অপেক্ষা ২০০০ (দুই সহস্র) গুণ শ্বেতসারকে অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে! এই ডায়ষ্টেস্গণই বীজের দলগত ঘন (Solid) পদার্থনিচয়কেও শর্করাদি পাচ্যপদার্থে পরিণত করিয়া দেয়।

শ্বেতসারের শর্করায় পরিণত হইবার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন। রসসিক্ত বীজে অম্লজান প্রবেশ লাভ করিলে বীজমধ্যে উত্তাপের সঞ্চার হয়। উত্তাপ সঞ্চারিত হইবার পর ভৌতিক ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সমাবেশ হয়। বীজমধ্যে এত ব্যাপার সংঘটিত হইলে, তবেই উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য আহরণোপযোগী হয়; ফলে উদ্ভিদ সুচারুরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি।

বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বঙ্গবিহারের প্রত্যেক গৃহে সুপরিচিত। বিদ্যাপতির নাম বা কবিতার বিষয় না শুনিয়াছেন, এমন বাঙ্গালী বা বেহারী, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ হইলেও, বাঙ্গালীরাও তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া দাবী করিতে ছাড়েন না। তাঁহার কবিতাবলী বঙ্গদেশে এত সুদীর্ঘ কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা, এমন কি, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৎকালে বঙ্গদেশীয় ভাষার সহিত মৈথিলী ভাষার অধিক পার্থক্য ছিল না। সেই সময়ে বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র-পারদর্শী বিবুধমণ্ডলীর নিকেতন মিথিলাদেশে গমনাগমন করিতেন। বিদ্যা-পতির সুললিত পদাবলীর মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া উক্ত বিদ্যার্থিগণ অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত বিদ্যাপতির কবিতাবলীও মিথিলা হইতে আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিরসপ্রধান ধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসাত্মক বিদ্যাপতির পদাবলীও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচারিত হয়। কালবশে বিদ্যাপতির বঙ্গদেশ-প্রচলিত কবিতাগুলির ভাষাও ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়া অনেকটা বঙ্গভাষার আকার ধারণ করে। বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিদ্যাপতির কবিতাবলী ক্রমশঃ কিরূপ বঙ্গভাষাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য নিম্নে কতিপয় বিদ্যাপতির পদাবলী উদ্ধৃত হইল :—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি ॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি ?
বেলা-অবসান-কালে
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়া বদন-চান্দে
তারে ফেলিয়া বিষম ফাঁন্দে
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কাঁন্দে ॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি ॥

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখহ মোর নাম দুই চারি।।
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম।।
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম।।
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে।।
দিনে একবার পাহু লিহে মোর নাম।
অরুণ ভুলহ করে দিহে জল দান।।
বিদ্যাপতি কহে শুণ বরনারী।
ধৈরজ ধর চিত্তে মিলব মুরারি।।

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?
তোমরা যতেক সখী থেকো মরু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মরু অঙ্গে।
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুণে।।
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তামালের ডালে।।
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়।।
করহু সোঁপিয়া যদি আসে বিন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে।।
পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহঅনল মাহ তনু তেয়াগিব।।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি।।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ।।

* * * *
* * *

এইরূপ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা বঙ্গদেশে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার ন্যায়, এবং বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলীর, বিশেষতঃ মিথিলায় ও বেহারে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা হইতে অনেকটা বিভিন্ন। বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। এই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে সমস্তগুলি বেহার অঞ্চলে সংগৃহীতপদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারণে অনুমান হয় যে, অনেক বঙ্গদেশীয় কবিও স্বীয় কবিতা বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই প্রকার বঙ্গ ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির ভণিতা যুক্ত ও বিদ্যাপতিরচিত বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত কবিতাবলীর ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সাদৃশ্যদর্শনে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

৺ রামগতি ন্যায়রত্ন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি বীরভুমের নিকট কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিব সিংহ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বা বীরভূম জেলার মধ্যে কোনও স্থানের পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন, এবং বিদ্যাপতি এই জমীদারের আশ্রয়ে থাকিয়া কবিতাদি রচনা করেন।

এক জন লিখিয়াছেন যে, শিব সিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বঙ্গভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। অপর এক জন লিখিয়াছেন যে, যশোহর জিলার অন্তর্গত ভূগুট্ট গ্রামনিবাসী ভবানন্দ রায়ের বিদ্যাপতি নামক এক পুত্র ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম বসন্ত রায় ছিল, ইনি কবিতাতেই নিজেকে বিদ্যাপতি নামে পরিচিত করিতেন। ইহা তাঁহার উপাধি ছিল।(১) কেহ কেহ এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি-নামধেয় কোনও ব্যক্তি ছিল না, রায়গুণাকর, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যাপতি একটি উপাধি, এবং একাধিক ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।(২)

প্রথমতঃ ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণিত করেন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিব সিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, এবং বিস্ফি গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই বিস্ফি গ্রাম শিব সিংহ বিদ্যাপতিকে দান করেন। (৩) রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতিও রাজকৃষ্ণ বাবুর সমর্থন করেন।

তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ মনীষী গ্রীয়ারসন বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী মিথিলা হইতে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে যে তাম্রশাসন দ্বারা বিস্ফি গ্রাম দান করেন, গ্রীয়ারসন্ তাহা সমস্ত প্রকাশিত করেন।(৪) তিনি পঞ্জী হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির সাময়িক মিথিলার রাজবংশের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত করেন।(৫) এইরূপে বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপে বিদ্যাপতি সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইলেও, কেহ কেহ বিদ্যাপতির বাঙ্গালীত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টায় বিরত হন নাই।(৬)

বিদ্যাপতি বিস্ফি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বিস্ফি গ্রাম এখনও দ্বারভাঙ্গা জেলায় বর্ত্তমান। কিন্তু চারি পুরুষ হইতে তাঁহার বংশধরগণ উক্ত

১। সোমপ্রকাশ ১০ই পৌষ সন ১২৭৯ সাল।

২। " I would suggest the possibility of there having been more than one Bidyapati and that the word is not a proper name but a title like Ray Gunakar or Kabikankan".—John Beams.

৩। বঙ্গদর্শন ; ৪র্থ ভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৫ সাল।

৪। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1893 p. 143.

৫। Indian Antiquary, 1885. Vol. XIX. p. 196.

৬। কৈলাশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বঙ্গসাহিত্য"; ৩১—৩৩ পৃষ্ঠা।

বিস্ফি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত সৌরাঠ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিস্ফিগ্রাম দ্বারভাঙ্গার মধুবনী সবডিবিজনের অন্তর্গত বেণীপট্টি থানার অধীন জরৈল্ পরগণাতে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। (১) এই গ্রামের একটি উচ্চ স্থানকে লোকে বিদ্যাপতির ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই গ্রামে অদ্যাবধি বিদ্যাপতির কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দির ও তাঁহার পাঠশালার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির ভিটার উপর একটি সুড়ঙ্গ আছে; তাহার অনেকটা বুজিয়া আসিয়াছে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে বসিয়া তিনি ভগবৎ-আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন।

বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ বিষ্ণুঠাকুর প্রথম বিস্ফি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সম্ভবতঃ রাজা নান্যদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন। বিষ্ণু ঠাকুরের পৌত্র কর্ম্মাদিত্য মিথিলার রাজমন্ত্রী ছিলেন। পঞ্জীতে ইঁহার নাম এইরূপ লিখিত আছে:—"গড় বিস্ফি নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী।" মিথিলার তিলকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে যে কীর্ত্তিশিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কর্ম্মাদিত্যের নাম উৎকীর্ণ আছে। (২) ইঁহার পুত্র দেবাদিত্য (মতান্তরে শিবাদিত্য) সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বীরেশ্বর ঠাকুর। ইনি "বীরেশ্বরপদ্ধতি", "ছান্দোগ-দশকর্ম্মপদ্ধতি" প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইঁহার গ্রন্থানুসারে দশকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইঁহার ভ্রাতা ধীরেশ্বর ঠাকুরও এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।(৩) বীরেশ্বরের পুত্র প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত চণ্ডেশ্বর রাজা হরি সিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। ধীরেশ্বরের পুত্র জয়দেব ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতামহ ছিলেন। ইনি এক জন পরম যোগী ছিলেন। ইঁহার পুত্র গণপতি ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতা ছিলেন। ইনি কামেশ্বর ঠাকুরের বংশীয় রাজা গণেশ্বর ঠাকুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি পুত্র লাভার্থ কপিলেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া বিদ্যাপতিকে পুত্ররূপে লাভ করেন। মিথিলায় অদ্যাপি কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান আছে।(৪) ইনি "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক এক গ্রন্থের রচনা করেন। ইঁহার মাতার নাম হাঁসিনী দেবী।

---

(১) ব্রজনন্দন সহায় প্রণীত "মিথিলা-কোকিল বিদ্যাপতি"র ভূমিকা।

(২) এই শিলালিপি ২১৩ ল সং অর্থাৎ ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়; যথা:—"আদনেত্র-শশাঙ্কপক্ষেঽদিতে শ্রীলক্ষণক্ষ্মাপতেঃ"।

বিদ্যাপতি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ জানিতে পারা গিয়াছে। সেই সমস্ত ঘটনার তারিখের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুর কাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলেই বিদ্যাপতির জন্ম-মৃত্যুর সময়নির্ণয় সন্তোষজনক হয় নাই। যেহেতু এইরূপ বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে কোনও স্থলে অতি অপরিণত বয়সে অসাধারণ কবিত্ব ও অতি বৃদ্ধ বয়সে অতি শ্রমসাধ্য কার্য্যাদি তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এবং ইহার সমর্থন জন্য অনেককে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ের সহায়ক নিম্নলিখিত ঘটনা কয়টী জানিতে পারা যায়।

১। বিদ্যাপতি রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় পিতার সহিত যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি বালক ছিলেন। গণেশ্বর ২৫২ ল সং বা ১৩৫৯ খৃঃ নিহত হন।(১)

২। এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরিতে একখানি হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকটি বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী গজরথপুরে ২৯১ ল সংএ অর্থাৎ ১৩৯৮ খৃঃ লিখিত হয়।

৩। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ২৯৩ ল সংএ, ১৩২৯ শকে, ১৪৫৫ সংবতে বিস্ফী গ্রাম দান করেন, ইহা উক্ত রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়।

---

(৩) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর রাজা কামেশ্বর ঠাকুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের পুত্র চণ্ডেশ্বর রাজা হরিসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন, ইহা আমরা মণ্ডেশ্বর গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিতেছি। অতএব, চণ্ডেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বীরেশ্বর হরিসিংহ দেবের পরবর্ত্তী রাজা কামেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা অসম্ভব না, হইলেও সামঞ্জস্যহীন বোধ হইতেছে।

"মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির" রচয়িতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বর নান্যদেব বংশীয় রাজা শক্রসিংহ ও হরিসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইহা সঙ্গত হইতে পারে বটে, কিন্তু আবার উক্ত মহোদয় লিখিয়াছেন যে, বীরেশ্বরের ভ্রাতা ধীরেশ্বর রাজা কামেশ্বর ঠাকুরের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু উপরি-উক্ত কারণে ইহাও সামঞ্জস্যহীন বোধ হইতেছে।

(৪) দ্বারভাঙ্গা জেলার জরৈল পরগণার অন্তর্গত হসলপুর গ্রামে এই মন্দির অবস্থিত। এখানে প্রত্যেক বৎসর ফাল্গুন মাসে এক মেলা হয়।

৪ বিদ্যাপতি নিম্নলিখিত কামেশ্বর-ঠাকুরবংশীয় মিথিলার রাজাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন :—

রাজা কীর্ত্তি সিংহ
„ দেব সিংহ
„ শিব সিংহ
রাণী হরপ্রিয়া দেবী
রাজা পদ্ম সিংহ
রাণী বিশ্বাস দেবী
রাজা নর সিংহ।
রাজা ধীর সিংহ
„ ভৈরব সিংহ

৫। রাজা ধীরসিংহ ৩২১ ল সংএ বর্ত্তমান ছিলেন, এবং ইঁহার পরবর্ত্তী রাজা ভৈরবসিংহের সময়ে বিদ্যাপতি পরলোকে গমন করেন (২)

৬। রাজা শিব সিংহ ২৯৩ ল সংএ রাজা হন, এবং ইহার ৩।৪ বৎসর পরেই অর্থাৎ ২৯৭ ল সং এর মধ্যে দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হন। বিদ্যাপতির কবিতা-পাঠে বোধ হয় যে তিনি শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হইবার পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন। যথা :—

স্বপন দেখল হাম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরষ পর সামর রূপ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আর ভেলহু হম আয়ু বিহীন॥(৩)

(১) বিদ্যাপতি-প্রণীত কীর্ত্তিলতা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজা গণেশ্বর আসলান নামক এক জন মুসলমান কর্ত্তৃক ২৫২ ল সংএ নিহত হন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতি" ঠাকুরের পদাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বারভাঙ্গার মহারাজের লাইব্রেরিতে "সেতুদর্পণী" নামক একখণ্ড হস্তলিখিত পুরাতন তাল-পত্রের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে :—"পরমভট্টারক ইত্যাদি মহা-রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবীয়ৈকবিংশত্যধিক শতত্রয়তমাব্দে কার্ত্তিকাবাবস্থায়াং শনৌ সমস্ত প্রক্রত্যা বিরাজমান রিপুরাজ কংশনারায়ণ শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমদ্ধীরসিংহ সভুজ্যমানায়াং তীরভুক্তৌ * * শ্রীরত্নেন চরেণ * * লিখিতমদঃ পুস্তকমিতি।"

(৩) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী।"

রাজা গণেশ্বরের মৃত্যুকালে যদি বিদ্যাপতির বয়স ৮ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে বিদ্যাপতি ২৪৪ ল সং এ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে। রাজা শিবসিংহ ২৯৭ ল সংএ নিরুদ্দিষ্ট হন। অতএব ২৯৭+৩২= ৩২৯ বা ৩৩০ ল সংএ বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ধীরসিংহ ৩২১ ল সংএ বর্ত্তমান ছিলেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা তদীয় ভ্রাতা ভৈরবসিংহের ৯ বৎসর পরে ২৩০ ল সংএ রাজত্ব করা খুব স্বাভাবিক। ২৪৪ ল সংএ বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিলে ৪৯ বৎসর তিনি স্বীয় কবিত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে বিস্ফি গ্রাম দান পাইয়াছিলেন। এই ঘটনা ও ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের নিকট স্বীয় কবিত্বগুণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া আনা, এই ঘটনা খুব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এবং এই ঘটনাগুলি বিদ্যাপতির পরিণত বয়সে সংঘটিত হইবার স্বাভাবিকতা দেখাইবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতি ২৪৪ ল সং বা ১৩৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে ৩৩০ ল সংএ বা ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির যে অনুমানিক জন্মকাল-নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১) তাহা হইতেও আমার নির্দ্দিষ্ট কালের অধিক পার্থক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের খুল্লতাত হরি মিশ্রের নিকট বিদ্যাপতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পক্ষধর মিশ্র ইহাঁর সহপাঠী ছিলেন। পক্ষধর মিশ্র ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

বিদ্যাপতির এক অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন শেষ হইলে তিনি স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। এক দিবস এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি অতিথিশালায় গেলে, সমস্ত অতিথি দণ্ডায়মান হইলেন, কেবল একজন

(১) "২৯৩ ল সংএ তিনি (শিবসিংহ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে, শিবসিংহের বয়ঃক্রম তখন প্রায় ৫০ বৎসর। ৩॥ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হইয়া যান, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই অনুমানই সঙ্গত। শিবসিংহের জন্ম যদি ল সং ২৪৩এ মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ২৪১ ল সংএ বিদ্যাপতির জন্ম, অনুমান করা যাইতে পারে।"

"বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী" ; ভূমিকা।

কৃশকায় অতিথি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলেন। বিদ্যাপতি বলিলেন :—"প্রাঘুণো ঘূর্ণবৎ কোণে সূক্ষ্মত্বান্নোপলক্ষিতঃ।" অর্থাৎ, গৃহকোণে অবস্থিত সূক্ষ্মকীটবৎ অতিথি সূক্ষ্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ শ্লোকের অপরার্দ্ধ দ্বারা উত্তর দিলেন :—"নহি স্থূলধিয়াং পুংসাং সূক্ষ্মে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে।" অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্ম দৃষ্টি-গোচর হয় না। তৎপরে বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

বিদ্যাপতি বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত মিথিলা রাজসভায় যাতায়াত করিতেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে রাজা কীর্ত্তিসিংহের সভাসদরূপে দেখিতে পাই। তিনি কীর্ত্তিসিংহের পৈত্রিক রাজ্যলাভ জন্য দিল্লী গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যলাভ বিষয় বর্ণনা করিয়া কীর্ত্তিলতা নামক গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি রাজা দেবসিংহের সভাতেও বর্ত্তমান ছিলেন। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন।

উভয়ে উভয়ের গুণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাপতি শিব সিংহের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, শিব সিংহ দিল্লিতে কর প্রেরণ বন্ধ করেন, এবং তজ্জন্য দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। বিদ্যাপতি প্রিয় সুহৃদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহার উদ্ধার জন্য দিল্লীযাত্রা করেন, এবং স্বীয় কবিত্বগুণে দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া শিবসিংহকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন।

বিদ্যাপতির কবিতাবলীতে শিবসিংহ ও লখিমা দেবীর নামোল্লেখ যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবার আর কোনও রাজা বা রাণীরই নাম পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শিব সিংহ ও লখিমা দেবীর সময়েই তাঁহার কবিত্বশক্তি সবিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ পদাবলী এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার কবিত্বের যশোভাতি এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, শিবসিংহ তাঁহাকে "নব জয়দেব" উপাধি দান করিয়াছিলেন। শিবসিংহ রাজ্যারোহণ করিয়াই কবিত্ব ও সৌহার্দ্দ্যের পুরস্কারস্বরূপ বিদ্যাপতিকে "বিসৃফি" গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম এত সুবিস্তৃত ছিল যে, এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ মিথিলায় প্রচলিত আছে :—

অমিয়া সৈ হর বিসৃফি বহে।
তেও বিসৃফি পড়লেপরহে॥

অদ্যাবধি বিদ্যাপতির বংশধরেরা এই গ্রাম ভোগ করিয়া আসিতেছেন। (১)

রাজা শিবসিংহ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তৃতীয়বার আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে স্বীয় পুরমহিলাদিগকে বিদ্যাপতির সহিত নেপালের নিকটবর্ত্তী রাজবনৌলী নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাপতি এইখানে দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের সভায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি রাজাপুরাদিত্যের আদেশে ২৯৯ ল সংএ "লিখনাবলী" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই স্থানে তিনি সমস্ত ভাগবত গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া ৩০৯ ল সংএ সমাপ্ত করেন। (২) বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাবধি তরৌণী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাণী লখিমা দেবী, রাজা পদ্মসিংহ, রাণী বিশ্বাস দেবী, রাজা নবসিংহ, ধীরসিংহ ও ভৈরব সিংহের সভা সুশোভিত করেন।

মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থের রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি প্রায়ই অপ্রাপ্য বা বিরলপ্রাপ্য। কোনও কোনও গ্রন্থের কতক অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনও কোনও গ্রন্থের অংশবিশেষ ব্যতীত অধিক দেখিবার সৌভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হয় নাই। তবে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

১। কীর্ত্তিলতা—এই গ্রন্থ রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময়ে রচিত হয়, ইহাতে রাজা কীর্ত্তিসিংহের পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দিল্লী গমন ও পৈতৃক রাজ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ নেপাল মহারাজের লাইব্রেরীতে দেখিতে পান, এবং সেখান হইতে নকল করিয়া আনেন। শ্রীনগরের ৺ রাজা কমলানন্দ সিংহ মহাশয় ইহার ৫টি শ্লোক "সরস্বতী" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের ভাষা

---

(১) এক্ষণে এই গ্রামের জন্য তাঁহারা বৃটিশ গভর্মেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

(২) "মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন, এই ভাগবত গ্রন্থ ৩৪৯ ল সংএ লিখিত হইয়াছিল। এত সুদীর্ঘকাল বিদ্যাপতির জীবিত থাকা, এবং জীবিত থাকিলেও এত বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য অতি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি ৩০৯ ল সংএ ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করেন।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত নয়। ইহা কতক সংস্কৃত ও কতক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। বিদ্যাপতি এই ভাষাকে 'অবহট্ট' ভাষা বলিয়াছেন।

২। পুরুষপরীক্ষা—এই গ্রন্থ রাজা শিবসিংহের আদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে কথাচ্ছলে ধর্ম্ম এবং রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ৪৮টি উপাখ্যান আছে। পুরুষ-নামধারী সকলেই যে পুরুষ নহে, প্রকৃত পুরুষ-পরীক্ষা কি, উপাখ্যানচ্ছলে ইহাতে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গার রসও আছে। এই গ্রন্থের ৩য় শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন :—

শিশূনাং সিদ্ধ্যর্থং নয়পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুকযুষাম্।
নিদেশান্নিঃশঙ্কং সপদি শিবসিংহক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতিকবিঃ ॥৩॥

অর্থাৎ :—অপরিণতবুদ্ধি শিশুদিগের নৈতিক শিক্ষার জন্য ও পৌর-স্ত্রীদিগের জন্য রাজা শিবসিংহের আদেশে কবি বিদ্যাপতি নিঃশঙ্কিতচিত্তে এই সমস্ত গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক ৺হরপ্রসাদ রায় মহাশয় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এই বঙ্গানুবাদ উক্ত কলেজে পড়ান হইত।

৩। লিখনাবলী—বিদ্যাপতি যখন দ্রোণবংশীয় রাজা পুরাদিত্যের রাজ-সভায় রাজবনৌলি গ্রামে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে ২৯৯ ল সংএ উক্ত রাজার আদেশে এই গ্রন্থের রচনা করেন। ইহাতে তৎকালপ্রচলিত পত্রলিখন-প্রণালী লিখিত আছে।

৪। শৈবসর্ব্বস্বসার—রাণী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে রাণী লখিমা দেবী ব্যতীত ভবসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বাস দেবী পর্য্যন্ত মিথিলা-রাজবংশের দানশীলতা, দেবভক্তি ও বীরত্বাদি যশোবর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে রাজকুলদেবতা মহাদেবের পূজা অর্চ্চনার পদ্ধতিও লিখিত আছে।

৫। গঙ্গাবাক্যাবলী—এই গ্রন্থও রাণী বিশ্বাস দেবীর আদেশে লিখিত। এই গ্রন্থের শেষে এইরূপ লিখিত আছে :—

কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতিসূরিণা।
গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা॥

৬। বিভাগসার।—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত। ইহা দায়াধিকারসম্বন্ধীয় স্মৃতিগ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে :—

রাজ্ঞো ভবেশাঙ্করি সিংহ আসীৎ।
তৎসূনুনা দর্পনারায়ণেন।
রাজ্ঞা নিযুক্তোহত্র বিভাগসারং।
বিচার্য্য বিদ্যাপতি রাতনোতি॥

৭। গয়াপত্তন।—এই গ্রন্থ রাজা নরসিংহের পত্নী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত হয়।

৮। দানবাক্যাবলী।—এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত হয়।

৯। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী।—এই গ্রন্থ রাজা ভৈরব সিংহের আদেশে রচিত হয়। (১) ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহাতে দুর্গাপূজা-প্রণালী বিবৃত আছে। অদ্যাপি অনেক স্থলে এই গ্রন্থানুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের অনুচর অদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণকালে মিথিলায় বিদ্যাপতির সাক্ষাৎলাভ করেন। পদকল্প তরুগ্রন্থের দুইটি কবিতা, পাঠে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ঘটনাকে কবি-কল্পনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বীরভূমির অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই তিনি বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই কবি ও কৃষ্ণপ্রেমানুরাগী ছিলেন; এমন অবস্থায় যে উভয়ে পরস্পরের গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি ঠাকুর ও পুত্রবধূর নাম চন্দ্রকলা। ইনি বিদুষী রমণী ছিলেন। ইঁহার রচিত কয়েকটি পদ লোচন নামক কবির সঙ্কলিত "রাগতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী ও কন্যার নাম দুল্হি বা দুর্লভা ছিল, তাঁহার কোনও কোনও কবিতা হইতে জানিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির

১। এতৎ সম্বন্ধে কেহ কেহ মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ হয়, ইহা আমরা পদকল্পতরুর কয়টি কবিতা হইতে জানিতে পারি। চৈতন্যদেবের অনুচর অদ্বৈত প্রভু তীর্থভ্রমণকালে বিদ্যাপতিকে মিথিলায় দেখিতে পান।

বিদ্যাপতি আনুমানিক ৩৩০ল সংএ অর্থাৎ ১৪৩৭ খৃঃ ৮৬ বৎসর বয়সে রাজা ভৈরব সিংহের রাজত্বসময়ে কার্ত্তিক শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে গঙ্গাতীরে পরলোকে গমন করেন।(১) কথিত আছে যে, বিদ্যাপতির চিতাভূমি ভেদ করিয়া এক শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়। B. N. Ry. ষ্টেশন দলসিংসরাইএর নিকটবর্ত্তী সলকলীপুরের একটি শিবমন্দিরকে বিদ্যাপতির চিতাধিষ্টিত শিবলিঙ্গের উপর নির্ম্মিত মন্দির বলিয়া স্থানীয় লোকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। (২)

বিদ্যাপতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও তাঁহার মৈথিলী ভাষায় রচিত কবিতাবলীর জন্যই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কবিতাবলীর কোনও প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ মিথিলায় পাওয়া যায় না। তদ্দেশে বিদ্যাপতির কবিতাবলী এতকাল লোকের মুখে মুখে আবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বরং বঙ্গদেশীয় পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগৃহীত আছে। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, লিখিত না থাকায় মিথিলাতে ও বিদ্যাপতির পদাবলী যে সেইরূপ অবিকৃত হয় নাই, এমনও বলা যায় না। লোকমুখে সেখানেও পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। দেখা গিয়াছে যে, একই 'কবিতা দুই জন মিথিলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ উভয়ের মধ্যে মিল নাই'।

১। বিদ্যাপতিক আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদশী জান।

বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে এক অলৌকিক ঘটনার গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, স্বীয় অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া বিদ্যাপতি শিবিকারোহণে গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করেন। যখন গঙ্গাতীর পঁহুছিতে দুই ক্রোশ অবশিষ্ট তখন তিনি বলিলেন যে, আমি মাতা ভাগীরথীর ক্রোড়লাভ জন্য এতদূর আসিলাম, তিনি কি সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার জন্য এই-টুকু পথ আসিবেন না। এই বলিয়া তিনি ঐস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন রাত্রিকালের মধ্যেই গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া উক্ত স্থানে প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি গঙ্গার স্তব করিতে করিতে উক্ত স্থানে দেহ ত্যাগ করিলেন।

বর্ত্তমান কালে গ্রিয়ারসন সাহেব প্রথমে মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির অনেক পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। তৎপরে হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন।

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিদ্যাপতির বঙ্গদেশ-প্রচলিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সুবিস্তৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বেহারের আরার উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে মিথিলার অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও বিদ্যাপতির জীবনচরিত সহ 'মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি' নামে বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

চারি পুরুষ হইতে বিদ্যাপতির বংশধরগণ বিসফি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সৌরাঠ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতির ১২শ-১৩শ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র।

। * ..

শঙ্খ। একখণ্ড অস্থিমাত্র; কুটিলকণ্ঠ, শূন্যগর্ভ, দীর্ণমেরু এক খণ্ড অস্থিমাত্র। কাহার অস্থি? যে অনন্তের তলে বেড়ায়, অসীম অম্বুনিধির কূলে, গড়ায়, যে জীব সামান্য শব্দ করিতে পারে না, বুঝি বা সমুদ্রের অনবরত হাহাকারে যাহার শ্রবণ বধির, জিহ্বা স্থবির হইয়াছে, এমন নাতিবৃহৎ শম্বূকের অস্থি। এই অস্থিই তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব। ঐ কঠিন কঠ-আবরণের ভিতরে সে তাহার ইহকালের অতি কোমল জীবদেহ লুকাইয়া রাখে। ঐ আবরণের উপর ক্ষণে ক্ষণে নীলাম্বুর ঊর্ম্মিরাশি আসিয়া অব্যা-

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।

হত পরম্পরায়, কেবল আছাড়ি-বিছাড়ি খেলা করিতেছে; ঐ আবরণের উপরে হিংস্রাশ্বাদ সাগরজল আসিয়া আশ্রয় লইতেছে, উহাকে ক্ষয় করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বিধাতার দান, তাই অমন কুটিল আবরণ সাগরের অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হয় না; বরং কঠিনীকৃত চূর্ণকের আকারে উহা নিত্য বিদ্যমান থাকে। এই অস্থি যতদিন সজীব, ততদিন নীরব; যে দিন উহার কুক্ষিগত জীবন অনন্ত জীবনে মিশিয়া যায়, সেই দিন হইতে উহা শব্দের—ধ্বনির—আরাবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে। একবার উহার মুখে মুখ মিলাইয়া ফুৎকার দিলে আজীবন-সঞ্চিত অনন্তের ধ্বনির—প্রতিধ্বনি উহা শুনাইয়া দেয়। চিরজীবন যে হাহাকারের মধ্যে থাকিয়া, যে অব্যাহত বিকট ভৈরধ্বনির লীলার মধ্যে থাকিয়া, উহা নীরবে যে মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দের সংস্কার স্বীয় অস্থির স্তরে স্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, যেন তাহাই নরনারীর অধরৌষ্ঠের সম্মিলনে আবার ফুটাইয়া তোলে। ইহাই শঙ্খ, যাহা মরিয়া জীবনের সুখসোহাগের প্রতিধ্বনি করে, যাহা সাগরের শব্দমহিমার পরিচয় তোমাকে দিয়া দেয়, যাহা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে শব্দের—নাদের বন্ধনীস্বরূপ, তাহাই শঙ্খ।

কবি শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বড়াল এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন;—আবেগ ও আবেশ মিলাইয়া, সাধ ও সোহাগ জড়াইয়া স্মৃতি ও বিস্মৃতির মিলন ঘটাইয়া, কি জানি কোন্ অজানা দেশের বার্ত্তা শুনাইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় বড়াল কবি এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন। তোমাদের শ্রবণে সে রব—ভাবের সে ঘনঘোর নির্ঘোষ পঁহুছিয়াছে কি? একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া সৃষ্টিধর ভগীরথ পতিতপাবনী দুকুলপ্লাবিনী মন্দাকিনীকে ধরাধামে নামাইয়াছিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত প্রবঙ্গা গঙ্গার কুল্ কুল্ ধ্বনিতে ভারতভূমি নিত্যমুখর হইয়া আছে। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া পরশুরাম পিতৃঋণ-পরিশোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন;—ধরাধাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি মা জানকীকে মিথিলা হইতে অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। হরধনুর মড়্ মড়্ ঘোর রবের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শঙ্খের কল্যাণ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। আর একদিন ভারত-জীবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে এই শঙ্খ বাজাইয়া গীতার অশরীরী গীতের সপ্তস্বর মুখর করিয়াছিলেন;—তিন গ্রাম,—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—তারা, উদারা, মুদারা—পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। আর

সর্ব্বশেষে সংযুক্তার বিবাহ-বাসরে এই শঙ্খ একবার মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে কি সে সব শব্দ? সে আহ্বান, সে উদার ও উন্নত আকিঞ্চন,—ধ্বনি মনে পড়ে কি? শুন শুন! ভারত-সাগরের প্রত্যেক তরঙ্গের অভিঘাতে সফেন কোটীবুদ্বুদ-মণ্ডিত জলবিস্তারে—বেলাভূমির উপর ব্যর্থ আঘাত-পারম্পর্য্যে বুঝি বা এই সকল শব্দ লুকান আছে;—যুগযুগান্তরের, কল্পকল্পান্তরের এই শব্দস্মৃতি যেন জড়ান মাখান আছে। কবি সেই অনন্ত সমুদ্রের অক্ষত শব্দভাণ্ডারের তটভূমি হইতে অক্ষয় শঙ্খ আহরণ করিয়া, আজ সোহাগ-ফুৎকারে উহাকে শব্দময় করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই শঙ্খ-কবিতা, আরাবের মঞ্জুষা, ধ্বনির পরম্পরা। শুনিয়াছি, শব্দই ব্রহ্ম; এই শব্দ তিনবার ধ্বনিত হইয়া ত্রয়ীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই শব্দই ব্রহ্মার ওঙ্কার, পিনাকপাণির হুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব। এই শব্দই সুখ-দুঃখ-অসুখের অভিব্যঞ্জনা। এই শব্দই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ ও সম্ভোগের পরিচায়ক। ইহাই বিরহের হাহাকার, মৃত্যুর গদ্‌গদ্ ভাষা, চিতার চট্‌পটা। ইহাই জীবন ও মরণ, বিরহ ও মিলন,—ইহাই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বময়। কেমন করিয়া বুঝাইব—ইহা কি ও কেমন? শব্দের ত তুলনা নাই। যে শঙ্খ সূতিকাগারের দুয়ারে বাজে, যে শঙ্খ বিবাহের ছাল্‌নাতলায় বাজে, যে শঙ্খ মহাপ্রয়াণের দিনে বাজে, সে ত সবই একই শঙ্খ, একই ধ্বনি, একই নাদ। কিন্তু শ্রবণে পৃথক শুনায় কেন? ঐ এক সুরে বাঁধা শঙ্খ কখনও হাসে, কখনও কাঁদে কেন? কি জানি কেন! কবি বুঝি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন। অক্ষয় কবি উত্তর করেন নাই, ভঙ্গী দেখাইয়াছেন;—

> 'আসে যায়—কেহ নাহি চায়, সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি;
> কে শুনিবে হৃদয়ে আমার ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি!'

ঐ ত গোল! এ জগতে কেহ কাণ পাতিয়া শুনে না, সবাই চাহে, সবাই আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত থাকে, লইতেই ব্যস্ত হয়, শুনিতে চাহি না। চিকিৎসক যন্ত্রসাহায্যে হৃদয়ের গুরু-গুরু ধ্বনি শুনেন না, রোগ আছে কি না, তাহাই নির্ণয় করেন। প্রণয়িনীও সে শব্দ শুনে না, কেবল প্রেম আছে কি না, তাহারই অন্বেষণ করে। শিশুপুত্র বুকে মাথা দিয়া সে শব্দ শুনে, কিন্তু বুঝিতে পারে না, তাই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে জনকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই 'অনন্তের ধ্বনি' যে শরীরী হইয়া রক্তমাংসের অবয়ববিশিষ্ট

হইয়া পুত্ররূপে বুকে শুইয়া আছে, শিশুকে এ বারতা ত কেহ দেয় না। বড়াল কবি সে খবর একটু দিয়াছেন।

'কিংবা আজীবন এই হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ—
অণু পরমাণু মত ঘুরিত রে অবিরত,
ঘুরে' ঘুরে' এত পরে ধরেছে ও দেহ।'

* * *

'অনাদি-অনন্তরূপা মহাকাল মায়া,
আয়, বুকে আয়।
আয় সৃষ্টি-স্থিতি-মূর্ত্তি, আয় বিশ্বরূপা-স্ফূর্ত্তি,
কি যত্ন করিব তোরে—স্নেহে না কুলায়।'

স্নেহে কুলায় না বলিয়াই এত আকুলি-বিকুলি, এমন হা হুতাশ, স্নেহে কুলায় না বলিয়া ভাষা যুয়ায় না, কথা বলি বলি করিয়া বলা হয় না। তাই কবির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। কবি অক্ষয়, অক্ষয় শঙ্খে ধ্বনি করিয়া বলিতেছেন ;—

'ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক্ মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্ত-প্রধান।'

ইহাই শঙ্খের ধ্বনি। ইহাই শব্দ-ব্রহ্ম—আপ্তবাক্য। শঙ্খ না হইলে এমন ধ্বনি ফুটিয়া উঠে না। তাই প্রথমেই শঙ্খের পরিচয় দিতে হইয়াছে।' এমন শঙ্খের রব যে ব্রহ্মময়, তাহাও বলিতে হইয়াছে। নহিলে এমন সমাচার শুনিতে পাই! ইহাই অনন্ত-ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ইহাই বংশীরব। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিব। কবিই বলিয়াছেন ;—

'শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি-তুমি,
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা।
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা।'

ইহাই জীবনের জিজ্ঞাসা ; ইহাই শাস্ত্র, ইহাই বেদ ও বেদান্ত। আমি আছি যখন, তখন তুমি আছই ; কেন না, আমার আমিত্বের উপলব্ধি যখন হইয়াছে, তখন তোমার তুমিত্বের অধ্যাস আমাতে হইয়াছে-ই। আমি তাই তোমাকে আমার করিতে চাহি, বা আমাকে তোমার করিতে চাহি। এই তোমার-

আমার মিলনচেষ্টা এবং বিরহ-অনুভূতি লইয়াই সংসারের সুখ দুঃখ। কিন্তু এই সুখ-দুঃখে দেহই বিষম অন্তরায়। দেহ আছে বলিয়াই ক্ষুধা আছে, দেহ আছে বলিয়াই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই বলিয়াই তুষ্টি তৃপ্তি নাই। এই অতৃপ্তির জ্বালা—বিষম জ্বালা; তাই খুঁজি সুধা। সেই সুধার আস্বাদ ভাগ্যে যদি থাকে ত, আমরা লাভ করিতে পারি। চাই অব্যাহত সুখ, অনন্ত তৃপ্তি। দেহের সাহায্যে কেবল এই সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতি হইয়াছে। এই দেহজন্যই তোমার-আমার বিভেদ-বিচার, এই দেহ-জন্যই তুমি—তুমি, আমি—আমি। তাই অমরতার জন্য এত প্রয়াস। তোমার অমরতা এবং আমার অমরতা—উভয়ের অক্ষয়তার জন্য এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই তত্ত্বকথাটি কবি অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যখন মনে হইবে, আমিই একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্যপ্রধান, তখনই আমার আত্মার টুকরাগুলি—সন্তানসন্ততিগুলিকে হৃদয়ব্রহ্মাণ্ডে অণুপরমাণুর মত ঘূরিত বলিয়াই মনে হইবে। এক এবং অদ্বিতীয় আমি বহু হইবার সাধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক আমি বহু হইলাম; গতিকেই বলিতে হয়, আমার হৃদয়ব্রহ্মাণ্ডে যে অণু-পরমাণুগুলি ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সাকার হইয়া আমারই আত্মজ-আত্মজা-রূপে প্রকট হইয়াছে। অক্ষয় কবি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গূঢ় তত্ত্ব অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইউরোপের ফিলজফি এই সিদ্ধান্তের—এই আত্মতত্ত্বের তেমন সমাচার রাখেন না। ইউরোপের কবিও মহাবাক্যের এমন প্রতিধ্বনি করিতে পারেন না। এই তুমি ও আমির খেলা, এই আমি ও তুমির সম্বন্ধ-বিচার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব, উহাই জীবননাট্যের প্রথম শঙ্খধ্বনি; উহাই আদি, উহাই অন্ত। বুঝিবে কি? যদি বুঝিতে চাও ত বড়াল কবিকে বুঝিয়া লও। উঁহার শঙ্খধ্বনির ভঙ্গীটা জানিয়া লও। প্রভাতে কবি গাহিয়াছেন,—

> 'বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন।
> চিরদিন ধরি-ধরি,
> খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি,
> সেই এই-এই করি যাবে কি জীবন?'

ইহা ভোরাই গান, ভৈরবীর উদাস তান। একবার মধ্যাহ্নের গৌড়-সারঙ্গ সুরটা শুন। কবি বলিতেছেন,—

> 'হৃদয় এলায়ে পড়ে, যেন কি স্বপন-ভরে।
> ঢুলে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে।

অন্যমনে চাহি' চাহি'— কত ভাবি, কত গাহি।
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে খসে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে।'

মধ্যাহ্নের এই গানের পর কবি 'আকুল হৃদয়ে কাঁদে কোথা তুমি—তুমি'। সকালে বুঝি না, মধ্যাহ্নে ছায়া-ছায়া কত ব্যথা—বুঝি বা ধরি-ধরি করিয়া ধরিতে পারি না; শেষে সায়াহ্নে তোমার খবর—তাহার খবর যেন একটু বুঝিতে পারি, যেন একটু ধরিতে পারি, তখন উদাস প্রাণে কোথায় তুমি বলিয়া কাঁদিতে হয়। কাঁদিয়াও নিবৃত্তি হয় না, তাই বলিতে হয়—

'ছায়া-ছাড়া হয়ে কেন বেড়াইছ ভাসি?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি।
নাহি কথা, নাহি ব্যথা— কি গভীর নীরবতা।
হৃদয় হৃদয়ে পড়ে উচ্ছ্বাসি—উচ্ছ্বাসি।'

কবির এইটুকু বলিয়া যেন সাধ মিটিল না;—যেন সবটা বলার মতন বলা হইল না। তাই ডাক দিয়া কবি বলিতেছেন,—

'দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।

*   *   *

দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মস্ত ব্রহ্মানন্দ তাই।'

ইহাই শব্দের ফিলজফি, শব্দের তত্ত্বকথা, উহার অনাহত ধ্বনি। এইটুকু বুঝাইব কেমন করিয়া? বলিয়াছি ত, ইহাই বেদ-বেদান্ত, ইহাই তন্ত্রতত্ত্ব, ইহাই মানবতার আধার, পুরুষকারের বেদী।

কবি কে? যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন;—যাহা বলি-বলি বলা হয় না—যাহা বলি-বলি বলিতে পারি না,—কবি তাহাই স্পষ্ট বলিয়া দেন। কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হন না; কবি এমন করিয়া কথাগুলি বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে অনেক নূতন কথা, কত অ-জানা দেশের অপরিজ্ঞাত কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে সব কথা বলা যায় না, পরন্তু বুঝা যায়;—বুঝি বা তেমন করিয়া বুঝাও যায় না, তবে কেমন-যেন কি-রকম ভাবে

সে সব কথা আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে। তাই বলিতে হয় যে, সে সব বিষয়ের ভাষা নাই; অভিব্যঞ্জনার কোনও উপায় নাই।' ভাগ্যে থাকে, বুঝিতে পারিবে; ভাগ্যে না থাকে ত এ জীবনে আর সে বিষয়ের বোধ ও বোধ-লক্ষণা কোনও কিছুরই উপলব্ধি হইবে না। কাজেই বলিতে হয়, কবি বুঝান না—দেখান; কদাচিৎ দেখাইতেও পারেন না—কেবল ভাবান। কবি বলিতেছেন;—

'দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তাই।'

বুঝাও দেখি, ইহার মর্ম্ম! রসতত্ত্ব নিঙ্গাড়িয়া নিঙ্গাড়িয়া বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে পার; পরন্তু যে রসিক নহে, তাহাকে ইহার মাধুরী কখনই বুঝাইতে পারিবে না। আমি ও তুমি—ইহারা দুই জন কাহারা? আমি? পৃথিবীবাসী শতকোটী নরনারী বলে 'আমি'—কে আমি? বলিবে আত্মা? সে আবার কি সামগ্রী? সে আবার কেমন পদার্থ? সবাই আমি—আমি বলে, সবাই আমাকে লইয়া ব্যস্ত; পরন্তু কেহই 'আমি' পদার্থটাকে চিনে না, জানে না। উহা জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত, করতলগত হইয়াও আকাশের চাঁদ, হৃদয়ের সামগ্রী হইয়াও স্বপ্নের নিধি। এ যে সব আমি! —আমি-ময়, আমি মাখা, আমিত্বে ঢাকা! আমার পরিচয় আমি দিব কাহাকে? আমার পরিচয় শুনিবার লোক নাই বটে, পরন্তু সে পরিচয় দিবার সাধ আমাতে আজন্ম—অনাদি কাল হইতে গাঁথা আছে। আমি সেই পরিচয় দিতে চাহি বলিয়াই, সে পরিচয় দিতে না পারিলে আমার শান্তি, তুষ্টি, তৃপ্তি, ক্ষান্তি হয় না বলিয়াই,—আমি 'তোমাকে' খুঁজিয়া বেড়াই। কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তর করাও বড় কঠিন। আমি আছি বলিয়াই তুমি আছ, পরন্তু আমি যেমন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত তুমিও তেমনি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তোমায়, যখন নির্নিমেষনয়নে দেখিতে থাকি, তখন তোমাতে আমি আমাকে দেখি কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সে দেখায় যে মাধুরী ফুটিয়া উঠে, আমি তাহাকে প্রেম বলি, রস বলি, মধুরতা বলি। কেন বলি? বড় সাধ—তোমাকে আমি আমার করিয়া লইব; বড় আশা—আমি তোমার হইয়া থাকিব। কেন এমন সাধ হয়? পরকে আপনার করিবার, আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিবার, প্রাণ লইয়া এই রসের হাট—সংসারে কিরি করিবার কেন

এমন সাধ হয়? হয় বলিয়াই হয়—হইতে হয় বলিয়াই হয়—'স্বভাব এই যে তোমা বৈ আর জানি না,' তাই হয়—নিয়তির এমনই বিধান, তাই হয়! কেন হয়, কে বলিতে পারে! স্বয়ং সদাশিব এইখানে মূক। কাজেই বলিতে হয়, মত্ত ব্রহ্মানন্দ তাই। কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে হইলে যে প্রীতির প্রয়োজন, সে প্রীতি যে অতি অসহায়, কবি অক্ষয় তাহা খুলিয়া লিখিয়াছেন। অহঙ্কারের বেত্রাঘাতে প্রীতির যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। সেই অহঙ্কার-বিবশা শ্রীরও অভিব্যঞ্জনা কবি করিতে ছাড়েন নাই। আমার শাস্ত্র এইখানে আসিয়া কবিকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। চণ্ডী অতুল্য ভাষায় বলিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রীতি ও শ্রীজগন্ময়ী জননী - মা অন্নপূর্ণা! এক কথায় জীবনভরা তপ্তশ্বাসের ঝঞ্ঝা মলয়সমীরে—সুখ-শিহরণে পরিণত হইল। সাধকে এবং কবিতে এইটুকু পার্থক্য। কবি সদাই মৃগমদমত্ত, স্বীয় কল্পনাগত সৌরভে আকুল; সাধক সে কস্তূরীমঞ্জুষা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেন। আশীর্ব্বাদ করি, অক্ষয় কবি, অক্ষয় সাধক হউন।

'এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে থাকি সুর দিতে, ফুলে থাকি তুলে নিতে;
স্বপ্ন থাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল!'

বটেই ত! সে যদি গো আসিত কেবল! ঐ দুঃখেই ত জীবনে মরণ ঘটিয়াছে,—ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে মরণে জীবনলাভ করিতেছি। সে যদি গো আসিত কেবল!—শতচাঁদ নিঙ্গড়ান সুধা-মাখান নিধি আমার, জীবনমরীচিকার হেম-মৃগ আমার, সে যে আসে—আসে করিয়া আসে না,—ধরা দেয়—দেয়—দেয় না। শ্মশান-ক্ষেত্রে গঙ্গার তীরে চিতা-চুল্লী জ্বালিয়া যখন বসিয়া থাকে, গঙ্গার কোটীবীচিবল্লরীবিতানের কুল্‌-কুল্‌ ধ্বনির উপর দিয়া যে সময়ে বাতাস বহিয়া যায়, তখন মনে হয়, তাহার অঞ্চলখানি বুঝি কপোলের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। যায় বটে, কিন্তু আর আসে না। চমক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ মিটে না। পরিণয়-বাসরে ফুল-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যখন বসিয়া থাকে, তখন পার্শ্বে চেলাঞ্চলবিমণ্ডিতা বালিকার সাবধান প্রশ্বাসের শব্দে মনে হয়, সে বুঝি গো আসিয়া বসিল!

পরক্ষণেই সব অন্ধকার—স্তব্ধ, শান্ত, সংযত, স্থবির! চমক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ যে মিটে না। এমনই জীবনের সকল ব্যাপারে, পদে পদে, উঠিতে—বসিতে, খাইতে—শুইতে কেবল ঠকিতে থাকি; কোটী জন্মেও ট্যান্টালসের তৃষার উপশান্তি ঘটে না।

'বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে!'

তাই বুক ফাটাইয়া—গগন পবন স্তব্ধ করিয়া বলিতে হয়—দুই বাহু তুলিয়া, উর্দ্ধনেত্র হইয়া ফুকারিয়া বলিতে হয়,—'কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান!'

ইহাই শঙ্খ! মড়া হাড়ের শুষ্ক নীরস পঞ্জর ভেদ করিয়া ইহাই শঙ্খধ্বনি! জন্ম-জন্ম এমনই ভাবে কত শঙ্খ বাজাইলাম—কত কাঁদিলাম, কত হাসিলাম। সাগরকূলে ঐ মৃত অস্থিখণ্ডের শব্দ-মহিমা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলাম না। কাহাকে ডাকে? কাহার আহ্বান এমন শুষ্ক রব করে?

'এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্ত, জয়দেব-ধ্বনি;
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!'

এস—এস! বাঙ্গালার অনন্ত অতীতের শঙ্খবাদকগণ, তোমরা সবাই একবার এস। বলিতে পার কি, এখনও কেন শঙ্খ বাজাই! বলিতে পার কি, এখনও কেন গৃহলক্ষ্মীদের হাতে ঐ শঙ্খ দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করি! কেন তাহাদের স্নেহ-ফুৎকারের একটানা শব্দে প্রমত্ত হই? কেন শ্মশানের হাড় লইয়া এখনও সংসার-লীলাকে মুখর করি?

অশরীরিণী বাণী এ জিজ্ঞাসার উত্তর করিবে। বঙ্গাল কবি সে উত্তরের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই 'শঙ্খ' পড়িয়া আমি ধন্য হইয়াছি। বিস্মৃতির ভস্মস্তূপ এক ফুৎকারে উড়িয়াছে। দেখ—দেখ, ভাগ্যে থাকে যদি তবে একটা স্ফুলিঙ্গও খুঁজিয়া পাইবে। অগ্নিহোত্রীর দেবকুণ্ড এই বিন্দুর সাহায্যে

আবার ধূ-ধূ জলিয়া উঠিবে। ঐ শুন—শ্রবণময় হইয়া শুন, কবি শঙ্খধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

'এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক্ শেষ,
তুমি যেন আর—
একটী একটী করি', ন্যায়-তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার।'

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা।

রামপালের মৃত্যুকাল।

সন ১৩১৯ সালের ৩য় সংখ্যক 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'গৌড়-রাজমালা—উপক্রমণিকা" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিলাম। এই প্রবন্ধে 'সেখশুভোদয়া' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, বলিয়া যে শ্লোকটি ধৃত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের চক্ষে অতীব মূল্যবান; যে হেতু উহাতে রামপালের মৃত্যুকাল কথিত আছে। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের প্রসিদ্ধ রাজবংশীয় কোনও রাজার মৃত্যুকাল যদি কোনও প্রাচীন লিপি হইতে পাওয়া যায়, তাহা অল্প লাভ বলিয়া মনে করা যায় না। মৃত্যুকাল নির্ণীত হইলে, তাঁহার রাজ্যাবসানকালের নিমিত্ত ও পরবর্ত্তী রাজার রাজ্যারম্ভকালের নিমিত্ত অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না; অপরন্তু সমসাময়িক অন্যান্য রাজারও সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর কালনির্ণয়ের সুবিধা ঘটিয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, অক্ষয় বাবু যে শ্লোকটি ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রামপালের মৃত্যুকালবাচক অংশে পাঠের বিকৃতি থাকায়, তদীয় মৃত্যুকাল তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অক্ষয় বাবুর ধৃত উক্ত মৃত্যুকালবাচক শ্লোকাংশ এইরূপ—

"শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্র গতে"

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল (I. C. S.) ১৮৯৪ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে, একটি প্রবন্ধমধ্যে, মালদহের একটি মসজিদ হইতে, তাহার উদ্ধৃত, প্রাচীন পুঁথির যে শ্লোক ধৃত করেন, তাহাতে রামপালের মৃত্যুকালবাচক শ্লোকাংশ এইরূপ—

"শাকে যুগ্মরেণুরন্ধ্রগতে"—P 46.

একে ত উক্ত পাঠ হইতে কোনও কাল নির্ণয় হয় না, তাহাতে আবার উক্ত উদ্ধৃত প্রাচীন পুঁথিতে গণিতাঙ্ক "৯২২ শাকে" রামপালের মৃত্যুকাল, উপরিধৃত শ্লোকাংশের অর্থরূপে লিখিত থাকায়, বটব্যাল মহাশয় কালনির্ণয় করিতে গিয়া বিষম গোলযোগে পড়েন। আমি উহাতে ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে দেখিয়া, ছন্দের উদ্ধারের সহিত, প্রকৃত পাঠের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেই, প্রকৃত পাঠ আমার মনে প্রতিভাত হওয়ায়, আমি যেমন আনন্দিত হই, বটব্যাল মহাশয়, তৎকালে সশরীরে বর্ত্তমান না থাকায়, তাঁহাকে প্রকৃত পাঠ জানাইতে পারিব না বলিয়া, তেমনই দুঃখিত

'কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!'

চিত্রকর— এটী।

Mohila Press, Cal.

হই। তৎকালে আমি "গোবিন্দচন্দ্রগীত" মদুদ্ধৃত প্রাচীন পুথি হইতে সম্পাদন করিতে-ছিলাম। তাহারই টীকায় প্রসঙ্গক্রমে উক্ত শ্লোকটির কালবাচক অংশে সংশোধিত করিয়া ও সমগ্র শ্লোকটি ধৃত করিয়া রামপালের মৃত্যুকাল নির্ণয় করি। (গোবিন্দচন্দ্র গীত, ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনন্তর এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশের জন্য, ঐ বিষয়ের একক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাই। এক্ষণে বুঝিতেছি যে, "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যত্নে যে 'গৌড়বিবরণ' প্রকা-শিত হইতেছে, তাহার কর্ত্তাগণ, মৎকৃত পাঠোদ্ধার ও কালনির্ণয়ের বিষয় অবগত নহেন। 'সাহিত্যে' এ বিষয় লিখিলে, তাঁহারা জ্ঞাত হইয়া 'গৌড়বিবরণে' সংশোধিত শ্লোকটি নিবেশিত করিতে পারিবেন বলিয়া, মৎশোধিত কালবাচক অংশের সহিত সমগ্র শ্লোকাদি 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' হইতে ধৃত করিতেছি—

শাকে যুগ্মকরেণুরন্ধ্রগণিতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যত স্বনশনৈ র্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিং শ্রীরামপালো মৃতঃ॥

যুগ্ম করেণু=৮৮। রন্ধ্র=(শরীরের নবদ্বার)=৯। অঙ্কের বামাগতিক্রমে ৯৮৮ লব্ধ হইতেছে। উদ্ধৃত পুঁথির লেখক ভ্রমক্রমে করেণুকে 'রেণু' ও গণিতকে 'গতে' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শগ্রন্থে নিশ্চয়ই করেণু এই পাঠ ছিল। তিনি করেণুকে—কর অর্থাৎ ২ বুঝিয়া, যুগ্ম করেণু=২২ এবং রন্ধ্র=৯ উহার বামে বসাইয়া ৯২২ করিয়াছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার।

ভাদ্র মাসের সাহিত্যে "শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন"এর পাঠোদ্ধার ও ছায়াচিত্র দেখিলাম। এই শাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"চন্দ্রাণামিহ রোহিতা [ ] শ্বি (?) ভুজাম্বংশে বিশালশ্রিয়া-
ম্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণচন্দ্রসদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ।

পাঠোদ্ধারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন,—'এই শ্লোকে প্রথম পাদে 'রোহিতা' অক্ষরত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবর্ত্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা 'শ্বি' বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটি অক্ষর 'ভুজা' অক্ষরদ্বয়েরসঙ্গে সমাসবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণা' পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'রোহিতাবনিভুজাং' অথবা ঐরূপ কোনও জনপদভোগের কথা উৎকীর্ণকর্ম্মে সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবে-চনা করিয়া দেখিবেন"

বসাক মহাশয় 'রোহিতা'র পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই মনে করিয়া, সেই স্থানে [ ] এইরূপ চিহ্ন দিয়াছেন। যদিও আমি সুধী নহি,তথাপিবিবেচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি বলি, তাম্রফলকে রোহিতা'র পরের।অক্ষরটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। যে অক্ষরটির পর বসাক মহাশয় (?) এই চিহ্ন দিয়াছেন, তাহাই সেই অক্ষর। এই অক্ষর, যাহাকে বসাক মহাশয় 'দ্বি' মনে করিয়াছেন, তাহা 'গি'। এই 'গি'র পরের অক্ষরটি শিল্পীর প্রমাদে উৎকীর্ণ হয় নাই। সে অক্ষরটি হইবে,—রি। অতএব প্রথম চরণের শোধিত পাঠ এইরূপ হইতেছে—

চন্দ্রাণামিহরোহিতাগিরিভুজাং বংশে বিশালশ্রিয়াং

এই 'রোহিতাগিরি' শোণনদতটে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একালে লোকে ইহাকে রোহিতস্-গড়, রোতাস্গড় ও রোহিত বলে। 'রোহিতাগিরি'র ব্যুৎপত্তি ও সংস্থানের প্রমাণাদি আমার 'গৌড়ে সুবর্ণবণিক্' পুস্তকে দৃষ্ট হইবে।

তাম্রফলকের এই শ্লোকটি হইতে বসাক মহাশয় সুবর্ণচন্দ্রকে চন্দ্রকুলজাত মনে করিয়াছেন,—

"বুদ্ধস্য যঃ শশকজাতকমঙ্কসংস্থং
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ।
চন্দ্রস্য তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধঃ
পুত্রঃ শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণচন্দ্রঃ॥"

শ্লোকের ভাবার্থ এইরূপ,—চন্দ্র, শশকশিশুরূপ বুদ্ধকে বক্ষে ধারণ করিয়া বৌদ্ধ সাজিয়াছেন, সুবর্ণচন্দ্রও চন্দ্রত্ব ও বৌদ্ধত্ব হেতু, যেন চন্দ্রের (তস্য চন্দ্রস্য কুলে জাত ইব) কুলে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়।

এই শ্লোক হইতে সুবর্ণচন্দ্রকে চন্দ্রের কুলজাত বলিয়া সপ্রমাণ করা যায় কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বিবেচনা করিবেন। ইনি যদি চন্দ্রবংশীয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রবংশে উৎপত্তির কথা অগ্রেই কথিত হইত। আমি চন্দ্ররাজগণকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া মনে করি। আমাদের কনকক্ষেত্রীদের (তখন সুবর্ণবণিক্ উপাধি হয় নাই) জাতীয় রাজা (প্রথম) শ্রীচন্দ্র, রোহিতাগিরি'তে রাজত্ব করিতেন। এই তাম্রশাসনোক্ত রাজগণকে, তাঁহারই বংশধর বলিয়া মনে হয়। প্রথম শ্রীচন্দ্রের বংশধর এবং আমাদের জয়পতিচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ, সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়া গৌড়মণ্ডলের দিকে অপসৃত হইলে, তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্ররাজদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করেন, এবং উত্তরকালে তাঁহারাও বঙ্গাভিমুখে অপসৃত হইলে, তাম্রশাসনোক্ত ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে রাজা হইয়াছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

এই বেলা।

এখন ত প্রেম জাগে, নয়নে যে রূপ লাগে,
পরাণ শিহরি' উঠে গানে।
কোমল মলয় বায় কি সুধা ঢালিয়া যায়,
এখনো মদিরা কুহু-তানে।
এখন ত ফুলবাসে স্মরণ-স্বপন ভাসে,
বিভল চাহিলে চাঁদ পানে।
এই বেলা,—এই বেলা, না ফুরাতে এই খেলা —
মাধুরীর মেলা না ফুরাতে,
এস মোর স্মৃতিময়, এস মোর প্রীতিময়,
এস, এস, শেষ মধুরাতে।
বাসর সাজায়ে আজি আশা-পথ চেয়ে আছি,
গাঁথিয়াছি বাসনার মালা,
চিরবিরহের ব্যথা মরমে রয়েছে গাঁথা,
শিখাসম প্রাণে জ্বলে জ্বালা।
সমুখে যমুনা-জল, টল-মল ঢল-ঢল,
কূলে কূলে ফুটে কলবাণী।
লহর সোহাগে সাধে চাঁদে চাঁদে মালা গাঁথে,
আঁচল বিছায় ছায়া-রাণী।
স্বপনের মত ধীরে, এস এ যমুনা-তীরে,
বাহিয়া ফুলের ডিঙাখানি।
লহরীর মুখে মুখে যমুনার বুকে বুকে
সোনার হাসির রেখা টানি'।
চাঁদ চমকিয়া চায়, বিহগ মঙ্গল গায়,
ফুলে ফুলে ফলে মধুকণা,
বঁধু হে আসিবে বলে' আকুল নয়ন-জলে
দিয়াছি গো শুভ আলিপনা।
বিনোদ-বাসর-বেশে, সমুখে দাঁড়াও হেসে
একবার মুখ পানে চাও!

নাহি দোঁহে দেখাদেখি, মন বলে দেখি—দেখি,
ও গো বঁধু, জীবন জুড়াও।
আমার পরাণ মাঝে যা কিছু মধুর আছে,
যাহা কিছু দেবতার দান,—
রাঙ্গা পায় লুটাইয়া, চরণে অঞ্জলি দিয়া,
শেষে দিব ব্যথা-ভরা প্রাণ।
ঢালিয়া অমিয়া-রাশি, তখন বাজা'ও বাঁশী—
ঢল-ঢল প্রেমমাখা মুখে,
তোমার বাঁশীর রবে, মরণ মিলন হবে,
জ্বালা মোর মালা হবে বুকে।
অই চাঁদ পড়ে ঢলে, নদী স্থির বনতলে,
'শেষগান অই গায় পিক।
মধু-নিশি-অভিসারে, কামনা-যমুনাপারে
এই বেলা এস, প্রাণাধিক।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অনুপমার প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিরহ।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নবেল পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য্য, যত তৃষা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্রিত করিয়া নিজের মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে; মনুষ্য-স্বভাব মনুষ্য-চরিত্র তাহার নখদর্পণ হইয়াছে। জগতে শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই; সব জানিয়া ফেলিয়াছে, সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সতীত্বের জ্যোতিঃ সে যেমন দেখিতে পায়, প্রণয়ের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগতে আর যে কেহ তেমন সমজদার আছে, অনুপমা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। অনু ভাবিল, সে একটি মাধবী লতা; সম্প্রতি মুঞ্জরিয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় আশু সহকার-শাখা-বেষ্টিতা না হইলে, ফোট ফোট কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণবিকশিত হইতে পারিবে না। তাহাই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি নবীনকান্তি সহকার মনোনীত করিয়া লইল, এবং দুই চারি দিবসেই তাহাকে মন প্রাণ জীবন যৌবন সব দিয়া ফেলিল। মনে মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্ব্বে সহকারটার মতামতেরও ঈষৎ প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবী লতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরদকান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবী লতা—স্ফুটনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ি ফুল লইয়া মাটীতে লুটাইয়া লুটাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এত জানিতে পারিল না। না জানুক, অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রণয়ে বিচ্ছেদ চির-প্রসিদ্ধ। দুই চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিততনু হইয়া মনে মনে বলিল, "স্বামিন্, তুমি আমাকে লও, বা না লও, ফিরিয়া চাহ, বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার। কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাইব;—

তখন দেখিবে, সতী সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল!" অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটীসংলগ্ন উদ্যানও আছে, মনোরম সরোবর আছে;—সেথা চাঁদও উঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও ঝঙ্কার করে; এইখানে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া, অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, গাত্রে ধূলি মাখিয়া প্রেমের যোগিনী সাজিয়া, সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া গোলাপ পুষ্প চুম্বন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল;—আহারে রুচি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজ সজ্জায় বিষম বিরাগ, গল্প গুজবে রীতিমত বিরক্তি—অনুপমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া অনুর জননী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—"এক বই মেয়ে নয়, তার আবার এ কি হ'ল?" জিজ্ঞাসা করিলে সে কি যে বলে, কেহ বুঝিতে পারে না; ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়। অনুর জননী এক দিবস জগবন্ধু বাবুকে বলিলেন, "ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বই মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় মরে যায়।" জগবন্ধু বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি হ'ল ওর?"

"তা জানিনে।" ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "অসুখ বিসুখ কিছু নাই।"

"তবে এমন হ'য়ে যায় কেন?" জগবন্ধু বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা' কেমন করে জানব?"

"তবে মেয়ে আমার মরে যাক?"

"এ ত বড় মুস্কিলের কথা; জ্বর নেই, বালাই নেই—শুধু শুধু যদি মরে যায় ত আমি কি ধরে রাখব?" গৃহিণী শুষ্কমুখে বড় বধূমাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, অনু আমার এমন ক'রে বেড়ায় কেন?"

"কেমন ক'রে জানব, মা?"

"তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না?"

"কিছু না।" গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন; "তবে কি হবে? না খেয়ে না শুয়ে এমন ক'রে সমস্ত দিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে ক'দিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হ'ক একটা বিহিত ক'রে দে—না হ'লে বাগানের পুকুরে একদিন ডুবে মরব।" বড়বৌ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "দেখে শুনে একটা বিয়ে দাও; সংসারের ভার পড়লে আপনি সব সেরে যাবে।"

"বেশ কথা, তবে আজই এ কথা আমি কর্ত্তাকে জানাব।"

কর্ত্তা এ কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, "কলিকাল! দাও—বিয়ে দিয়েই দেখ, যদি ভাল হয়।" পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটক ঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধু বাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্ত্তা এ কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড়বৌকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও শুনিল।

দুই এক দিবস পরে একদিন দ্বিপ্রহরের সময় সকলে মিলিয়া অনুপমার বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময় সে এলোচুলে, আলু-থালু-বসনে একটা শুষ্ক গোলাপ ফুল হাতে করিয়া ছবিটির মত আসিয়া দাঁড়াইল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মা যেন আমার যোগিনী সেজেছেন!" বড়বৌ ঠাকুরুণও একটু হাসিয়া বলিল, "বিয়ে হলে কোথায় সব চলে যাবে। দুটো একটা ছেলে মেয়ে হলে ত কথাই নেই।" অনুপমা চিত্রার্পিতার ন্যায় সকল কথা শুনিতে লাগিল। বৌ আবার বলিল, "মা, ঠাকুরঝির বিয়ের কবে দিন ঠিক হল?"

"দিন এখনো কিছু ঠিক করা হয়নি।"

"ঠাকুরজামাই কি পড়েন?"

"এইবার বি. এ. দেবেন।"

"তবে ত বেশ ভাল বর।" তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, "দেখতে কিন্তু খুব ভাল না হলে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।"

"কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার বেশ দেখ্‌তে।" এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল; ঈষৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মৃত্তিকা খনন করিবার মত করিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "বিবাহ আমি করিব না।" জননী ভাল শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা?" বড়বৌ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি বলছে,—ও কখন বিয়ে করবে না।"

"বিয়ে করবে না?"

"না।"

"না করুকগে!" অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী চলিয়া যাইলে বড়বধূ বলিল, "তুই বিয়ে করবি নে?"

অনুপমা পূর্ব্বমত গম্ভীরমুখে বলিল, "কিছুতেই না।"

"কেন ?"

"যাহাকে তাহাকে গছাইয়া দেওয়ার নামই বিবাহ নয়। মনের মিল না হইলে বিবাহ করাই ভুল।" বড়বৌ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "গছিয়ে দেওয়া আবার কি লো ? গছিয়ে দেবে না ত কি মেয়েমানুষে দেখে শুনে পছন্দ করে' বিয়ে করবে ?"

"নিশ্চয়।"

"তবে তোর মতে আমার বিয়েটাও ভুল হয়ে গেছে ? বিয়ের আগে ত তোর দাদার নাম পর্য্যন্ত আমি শুনি নি।"

"সবাই কি তোমার মত ?"

বউ আর একবার হাসিয়া উঠিল,—"তোর কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেছে নাকি ?" অনুপমা বধূঠাকুরাণীর সহাস্য বিদ্রূপে মুখখানি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, "বউ, ঠাট্টা করিতেছ নাকি ? এখন কি বিদ্রূপের সময় ?"

"কেন লো—হয়েছে কি ?"

"হয়েছে কি ? তবে শোন—" অনুপমার মনে হইল, তাহার সম্মুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে—সহসা কতলুখাঁর দুর্গে বধমঞ্চ-সম্মুখে বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের দৃশ্য তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল; অনুপমা ভাবিল, তাহারা যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না ? সতী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে ? দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে অঞ্চলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধূ তিন হাত পিছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববর্ত্তী খাটের খুরো বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল,—"প্রভু, স্বামী, প্রাণনাথ, জগৎ-সমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, তুমিই আমার প্রাণনাথ! প্রভু, তুমি আমার, আমি তোমার! ইহা খাটের খুরো নহে, ইহা তোমার পদযুগল—আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি—এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না; কাহার সাধ্য, প্রাণ থাকিতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে! মা গো, জগৎজননী—"

বড়বধূ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল ;—"ও গো দেখসে —ঠাকুরঝি কেমন ধারা কচ্ছে !" দেখিতে দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বউ ঠাকুরুণের চীৎকার বাহির পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। "কি হয়েছে— হোলো কি ?" কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে, পুত্র-পুত্রবধূতে, দাস-দাসীতে মুহূর্ত্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মূর্চ্ছিতা হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে। গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, "অনুর আমার কি হ'লো ?" 'ডাক্তার ডাক!' 'জল আন্!' 'বাতাস কর্!' ইত্যাদি চীৎকারে পাড়ার অর্দ্ধেক প্রতিবাসী বাড়ীতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কোথায় ?" তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।" অনুপমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু মৃদু কহিল, "ওঃ! তোমার কোলে! ভাবিতেছিলাম, আমি আর কোথাও কোনও স্বপ্নরাজ্যে তাঁহার সহিত ভাসিয়া যাইতেছি।" দরবিগলিত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুছাইয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "কেন কাঁদছ মা ? কার কথা বলছ ?" অনুপমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল। বড়বধূ চন্দ্রবাবুকে একপাশে ডাকিয়া বলিল, "সবাইকে যেতে বল ; আর কোনও ভয় নেই ; ঠাকুরঝি ভাল হয়েছে।" ক্রমশঃ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড় বৌ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুই সুখী হোস ?" অনুপমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, "সুখ দুঃখ আমার কিছুই নেই ;—সেই আমার স্বামী—"

"তা' ত বুঝি—কিন্তু কে সে ?"

"সুরেশ! সুরেশই আমার—"

"সুরেশ ? রাখাল মজুমদারের ছেলে ?"

"হাঁ সে-ই।"

রাত্রে গৃহিণী এ কথা শুনিলেন ; পরদিন অমনই মজুমদারদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, "তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও।" সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, "মন্দ কি!"

"ভাল মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।"

"তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। সে বাড়ীতেই আছে ;

তার মত হ'লে কর্ত্তার অমত হবে না।" সুরেশ বাড়ীতে থাকিয়া তখন বি. এ, পরীক্ষার-জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—এক মুহূর্ত্ত তাহার এক বৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলে সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, "সুরে, তোকে বিয়ে কর্‌তে হবে।" সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, "তা' ত হবেই, কিন্তু এখন কেন? পড়ার সময় ও সব কথা ভাল লাগে না।" গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না—, পড়ার সময় কেন! একজামিন হ'য়ে গেলে বিয়ে হবে।"

"কোথায়?"

এই গাঁয়ে জগবন্ধু বাবুর মেয়ের সঙ্গে।"

"কি? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে? যেটাকে খুকী বলে' ডাকৃত?"

"খুকী বোলে ডাকৃবে কেন,—তার নাম অনুপমা।" সুরেশ অল্প হাসিয়া বলিল, "হাঁ—অনুপমা!, তা—দুর দুর—সেটা ভারি কুৎসিত।"

"কুচ্ছিত হবে কেন? সে বেশ দেখ্‌তে।"

"তা' হোক বেশ দেখ্‌তে; এক যায়গায় শ্বশুর বাড়ী, বাপের বাড়ী আমার ভাল লাগে না।"

"কেন, তাতে আর দোষ কি?"

"দোষের কথায় কাজ নেই, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু পড়ি; কিছুই এখনো হয় নি।" সুরেশের জননী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সুরে ও' এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।"

"কেন?"

"তা ত জানি নে।" অনুর জননী মজুমদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া কাতর-ভাবে বলিলেন, "তা হবে না, ভাই। এ বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে।"

"ছেলের অমত, আমি কি করব বল?"

"না হ'লে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

"তবে আজ থাক; কাল আর একবার বুঝিয়ে দেখ্‌ব—যদি মত করতে পারি।"

অনুর জননী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধু বাবুকে বলিলেন, "ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে আমার মেয়ের বিয়ে হয়, তা কর।"

"কেন বল দেখি? রায়গ্রামে ত এক রকম সব ঠিক হয়েছে; সে সম্বন্ধ আবার ভেঙ্গে কি হবে?"

"কারণ আছে।"

"কি কারণ ?"

"কারণ কিছুই নয়; কিন্তু সুরেশের মত অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে? আরও—আমার একটি মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হ'লে যখন খুসী দেখ্‌তে পাব।"

"আচ্ছা—চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা নয়—নিশ্চয় দিতে হবে।" কর্ত্তা নথ নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"তাই হবে গো !"

সন্ধ্যার পর কর্ত্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "বিয়ে হবে না।"

"সে কি কথা!"

"কি করব, বল ? ওরা না দিলে ত আমি জোর কোরে ওদের বাড়ীতে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনে!" "দেবে না কেন ?"

"এক গাঁয়ে বিয়ে হয়—ওদের মত নয়।" গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার কপালের দোষ!" পরদিন তিনি পুনরায় সুরেশের জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "দিদি, বিয়ে দে।"

"আমার ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মত হয় কৈ ?"

"আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরো পাঁচ হাজার টাকা দেব।"

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ কথা সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্ত্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে।"

"কেন ?"

"কেন আবার কি ? এ বিবাহে তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও মত; সঙ্গে সঙ্গে একটু কারণও হইয়া পড়িয়াছে।" সুরেশ নতমুখে বলিল, "এখন পড়াশুনার সময়—পরীক্ষার ক্ষতি হইবে।"

"তাহা আমি জানি বাপু, পড়া শুনার ক্ষতি করিতে তোমাকে বলিতেছি না। পরীক্ষা শেষ হইলে বিবাহ করিও।"

"যে আজ্ঞা।"

অনুর জননীর আনন্দের সীমা নেই; এ কথা তিনি কর্ত্তাকে বলিলেন,

দাসদাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ কথা জানাইয়া দিলেন। বড়বৌ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, "ওলো! বর যে ধরা দিয়েছে।"

অনু সলজ্জে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাহা আমি জানিতাম।"

"কেমন করিয়া জানলি? চিঠিপত্র চল্‌ত নাকি?"

"প্রেম অন্তর্য্যামী! আমাদের চিঠিপত্র অন্তরে অন্তরেই চলিত।"

"ধন্যি মেয়ে তুই!"

অনুপমা চলিয়া যাইলে বড়বধূ ঠাকুরাণী মৃদু মৃদু বলিল, "পাকামি শুন্‌লে গা জ্বালা করে! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শেখাতে এলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার ফল।

দুর্লভ বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোকে গমন করিলে তাঁহার বিংশতি-বর্ষীয় একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্ত করিয়া একদিন স্কুলে যাইয়া মাষ্টারকে বলিল, "মাষ্টার মহাশয়, আমার নামটা কাটিয়া দিন।"

"কেন বাপু?"

"মিথ্যা পড়িয়া শুনিয়া কি হইবে? যে জন্য পড়াশুনা, তাহা আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্য অনেক পড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন।"

মাষ্টার চক্ষু টিপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, "তবে আর ভাবনা কি? এইবার চরিয়া খাওগে।" এইখানেই ললিতমোহনের বিদ্যাভ্যাসে ইতি হইল।

ললিতমোহনের কাঁচা বয়স, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবামাত্র বিস্তর বন্ধুও জুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, গায়ক গায়িকা, ইত্যাদি একটির পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানাও পূর্ণ করিল। এ দিকে পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশিও জলবৎ ঢেউ খেলিয়া তরতর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। এক দিন সে ঘূর্ণিতলোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল, "মা, এখনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও"। "একটি পয়সাও আমার নেই।" ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর হাতবাক্স চিরিয়া ফেলিয়া

পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্দুকের চাবি দিয়া বলিলেন, "বাবা, এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও; তোমার বাপের টাকা যেমন ইচ্ছা খরচ কোরো, আমি আর বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমার চোখ ফোটে।"

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায় যাবে?"

"তা জানিনে। আত্মঘাতী হ'লে কোথায় যেতে হয়, তা' কেউ জানে না; তবে শুনেছি, সদ্গতি হয় না। তা' কি করব, বল,—আমার যেমন কপাল!"

"আত্মঘাতী হবে?"

"না হ'লে আর উপায় কি? তোমাকে পেটে ধ'রে আমার সব সুখই হ'ল! এখন নিত্যি নিত্যি তোমার লাথি ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূটের আগুন-কুণ্ড ভাল।"

ললিতমোহন জননীকে চিনিত; সে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাকে মাপ কর, এমন কাজ আর কখনও করব না। তুমি থাক, তুমি যেও না।"

জননী রুক্ষভাবে বলিলেন, "তাও কি হয়? তোমার বন্ধুবান্ধব—তার সব যাবে কোথায়?"

"আমি কাউকে চাইনে। আমি টাকাকড়ি বন্ধুবান্ধব কিছুই চাইনে—শুধু তুমি থাক।"

"তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

"কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা' বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেছি? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তা'র অধিক এক পয়সাও চাব না।"

"ইচ্ছা-সুখে তোমাকে এক পয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না—কেন না; এই এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ, তার অর্দ্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জ্জন করতে পারবে না।"

"তুমি আমাকে কিছুই দিও না।"

জননী কোমল হইলেন ; "না—অতটা তোমার সবে না ; আমিও তা ইচ্ছে করিনে। মাসে এক শ' টাকা পেলে তোমার চল্‌বে কি ?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তবে তাই হোক।"

দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সরিয়া ড়িতে লাগিল। ললিতমোহন দুই এক জনের বাটীতে ডাকিতে গেল ; কেহ বলিল, 'কাল যাব'। কেহ বলিল,'আজ কাজ আছে'। ফলতঃ কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না ; কিন্তু সময় কিরূপে কাটিবে ? কাজেই মদ ছাড়া হইল না। একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত ; এ পথটা জগদ্বন্ধু বাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া—অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া মদ খাইয়া এইখানে বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি ; কাহারও বাটীতে যাওয়া তাহার ভাল দেখায় না—কাজেই মদ খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত। আজকাল তাহার আর এক জন সঙ্গী জুটিয়াছে ;—সে, অনুপমা! আসিতে যাইতে সে প্রায়ই দেখে, তাহারই মত অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে—কিন্তু আজকাল তাহাতে যেন একটু নূতনত্ব দেখিতে পায়। জগদ্বন্ধু বাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে, অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তরুতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও বা ফুল তুলিতেছে, এক এক সময় বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকাসুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহাকে বেশ লাগে ; ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চুলগুলি, অযত্নরক্ষিত দেহলতা, আলু-থালু বসন ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মদের চোখে একটি পদ্মফুলের মত বোধ হইত। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। রাত্রি হইলে বাড়ীতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে, স্বপ্নেও কখনও কখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এমনই করিয়া কত দিন যায় ; জগদ্বন্ধু বাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটিতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজকাল তাহার নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে ; অল্পদিনেই বুঝিতে

পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এরূপ ভালবাসায় লাভ নাই—সে জানিত, সে মাতাল; সে অপদার্থ, মূর্খ; সে সকলের ঘৃণিত জীব—অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে—শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাইতে পারা সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ কি? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না—সূর্য্য অস্তগত হইলেই সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙ্গা পাঁচিলটির উপর আসিয়া বসিত। তবে ভিতরে একটা কথা আছে। —কাহাকেও ভালবাসিলে মনে হয়, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে; আমাকে কেন বাসিবে না? অবশ্য, এ কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

* * * * *

একদিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে। এমন সময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল।

চন্দ্রবাবু দ্বারবানকে হাঁকিয়া বলিলেন, "* * কো পাকড়ো।" দ্বারবান প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কাহাকে ধরিতে হইবে; পরে যখন বুঝিল, ললিত বাবুকে, তখন সেলাম করিয়া তিন হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রবাবু পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "* কো পাকাড়কে থানামে দেও।"

দ্বারবান আধা বাঙ্গলা আধা হিন্দীতে বলিল, "হামি নেহি পারবে বাবু।" ললিতমোহন ততক্ষণ ধীরে ধীরে প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে চন্দ্রবাবু বলিলেন—"কাহে নেহি পাকড়া?" দ্বারবান চুপ করিয়া রহিল। এক জন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল, "ও বেটা ভোজপুরীর সাধ্য কি, ললিত বাবুকে ধরে? ওর মত চারটে দরওয়ানের মাথা ওর এক ঘুসিতে ভেঙ্গে যায়।" দ্বারবানও তাহা অস্বীকার করিল না—বলিল, "বাবু নোকরি করনে আয়া, না জান দেনে আয়া?"

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ললিতের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন; এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া, অনধিকার প্রবেশ এবং আরও কত কি অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধু বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এ মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনিলেন না। বিশেষ মর্ম্মপীড়িতা অনুপমা জিদ ধরিয়া বলিল যে, পাপীকে শাস্তি না দিলে তাহার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইনস্পেক্টর বাটীতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল; অনুপমা সমস্তই ঠিক ঠাক বলিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, ললিতের জননী, বিস্তর অর্থ-ব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিত-মোহনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

* * * *

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছেন। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন—"নিজের কথা নিজে বল্‌তে নেই, কিন্তু দেখ দেখি একবার আমার মেয়ের পয়!"

সুরেশের মাতা সহাস্যে বলিলেন, "তা' ত দেখছি।"

"একবার বিয়ে হোক্, তার পর দেখিস—তোর ছেলে রাজা হবে,—অনু যখন জন্মায়, তখন এক জন গণৎকার এসে গুণে' বলেছিল যে, এ মেয়ে রাণী হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকেনি, থাকবে না; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।"

"কে বলেছিল?"

"এক জন সন্ন্যাসী।"

"কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ী কিনে দিও।"

"তা আর দোব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলে বলেই জানি, কিন্তু অনুরও ত ধর্‌লে কর্ত্তার অর্দ্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাক্‌লে তা' পাবেও।"

"তাই হোক—ওরা রাজা রাণী হয়ে সুখে থাক—আমরা যেন দেখে মরি"

দুই দিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "৫ই বৈশাখ তোমার বিবাহের দিনস্থির করিলাম।"

"এখন বিবাহ হয়, আমার একেবারে ইচ্ছা নয়।"

"কেন?"

"আমি Guilchrist Scholership পাইয়াছি, তাহাতে আমি ইচ্ছা করিলে বিলাতে গিয়া পড়িতে পারি।"

"তুমি বিলাত যাইবে?"

"ইচ্ছা আছে।"

"পড়িয়া পড়িয়া তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অমন কথা আর মুখে আনিও না।"

"বিনা পয়সায় যখন এ সুবিধা পাইয়াছি, তখন দোষ কি?" রাখাল বাবু এ কথায় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; "নাস্তিক বেটা! দোষ কি? পরের পয়সায় যদি বিষ পাওয়া যায় ত কি খেতে হবে?"

"সে কথায় এ কথায় অনেক প্রভেদ।"

"প্রভেদ আর কোথায়? এক দিকে জাতি খোওয়ান, ম্লেচ্ছ হওয়া, আর অপর দিকে বিষ-ভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল চুল মিলিয়া গেল না কি?"

সুরেশ আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে রাখাল বাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, "বেটা পাতা দুই ইংরিজি প'ড়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক কর্‌তে আসে! কেমন কথাটা বল্‌লাম,—'পরের পয়সায় বিষ পেলে কি খেতে হবে?' বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বল্‌তে পারলে না। এ অকাট্য যুক্তি কি ও কাটতে পারে!"

বিবাহের সমস্ত পাকা রকম স্থির হইয়া যাইলে বড়বধূ একদিন অনুপমাকে বলিলেন, "কি লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না!"

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "যার সতী সাধ্বী স্ত্রী, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে।"

"তবু ত এখনো বিয়ে হয়নি লো!"

"বিবাহ আমাদিগের অনেক দিন হইয়াছে; জগৎ জানে না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বহুদিন আমাদিগের পূর্ণ মিলন হইয়া গিয়াছে।"

বড় বধূ অল্প হাসিল; ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু থামিয়া বলিল, "এ কথা আর কোথাও বলিস্‌নে; আমরা বুড়ো মাগী, আমাদেরো,—বলা দূরে থাক—এমন ধারা শুন্‌লেও লজ্জা করে; সব কথায় তুই যেন থিয়াটারে Act (অ্যাক্ট) কত্তে থাকিস। —এমন করলে লোকে পাগল বল্‌বে যে।"

"আমি প্রেমে পাগল!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

আজ ৫ই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগদ্বন্ধু বাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না; কত লোক যাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান দাওয়ানর ঘটা, কত বাজনা বাদ্যের ধূম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধুমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যা লগ্নেই বিবাহ; এখনই বর আসিবে— সকলেই উৎসাহে আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে।—কিন্তু বর কোথায়? রাখাল বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কলরব বাধিয়া উঠিয়াছে—'সুরেশ গেল কোথায়?' 'এখানে খোঁজ', 'ওখানে খোঁজ', 'এ দিকে দেখ', 'ও দিকে দেখ।' কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রাগ্নির মত এ কথা জগদ্বন্ধু বাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; "সে কি কথা!"

আটটার সময় বিবাহের লগ্ন, কিন্তু নয়টা বাজিতে চলিল; কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগদ্বন্ধু বাবু মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহিনী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িলেন, "কি হবে গো?" কর্ত্তার তখন অর্দ্ধক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন —"হবে আমার শ্রাদ্ধ—আর কি হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধ বয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল; এখন একঘ'রে হ'য়ে থাক্‌তে হবে। কেন মর্‌তে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান! শাস্ত্রেই আছে,—'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী'। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ'য়ে যাও।—"

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া আর কাজ নাই। এ দিকে এই— আর ও দিকে আর এক বিপদ। অনুপমা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছে।

এ দিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে; দশটা, এগারোটা, বারটা করিয়া ক্রমশঃ একটা, দুইটা বাজিয়া গেল; কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না।

সুরেশকে পাওয়া যাক আর না যাক, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিতেই হইবে! কেন না, আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে জগদ্বন্ধু বাবুর জাতি যাইবে।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশবর্ষীয় কাশরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচ জন জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল, এমনই করিয়া তাহার মাথা খাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্চ্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল,—"ওমা! আমায় রক্ষা কর, এমন ক'রে আমার গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব।" মা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি কি করব, মা?" মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাঁদিয়া কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন, "ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখ, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিষ খাবে।" কর্ত্তা কোনও কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ওঠ; ভোর হয়ে যায়।"

"কোথায় যাব, বাবা!"

"এখনই সম্প্রদান করব।"

অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল—"বাবা আমাকে মেরে ফেল—আমি বিষ খাব।" "যা ইচ্ছে হয়, কাল খেয়ো মা,—আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তার পর যেমন খুসী কোরো, বিষ খেও, জলে ডুবে মরো, আমি একবারও বারণ করব না।" কি নিদারুণ কথা! এইবার যথার্থই অনুপমার ভিতর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। "বাবা! আমায় রক্ষা কর।" কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোনও কথাই খাটিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগবন্ধু বাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর, একটু শাক সব্জীর বাগান—ইহাই দত্তজার সাংসারিক সম্পত্তি। বহু ক্লেশে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ী আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিল; অনেক দাস দাসী আসিল—কোনও ক্লেশ নাই—ছয় সাত দিবস তাঁহার পরমসুখে অতিবাহিত হইল। বড়লোক শ্বশুর—আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে। কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন দুই থাকিয়া সে যখন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাস দাসীরাও গোপনে চক্ষু মুছিল।

বাড়ী গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা স্বামি-ভবন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার তাহার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাগানের পুষ্করিণীর সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে; মুখের মরা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর একদিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সেও অধিক দিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেন না, এক জন ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন্ অপরাধে? শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। কে জেলে দিল! চন্দ্রবাবু। কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া, সে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না! পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই; বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, ললিত কি যথার্থই ভালবাসিত! হয় ত বাসিত—হয় ত বাসিত না; না বাসুক কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধি-হইয়াছে? জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছে, ঘানি টানিতেছে, আরও কত কি নীচ কর্ম্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয় ত চন্দ্রবাবুর লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাঁহাকে পাইতে পারিত? যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল; তাহার পর জলে নামিল। এক হাঁটু, এক বুক, এক গলা করিয়া ক্রমশঃ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আধ মিনিট কাল জলতলে থাকিয়া থাকিয়া, অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল, আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাঁতার দিতে জানিত, তাই সমস্ত পুষ্করিণীটা তন্ন তন্ন করিয়াও কোথায়ও ডুবন জল মিলিল না। অনেকবার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও ডুব দিয়া নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিঃশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়! এইরূপে সমস্ত পুষ্করিণীটা সাঁতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার ক্লান্ত অবসন্ন নির্জ্জীব দেহখানা কোনরূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে কোনও অবস্থায় যে কোনও কারণেই হউক, এমন করিয়া একটু একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে। পূর্ব্বে সে

বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিততনু হইয়া দিনে শত বার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না রাখা নায়ক নায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল, তাহাকে জন্মের মত বিদায় দেওয়া—তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোর বেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে; মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনু, এত ভোরেই নেয়ে এলি মা?" অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হঁা।"

এ দিকে দত্ত মহাশয়, একরূপ চিরস্থায়ি-রূপে শ্বশুর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম জামাই-আদর তাঁহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বাড়ী শুদ্ধ কেহই প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবাবু প্রতিকথায় তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ অপদস্থ লাঞ্ছিত করেন; তাহার একটু কারণও হইয়াছিল; একে ত চন্দ্রবাবুর হিংসাপরবশ অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্ম্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধু বাবু কিছু বিষয় আশয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না; খাশুড়ী ঠাকুরাণীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যত্ন আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না; যাহা পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার উপর দু'বেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় দত্ত মহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার সুখভোগ করিবার অধিক দিনও আর বাকি ছিল না। একে জীর্ণ শীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাশরোগ অনেকদিন হইতে তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত। এবারও শীতকালে বিষম টানাটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধু বাবু দেখিলেন, যক্ষ্মা রামদুলালের অস্থি-মজ্জায় প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয় সুচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছুদিন সুচিকিৎসার পর সতী সাধ্বী অনুপমার কল্যাণে দুটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলাল সংসার ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তথাপি অনুপমা একটু কাঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙ্গালীর মেয়েকে কাঁদিতে হয়, তাহাই কাঁদিল। তাহার পর স্বইচ্ছায় শাদা থান পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অনু, তোর এ বেশ ত আমি চোখে দেখতে পারি না। অন্ততঃ হাতে একজোড়া বালাও রাখ।"

"তা' হয় না; বিধবার অলঙ্কার পরিতে নেই।"

"কিন্তু তুই কচি মেয়ে।"

"তা হউক, বাঙ্গালীর মেয়ে বিধবা হইলে কচি বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়।" জননী আর কি বলিবেন? শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধব্যে লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে, তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সধবা থাকে? কর্ত্তাও এ কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন; তাহাই শোকটা নূতন করিয়া আর হইল না। যাহা হইবার তাহা বিবাহরাত্রেই হইয়া গিয়াছে স্বামীকে ভালবাসিল না, জানিল না, শুনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধব ব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুষ্টি স্বহে সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে; আজ পূর্ণিমা; কা অমাবস্যা; পরশু শিবরাত্রি; এমন করিয়া মাসের পনর দিন সে কিছুই খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, "আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও।" এত কিন্তু সহিবে কেন? উপবাসে অনিয়মে অনুপমা শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গেল। দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্ত্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অনুর আবার বিয়ে দিই।" গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কি হয়? ধর্ম্ম যাবে যে।"

"অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, দুইবার বিবাহ দিলেই ধর্ম্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করিয়া খুন করিলেই ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা।" "তবে দাও।" অনুপমা কিন্তু এ কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা হয় না।" কর্ত্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুব হয়, মা।"

"তাহা হইলে আমার ইহকাল পরকাল—দুই কালই গেল।"

"কিছুই যায় নাই, কিছুই যাইবে না—বরং না হইলেই যাইবার সম্ভাবনা। মনে কর, তুমি যদি গুণবান পতি লাভ কর, তাহা হইলে দুই কালেরই কাজ করিতে পারিবে।"

"একা কি হয় না?"

"না, মা, হয় না। অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া সামান্য কোনও একটা কর্ম্ম করিতে হইলেই তাহাদিগকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, স্বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করিতে পারে, বল? আরও কি দোষে তোমার এত শাস্তি?" অনুপমা আনতমুখে বলিল, "আমার পূর্ব্ব-জন্মের ফল!" গোঁড়া হিন্দু জগবন্ধু বাবুর কর্ণে এ কথাটি খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তাই যদি হয়, তবুও তোমার এক জন অভিভাবকের প্রয়োজন; আমাদের অবর্ত্তমানে কে তোমাকে দেখিবে?" "দাদা দেখিবেন।"

"ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে? সে তোমার মার পেটের ভাই নয়; বিশেষ, আমি যত দূর জানি, তাহার মনও ভাল নয়।" অনুপমা মনে মনে বলিল, "তখন বিষ খাব।" "আরও একটা কথা আছে অনু; পিতা হইলেও সে কথা আমার বলা উচিত,—মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক এক রকমই থাকিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না; বিশেষ, যৌবনকালে প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদা বশ রাখিতে মুনি ঋষিরাও সমর্থ হন না।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, "জাত যাবে যে!"

"না মা, জাত যাবে না—এখন আমার সময় হয়ে আস্‌ছে—চোখও ফুটেছে।" অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল, "তখন জাতি গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষুঃকর্ণ বন্ধ করিয়া তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবিলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেছে—আমিও ভালরূপ প্রতিশোধ দিব।"

কোনরূপে তাহাকে টলাইতে না পারিয়া জগবন্ধু বাবু বলিলেন, "তবে মা, তাই ভাল; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাই না। তোমার খাইবার পরিবার ক্লেশ না হয়, তা আমি করিয়া যাইব! তাহার পর ধর্ম্মে মন রাখিয়া যাহাতে সুখী হইতে পার, করিও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবুর সংসার।

তিন বৎসর পরে খালাস হইয়াও ললিতমোহন বাড়ী ফিরিল না। কেহ কহিল, লজ্জায় আসিতেছে না; কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাইতে পারে? ললিতমোহন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা একদিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা, এবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও, যাহা কপালে ছিল, তাহা ত ঘটিয়া গিয়াছে; এখন সে জন্য আর মনে দুঃখ করিও না।" ললিতও যাহা হয় একটা করিবে, স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া, ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল; বিশেষ দেখিল জগবন্ধু বাবুর বাটীতে! কর্ত্তা গিন্নী কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথ বাবু এখন সংসারের কর্ত্তা; অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে; কারণ, তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্ব্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল, পিতা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে, এবং সেই টাকায় পুণ্যধর্ম্ম নিয়ম ব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে একবারে মর্ম্মাহত হইল; পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বড়লোক; এই সামান্য টাকা তাহাদিগের নিকট টাকাই নহে; বাস্তবিক, এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামের অনেকেই কানাঘুষা করিল, এ উইল জগবন্ধু বাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে কথায় ফল কি? নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্র বাবুর বাটীতেই রহিল।

লোকে বলে, পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সৎমাকে চিনিতে পারা যায় না; সৎভাইকেও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত চিনিতে পারা কঠিন। এতদিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা চন্দ্রনাথ বাবু কি চরিত্রের মনুষ্য। যত প্রকার অধম শ্রেণীর মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রনাথ বাবু তাহাদের সর্ব্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে একতিল দয়া মায়া নাই—চক্ষে একবিন্দু চামড়া পর্য্যন্ত নাই। অনুপমার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায়,

এমন কি, উঠিতে বসিতে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল এত অধিক না দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভাল জানেন। বড়বধূ পূর্ব্বে তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনিও দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ মা বাঁচিয়া ছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচ জন ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপনার বলিতে কেহ নাই, টাকা কড়ি নাই, পরের অন্ন না খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড় বধূর তিন চারিটি ছেলে মেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ত্রুটী হইলেই অমনি বড়বধূঠাকুরাণী রাগ করিয়া রীতিমত পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দু'বেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই চারিটা ভাল তরকারী রাঁধিতে হয়; পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হউক, দ্বাদশীই হউক, আর উপবাসই হউক, সে রান্না তাহাকে রাঁধিতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিত; এখন তাহাকে সে সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরাণী বলিয়া উঠেন, "ঠাকুরঝি, একটু হাত চালিয়ে নাও; ছেলেরা কাঁদছে—এখন পর্য্যন্ত কিছু খেতে পায়নি।" অনুপমা যা' তা' করিয়া উঠিয়া আসে; একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাত্রে রন্ধন করিতে যাইতে হয়; তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়; কেন না, জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন—না হইলে অনুপমা এতদিন মরিয়া যাইত।

এ সংসারে তাহা অপেক্ষা দাস দাসীরাও শ্রেষ্ঠ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো বলিলে তাহারাও দুটো জোরের কথা বলিতে পারে; অন্ততঃ "আমার মাহিনাপত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ী যাই"—এ কথাও বলিতে পারে; কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না; সে বিনামূল্যে ক্রীতদাসী; মারো, কাটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার যো নাই; সে বিধবা, সে বড়লোকের কন্যা! অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না; বুঝিতে হয়!

বাঙ্গালীর ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে না বুঝিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে বসিল। তখনও পনর মিনিট হয় নাই; বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার কি আজ সমস্ত দিনে হবে না? এমন করলে চলবে না বাপু।" অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না; বড়বধূ দশ মিনিট পরে পুনর্ব্বার ঘুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চীৎকার করিলেন,"অত পুণ্য ছালায় আঁটবে না গো, অত পুণ্যি কোরো না—আর অত পুণ্যি-ধর্ম্মের সখ হয়ে থাকে ত বনে জঙ্গলে গিয়ে করগে, সংসারে থেকে অত বাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না।" তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড়বউ দ্বিগুণ চেঁচাইয়া উঠিলেন, "বলি—কেউ খাবে দাবে—না, না?" অনুপমা হস্তস্থিত বিল্বপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি কিছু পারব না।"

"পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?"

"কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কি হ'ল?"

"তার জ্বর হয়েছে—আর উনি কি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?"

"না পারেন—তুমি রেঁধে দাওগে।"

"আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ ২৪ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে—আর আমি আগুনের তাতে যাব?"

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "তবে সবাইকে উপোস কর্‌তে বলগে।"

"তাই যাই—তোমার দাদাকে এ কথা জানাইগে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে ধুয়ে এলে, এখনি গিল্‌বে কুট্‌বে, আর বড় ভাইকে একটু রেঁধে খাওয়াতে পার না?"

"না পারিনে। বড়বউ, আমি তোমাদের কেনা বাঁদী নই যে, যা মুখে আস্‌বে, তাই বল্‌বে। আমি এ সব কথা দাদাকে জানাব।"

"বড়বউ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তাই জানাওগে—তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক্!"

অনুপমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তা জানি। দাদা ভাল লোক হ'লে আর তোমার এত সাহস!"

"কেন, তিনি করেছেন কি? খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন—আবার

কি কর্‌বেন? সত্যি সত্যি ত আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাকে মাথায় ক'রে রাখ্‌তে পারেন না—এ জন্য আর মিছে রাগ করলে চল্‌বে কেন?"

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। সে এত দিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, "দাদা আমাকে খাওয়াবেন পরাবেন কি—যে বাপের টাকায় তিনি খান—আমিও সেই বাপের টাকায় খাই।" বড়বউও ক্রুদ্ধ হইল,—তাই যদি হ'ত, তা হ'লে বাপ আর তোমাকে পথের কাঙ্গাল ক'রে রেখে যেত না।"

"পথের কাঙ্গাল করে' তিনি যান নি, তোমরাই করেছ। গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যান নি। সে টাকা দাদা চুরী না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া খেতে হোতো না।" বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, —"গ্রাম শুদ্ধ সবাই জানে—উনি চোর? তবে এ কথা ওঁকে জানাব?"

"জানিও -আরও বোলো যে, পাপের ফল তাঁকে পেতেই হবে।"

সে দিন এমনই গেল। অবশ্য এ কথা চন্দ্রনাথ বাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

চন্দ্রনাথ বাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া এক জন ছোঁড়া মত ভৃত্য ছিল। পাঁচ ছয় দিন পরে চন্দ্রবাবু একদিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। চীৎকার-শব্দে অন্যান্য দাস দাসীরা ছুটিয়া আসিল—তখনও অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিয়া সেও ছুটিয়া আসিল। ভোলার নাক মুখ দিয়া তখন রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা, কর কি—মরে গেল যে!" চন্দ্রবাবু খিঁচাইয়া উঠিলেন, "আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌ব। তোকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ ব'লে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করবো না। বাবা তোকে পাঁচ শ' টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা।" অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু বলিল, "সে কি!"

"কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হ'য়ে যাও।—বাইরে গিয়ে যা খুসী করগে।"

অনুপমা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। দাস দাসীরা সকলেই

এ কথা শুনিল; কেহ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল; কেহ হাসি চাপিয়া ভাল-মানুষের মত সরিয়া গেল; কেহ বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিতে আসিল। চন্দ্রনাথ বাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর একটা পদাঘাত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শেষ দিন।

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ সংসারে আর সে থাকিবে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলেবেলায় ভালবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে ঘুচাইয়াছিল; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া বিধাতা তাহাকে একদিনও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালবাসিত—মনে করিত, তাহাকে পাইল না; যে ভালবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থল নাই, স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন সতীত্বের সুযশ, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে এ সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত কৌমুদী-রজনীতে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, আবার,—বার বার তিনবার—পুষ্করিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে। আর বার সন্তরণশিক্ষাটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুষ্করিণীর কোথায় ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে—এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে। মরিবার পূর্ব্বে পৃথিবী বড় সুন্দর দেখায়। ঘর-বাড়ী, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফল, ফুল, লতা, পাতা, বৃক্ষ, সব সুন্দর হইয়া উঠে; যে দিকে চাও, সেই দিকই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, "মরিও না; দেখ, আমরা কত সুখে আছি—তুমিও সহ্য করিয়া থাক, একদিন সুখী হইবে। না হয় আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাকে সুখী করিব; অনর্থক বিধাতৃ-দত্ত আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না।" মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময়ে ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহার এক তিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার এক বিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজন নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, "ছি ছি! ফিরিয়া যাও—এমন কাজ করিও

না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইবে? কেমন করিয়া জানিলে, ইহা অপেক্ষা আরও গভীর দুঃখে পতিত হইবে না?" মানুষ অমনই সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এ সব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের কথা মনে হইল! যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাহাকে ভালবাসিত, তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে, শুধু এক জন এখনও জীবিত আছে। সে ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই; বরং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। শুধু কি তাই? জেলে পর্য্যন্ত দিয়াছিল; ললিত সেখানে কত ক্লেশ পাইয়াছিল, হয় ত অনুপমাকে কত অভিস্পাত করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, নিশ্চিত সেই পাপেই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা! সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাল হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে। * * * সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয় ত করে না, হয় ত বা করে—কিন্তু তাহাতে কি? তাহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে। তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে, আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়া মরিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি ছি! কত ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে!

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল। এমন সময় কে এক জন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "অনুপমা!" অনুপমা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, এক জন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল, এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

"অনুপমা, আত্মহত্যা করিও না।"

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানতা লজ্জাবতী লতা নহে; সে সাহস করিয়া বলিল, "আমি আত্মহত্যা করিব, আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

"তবে গলায় কলসী বাঁধিয়াছ কেন?" অনুপমা মৌন হইয়া রহিল।

আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আত্মঘাতী হইলে কি হয় জান?"

"কি?"

"অনন্ত নরক।" অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলসী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, "এ সংসারে আমার স্থান নাই।"

"ভুলিয়া গিয়াছ। আমি মনে করিয়া দিতেছি। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে এক জন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চাহিয়াছিল,—স্মরণ হয়?" অনুপমা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া বলিল, "হয়।"

"এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

"আমার কলঙ্ক রটিয়াছে—আমার বাঁচা হয় না।"

"মরিলেই কি কলঙ্ক যায়?"

"যাক না যাক, আমি তাহা শুনিতে যাইব না।"

"ভুল বুঝিয়াছ, অনুপমা। মরিলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মত তোমার নামের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে। বাঁচিয়া দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হইবে না।"

"কিন্তু কোথায় যাইয়া বাঁচিয়া থাকিব?"

"আমার সঙ্গে চল।"

অনুপমার একবার মনে হইল, তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, "আমাকে ক্ষমা কর।" বলিবে, "তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি দূরে গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি।" পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আমি যাইব না।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* * * *

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল, সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে। পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতরস্বরে বলিল, "কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

* * * *

কিছু দিন পরে জননীর মত লইয়া ললিতমোহন অনুপমাকে বিবাহ করিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।